

“দাস গোস্বামী”

[‘ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত’ ‘স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্য’,
‘গঙ্গৌরা-বিহারী গৌরহরির লীলাচল লীলার ধারক’
‘আরোপে আরতি হেরে ছ’ছ’কারী’
শ্রীমদ রাঘুনাথ দাস গোস্বামীর
সু-দীনশীল জীবন চরিত ।]

“প্রচার সংস্করণ”

প্রকাশনে—

“শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রেরণা”

সঙ্কলনে—

রামকিঙ্কর দ

প্রথম প্রকাশ :

শ্রী শ্রী সত্যানন্দ প্রকাশ

১৭ই মার্চ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ ;

এই তিথিটি :

- (১) 'গৌরহরির অভিন্ন-তনু' নিতাইটানের আবির্ভাব তিথি
এবং
- (২) পরম গুরুদেব শ্রীল রাখারাম চরণদাস দেবের নবদ্বীপস্থ
প্রখ্যাত 'সমাজবাটিতে' প্রথম প্রবেশ তিথি

"রাজপথের গাছ তলার কাড়িয়ে কেউ আমার গাছ ব'লে দাবী করলে কলহ হয়, রাজা কি সে কথা জানেন? তিনি বলেন—

'পথের গাছ সবাই, ওর 'ছায়া' ওর 'ফুল' ওর 'ফলে' সবাই সমান অধিকার। নষ্ট ক'লেই দোষী।'

ভক্তি পথে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা তাঁরই তৈয়ারী গাছ, তিনি স্বতদিন রাখবেন ততদিন সকলেরই। তবে তুমি যদি তোমার বাগানে লাগাতে চাও ওর বীজ নিয়ে যাও।"

(নামময়জীবন শ্রীল রাখারাম বাবাজী)

দৃশ :

যশোর প্লেস, ৫৭, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৫



শ্রীরামহরিদাস বাবাজী
বৃন্দাবন ও শ্রীনবদ্বীপ



শ্রীহরিচরণ দাস বাবাজী
কুন্তলসরোবর, শ্রীকুণ্ড



শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী
কেশিঘাট, শ্রীবৃন্দাবন



শ্রীরাধারমনচরণ দাস দেব
সমাজবাটা, নবদ্বীপ

শুভ বিটাই গৌর বাধেশ্যাম ।

জগ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

জয়গুরু শ্রীগুরু

জয় ঠাকুর হরিদাস



বাবাজী ম'শায়ের নিত্য 'দর্শন' স্মরণ ও বন্দনার মহাপুরুষবৃন্দ :-
শ্রীশ্রীজগদগুরু প্রভু, শ্রীহরিবোলানন্দ ঠাকুর, প্রভূপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,
অবধূত জ্ঞানানন্দস্বামী, শ্রীশ্রীপ্রেমাঙ্গক ভারতী, শ্রীমৎ স্বামীসচ্চিদানন্দ-
বালকৃষ্ণ ব্রজবালা, শ্রীগোবহরিদাস বাবাজী, শ্রীরামহরিদাস বাবাজী,
শ্রীহরিচরণদাস বাবাজী, শ্রীমাধবদাস বাবাজী, শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী এবং
পরম গুরুদেব শ্রীল বাধারমণ চরণদাস বাবাজী ।
—এঁদের 'চিত্র' পরপৃষ্ঠায় সংযোজিত হইল ।

“শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা”

“জয় জয় শ্রীগুরু

প্রেম-কল্পতরু”

বল ভাই—জয় জয় শ্রীগুরু

একবার,—জয় দাও ভাই

পরম-করণ শ্রীগুরুদেবের

জয় দাও ভাই

অযাচিত কৃপাকারী প্রভুর

জয় দাও ভাই

অদোষে-দরশী প্রভুর

জয় দাও ভাই

অগতির গতি দাতা প্রভুর

জয় দাও ভাই

“জয় জয় শ্রীগুরু—প্রেম-কল্পতরু”

কল্প-তরুর সনে—তুলনা হয় না

—সে ত’,—না চাহিলে দেয় না রে

কল্পতরু বলে যারে

সে ত’,—না চাহিলে দেয় না রে

তার, কাছে গিয়ে দাও বলে

—সে ত’, না চাহিলে দেয় না রে

তার, কাছে না গেলে ত’ দেয় না রে

বাহিত ফল তার, কাছে না গেলে ত’ দেয় না রে

এ যে, অপরূপ প্রেম কল্পতরু

সেধে যেচে বিলায় রে

চির অনপিত প্রেমফল,—

সেধে যেচে বিলায় রে

‘চির অনর্পিত প্রেমফল’

যা, কিশোরীর ভাঙারের নিধি চির অনর্পিত প্রেমফল
 যা, ব্রহ্মাদিবও সুহৃৎভ চির অনর্পিত প্রেমফল
 যা, গোলকে গোপনে ছিল সেই—চির অনর্পিত প্রেমফল
 যা, কোটি কল্প কঠোর সাধনেও মিলে না

—চির অনর্পিত প্রেমফল

সেধে যেচে বিলায় রে
 গিষে, আচণ্ডালের দ্বাবে দ্বাবে সেধে যেচে বিলায় বে
 তাই বলি, তুলনা হয় না
 প্রাকৃত, কল্পতরু দনে—তুলনা হয় না

“অদ্ভূত যঁহার প্রকাশ”

অতি, অদ্ভূত প্রকাশ ভাই
 অদ্বয়-ব্রহ্ম, শ্রীনন্দনন্দনের অতি, অদ্ভূত প্রকাশ ভাই
 মো হেন অধমেব লাগি অতি, অদ্ভূত প্রকাশ ভাই

ও,—“জীবের নিস্তার লাগি নন্দমুত হনি ।

ভুবনে প্রকাশ হন গুরু-কপ ধরি ॥”

গুরু-কপে অদ্ভূত প্রকাশ
 তাই বলি,—অতি অদ্ভূত প্রকাশ ভাই
 “হিয়া-অগেযান, তিমির বব-জ্ঞান,
 সুচন্দ্র-কিরণে কক নাশ ।”

হিয়ার, অজ্ঞান-আধার দূর কৈলেন
 বর-জ্ঞান-সুচন্দ্র-কিরণ প্রকাশে
 —হিয়ার, অজ্ঞান আধার দূর কৈলেন

চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ

কিসে বা গণি রে

কিসে বা গণি রে

তারা, বাহিরের তাপ-তমঃ নাশে

উদয় হ'য়ে আকাশে

হৃদয়ের পাপ-তমঃ নাশে

উদয় হ'য়ে হৃদ আকাশে

হৃদয়ের পাপ-তমঃ নাশে

“সুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ ।

ইহ লোচন-আনন্দধাম ॥”

লোচন-আনন্দধাম

শ্রী গুরু-মুরতিখানি—লোচন-আনন্দ-ধাম

ইহ লোচন-আনন্দধাম ।

“অযাচিত মো হেন

পতিত হেরি যো পছ'

বাচি দেয়ল হরিনাম ॥”

আমায়, সেধে যেচে নাম দিলেন
আমি, কখনও ত' জানতাম্ না ভাই

হরিনাম দাও ব'লে

আমি, কখনও ত' চাই নাই ভাই
আমি, কখনও ত' চাই নাই ভাই

বাহু পসারি হিয়ায় ধ'রে

আমায়, সেধে যেচে নাম দিলেন
আমায়, সেধে যেচে নাম দিলেন
ধর, ধর নামের মালা পর

কেন মিছে,—ত্রিতাপ জ্বালায় জ্ব'লে মর

ধর, ধর নামের মালা পর

এ যে ত্রিতাপ হর—

ধর, ধর নামের মালা পর

হরি,—নামের মালা কণ্ঠে পর

বল, “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

বল, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

ধর,—পর হরিনামের মালা

ওরে ও কলিহত জীব—পর হরিনামের মালা

দূরে যাবে ত্রিতাপ-জ্বালা

পর হরিনামের মালা

যাবে জ্বালা, পাবে নন্দলালা

পর হরিনামের মালা

হয়ে, ব্রজবালা, পাবে নন্দলালা

পর হরিনামের মালা

আমায়,—সেধে যেচে নাম দিলেন

যাচি দেয়ল হরিনাম ॥

আমি, দূর-মতি অগতি,

সতত-অসত মতি,

আমার,—“নাহি সুকৃতি-লব লেশ ।

আমার, নাহি কোনও সুকৃতি

আমি, দূরমতি অগতি

আমার, অসৎ সঙ্গে সদা বসতি

আমি, দূরমতি অগতি

আমি, দূরমতি অগতি

সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমার, কোনও জন্ম জন্মান্তরের—সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমি, শ্রীগুরু কৃপা পেতে পারি—এমন কোন

—সুকৃতির ত' লেশ ছিল না

আমার, “নাহি সুকৃতি লব লেশ ।

শ্রীবৃন্দাবন,

যুগল ভজন ধন

মোহে করল উপদেশ ॥”

নিজগুণে জানাইলেন
 ব্রজে, রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নিজগুণে জানাইলেন
 আমায়,—কৃপা ক'রে জানাইলেন
 ষুগল-ভজন-কথা আমায়,—কৃপা ক'রে জানাইলেন

আ'মরি কি করুণা রে
 করুণার বালাই ল'য়ে ন'রে যাই আ'মরি কি করুণা রে

“মোহে করল উপদেশ ॥

নিরমল-গৌর প্রেমরস সিঞ্চে

আ'মরি— নিরমল নিরমল
 গৌর আমার উন্নত উজ্জ্বল নিরমল নিরমল
 'মহা,' রাস-বিলাসের পরিণতি—
 রাই কানু একাকৃতি মহা, রাস-বিলাসের পরিণতি
 আ'মরি,—নিরমল নিরমল

ও,—“নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চে,
 পূরল সব-মন-আশা ॥”

আমার, সকল আশা পূরণ কৈলেন
 আশার অতীত-ধন দিয়ে
 —আমার, সকল আশা পূরণ কৈলেন
 'আশার অতীত-ধন দিয়ে'—
 আমি যা স্বপনেও কভু ভাবি নাই—আশার অতীত-ধন দিয়ে
 আমার, সকল আশা পূরণ কৈলেন

“পূরল সব মন আশ ।

সো চরণাশুজে,

রতি নাহি হোয়ল,”

দয়াল,—“(গুরু-চরণাশুজে রতি নাহি হোয়ল”)

আমার রতি মতি হ'ল না ভাই

শ্রীগুরু চরণাশুজে—আমার মতি গতি হ'ল না ভাই

কি হবে আমার গতি

শ্রীগুরু-চরণে না হ'ল রতি

কি হবে আমার গতি

ভাই, সেই তো উত্তমা গতি

শ্রীগুরু-চরণে রতি—ভাই, সেই তো উত্তমা গতি

আমার গতি কি বা হবে

আমি, একদিনও ত ভজলাম না ভাই

নিষ্কপটে শ্রীগুরু-চরণ—

একদিনও ত ভজলাম না ভাই

আমি ভুলেও একবার বললাম না ভাই

ভজার কথা দূরে থাক্

—আমি ভুলেও একবার বললাম না ভাই

‘হা, গুরুদেব তোমার হ'লাম বলে’

মায়া'র দাসত্ব ছেড়ে—হা, গুরুদেব তোমার হ'লাম বলে

মুখেও একবার বললাম না ভাই

তাই বলি, আমার গতি কি বা হবে

“ধিক্ ধিক্ জীবনে কি আশ ॥”

“রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥”

এই কৃপা কর সকলে

ওগো,—বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী

এই কৃপা কর সকলে

[॥७०]

পরম-করণ-শ্রীগুরুপদে যেন, অবিচারে বিকাতে পারি
যেন, অবিচারে বিকাতে পারি

কায়-মন-বাক্য দ্বারা যেন, আজ্ঞাপালন ক'রতে পারি
যেন, আজ্ঞাপালন ক'রতে পারি

শ্রীগুরু-চরণ বিস্মরি যেন, কখনও না হই স্বতন্তুরী
যেন, কখনও না হই স্বতন্তুরী
ভাঁর কৃপাদত্ত নামাবলী যেন, প্রাণ ভ'রে গাঠিতে পারি

আর যারে দেখি তা'রেই বলি—

‘ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ।
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥’

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

প্রথম :

সর্ব প্রথমে শ্রীগুরু করুণার জয় দিয়া এই “দাস গোস্বামী” শ্রীগ্রন্থের প্রকাশের উত্তিবৃত্তটুকু নিবেদন করি। ১৩৩৪ . বঙ্গাব্দের নিয়ম সেবার সময় (আশ্বিন শুক্লা একাদশী হইতে কার্তিক শুক্লা একাদশী সময়কে নিয়ম সেবার মাস বলা হয়)—শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার, পুরীতে ‘দাস গোস্বামী’ সঙ্কলনের প্রেরণা মনে জাগে। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত উদঘাটিকাটির খসড়াটি সেখানে আত্মপ্রকাশ করেন। কার্তিক পূর্ণিমার দিন এই গ্রন্থ সঙ্কলন আরম্ভ হয় ‘টিটিলাগড়ে’ এবং সম্পূর্ণ হইলেন—সঙ্কলয়িতার শ্রীকুণ্ডতে অবস্থানের আবাসে।—সেদিন সোমবার, অমাবস্যা, ২৭শে মে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ।

তাহারই আঠার দিন পরে বা ১৫ই জুন তারিখের অপরাহ্নে ‘শ্রীগুরু করুণাই’ মাসুঘের মূর্তি ধারণ পূর্বক শ্রীকুণ্ডে আগমন করেন এবং ‘রামকিঙ্করদাসকে’ খুঁজিতে খুঁজিতে বহুক্ষণ পরে একরূপ পরিচয় হীন সঙ্কলয়িতার কুটিরে (তারাস মন্দির, পোষ্ট : রাধাকুণ্ড, জেলা : মথুরা) পদার্পণ করেন।

এই ঘটনার দেড়মাস পরে (৪ঠা আগষ্ট) শ্রীগুরু করুণার সেই সচল মূর্তি কাঙ্গাল সঙ্কলয়িতাকে নিজের মোটরে ষ্টেশনে পঁছাইয়া ‘ভূফান মেলে’ কলিকাতার একখানি ‘টু-টায়ার বার্থ-এর’ টিকিট সহ ট্রেনে চড়াইয়া দেন। ঐ শ্রীগুরু করুণার সচল মূর্তির মধুর স্বভাবা দ্বিতীয়া পুত্রবধুটিও এই ভিখারী সঙ্কলয়িতাকে অপত্যস্নেহে—ট্রেনে ব্যবহারের জন্য এক কুঁজা যমুনার জল ও পর্যাপ্ত ফল সঙ্গে দেন।

৫ই আগষ্ট '৬৮ সন্ধ্যাকালে সঙ্কলয়িতা গৌরপরিকর শ্রীল ভাগবত
আচার্যের শ্রীপাঠবাড়ী বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫-এ অবস্থিত নিজ
'শ্রীগুরু-পাঠ'-এ উপনীত হয়।

ধন-জন-সহায়-সম্পদ-হীন অধম ভিখারী সঙ্কলয়িতা ৯ই আগষ্ট
তারিখে (৬) শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে বসিয়াই টেলিফোনে সংবাদ
পায়—

এস্থ ছাপাই জন্ম 'প্রিন্টিং ও আর্ট পেপার' এবং প্রেসের ব্যবস্থা
প্রস্তুত। ছাপাই শুরু হয়। ১৯-৮-৪৮ তারিখে "দাস গোস্বামী"র
প্রথম ফর্ম্যাটির 'ফাইল কপি' আমরা পাই।

লিখা বাহুল্য যে এই সব ব্যবস্থা, উপরে উল্লিখিত সচল শ্রীগুরু-
করণারই কীর্তি।

আবার ছাপাই কার্য আরম্ভ হওয়ার কিছু দিন পরে যখন তিনি
(শ্রীগুরু করণার সচল মূর্তি) জানিতে পারিলেন যে (সাহায্যকারী)
ফ্রফ্ রীডারের পারিশ্রমিক এবং সঙ্কলয়িতার বরাহনগর তইতে
বেনিয়াটোলায় অবস্থিতি 'প্রেসে' ও অন্যান্য স্থানে প্রত্যহ যাতায়াত
জন্য রিক্সা ট্রাম ও বাসের ব্যয়ের সংস্থানও দরকার, তিনি সঙ্গে সঙ্গে
সে সব প্রয়োজনেরও সংস্থান করিয়াছেন।

শ্রীগুরু-করণার উক্ত সচলমূর্তি—'জাত-সেবক'। এই কারণেই
তাঁহার সুখের জন্ম এখানে (তাঁহার) নামোল্লেখ হইল না।

'লীলা ত্রিকাল সত্য'

'কেউ কোথাও যায় না'

—এই সূত্র অনুসারে, আমাদের এই সচল শ্রীগুরু-করণার মূর্তির
আচরণ ও কার্য কোন্ শক্তির খেলা ?

বিচিত্র !—

[মায়ার দাসত্ব ছেড়ে—

হা ! গুরুদেব ! তোমার হ'লাম বলে, মুখেও একবার বলছি না—
অথচ নিহেতুক কৃপাকারী শ্রীগুরুদেবের করুণা নিজ স্বভাবেই নৃত্য
ক'রে চ'লেছেন ।

হা গুরুদেব ! যদি রাখতে সাধ তবে এই জগতে এই কৃপা কর,
যেন তোমার প্রদর্শিত পথে চলতে পারি । তোমার কৃপাদত্ত নাম
যেন ভুলি না এবং আমা হ'তে তোমার 'অকলঙ্ক নামে' (যেন) কলঙ্ক
রটে না ।]

দ্বিতীয় :

একজন ধনী ব্যক্তির অবোধ শিশু সন্তানকে পরীক্ষার প্রস্তুতির
জন্য গৃহশিক্ষকে যে 'শ্রম' ও 'দক্ষতা' প্রয়োগ করিতে হয়, অনুরূপ
শ্রম ও দক্ষতার সহিত শ্রীগুরুকৃপাস্নাত, অগাধ পণ্ডিত, কবিরাজ
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর দেবশর্মা-শাস্ত্রী, পঞ্চতীর্থ (শ্রীগুরু
সম্পর্কে এ অধমের 'দাদা') সঙ্কলয়িতার "ভাব" ও "প্রকাশ ভঙ্গীকে"
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই শ্রীগ্রন্থকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন ।

এই শ্রীগ্রন্থের সপ্তদশ তরঙ্গে 'প্রীতিউপহার' (২) (গৃষ্ঠা
৫২১-৫৬১ পর্য্যন্ত) সম্পূর্ণ অংশ, এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র সংগ্রহ হইতে
লওয়া হইয়াছে ।

দৈনন্দিন, আলাপে, বাবাজী ম'শায়ের শ্রীমুখ হইতে যে সব
অমূল্য নিধি ছড়াইয়া পড়িত, সে সব সংরক্ষণে যাঁহারা প্রয়োজন বোধ
করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি শুধু প্রধানই নন, সে সব সংরক্ষণের
সার্থক রূপ (প্রায় অর্ধেক মুদ্রিত হইয়াছে, বাকী তাঁহার নিকট পাণ্ডু-
লিপিতে সুরক্ষিত আছে)— দিয়াছেন ।

এ ছাড়া, শ্রীল রামদাসবাবাজী মহাশয়ের অমল জীবন চরিত (নাম চরিত মাধুরী) গ্রন্থের সঙ্কলকও এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ।

শ্রীগুরু চরণে সকাতির প্রার্থনা যেন তিনি নিত্য নূতন ভাবে দাদাকে অনুরূপ সেবা-সৌভাগ্য-গৌরবে গৌরবাধিত করিতে থাকেন ।

তৃতীয় :

এই শ্রীগ্রন্থে অষ্টাদশ তরঙ্গে পাথ্যে (২) ব্রজের মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীশ্যামকৃষ্ণের ইতিহাস সংযোজিত হইয়াছে ।--এই ঐতিহাসিক সংযোজনে—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিবরণ ও তথ্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণব-কুল-গৌরব শ্রীল নবদ্বীপ দাস বিরচিত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ইতিহাস' গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে ।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৮ পর্য্যন্ত সময়ের তথ্যাবলী বর্তমান মহান্ত শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের কৃপায় পওয়া গিয়াছে । এবং পূর্বাপর সমস্ত তথ্যই পূজনীয় মহান্তজীর নিকট সংরক্ষিত রেকর্ডের (records) সহিত মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে ।

আর ৫৮০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত (পরিক্রমার রাস্তা ও গোস্বামীদের স্থানগুলির চিহ্ন সহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীশ্যামকৃষ্ণের) মানচিত্রটি (এই) মহান্তজীর নিকট আদালতের যথার্থ অনুলিপির মানচিত্র হইতে অবিকল নকল করিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে ।

মহান্ত মহাশয়ের স্নেহ, কৃপা, সাহায্য ও উৎসাহ দান, এ সঙ্কলয়িতার নিত্য সাধ্যায়ের ধন । তিনি কৃপা পূর্বক অপদার্থ সঙ্কলয়িতার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করেন ইহাই সকাতির প্রার্থনা ।

(মনে হয়)—ইহার মুখ্য ভজন—

শ্রীকৃষ্ণবাসী বৈষ্ণববৃন্দ যাহাতে নিরুপদ্রবে 'ভজন' করিতে পারেন, তাহার 'চেষ্টা' ও 'সু-ব্যবস্থা'। অদ্ভুত !

পাথের (১) : মহামন্ত্রের পরিচর্যা সঙ্কলনে—

বিচারত্ব, শ্রীগোপালদাস কাব্য-তীর্থ-ব্যাকরণ সঙ্কলিত
“শ্রীশ্রীমহামন্ত্র মীমাংসা” গ্রন্থ আমাদের মূল উৎস।

চতুর্থ :

বর্তমান ব্রজমণ্ডলের (শ্রীবৃন্দানবাসী) আদর্শ গৃহী, প্রখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ, অধম সঙ্কলয়িতাকে (নিজগুণে) আপন ছোট ভাই-এর মত সদা স্নেহ করেন। তিনি তাঁহার বহুমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া এই শ্রীগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদৃত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার স্নেহাণ যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ইহাই শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণে সকাতির প্রার্থনা।

এখানে প্রসঙ্গত নিবেদন যে, এই পাণ্ডুলিপি পঠন ও শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছেন—

“ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত” “স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্য” “গস্তীরা-বিহারী গোরহরির নীলাচল লীলার ধারক” এবং “আরোপে আরতি হেরে হুঁ হুঁকারী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সু-রসাল জীবন কথা সঙ্কলিত হয়েছেন, এ যেন, বাবাজী ম'শায়ের “করণা” অক্ষর রূপে মূর্তি ধরেছে !

(বহুবার দেখেছি ত') তাঁর সংকীর্তন, সময়ে (আঁখরে প্রকাশিত) স্বতঃস্ফূর্ত “তত্ব” ও “তথ্যাবলী” সবই শাস্ত্রের কথা।

পণ্ডিতবাবা (বৃন্দাবনস্থ রমণরেতিতে নিত্য লীলায় অবস্থিত) -ও —এ অভিমত পোষণ করিতেন। তিনি বলিতেন—

‘শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় শাস্ত্রের যে পৃষ্ঠা হইতে কীর্তন করেন, আমরা এখানো সে পৃষ্ঠায় পৌঁছাই নাই।’

পঞ্চম :

মায়া কবলিত নরপশু সঙ্কলয়িতাকে পারমাথিক পথে আকর্ষণের প্রথমা ও প্রধানা শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী শ্রীমতি রাণুবাল্লা দাসী (স্নেহ-ময়ী দিদি) শ্রীকুণ্ডে, “দাস গোস্বামী” সঙ্কলন সময়ে পাঁচ মাস কাল ব্যাপী যে অপূর্ব ‘সেবা’ ও ‘উৎসাহ’ দান করিয়াছেন, তাহা অভূতপূর্ব । তাঁহার স্নেহ ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক ।

(ক) শ্রীকুণ্ডে বিরক্ত বৈষ্ণবদের একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার আছে । ঐ গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় ।

“দাস গোস্বামী” এবং ‘পরিণতির পরিণতি-লীলার অন্ততম নায়ক ঠাকুর মহাশয় শ্রীল নরোত্তম” (গ্রন্থদ্বয়) সঙ্কলিত হইতেছে জানিয়া, ইনি তাঁহাদের গ্রন্থাগার হইতে, এককালে অন্ততঃ পনের কুড়ি খানি ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ, সঙ্কলয়িতাকে, নিজ কুটিরে লইয়া গিয়া, নিজ অবসর ও প্রয়োজন মত দেখার সুযোগ দান করিয়া অত্যন্ত রূপা করিয়াছেন ।

(খ) শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারীদাস বাবাজী মহাশয়, নিজ বহুমূল্য ‘সময়’ ও ‘ভজনের’ বিপ্ল স্বীকার করিয়া, এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত ৫৮০ পৃষ্ঠায় সংযোজিত চিত্রে, সমস্ত নামগুলি লিখিয়া দিয়াছেন ।

এঁরই রূপায় ৪৮৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত তুল্য ঐতিহাসিক ছবিটির সন্ধান মিলে ।

(গ) শ্রীকুণ্ডবাসী শ্রীশচীনন্দন দাসজী, শ্রীভাগবত দাসজী শ্রীশ্যামসুন্দর দাসজী, শ্রীদীনবন্ধু দাসজী এবং আর আর

সকলেই অযোগ্য সঙ্কলয়িতাকে যে স্নেহ ও কৃপা প্রদর্শন করেন তাহা বর্ণনার ভাষা হয় না।

ভুবন-পাবন শ্রীকৃষ্ণবাসী সকলের শ্রীচরণের ধূলিকণার কৃপাপ্রার্থী এ অযোগ্য সঙ্কলয়িতা।

সপ্তম :

গৌর পরিকর শ্রীল (রঘুনাথ উপাধ্যায়) ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীপাঠবাড়ীর’ (বরাহনগর) সেবা ভার ১৯২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীহস্তে আসে। ঐ সময় হইতেই সঙ্কলয়িতার জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা নিত্যধামগত ‘হরি ঘোষালদাদা’ শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমের অন্যতম সেবক। (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে চৈত্র কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিন এই শ্রীপাঠবাড়ীতেই তাঁহার দীক্ষা হয়)। এই আশ্রমেই তিনি দেহ রক্ষা করেন,—সে দিনটি ১লা ফাল্গুন ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

এই ‘হরি ঘোষালদা’ বাবাজী মহাশয়ের দিব্য জীবনের—“স্বতঃ-স্বর্ভূত ‘আঁখর সমন্বিত’ কীর্তনাবলী সংরক্ষণের ‘মূল্য’ ও ‘গুরুত্ব’ অনুভব করেন। তাঁহারই অনলস সেবা চেষ্টায় আজ আমরা (জন-সাধারণ)—সেই আঁখরগুলির মধ্যে—

গৌরলীলার ইতিহাস (History) গৌরলীলার ঐতিহ্য (Tradition) গৌরলীলার বিজ্ঞান (Science) গৌরলীলার দর্শন (Philosophy) এবং গৌরলীলার সু-গভীর মর্মার্থ—‘দর্শন’ ‘পাঠ’ ও ‘কীর্তনের’ সু-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।

হরি ঘোষালদা’র অপ্রকটের পর অন্যতম গুরুভ্রাতা বৈরাগ্যের প্রতীক শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবাজী মহাশয়ের দেওয়া সার্থক নাম ‘রতন’) নীরবে,—যে ‘ধৈর্য্য’ ‘অধ্যবসায়’ ও ‘সহিষ্ণুতার’

সহিত হরিঘোষালদা'র আরন্ধ কার্য (বাবাজী ম'শায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অঁখর সমন্বিত কীর্তনবলী সংগ্রহ) এবং (কৃতজ্ঞতা স্বীকারে পূর্বে, দ্বিতীয়ে উল্লিখিত) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা'র আরন্ধ কার্য বাবাজী ম'শায়ের দৈনন্দিন আলাপে যে সব অমূল্য নিধি ছড়াইয়া পড়িত তাহার সংগ্রহ ও প্রকাশ ইনি যে ভাবে সম্বন্ধ করিয়াছেন তাহা কেবল অনুভবের ধন।

উক্ত রতনদা' বাঁকুডায় অবস্থিত গোয়েঙ্কা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছেন।

“বাহির দেখ না ঠকে যাবে, কাজ দেখে মিলিয়ে নাও”

—বাবাজী ম'শায়ের এই বাণী বা সূত্র অনুসারে উপরে উল্লিখিত হরিঘোষালদা', শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' এবং 'রতনদা' এঁরা তিন জনেই শ্রীগুরুদেবের “বিশেষ চিহ্নিত দাস”।

এই শ্রীগ্রন্থে যে সকল 'কীর্তন' ও 'উপদেশামৃত' সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সবার মূল উৎস এঁরা।

অষ্টম :

“দাস গোস্বামী”র মুদ্রণ কার্য চলিতেছে। মূল গ্রন্থের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয় হয় এমন সময় ডক্টর শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী নিজ গবেষণা উপলক্ষে শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রমে (কলিকাতা-৩৫) আসেন। সঙ্কলয়িতার সহিত মিলন ও বারদিন একত্র বাস ঘটে। ঐ সময় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'পাথেয়' 'নিবেদন' আদি কয়েকটির মুদ্রণ বাকী ছিল। ঐ সব পাণ্ডুলিপিগুলি তিনি নিজের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া দেখিয়া দেন। 'স্মরণীয় বাণী কণা' এই সু-মিষ্ট শীর্ষ নামটি তাঁরই দেওয়া।

বিদ্যার Climax হচ্ছে ভগবৎ চরণে অব্যভিচারিণী 'মতি' ও 'রতি'। যিনি ঐ ধনে ধনী হইতে পারেন তাঁহার 'যাজন' বা 'স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই, জগতে প্রকৃত কল্যাণ দান করে।

স্নেহভাজন ডক্টর নিরঞ্জন চক্রবর্তী বিদ্যার এই পূর্ণ অধিকার লাভ করুন, ইহাই (শ্রীগুরু আনুগত্যে) নিতাইটাদের নিকট আমাদের প্রার্থনা ।

নবম :

শ্রীভক্তভাজন শ্রীমান শতদল কর গুপ্ত, তাঁহার বহুমূল্য সময় ব্যয় করিয়া নিজ মোটরে পানিহাটি গমন পূর্বক বটবৃক্ষ ৩৮ পৃষ্ঠা ও মাধবীকুঞ্জ ১৮৯ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত চিত্র দুইটির ফটো তুলিয়া তাহার ‘নেগেটিভ’ এবং এই গ্রন্থে ৬০৮ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর (শ্রীকুণ্ডতটে) অবস্থিত সমাধির ফটোটি দিয়া (তিনি) “দাস গোস্বামী” গ্রন্থের সেবা করিয়াছেন । শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এইরূপ মহৎ সেবা সৌভাগ্য তাঁকে সদাই দান করেন

দশম :

এই গ্রন্থে যেখানে যেখানে যাহা যাহা অঁাখর সমন্বিত কীর্তন সন্নিবেশিত হইয়াছে সে সবই নামময়জীবন শ্রীল রামদাস বাবাজী ম’শায়ের । কোনও কোনও স্থানে তাঁহার নামোল্লেখ বাদ পড়িয়াছে মাত্র ।

একাদশ :

গৌরহরির প্রকট বিহারের পরিকরবৃন্দ এবং অপ্রকটে চিহ্নিত মহাজনবৃন্দ গৌরলীলার গ্রন্থ (চরিত্র, নাটক, পদ-পদাবলী কীর্তন ইত্যাদি) রচনা করিয়া “শব্দ” সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মনের ভাব প্রকাশ করার সামর্থ্য ঐ সব শব্দে

সু-পরিষ্কৃত। পরবর্তী মহাজনবৃন্দ ঐ সব 'শব্দে' অধিক শক্তি যোজনা করিয়াছেন। ঐ সব মূল্যবান 'শব্দ সম্পদ' আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি।

শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির যথোচিত মর্যাদা দেওয়া হইল কি না তাহা, এই শ্রীগ্রন্থ 'পাঠক' 'পাঠিকা' যাঁহারা পড়িবেন বা যাঁহারা শুনিবেন এবং শুনিয়া অনুভব করিবেন তাঁহারা নিজেদের বহুমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া আমাদের জানাইলে কৃতার্থ হইব।

দ্বাদশ :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাস (Artist & Block maker 'ডস্ আর্ট এম্পো-রিয়াম, ১৫৩. আপার চিংপুর রোড, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫) অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সহিত এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত চিত্রাবলী :—

১। প্রচ্ছদ পটের ব্লক ২। সেবাঞ্জলি ৩। জগন্নাথের শ্রীমন্দিরের পার্শ্ব রাজপথে (রাজপুত্র) "রঘুনাথ"—এই তিনটির 'ডিজাইন' ও ব্লক এবং সঙ্কলয়িতার শ্রীগুরুদেব এবং সেবাঞ্জলিতে উল্লিখিত মহাজনবৃন্দের চিত্রগুলিতে 'টাচিং' 'ফিনিসিং' পরে ব্লক করিয়াছেন। শ্রীগুরু আনুগত্যে নিতাইচাঁদের শ্রীচরণে এই শচীনবাবুর সর্বস্বীয় কল্যাণ কামনা করি।

ত্রয়োদশ :

বৃহত্তর কলিকাতার মধ্যে অবস্থিত পত্র পত্রিকা এবং প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দের নিকট গমন পূর্বক সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের শ্রীকর-কমলে "দাস গোস্বামী" প্রদান করা আমাদের আন্তরিক কামনা।

উদার স্বভাব (গুরু ভ্রাতা) কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন, কবিকেশরী, নিজ বহুমূল্য সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া এই মহৎ সেবা (আংশিক) সানন্দে গ্রহণ করিবার স্বীকৃতি দিয়াছেন ।

শ্রীগুরুদেবের নিকট সকাতির প্রার্থনা যেন তিনি জ্যোতিঃপ্রসন্নদা'কে অছিদ্রভাবে অনুরূপ সেবা সৌভাগ্য দান করেন ।

চতুর্দশ :

পাঠক পাঠিকাবৃন্দের শ্রীচরণে ভুলগ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণামান্তে নিবেদন— এই গ্রন্থের বক্তব্যের ভাষায় এবং প্রুফ্ দেখার ক্রটির পরও বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি যে সব দোষ ও কর্কশতা সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলির প্রতি তাঁহাদের কৃপাসুন্দর দৃষ্টি ও শোধন মার্জনের প্রসন্ন প্রয়াস এই মুখ' সঙ্কলয়িতার ভিক্ষা প্রার্থনা ।

मङ्गलाचरणम्

- (१) भक्तिरसामृतसिक्धौ, चरतः परिभूत कालजालभियः
भक्तमकरान्शीलित—युक्तिनदीकाङ्गमश्यामि ॥
- (२) वन्देहनन्ताद्भूतैश्वर्यं श्रीनित्यानन्दमीश्वरम् ।
यशोच्छया तत्स्वरूपमङ्गेनापि निरूपयते ॥
- (३) विभ्रं कान्ति विकच-कनकाञ्जोर्जगर्भाभिराम—
मेकैभूतं वपुरतु वो राधया माधवशु ॥
- (४) हेलोक्कूलित खेदया विशदया प्रोम्नीलदायोदया
शाम्यच्छात्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया ।
शशक्तिक्रि विनोदया-समदया माधुर्या मर्ष्यादया
श्रीचैतन्य ! दरानिधे ! तव दया भूयादमन्दोदया ॥
- (५) कृपाञ्जुर्गैर्षः सुगृहाङ्गकृपाद्वृत्त्यु भक्त्या रघुनाथदासम् ।
न्युशु स्वरूपेविदधेऽसुरजं श्रीकृष्णचैतन्यममुं प्रपद्ये ॥

পয়ার, অনুবাদ ও টীকা :—

(১) 'ধারা ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে বিহরে ।

মহাকাল জালভয় পরাভব করে ॥

পঞ্চবিধা মুক্তি নদী করে অনাদর ।

অনু অভিলাষশূন্য যাদের অন্তর ॥

সেই গৌর-ভক্তগণ মকর প্রধান ।

তা সভার চরণে মোর কোটি পরণাম ॥'

(শ্রীশ্রীভাবনাসার সংগ্রহ)

(২) বন্দ ইতি । শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে । কীদৃশং ? ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং
অনন্তং অগণ্যং অদ্ভুতং মহাচমৎকরণীয়ং ঐশ্বর্যং ঈশ্বরাত্মাদিকং যন্ত তম্ ।
যন্ত শ্রীনিত্যানন্দস্ত ইচ্ছয়া কৃপয়া অজ্ঞেন শাস্ত্রানুব্যুৎপন্নেনাপিময়া তন্ত
স্বরূপং তত্ং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে ।

(৩) 'সিংহ জিনি কণ্ঠশোভা, গণ্ড কিবা মনোলোভা, মধুর মধুর হাসি তায় ।
অতিগূঢ় রসময়, আশ্চর্য্য বিকারচয়, কত শোভা পায় গোরা রায় ॥
বিকচ হেমাঙ্গসম, কান্তি কিবা মনোরম, গোরারূপে জগত বিকল ।
রাধা-মাধবের যেই, একীভূত-তনু সেই, তোমাদের করুণ মঙ্গল ॥'

(শ্রীশ্রীভাবনাসার সংগ্রহ)

(৪) হে চৈতন্য দয়ানিধি ! তোমার দয়ার অতি সহজেই জীবের সর্ব সস্তাপ
দূরে যায়, চিন্তা নির্মল হয় এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের উদয় হয় । তোমার
দয়ার শাস্ত্রাদির বিবাদ প্রশমিত হয় । তোমার দয়া চিন্তে গাঢ়রস
সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মস্ততার সৃষ্টি করে । তোমার দয়া হইতেই ভক্তি-
জাত সর্বপ্রকার আনন্দ ও সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয়, ইহা সকল
মাধুর্যের দ্বার । হে কৃপাসিন্ধু ! এ অধমে দয়া কর ।

(৫) স্নুগ্হাহকৃপাং শোভনাং—গৃহাহকৃপাং । ভঙ্গ্যা যে কৃপা-রূপগুণা স্তৈঃ ।
ভঙ্গ্যা ইতি—রাত্রি শেষে শ্রীযত্নন্দন আচার্য্যস্ত অন্তঃ প্রেরণায়ৈ—
তদৃগ্হং যাপয়িত্বাচার্য্যেণ সহ তদৃগ্হগমনায় কিঞ্চিৎ প্রদেশং শ্রীরঘুনাথ
দাসং নীত্বা তস্মাৎ তন্ত পলায়নং ইত্যেবংরূপয়া ভঙ্গ্যা ।

(চক্রবর্তী)

নিবেদন— (শ্রীগুরু প্রেরণায়)

‘ব্রজলীলা’ ও নদীয়ালীলা,—এই উভয় লীলাতে ‘গৌরপারিকর-বৃন্দের’ সমান প্রবেশ। এ সম্বন্ধে, বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী দিক-দর্শক হিসাবে শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের চরিত্রে তাহা প্রস্তুত করিয়াছেন।

ঘটনাটি—

‘মুরতিমন্তু-গৌর-প্রেম’ শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু দুইটি বিবাহের পর (তিনি) বিষ্ণুপুরে আছেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীগৌরান্ধপ্রিয়াদেবীও সেখানে আছেন। এমন সময় একদা তিনি লীলা ধ্যানে অস্বাভাবিক সময় পর্য্যন্ত বাহুজ্ঞান রহিত। তাঁহার সে অবস্থা দেখিয়া—

“শ্রীগৌরান্ধপ্রিয়া আদি আকুল হইয়া কাঁদি
চিন্তাশ্রিত মন সবাকার।”

কি চিন্তা ?--

‘সবাই মনে মনে ভয় গণে
আচার্য্য কৈলা বুঝি লীলা সঙ্কোপনে .

—সবাই মনে মনে ভয় গণে

এ হেন সময়ে, লীলাশক্তির আকর্ষণে—

“রামচন্দ্র হেনকালে আসি উপনীত হইল”

তারপর তিনি—

‘শুনি তার সব বিবরণ’

—গৌরান্ধ্রপ্রিয়াদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আচার্য্যপ্রভুর
অনুগত্যে তাঁহার বাহু-জ্ঞানহীন শ্রীঅঙ্কের নিকট (তাঁহারই শ্রীচরণে
শরণাগত হইয়া) নিজেও লীলাধ্যানে বসিলেন

এবং—

“ধরি নিজ সিদ্ধ দেহ গুরুরূপা সখী সহ
মিলিলেন শ্রীযমুনা তীরে।”

সেখানে, দেখিলেন যে,—

রাসলীলা অন্তে, শ্রীযমুনা জলকেলি সময়ে শ্রীমতীর নামার
বেসর খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছে। জলকেলি অন্তে সখিরা নিজ
নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সকালে তাঁহারা শ্রীমতীর সহিত
মিলনকালে দেখেন যে, তাঁহার নামায় বেসর নাই। সুতরাং সকলেই
অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন।—এ হেন সময়ে আচার্য্যপ্রভু নিজ সিদ্ধ-
স্বরূপে শ্রীমতীর সান্নিধ্য (লাভের) লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

ওদিকে নিজ সিদ্ধ স্বরূপে, এই লীলায় প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্রও
দেখেন যে, সখীদের আদেশ মতে তাঁহার শ্রীগুরুদেব ‘বেসর’ অনুসন্ধানে
ব্যাকুল। বেসর সন্ধানের আবেশেই তিনি বিভোর হইয়া আছেন।
ফলে তাঁহার যথাবিহিত দেহের বাহু-জ্ঞান নাই এবং এই দশাতে তিন
দিন (সময়) অতিবাহিত হইয়াছে।

এখন—

তবে ছই সখী মিলি হ'য়ে অতি কুতূহলী
খুঁজি তথা পদ্য পত্র তলে।—

তারপর—

পাইয়া বেসরখানি আনন্দেতে পুনি পুনি
বন্ধে শিরে ধরে পরম্পরে ॥”

‘শ্রীগুরু-আনুগত্য-বলে’ ‘রামচন্দ্র’ পদ্ম পত্র তলে বেসরটি পাইলেন। ইহাতে তাঁহার ও আচার্য্যপ্রভুর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীমতির বেসরটি পাইয়া তাঁহারা আনন্দে প্রমত্ত হইলেন।

এখন উপাসনার রীতিতে (ব্রজলীলার মঞ্জরী স্বরূপে) তাঁহারা সেই বেসরটি আচার্য্য প্রভুর শ্রীগুরুদেব গোপাল ভট্টের সিদ্ধ স্বরূপ শ্রীগুণ মঞ্জরীর শ্রীকরে দিলেন। তিনি আবার, শ্রীরূপ গোস্বামীর সিদ্ধ স্বরূপ রূপ মঞ্জরীকে তাহা দিলেন। তিনি -

“তিঁহ শীঘ্র শ্রীমতীরে, পরাইল সে বেসরে,
সবে অতি আনন্দ লভিলা।”

এ রহস্য অপরূপ।—

পর পর আনন্দের বিকাশ। বেসর পাইয়া শ্রীমতীর যত সুখ, তাহা দেখিয়া শ্রীরূপের সে আনন্দ কোটি গুণ ভোগ। পরস্পরের মুখাবলোকনে এই আনন্দের ক্রম বিকাশ চলিতেছে।—শ্রীরূপের ভোগ কোটি গুণিত হইয়া শ্রীগুণমঞ্জরীতে পর্যবসিত। আবার তাহা কোটি গুণিত হইয়া আচার্য্যপ্রভুতে পর্যবসিত।—‘আচার্য্যপ্রভুর’ ভোগ কোটি গুণিত হইয়া ‘রামচন্দ্রে’ পর্যবসিত।

—“আনুগত্যে অধিক সুখ”

তারপর—

“শ্রীরাধিকা হৃষ্টা মনে, চর্কিত তাম্বুল দানে,
তুষিলেন নব সখী-দ্বয়ে।

ফলে,—

তাহার অধরামৃত, পাই দৌহে প্রফুল্লিত,
‘রাধে জয়’ ধ্বনি উচ্চারয়।”

আনন্দে গদভাসে তাঁহারা শ্রীমতীর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—

“হে প্রেমময়ী রাধে ! না চাইতেই তুমি আশা পূরণ করলে ।
করণাময়ী ! নিজ কিস্করী করে (সদা) শ্রীচরণে রেখো !”

অতঃপর—

বাহু হৈল হেনমতে দেখিল তাম্বুল হাতে
সৌরভেতে ভরিল আলয় ।*

এবং এইরূপ উভয় লীলায় সমান প্রবেশের অবধি (climax) হচ্চেন শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ।

মূর্খ অবোধ বালক নিজ পাঠ্য পুস্তক অশুদ্ধভাবে, উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে থাকিলে,—দয়ালু-বিজ্ঞ-শ্রোতা যে পাঠ শুদ্ধ করিয়া দেন, ফলে, বালকের ভ্রম সংশোধন হয় ।

কাজল, মূর্খ, সঙ্কলয়িতার ‘দাস গোস্বামী’ সঙ্কলন প্রচেষ্টাও মূর্খ বালকের উচ্চৈঃস্বরে পাঠের মত । এই ‘আশয়েই’ এই সংস্করণের নাম ‘প্রচার সংস্করণ’ ।

(শ্রীগুরু করুণায়) মাত্র এগার শত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে পাঁচ শত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গবেষক, বিচারক, চিকিৎসক, জ্ঞানী, গুণী,

* এ আলয়, বিষ্ণুপুরে আচার্য্যপ্রভুর বাসস্থান—যেখানে, দেবীগৌরান্দ-প্রিয়া, সগোষ্ঠী রাজা বীরহান্নির এবং বিষ্ণুপুরের অগণিত অধিবাসী—এ তিন দিন যাবৎ আকুল প্রাণে উদ্গ্রীব হইয়া অপলক দৃষ্টিতে আচার্য্যপ্রভু ও রামচন্দ্রের শ্রীদেহ দুইটিকে ঘিরিয়া সজল নয়নে অপেক্ষা করিতেছিলেন । মনে তাঁদের নিরন্তর ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, আর কতক্ষণে চেতনা হবে ?

বিচিত্র !—এখন ঘন ঘন হরিশ্বনিত্তে স্থানটি অপ্ৰাকৃত মাধুর্য্যে পূর্ণ হইল । পরে আচার্য্যপ্রভু মধুর হাসিতে হাসিতে সমবেত জনতার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলেন ।

পণ্ডিত এবং বৈষ্ণব ধর্মের অনুশীলনকারী মহাত্মাদের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ জন্য চিহ্নিত হইয়াছে।

--এবং ছই শত গ্রন্থ নদীয়া, নীলাচল ও ব্রহ্মে অবস্থিত ভুবন-পাবন বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ জন্য চিহ্নিত হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারিশত গ্রন্থ (বোর্ড বাঁধাই) প্রতিটি গ্রন্থ দশ টাকার বিনিময়ে সর্বসাধারণের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে। এইরূপে যে অর্থাগম হইবে তাহার ব্যয় বিবৃতি :—

(১) শ্রীবৃন্দাবনবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক শ্রীযুত রবীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগবতভূষণ মহাশয় বৈষ্ণব ও ভক্তগোষ্ঠীতে 'প্রতিদিন' ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার প্রধান পাঠের আসর স্বনামধন্য অশ্বিনীবাবুর মন্দির, বৃন্দাবন।

এক শত গ্রন্থ কিম্বা গ্রন্থের বিনিময় মূল্য তাঁহার শ্রীকর-কমলে অর্পিত হইবে। তিনি প্রতি বর্ষে (যতদিন পর্য্যন্ত অর্থ সঙ্কুলান হয়) বৎসরের কোন এক সময়ে, তাঁহার (ঐ) নিত্য পাঠের আসরে এই শ্রীগ্রন্থ আচুস্ত পাঠ করিবেন, ইহাই একান্ত নিবেদন।

(২) শ্রীকুণ্ড-তট-বাসী বিরক্ত বৈষ্ণব শ্রীযুত দীনবন্ধু দাস মহাশয়ের শ্রীকর-কমলে একশত গ্রন্থ কিম্বা শত গ্রন্থের বিনিময় মূল্য সমর্পিত হইবে। তিনি ঐ অর্থ হইতে ব্যয় করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দণ্ডমহোৎসবের' সময় প্রতি বর্ষে, শ্রীকুণ্ডে, এই গ্রন্থ আচুস্ত পাঠের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাই আমাদের সকাতির প্রার্থনা।

(৩) বাঁকুড়ায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস মহাশয়ের শ্রীকর-কমলে একশত গ্রন্থ কিম্বা শত গ্রন্থের বিনিময় মূল্য সমর্পিত হইবে। তিনি ঐ অর্থ হইতে ব্যয় করিয়া (প্রতি বর্ষে) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরহ মহোৎসব মাসে তাঁহাদের নিত্য সঙ্ক্যায় পাঠের আসরে, এই শ্রীগ্রন্থ আচুস্ত পাঠ করিয়া আমাদের সুখী করিবেন।

[১৮৮০]

অবশিষ্ট একশত গ্রন্থ কিন্ম তাহার বিনিময় অর্থ শ্রীগুরুদেবের
কয়েকটি আশ্রমের সেবানুকূল্যে :

যথা—

	গ্রন্থ
(ক) শ্রীব্রজগোপাল দাস, শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, কলিকাতা-৩৫	৫০টি
(খ) " কানাইদাস বাবাজী, সমাজবাটী, নবদ্বীপ	২৫টি
(গ) " ননীগোপাল দাস, বাজুপিটা মঠ, পুরী	১৫টি
(ঘ) " নিতাইদাস, শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, পুরী	১০টি
	<hr/> ১০০টি

—

উদ্বোধিকা

গৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বে জনশ্রুতি ও বিদ্বদনুভূতি এবং ভাগবত পুরাণ আদি গ্রন্থাবলীতে ছিল যে শ্রীভগবান মানুষের দেশে মানুষের বেশে (মানুষীং তনুমান্ধিত্য) আসিয়া মানুষের সাথে মিশিয়া মানুষের মূর্তিতেই কত শত কৰ্ম (কৰোতি বিবিধা ক্রিয়াঃ) করেন ।

কিন্তু, আমাদের সু-সৌভাগ্যে শ্রীগৌরাজ্ঞ এবং গৌরাজ্ঞ পরিকর-বৃন্দের চরিত্রগুলি মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্বেই গৌড়ের উজ্জ্বলতম ইতিহাসের গ্রন্থপৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সু-প্রসিদ্ধ জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ও সাধু মহাত্মারা শ্রীগৌরাজ্ঞ শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের লীলাপরিকরবৃন্দের কার্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের 'চরিত্রকথা' ও 'লীলাবলী' সংস্কৃত এবং নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন । উড়িষ্যা এবং গৌড়দেশীয় (গৌর) পরিকর-বৃন্দের (প্রকট বিহারের) অনেকেই গ্রন্থ প্রণয়ন ও পদ পদাবলী-রচনা করিয়া 'জীবন্ত ইতিহাসের' সাক্ষ্য প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন । আবার 'বৃক্ষ', 'কুণ্ড', 'সরোবর', 'হস্তাক্ষর' ও 'তাঁহাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তু' এবং 'বংশ-ধারাক্রমেও' অদ্যাপি তাঁহারা বর্তমান রহিয়াছেন ।

গৌর ও গৌরপরিকরবৃন্দের চরিত্রানুশীলনে বিশেষ কথা—

চিন্তাশীল মানবের মধ্যে অনন্ত জিজ্ঞাসা থাকিলেও অন্যতম দুইটি প্রধান জিজ্ঞাসা—

(১) শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ কি ?

(২) যদি তিনি (ভগবান) থাকেন তবে বিশ্বের 'দৃষ্ট' ও 'শ্রুত' বস্তুর মধ্যে কি না ?

এই জিজ্ঞাসার সমাধানের পরতত্ত্বসীমা স্বয়ং ভগবান, শচীছল লাল গৌরহরিই এই বস্তু জগতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সপার্বদ (পিতা, মাতা, স্ত্রী, বান্ধব ও অগণিত ভক্ত সহ) সর্ব সাধারণের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ পাতিয়া পাতাইয়া—

(ক) ভগবানের মাধুর্যের সংবাদ—

(খ) অপূর্ব কারুণিকত্বের সংবাদ—

(গ) উদারতা—

(ঘ) ভগবানের সহিত নিকটতম সম্বন্ধের সংবাদ এবং—

(ঙ) ভাবীকালের জীবের জন্ম ভজনাঙ্গের উপাদেয়তা দান করিয়াছেন ।

(ক) 'মাধুর্যের সংবাদ'—

গৌরহরির আবির্ভাবের পূর্বে সর্ব-সাধারণ জীবের ধারণা ছিল, 'পাপের শাস্তিদাতা ভগবান' ।

গৌরহরির দান—

স্বয়ং ভগবান অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি সত্য, তথাপি তাহা অসমোর্ধ্ব মাধুর্যের সহিত অনুশ্রুত । ভগবানের ঐশ্বর্যে 'ত্রাস' 'জালা' বা 'সঙ্কোচ' নাই । ভগবান পাপীর শাস্তিদাতা তো ননই বরং যে যত পাপ করিয়াছে তাহার উপর ভগবৎ করুণা তত বেশী পতিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে । উচ্চারণের আভাস ভগবানের নামাভা সেই পাপ্, তাপ্, সব দূরে পলায়ন করে । এই করুণাময় ভগবানের মাধুর্যের অস্তিত্ব, তাহার তো কোন তুলনাই হয় না । সে মাধুর্য বর্ণনা করিতে বাণীর ভাণ্ডারে কোন ভাষা নাই । শ্রীকৃষ্ণ

মাধুর্য্য এমনই এক অনির্বচনীয় বস্তু যে তিনি স্বয়ং ‘আপ্তকাম’ আত্মারাম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহারই মাধুর্য্য তাঁহাকেই ‘মুক্ত’ ‘লুক্ক’ করে। কাম কাঙ্ক্ষনের-নফর মায়া কবলিত জীব অহেতুক ভগবৎ কৃপায় কিম্বা “তাঁহার দাসের কৃপায়” সেই পরম লোভনীয় মাধুর্য্য আশ্বাদন করিতে পারে।

(খ) অপূর্ব কারুণিকত্বের সংবাদ—

শ্রীভগবানের করুণার কথা সকল দেশের ধর্মাচার্য্যগণই প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু, সে সব বাণী শ্রবণেও জীবের মনের ‘ত্রাস’ ও সাধ্বস কাটে না। সেই জন্ম গৌরহরি বলিলেন—

‘শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণ। মায়া কবলিত জীবকে উদ্ধার করা তাঁহার ‘স্বভাব’ ও ‘স্বরূপগত ধর্ম্ম।’

(গ) উদারতা—

১। ভারতের হিন্দু সমাজেই শাক্ত, শৈব গাণপত্য, সৌর ও বৈষ্ণব এই পাঁচটি সম্প্রদায় ‘ধর্ম্ম’ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান আদি নানা ধর্ম্মও আছে। কিন্তু, সমস্ত বিশ্বের ধর্ম্মমত, পথ ও সম্প্রদায় বহু।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাস্ত্রকে বৈষ্ণব আচার্য্যবৃন্দ ‘সত্য জ্ঞানে’ যথোচিত মর্য্যাদা দান করেন। বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ‘সিদ্ধ’ অবস্থাই “ভাগবত বৈষ্ণবতা”। কারণ তখন তাঁহাদের অবস্থা—

“যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি।”

অবশ্য ভগবানকে ‘প্রাণপতি’ সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা, ভজনের রীতি গৌরহরিরই প্রবর্ত্তিত। ইহা, অন্ত্র কোথাও আছে কি না জানি না।

আর এক বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণবদের ভজন “সব কিছুকে লইয়াই”—এঁদের কেহ ‘ত্যজ্য’ নয়। আবার, শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শোনা যাচ্ছে—

“এ রাজ্যে’ ‘সে রাজ্যে’ কোন তফাৎ নেই—কেবল অমুভূতির হের ফের।”

২। ‘সাধন’ সম্বন্ধীয় উদারতাও অতুলনীয়—

‘নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।

সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।

কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥’

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

৩। বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে সকলেরই ‘ভজনের’ অধিকার আছে শুধু তাহাই নয়, যোগ্য হইতে “আচার্য্য” হইতেও বাধা নাই। যথা—

কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র গ্যাসী কেনে নয়।

যেই কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই ‘গুরু’ হয় ॥

—চরিতামৃত

(ঘ) ভগবানের সহিত নিকটতম সম্বন্ধের সংবাদ—

গৌরহরির প্রবর্তিত মধুর রসে সম্পৃক্ত ভজন পন্থায় কেবল মাধুর্য্যেরই পরম আকর্ষণত্ব। “মধুর রসের প্রভু” “মধুর রসের সখা” “মধুর রসের পুত্র” ও “(মধুর রসময় গতি) প্রাণপতি” এই চার প্রকারের নিবিড় সম্বন্ধে ভগবান বাঁধা। তাঁহার মত ‘পরম আত্মীয়’ ও ‘আপন জন’ জীবের কেহ তাই হইতেও পারে না।

(ঙ) ভজনাস্ত্রের উপাদেয়তা—

জ্ঞান-যোগাদি সাধনে সকলের দেহ মন যোগ্য হয় না। তা ছাড়া জ্ঞান ও যোগের সাধনা ও সাধ্যফল যে ফল দান করে তাহাও ভক্তির

সম্পর্ক ঘটিলেই পূর্ণতা লাভ করে। গৌরহরি এমন সরল মধুর ও সহজ সাধন ও ভক্তনের উপদেশ করিলেন যাহা দেশ-কাল-পাত্র নিবিশেষে (তাহা) অবলম্বনীয়। অর্থাৎ যে কোন লোক (বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ বা নারী) যে কোন অবস্থায় (খাইতে শুইতে) যে কোন সময়ে, যে কোন স্থানে (যথা তথা) সাধন ভক্তির সর্ব শ্রেষ্ঠ বা ‘অপ্রাকৃত উপচার’ ‘হরি সংকীর্তন’ করিতে পারে।

“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব সিদ্ধি হয় ॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

—যে হেতু গৌরমুন্দর ‘পরতত্ত্বের অবধি’ সূতরাং তাহার নিত্য পার্শ্বদবৃন্দও ‘সেবক তত্ত্বের অবধি’।

“পরিকর বৈশিষ্ট্যম্ ভগবৎ আবির্ভাব বৈশিষ্ট্যম্”

রসিক ভক্তেরা জানেন যে—

১। গৌর লীলার অপর নাম—‘আশ মিটান লীলা’

২। গৌর যুগল, পরিকর যুগল—‘যুগলে যুগলে খেলা’

শ্রীরাধা যে অনির্বচনীয় প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আশ্বাদন করেন, তাহার মহিমা কি প্রকার এবং শ্রীরাধার সেই আশ্বাচ্ছ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যই বা কি প্রকার এবং সেই মাধুর্য আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে কি সুখ হয়, তাহাই বা কিরূপ? এই তিনটি বাঞ্ছার

পুষ্টির জন্য শ্রীনন্দনন্দনই শ্রীরাধার ভাব হৃদয়ে ধারণ পূর্বক তাঁহার কান্তিও অঙ্গীকার করিয়া গৌরান্ধ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এতেই মিলন সম্পূর্ণ হইল কি? প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলন যে বাকী রহিল। তাই ‘রাই-কানুর মিলিত বিগ্রহ’ ও ‘অতি গূঢ়তম গৌরলীলায়’ কিছু অসম্পূর্ণ থাকার কথা নয়। রাধা গোবিন্দের অচিন্ত্য শক্তির লীলা সান্নিধ্যেই যুগলিত লীলা বিগ্রহ শ্রীগৌরান্ধ্রের আবির্ভাব। সেই লীলাশক্তির অপর এক রহস্য মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-দেহ শ্রীবলরামের সঙ্গে শ্রীরাধার দ্বিতীয়-দেহ অনঙ্গমঞ্জরীর মিলিত লীলা বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব। আবার, শ্রীরাধার যে যে অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য বৈভব, সেই বৈভবের সু-প্রকাশ তাঁর পরিকরবৃন্দ। তাই এক এক গৌরপরিকর পূর্বলীলারই দ্বিতীয় প্রকাশ। যেমন সুবল আর ললিতার ভাব মিলে ‘স্বরূপ দামোদর’। বিশাখা আর ব্রজের অর্জুন সখার ভাব মিলে ‘রামরায়’। এমনি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের ভাবগুলির এক এক সখা আর শ্রীরাধার অঙ্গের এক একটি ভাব মিলিত হইয়া এক এক গৌর-পরিকরের আবির্ভাব—এই তাঁদের লীলা-পার্বদ পরিচয়।

তাই ব্রজের পরিকরবৃন্দের যেমন শ্রীকৃষ্ণ উপাস্ত্র, তেমনি নদীয়ালীলায় গৌর পরিকরদের ‘উপাস্ত্র’ বা ‘সেবা’ পরতত্ত্ব সীমা ‘গৌর-স্বরূপ’। তাঁহাদের যত কিছু আচার, প্রচার, গ্রন্থ প্রণয়ন, পদ-পদাবলী, বিগ্রহ, সেবা-স্থাপন, সবই একমাত্র “গৌর সেবার” উপায়ন ভিন্ন অন্য কিছুই নয় এবং হইতেও পারে। এই তত্ত্বে সু-দৃঢ় স্থৈর্য্য রক্ষা করিয়া ‘গৌরপরিকরবৃন্দের’ চরিত্র অনুশীলন করিলে তবেই পূর্ণাঙ্গ হইবে।

(সেই অচিন্ত্য শক্তি লীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরান্ধ্র ও তাঁহার অবদানের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করা হয়।)

উপরে নিবেদন করা হইয়াছে যে, এই গৌরলীলার অপর একটি নাম ‘আশ মিটান লীলা’। ব্রজলীলায় সখীবৃন্দের লীলা মুখরতা

অসীম। তথাপি মঞ্জরীদের মত মুক আশ্বাদনে তাঁহাদের লোভ ছিল (অবগুণ্ঠিত চিত্তবৃত্তি)। তাঁহাদের সে বাসনার পূর্তি হইয়াছে।

ব্রজলীলায় মঞ্জরীবৃন্দ (যেন) ‘মুক’ ছিলেন। অথচ সখীদের মত, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা গানে তাঁহাদের ‘বাচাল’ হইবার লোভ ছিল সে লোভেরও পূর্তি হইয়াছে। এবার তাঁহাদিকেও ‘বাক্ চঞ্চল’ করিয়া সে ‘আশার’ পরিপূর্তি হইয়াছে।

এই মুকের গণেরই (বোবাদেরই) একজন সু-মধুর চরিত্র লইয়া গৌরলীলায়—“রঘুনাথ দাস” বা “দাস গোস্বামী” নামে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

[২]

/(ক) মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় সুহৃদ অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর স্বরূপকে বলিয়াছিলেন “এই রঘুনাথকে আজ আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে (শ্রীরঘুনাথকে) পুত্রের গ্ৰায় স্নেহে করিও ও ভৃত্যের গ্ৰায় কৃপা করিও বা তাহার সেবা গ্রহণ করিও। রঘু তোমাকে পারমাথিক পিতা জ্ঞান করিবে এবং শরণাগত ভৃত্যের গ্ৰায় সর্বদা তোমার সুখ-তাৎপর্যময় আচরণ করিবে। আমার রঘু অতি প্রিয় ধন, এ বস্তুটি আজ হইতে তোমারই হইল। অতঃপর লোকে-ইহার পরিচয় “স্বরূপের রঘুনাথ”। মহাপ্রভু রঘুনাথের দুইটি হাত ধরিয়া স্বরূপের কর-কমলে সমর্পণ করিয়াছিলেন। লোক ব্যবহারের ভাষায় যাহাকে বলে ‘হাতে হাতে সঁপিয়া দেওয়া’।

স্বরূপ দামোদর বা স্বরূপ তাঁহার নাম। পূর্বাশ্রমে ইহার পরিচয়—শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য। ইনি অতি অল্পকালের মধ্যেই নবদ্বীপে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ইহার নম্রতা, দীনতা ও পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। ইহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর। তাঁহার

সু-কণ্ঠে গান শুনিয়া সকলের চিত্ত বিমোহিত হইত। ইনি নিমাই পণ্ডিতের সৌন্দর্য্যে, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে এবং কোন এক অচিন্ত্যনীয় আকর্ষণে তাঁহার নিকট সতত সলজ্জ হইয়া অবস্থান করিতেন। একটি মুহূর্ত্ত ‘গৌরহরিকে’ না দেখিলে অধীর হইতেন।

ইনি—

‘প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।

সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা বারাণসী গিয়া’ ॥

—পরে যখন সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার সর্বস্ব নিধি গৌরহরি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন—ইনিও তখন আর কাল বিলম্ব না করিয়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া গৌর চরণে পতিত হইয়া দয়া প্রার্থনা সূচক স্বরচিত শ্লোকে * অপূর্ব স্তুতি পাঠ করিলেন।

গৌরমুন্দর স্বরূপের সহিত পুনরায় অন্তরঙ্গ মিলন লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহাকে বক্ষে জড়াইয়া গাঢ় প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাশ্রুতে উভয়ের অঙ্গ পরিষিক্ত, ঔষ্ঠাধর কম্পিত এবং আবেগে উচ্ছ্বসিত প্রেমে ডুবিয়া উভয়ে অবশ ও অচেতন প্রায় হন।

কিছুক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া শচীদুলাল গৌরহরি বলিয়াছিলেন—

‘তুমি যে আসিবা আমি স্বপ্নেই দেখিল।

ভাল হৈল অঙ্গ যেন ছই নেত্র পাইল ’ ॥

(খ) ‘শ্রীরূপ গোস্বামীর’ কবিত্ব ও রসতত্ত্ব বিচার বিশ্বের বিস্ময়-কর।—এ হেন শ্রীরূপকেও রসতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রসঙ্গে গৌরহরি স্বরূপকে আদেশ করেন—

* মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকটি দেখুন—

[২১৩০]

‘যোগ্য পাত্র হয় গুট রস বিবেচনে ।
তুমিও কহিও তারে গুট রসাখ্যানে ॥’

—চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

“তুমিও কহিও উহায় রসের বিশেষ”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১ম

(গ) শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌমের উক্তি—

.....এই স্বরূপ দামোদর ।
মহাপ্রভুর ইহঁো তয় দ্বিতীয় কলেবর ॥

(ঘ) শ্রীল বৃন্দাবন দাসের উক্তি—

কি শয়নে কি ভোজনে কি বা পর্যটনে ।
‘দামোদর’ প্রভু না ছাড়েন কোন ক্ষণে ॥

একেশ্বর ‘দামোদর-স্বরূপ’ গুণ গায় ।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাজ রায় ॥

‘অশ্রু ঘর্ম্ম হাস্য মূর্ছা পুলক লঙ্কার ।
যত কিছু আছে প্রেম-ভক্তির বিকার ॥
‘দামোদর-স্বরূপের’ উচ্চ সঙ্কীর্ণনে ।
শুনিলে না থাকে বাহ্য পড়ে সেই ক্ষণে ॥

দামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত রসময় ।
যার ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥

কীর্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ ।
এক প্রভু নাচায়েন কি আর সম্পদ ॥

অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্তন রঙ্গে ।
বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে ॥

পথ চলিতেও প্রভু 'দামোদর' গানে ।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া পথ নাহি জানে ॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্তি :-

(১)

'সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি ।
'দামোদর' সম আর নাহি মহামতি ॥'

(২)

'অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ ।
রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ ॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার ।
'দামোদর-স্বরূপ' হইতে যাহার প্রচার ॥

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥'

(৩)

'স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ।
প্রভুতে 'আবিষ্ট' যার 'কায়' 'বাক্য' 'মন' ॥
স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর নিজ ইন্দ্রিয়গণ ।
আবিষ্ট করিয়া করে গান আশ্বাদন ॥'

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আশ্বাদন ।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ ॥'

এককালে (যশোহরের) ভৈরব নদ হইতে প্রায় রূপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে “সপ্তগ্রাম মুলুক” বলা হইত। আর সপ্তগ্রাম বলিতেই—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর এবং শঙ্খনগর এই সাতটি গ্রামকে বুঝাইত। এই কয়টি গ্রামের মুকুটমণি ভূখণ্ডের নাম সপ্তগ্রাম-নগর। ‘সপ্তগ্রাম মুলুকের’ রাজধানী সপ্তগ্রাম। এখানে ছোট একটি Mint বা টাকশাল ছিল। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের সেরেস্তায় “সপ্তগ্রাম সরকার” নামে ‘সপ্তগ্রাম মুলুক’ অভিহিত হইত।

রাজকার্যে বিচক্ষণ, ক্ষমতামালী ও বিপুল বৈভবশালী কায়স্থকুল-প্রদীপ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস নামে দুই সহোদর ভ্রাতা ‘মোক্‌রর’ সূত্রে এই সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায়ের অছি বা ‘মোক্‌রর’ ছিলেন। ‘মোক্‌রর’ অর্থ এই যে, প্রতি সন রাজ-সরকারে নিদিষ্ট একটি রাজস্ব আদায় দিবার বন্দোবস্ত যিনি করেন এবং আয়টির ‘গ্যারান্টি’ যিনি দেন।

এই হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

‘হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস দুই সহোদর ।
সপ্তগ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥
মহেশ্বর্ঘ্যযুক্ত দোহে বদান্ত ব্রাহ্মণ্য ।
সদাচার সংকুলীন ধার্মিক অগ্রগণ্য ॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায় ।
অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥’

দেশ ও সমাজের গৌরব এই দুই ভায়ের একমাত্র বংশধর—
শ্রীল রঘুনাথ দাস (গোস্বামী)

প্রেমরস নির্যাস আশ্বাদনকারী, লোকে রাগমার্গ-ভক্তি প্রচারকারী, 'রসিকশেখর' ও 'পরমকরণ' 'সচল জগন্নাথ' গৌরহরির অপার করুণায় অনুপম চরিত্র শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সঞ্চারময়ী কৃপায় অখিল বাঙ্গার পুঁতি 'কল্পতরু' 'করুণাবাহন' শ্রীগুরুদেবের অবিরল-বর্ষিণী করুণা ধারার সিঞ্চন লাভ করিয়া "দাস গোস্বামী" প্রকাশিত হইলেন। সোনার-গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর 'সযত্ন-লালিত', 'কৃপা-সিঞ্চিত' 'কৃপাপুষ্ট' 'গৌর-গর্ব্ব-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত' 'ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত' শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সু-লালিত জীবন-সুধমা প্রকাশ করা অসম্ভব হইলেও অভিন্ন-চৈতন্য-তনু শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা-সিঞ্চিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কাবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের প্রেমময়ী লেখনীতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভক্ত মহানুভবগণ এই দুই শ্রীগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাসের অমল চরিত্র কথা বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি উক্ত মহান্ চরিত্রটিকে প্রামাণ্যসূত্রে গ্রন্থিত করিয়া 'দাস গোস্বামী' নামে প্রকাশ করিবার লোভ পাইয়া বসিল। উহা—

“আত্ম-শোধিবার তরে ছঃসাহস হেন”

এই 'দাস গোস্বামীর' জীবন কথার এমনি আকর্ষণ যে তাহা নিজের করিয়া আশ্বাদন করিতে প্রবল বাসনা হয়। অথচ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'সু-রসাল' 'সু-গন্তীর' জীবন কথা প্রকাশ করা আমাদের মত অযোগ্যের দ্বারা একান্ত অসম্ভব। তাই যঁাহারা তাঁহার সু-মধুর জীবন গাঁথা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট মাধুকরী করিয়া এই সম্পূট ভরিয়া তুলিয়াছি।

এই পরম মঙ্গল চরিত্রের মূল উৎস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং স্বতঃ অনুভূতিময়চিত্ত নামময়-জীবন মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অঁাখরে সমন্বিত কীর্ত্তনাবলী ও তাঁহারই বিবিধ প্রসঙ্গ।

এই শ্রীগ্রন্থ সঙ্কলনে এ অধমের অযোগ্যতা দোষে ক্রটি বিচ্যুতি
যাহা যাহা লক্ষণীয় হইবে সেগুলিকে উপক্ষা না করিয়া কৃপাময় পাঠক
ও পাঠিকাবৃন্দ আমাদের জানাইয়া পরবর্তী সংস্করণে সেগুলির
সংশোধনের সহায়তা করিবেন ইহাই এ দীনের সকাতির প্রার্থনা ।

‘সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন ।
যা সভার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥’

‘রঘুনাথ দাস কথা’ যেই জন শুনে ।
তাঁহার চরণ ধুঞা করে’। মুই পানে ॥

‘শ্রোতার পদরেণু করে’। মস্তকে ভূষণ ॥’

ভিখারী—

রামকিঙ্কর দাস

“স্মরণীয় বাণী-কণা”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে বর্ণিত ‘গৌর এবং গৌর-পরিকল্প-
বৃন্দের’, ‘অমল’ চরিত্র অনুশীলনে যে ‘কৃপা’ ও সাবধানতার প্রয়োজন,
সে সম্বন্ধে—

(১) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বমুখোক্ত বাণী—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না জুয়ায় ;
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ।
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ় ;
ঝুঝিবে রসিক ভক্ত,—না ঝুঝিবে মূঢ় ।

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন ।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আশ্বাদন ॥

—সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম ।
চৈতন্যের দাসে জানে, এই সব মর্ম ॥

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

চৈতন্যের লীলা গভীর কোটি সমুদ্র হৈতে ।
কি লাগি কি করে, কেহ না বুঝিতে ॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি ।
বাহু অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র গন্তীর ।

লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্য চরিত ।

তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২য়

(২) বঙ্গদেশীয় কবির নাটক প্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ দামোদরের বাণী—

‘কৃষ্ণলীলা’ বর্ণিতে না জানে সেই ছার ।

বিশেষ দুর্গম এই ‘চৈতন্য বিহার’ ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম

(৩) ঠাকুর হরিদাসের উক্তি—

যে কহে,—চৈতন্য মহিমা মোর গোচর হয় ।

সে জানুক, মোর পুন এই ত নিশ্চর—

তোমার মহিমানস্তায়তাপার সিন্ধু ।

মোর বাহ্ননোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য়

(৪) শ্রীমদাস গোস্বামী বিরচিত মুক্তাচরিতের মঙ্গলাচরণে—

নিজামুজ্জলিতাং ভক্তি সুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ

উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে ।

‘নিজাম্ উজ্জলিতাং ভক্তিসুধাং’—

“আশ্বাদিতে নিজ-মাধুর্য্য-সীমা

—প্রচারিতে নিজ নাম-মহিমা”

(বাবাজী ম’শায়)

“প্ৰহ্লাদ গট্টের পরিচয়”

প্রথম চিত্র :

টাঁদপুৰে—

“ৰঘুনাথ দাস” বালক করেন অধ্যয়ন ।
হরিদাস ঠাকুরে যাই করেন দর্শন ॥”

দ্বিতীয় চিত্র :

(শ্ৰীধাম-পুৰীতে) শ্ৰীশ্ৰীরাধাকান্ত মঠের অভ্যন্তরে প্রখ্যাত
‘গন্তীরা’

[(ফটো তুলিয়া) ঠাকুর হরিদাস শ্ৰীগ্রন্থে ১১০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত
হইয়াছে ।—সেই চিত্রটিরই ‘লাইন ব্লক’]

॥ সূচীপত্র ॥

তরঙ্গ :	বিষয় :	পৃষ্ঠা
প্রথম তরঙ্গ	বাল্যে ঠাকুর হরিদাসের কৃপা	: ১
দ্বিতীয় তরঙ্গ	গোর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণে	: ৫
	প্রথম গোর দরশনে	: ৭
	দ্বিতীয় বার গোর দরশনে	: ১১
	প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক প্রীতি	: ১৬
	পুরস্চরণ	: ১৭
তৃতীয় তরঙ্গ	বিপদে	: ১৯
চতুর্থ তরঙ্গ	নিতাই প্রসঙ্গে	: ২৩
	নিতাই মিলনে	: ২৭
	এ যুগের সাধন কি ?	: ৩২
	দশু মহোৎসব ও গোর আবির্ভাব	: ৩২
	দশু মহোৎসবের রাত্রিতে	: ৩৭
	‘রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথ উপরে’	: ৬৮
	নিতাইচাঁদের আশীর্বাদ	: ৩৯
	নিতাই মদিরা পানে	: ৪২
পঞ্চম তরঙ্গ	সংসার শৃঙ্খল মোচন	: ৪৫
	রঘুনাথের অদর্শনে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের ভবনে	: ৪৯
	নীলাচলের পথে	: ৫২
	নীলাচলে গোর-রঘুনাথ মধুর মিলন	: ৫৩
	রঘুনাথের নীলাচল বিহার	: ৫৮
ষষ্ঠ তরঙ্গ	স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্যরূপে	: ৫৯
	অযাচক বৃত্তিতে	: ৬০
	শ্রীনাম সাধনার স্বত্রে সঙ্কেত	: ৬৩

তরঙ্গ :	বিষয় :	পৃষ্ঠা
	শ্রীনামের চিন্ময় অবয়ব	: ৬৩
	শ্রীনামের প্রভাব	: ৬৩
	ধরণীতে নাম মূর্তির প্রকাশ	: ৬৫
	বিকশিত নামের বসতি স্থলী	: ৬৯
	শ্রীনামই গুরু মূর্তিতে	: ৬৯
	গুরু মূর্তিতে ভূরি দান	: ৭০
	নাম গ্রহণে শ্রীগুরু উপদেশ	: ৭১
	প্রতিশ্রুতি দান	: ৭১
	শাস্ত্র প্রসঙ্গে শ্রীগুরু উপদেশ	: ৭২
	শ্রীনামের বীর্যশক্তি	: ৭৪
	শ্রীনামের দ্বিতীয় লীলা মূর্তি	: ৭৫
	নামের লীলা মূর্তি প্রাপ্তি-লোভ জাগিলে	: ৭৫
	রহো লীলার নব যুগল	: ৭৬
	নব যুগল মূর্তির প্রমাণ প্রসঙ্গ	: ৭৭
	শ্রীনাম লীলার নব যুগল মূর্তির প্রসঙ্গ	: ৭৭
	শ্রীনামের রহস্যলীলার মর্শ্বকথা	: ৭৮
	শ্রীনামের গোরাঙ্গলীলা	: ৭৯
	শ্রীনামের নদীয়ালীলায় নব যুগল বিগ্রহের	
	নব-লীলা	: ৮২
	শ্রীনাম মূর্তির নীলাচল লীলা	: ৮৪
	শ্রীনামের লীলা পুত্তি	: ৮৮
	(১) নাম সর্বশক্তিমান	: ৮৯
	(২) আমিত্ত্ব থাকতে পুরুষকার থাকতে...	: ৯০
	সংশয় নিরসনে	: ৯০
	পিতার কল্যাণে	: ৯৭
	বৈরাগ্যের ক্রম প্রকাশ	: ১০০
সপ্তম তরঙ্গ	ভূমিকা	: ১০৫
	শ্রীরূপ প্রসঙ্গে	: ১০৬
	শ্রীচৈতন্যষ্টক (১)	: ১০৯
	” (২)	: ১১৫
	” (৩)	: ১১৮
	ইতিহাস	: ১২৩
	শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে	: ১২৩

তরঙ্গ :	বিষয় :	পৃষ্ঠা
	‘লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবে’	: ১২৮
	রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে	: ১৩৩
	গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গে	: ১৩৮
	অপর এক ঘটনা	: ১৪৩
	বল্লভ ভট্টের প্রসঙ্গে	: ১৪৪
	অনর্গলরসবেত্তা	: ১৪৫
	‘প্রেমসুখানন্দ’	: ১৯৬
	ঠাকুর হরিদাস প্রসঙ্গে	: ১৪৮
	জগদানন্দ প্রসঙ্গে	: ১৫২
	রঘুনাথ ভট্ট প্রসঙ্গে	: ১৭০
	বাণীনাথ প্রসঙ্গে	: ১৭৩
অষ্টম তরঙ্গ	নদী-সাগর-সঙ্গমে ভাসি গেলা নীলাচল	: ১৮০
	ঝালির ঝালি	: ১৮৫
	ঝালির অত্যাচর দ্রব্য	: ১৯০
	(মঠ হইতে গমন)	: ১৯৩
	(সিংহদ্বারে উপস্থিত)	: ১৯৪
	(কাশী মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া)	: ১৯৫
	(গঙ্গীর দ্বারে)	: ১৯৬
	ঝালি সমর্পণের প্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের	
	অনুস্মৃতিতে অধিক বিকাশ	: ২০৯
	গুণ্ডিচা মার্জন লীলা	: ২১২
	ইন্দ্রদ্যুয়ে—	: ২৩০
	আইটোটায়—	: ২৩৩
	নেত্রোৎসব দর্শনে—	: ২৩৭
	“পছন্নি বিজয়”	: ২৪১
অষ্টম তরঙ্গ	রথাগ্রে—	: ২৪৩
	রথের সম্মুখে—	: ২৪৭
	অপক্লপ রথের আগে—	: ২৬৬
	‘গোরা নাচে রাধাভাবে ।	
	এই জগন্নাথের রথের আগে ॥’	: ২৭৩
	গুণ্ডিচা বাড়ীর দরজায়	: ২৭৭

তরঙ্গ :	বিষয় :	পৃষ্ঠা:
	মনোমন্দিরে শ্রীশুরু আনুগত্যে লীলা চিত্তনে শ্রীরামদাস	: ২৮৩
নবম তরঙ্গ	নিতাই প্রসঙ্গে	: ২৯১
	নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত	: ২৯৫
	‘উদ্ধারিতে পতিত সবার । নিতাই তোমার অবতার ॥’	: ২৯৬
	গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রসঙ্গে (১)	: ৩০০
	গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ প্রসঙ্গে (২)	: ৩০৩
	কে বুঝিবে ঠাহা দোহার গোপভাব গুঢ় বিজয়া দশমী	: ৩০৬ : ৩০৮
দশম তরঙ্গ	শেষ যে রহিল প্রভুর ষাটশ বংশব উদ্ঘাটন	: ৩১০ : ৩১১
	প্রথম চিত্র	: ৩২০
	দ্বিতীয় চিত্র	: ৩৩০
	তৃতীয় চিত্র	: ৩৪১
	চতুর্থ চিত্র	: ৩৫৩
	পঞ্চম চিত্র	: ৩৬০
	ষষ্ঠ চিত্র	: ৩৬২
	সপ্তম চিত্র	: ৩৬৮
	কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ? অষ্টম চিত্র	: ৩৭১ : ৩৮০
	নবম চিত্র	: ৩৮৫
	দশম চিত্র	: ৩৯২
একাদশ তরঙ্গ	রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন— গোবর্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রসঙ্গে	: ৩৯৮ : ৪০২
ষাটশ তরঙ্গ	রূপ-সনাতন প্রসঙ্গে রূপ-সনাতনের অদর্শনে	: ৪০৪ : ৪০৭
ত্রয়োদশ তরঙ্গ	শ্রীকৃষ্ণ সংস্কারে	: ৪১০

তরঙ্গ :	বিষয় :	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ তরঙ্গ	শ্রীকৃষ্ণ তটে	: ৪১৭
	শ্রীনিবাস প্রসঙ্গে	: ৪১৮
	মা-জাহ্নবা-প্রসঙ্গে	: ৪২৩
	‘কবিরাজ ধীর শিষ্য রহিলেন কাছে’	: ৪২৫
পঞ্চদশ তরঙ্গ	গোর-বিরহ প্রমথনের ঔষধি	: ৪২৯
	শ্রীশ্রীগোরাক্স-স্তব-কল্পতরু	: ৪২৯
	শ্রীশচীনন্দনাষ্টক-স্তোত্রম্	: ৪৪০
	শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর স্বরচিত বাংলা	
	ঐ পদ-কীর্তন	: ৪৫০
	ঐ আরত্রিক বর্ণনা	: ৪৫১
ঐ জয়দেবের মহিমা কীর্তন	: ৪৫২	
	“বিরহে” গোর সেবার উপকরণ	: ৪৫৩
ষোড়শ তরঙ্গ	ভূমিকা	: ৪৫৬
	শ্রীসূচক কীর্তনের গোরচন্দ্র	: ৪৫৭
	শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর	
	শোচক কীর্তন	: ৪৬৯
	শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর	
	শোচকে “আক্ষেপ কীর্তন”	: ৫০৭
সপ্তদশ তরঙ্গ	শ্রীতি-উপহার	: ৫১৮
	(বিবরণ—৫১৮, সূচীপত্র—৫১৯)	
অষ্টাদশ তরঙ্গ	পাথের	: ৫৬১
	(পাথের সংকেত ৫৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন)	
	শ্রীগুরু কৃপায় কি না হয় ?	: ৬১৩
	(অভিমত সংকেত—৬১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)	

চিত্র সংকলন :

বিবরণ—	পৃষ্ঠা
১। প্রভু জগদ্বন্ধু, প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ষাদশ মহাপুরুষ (সেবাঞ্জলির পর পৃষ্ঠায় তিন ভাঞ্জে)	: :
২। (পানিহাটি গ্রামে) গঙ্গা তটে প্রখ্যাত 'বটবৃক্ষ'	: ৩৮
৩। শ্রীধাম পুরীতে (শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখে) রাজপথে, নিষ্কিন্ত 'মহাপ্রলাদ' সংগ্রহকারী (রাজপুত্র) রঘুনাথ	: ১০৩
৪। (শ্রীকুণ্ড-তটে) শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীল রঘুনাথ দাস ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ : —এ তিনের 'পুষ্প' সমাধি	: ১৭০
৫। রাঘব ভবনে 'মাধবকুঞ্জ'	: ১৮৯
৬। (শ্রীকুণ্ড-তটে) শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ভজন কুটির	: ৪১৬
৭। (শ্রীকুণ্ড-তটে) শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুটির	: ৪২৮
৮। পঞ্চোদ্বারের পরে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড : (ফটো—ভারিখ ২০শে জুলাই ১৯৪০ খৃঃ)	: ৪৮৯
৯। গ্রন্থ সকলয়িতার শ্রীগুরুদেব—নামময়-জীবন শ্রীল রামদাস বাবাজী	: ৫২০
১০। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ম্যাপ্	: ৫৮০
১১। 'গষ্ঠীরা-বিহারী গৌরহরির নীলাচল ঈলার ধারক' শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি (শ্রীকুণ্ড)	: ৬০৮

প্রথম তরঙ্গ

বাল্যে ঠাকুর হরিদাসের রূপা :

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনদাস দুই সহোদর। হিরণ্য জ্যেষ্ঠ, গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। হিন্দু-কুল-গৌরব এই দুই ভাই সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম মুলুকের অধিপতি। বিপুল বৈভব ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব না থাকিলে মুসলমান আমলে কোন হিন্দুর এইরূপ অধিকার সম্ভব নয়।

শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, বদান্যতায় ও সদাচারে এই দুই সহোদর জন-সমাজে সর্বিশেষ সমাদৃত ও সম্মানিত ছিলেন। হিরণ্য নিঃসন্তান। গোবর্দ্ধনের একটি মাত্র সন্তান, নাম 'রঘুনাথ'। সুতরাং দুই সহোদরের একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। ইনিই কালে জগৎ-পূজ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস বা 'দাস গোস্বামী'।

বৃটিশের আগমন পূর্বে এ দেশে 'আত্মধর্ম'† সম্বন্ধি বস্তুর আদর ছিল এবং 'অনাত্মধর্ম'† সম্বন্ধি বস্তু সমূহের তথ্য সংরক্ষণে অনাদর ও উপেক্ষা ছিল। তখনকার সমাজ ও গ্রন্থপ্রণেতৃগণ একটি মহাজীবনের সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহারই সংবাদ সংসারকে জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু কোন্ দেশ

* "আত্মধর্ম" :—যে ধর্মের সহিত জীবের 'স্বরূপ' অমুভব কর্তব্যের সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ যে ধর্ম সমূহ জীবাত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান এবং তাহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগকে 'আত্মধর্ম' বলে। এই আত্মধর্ম নিত্য অপরিবর্তনীয়।

† অনাত্মধর্ম :—দেহাদি অনাত্ম বস্তুর কর্তব্য নির্দ্ধারণে সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি, লোকাচার ও দেশাচারদিগকে 'অনাত্মধর্ম' বলা হয়। ইহারা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল।

হইতে কি প্রকারে সেই জীবনধারাটি প্রবাহিত হইয়া এইরূপ উদার অথবা মহান্ উচ্ছ্বসিত প্রবাহে পরিণত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে তাঁহারা যত্নবান হন নাই। এই কারণেই “রঘুনাথের” চরিত্র ঐতিহাসিক হইলেও তাঁহার জন্মস্থান, সন, তারিখ আদির প্রামাণ্য তথ্য তেমন সু-নির্দিষ্ট নাই।

দাস গোস্বামীর প্রকট জীবনের পরবর্তী কালের পরম শ্রদ্ধেয় মহাজনবৃন্দ তাঁহার (শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর) আবির্ভাবের যে সব তথ্যপ্রকাশ করিয়াছেন সেগুলিকে সাজাইয়া দেখিলে যাহা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ তাঁহার “শ্রীমৎ দাসগোস্বামী” শ্রীগ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন—

‘শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী কোন্ শকে সহর সপ্তগ্রামের কোন্ পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন তাহার নিশ্চয়ত্বক প্রমাণ নাই। তবে সম্ভবতঃ ১৪১৫ শক হইতে ১৪১৮ শকের মধ্যে কোনও সময়ে চাঁদপুর বা তন্নিকটস্থ কোন পল্লীতে এই বৈরাগ্য অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল।

(২) শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস কর্তৃক সংকলিত ‘শ্রীশ্রীগৌরগণ-সংক্ষিপ্ত চরিত রত্নাবলী’ (প্রথম খণ্ড) পৃষ্ঠা ৯৬ দ্বিতীয় লাইন—

‘রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪২০ শকাব্দায় কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।’

(৩) শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (৩) পৃষ্ঠা ১৩২৫—

‘আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর গ্রামে হিরণ্য মজুমদারের অনুজ গোবর্দ্ধনের গৃহে ইনি আবির্ভূত হন।’

জন্ম বিবরণের কথা দূরে থাকুক —‘রঘুনাথের’ বাল্য-ইতিহাসের সামান্য ইঙ্গিতও কোন প্রামাণিক গ্রন্থে সহজে পাওয়া যায় না। একমাত্র শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদই তাঁহার পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন।—

“সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

এই স্বল্পাক্ষর বর্ণনা হইতে যতটুকু জানা যায় সেই বিপুল বৈভবশালী গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠতাত, আত্মীয়বর্গ ও দাসদাসীর অত্যন্ত আদরের ছল্লাল হইয়াও রঘুনাথ আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুকাদিতে আবাল্য উদাসীন ছিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের একমাত্র স্নেহের ছল্লাল হইয়াও ভগবৎভক্তির আদর্শে তিনি গুরুগৃহে পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যে রঘুনাথের শিক্ষা-গুরুর নাম শ্রীবলরাম আচার্য্য। এই শ্রীবলরাম আচার্য্যই একদিন ভুবনপাবন নামময়জীবন ঠাকুর হরিদাসের কৃপাপাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইনি পরম ভক্তিমান, পবিত্রহৃদয় এবং বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। সাধু সজ্জন পাইলেই ভক্তিপূর্বক ও পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে তিনি নিজ আলয়ে লইয়া যাইতেন। তাঁহার গৃহে বিद्या অধ্যয়নকালীন রঘুনাথ সম্ভবতঃ ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। তখন তাঁহার সৌভাগ্যে শ্রীল বলরাম আচার্য্যের গৃহে ঠাকুর হরিদাস কিছুকাল অবস্থান করেন। রঘুনাথও সেই সুযোগে প্রত্যহ ঠাকুর হরিদাসকে দর্শন করিতে যাইতেন। যথা—

“হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা টাঁদপুরে ।
 আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥
 হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার ।
 তাঁর পুরোহিত বলরাম আচার্য্য নাম তার ॥
 হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে ।
 যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেই গ্রামে ॥
 নির্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন ।
 বলরাম আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নিব্বাহন ॥

রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন ।
 হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দরশন ॥
 হরিদাস কৃপা করেন তাহার উপরে ।
 সেই কৃপা কারণ চৈতন্য পাইবারে ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

স্বভাবেই ভগবৎপ্রিয় ও বিষয়ে উদাসী সেই বালক ‘রঘুনাথ’
 শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিয়া ও তাঁহার সু-মধুর কীর্ত্তন
 শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পরম রূপলাবণ্যময় বৈরাগ্যবেশ ও সরল-
 জীবন দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ও লুদ্ধ হইলেন । অপরদিকে
 ঠাকুর হরিদাসের কৃপা-কটাক্ষে তাঁহার জীবন সেই আদর্শে ধীরে
 ধীরে গড়িয়া উঠিতে লাগিল ।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন প্রসঙ্গেও পাওয়া
 যায়—

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক অনুরাগ

বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে—

স্বাভাবিক গৌর অনুরাগ

(পরস্পর) লোক মুখে শুনে—

স্বাভাবিক গৌর অনুরাগ

শুধু কেবল তাই নয়

আরও গুঢ় কথা আছে
গৌর অহুরাগ প্রকাশ পাবার রঘুনাথের আরও গুঢ় কথা আছে ভাই

বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন
ঠাকুর হরিদাসের— বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন

সেই স্বাভাবিক অহুরাগে
সদাই ব্যাকুলিত চিত
কবে 'গৌরপদে' ঠাই পাব— সদাই ব্যাকুলিত চিত



দ্বিতীয় তরঙ্গ

গৌর-নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণে :

হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রামের আশ্রয় ও অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, দীন দুঃখীকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান, জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, সাধু, সজ্জন, উদাসী, বিদ্যার্থী সকলের জন্যই অন্নসত্র এবং মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি, পূজা পার্বণে দান ও অন্যান্য জনহিতকর বিবিধ প্রকারের সেবা ছই ভাইয়ের স্বাভাবিক কৃত্য ছিল।

উপরোক্ত পরিবেশের ফলে নদীয়া, গোড় ও ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ বিশেষ সংবাদ লোকমুখে প্রচারিত হইয়া সদা সর্বদা

হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভাতেও প্রকাশ পাইত। শচীভূলাল গৌরহরির মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতে প্রতিটি ঘটনাই অতি আশ্চর্য্য ও পরমমাধুর্য্য মণ্ডিত। সুতরাং এ সংবাদও যে গোবর্দ্ধনের সভায় প্রকাশ পাইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বালক রঘুনাথ আত্মীয় ও দাসদাসীর মুখে এবং প্রতিদিন হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের মুখেও নদীয়া-বিহারী গৌরহরির অলৌকিক আশ্চর্য্য রূপমাধুরী, অমানুষী প্রতিভা এবং জন্ম বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সময়গুলিতে তাঁহার অনুপম মধুময় লীলামাধুরীর নিত্য নূতন সুরসাল বর্ণনা ও ঐ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে ছড়া, গান, পদাবলী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

পরমমঙ্গল 'গৌরনাম' ও তাঁহার মন-প্রাণ-মাতান লীলাবলীর স্বাভাবিক আকর্ষণ শক্তিতে বালক রঘুনাথ ইহ জনমের মতই গৌরচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ফলে গৌরদর্শন ও গৌরসঙ্গ-লাভের জন্য তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। ইতি-পূর্বে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের দর্শন ও তাঁহার কৃপা কটাক্ষে রঘুনাথের মন তীব্র বৈরাগ্যের ক্ষেত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার ফলে মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের প্রীতি ও স্নেহ, মনোমুগ্ধকর নিত্য নূতন আমোদ প্রমোদ, অশেষ বিশেষ বিলাস উপকরণ ও অতুল ঐশ্বর্য্যে রঘুনাথের মন বিতৃষ্ণ হইয়া গেল। অন্তরের আবেশে রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ গৃহত্যাগের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কয়েক বার তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। স্বাভাবিক মমতার বশে অন্ধ হইয়া কঠোর শাসনের পরিবর্তে রঘুনাথকে সতত সজাগ দৃষ্টিতে প্রহরার মধ্যে রাখিতে লাগিলেন।

প্রথম গৌর দর্শনে :

ইত্যবসরে নদীয়া-জীবন গৌরহরি কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগী জনের মধ্যে এই মর্মান্তিক সংবাদটি তড়িত গতিতে সমগ্র গোড় মণ্ডলে প্রচারিত হইয়া গেল। বালক রঘুনাথও এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুচ্ছিত হইলেন। আহার নিদ্রাও ত্যাগ করিলেন। শচীছল লহয়ত বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বহু দূর দেশের কোথাও যাইবেন।—এই চিন্তা রঘুনাথকে বিহ্বল করিল।

তিন দিন পরেই রঘুনাথ সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রাণ-মন উন্মাদকারী ‘গৌরহরি’ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে ভ্রমণান্তে শান্তিপু্রে শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাই প্রাণের দেবতা গৌরহরিকে একটিবার দর্শনের জন্ত রঘুনাথের চিত্ত অস্বাভাবিক ব্যাকুল হইল। রঘুনাথের এই ব্যাকুল চঞ্চল অবস্থা দেখিয়া বিচক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয় (হিরণ্য গোবর্দ্ধন) প্রচ্ছন্ন প্রহরীর ব্যবস্থায় পাইক, পর্যাপ্ত সেবক ও ব্রাহ্মণ সহ রঘুনাথকে শান্তিপু্রে পাঠাইলেন।

শান্তিপু্রে আসিয়া রঘুনাথ দেখিলেন শ্রীহরি-নাম কীর্তনের তরঙ্গে শান্তিপুর্ ডুবুডুবু। নিরবিচ্ছিন্ন জনশ্রোতে শত শত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী একাকার হইয়া গৌর দর্শনে চলিয়াছেন। সকলের মুখেই উচ্চৈঃস্বরে মন প্রাণ মাতান মধুর ‘হরিধ্বনি’। রঘুনাথের স্বাভাবিক গৌর অনুরাগ এই অনুকূল পরিবেশে সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। প্রেমাবিষ্ট রঘুনাথ ‘আচার্য্যের’ গৃহে যাইয়া গৌর-চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

“সন্ন্যাস করিয়া প্রভু শান্তিপু্রে আইলা।

তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

গৌরসুন্দর পরম স্নেহে রঘুনাথের মস্তকে নিজ রাতুল চরণের স্পর্শ

দিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। প্রণতঃ রঘুনাথকে উঠাইয়া নিজ বক্ষে ধারণ করিলেন। উভয়ের নয়ন ধারায় উভয়ের শ্রীঅঙ্গ সিঞ্চিত হইল।

রঘুনাথ সপ্তগ্রামের অধিপতির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সকলেই তাঁহাকে চেনেন। আবার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনের বিশিষ্ট পরিচয়। তিনি পরম স্নেহে ও অতিশয় যত্ন পূর্বক রঘুনাথের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ পাঁচ সাত দিন শান্তিপুরে থাকিয়া মনের সুখে গৌর দর্শন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত প্রভু প্রতিদিন গৌরের অবশেষ রঘুনাথকে ভোজন করাইলেন।

“তার পিতা করে সদা আচার্য্য সেবন।

অতএব আচার্য্য তারে হইল প্রসন্ন ॥

আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত।

প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

রঞ্জিয়া গৌরহরি পাঁচ সাত দিন অখণ্ড সঙ্গ-সুখ ও নিজ অধরামৃত দান করিয়া স্বচরণে পরিপূর্ণ ভাবে লুক্ক করিয়া রঘুনাথকে বিদায় দিলেন। রঘুনাথ গৌরাজের সুমধুর সঙ্গ-সুখ হারাইয়া ‘বিরহে’ নয়ন জলে মুখ বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিলেন। এই চোখের ধারাই রঘুনাথের জীবন সাথী হইল। রঘুনাথের এখনকার গৌর-বিরহ অবর্ণনীয়।

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের বিলাপ বর্ণনই সম্ভবতঃ রঘুনাথের দশার সহিত তুলনীয়।—

“মরম কহিব

সজনি কায়

মরম কহিব কায়।

উঠিতে বসিতে দিক্ নেহারিতে
 হেরি যে গৌরাঙ্গ রায় ॥
 যদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল
 সকলি গৌরাঙ্গময় ।
 এ ছুটি নয়নে কত বা হেরিব
 লাখ আঁখি যদি হয় ॥
 জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ
 সকলি গৌরাঙ্গ দেখি ।
 ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ
 কি হল মোর এ সখি ॥
 গগনে চাইতে সেখানে গৌরাঙ্গ
 গৌর হেরি যে সদা ।
 নরহরি কহে গৌরাঙ্গ চরণ
 হিয়ায় রহিল বাঁধা ॥”

গৌরাঙ্গ প্রেমের বাতুল রঘুনাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা মাতার শ্রীচরণে পরম অতির সহিত নিবেদন করিলেন যে, তোমারা আমরা প্রিয়জন, আমার সুখে সুখী হইয়া যদি আমার প্রাণ বাঁচাইতে চাহ তাহা হইলে তোমরা আমায় কৃপাপূর্বক ছাড়িয়া দাও । গৌর-বিরহে আমি প্রাণে বাঁচিব না । আমি তাঁহার কাছে যাই ।

‘রঘুনাথের’ বাতুল চেষ্ঠা ও এই বজ্রসম কঠোর প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অতি বিষণ্ণ ও শঙ্কিত হইলেন । কোন্ পিতা মাতা তাঁহাদের একমাত্র ছল্লালকে গৃহ ছাড়িয়া উদাসী হইবার অনুমতি দিতে পারে ? সুতরাং রঘুনাথের আবেদন নিষ্ফল হইল । কিন্তু গৌর-প্রেমের আকর্ষণে রঘুনাথের গৃহবাস অসম্ভব হইল । তিনি গৃহ হইতে পলায়নের নিত্য নূতন চেষ্ঠা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । সুচতুর পিতা ও

জ্যেষ্ঠতাতের সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁহার পলায়নের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল।

রঘুনাথের মনের গতি পরিবর্তনের আশায় বিষয়-বিচক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয় জাগতিক যত কিছু ভোগ, বিলাস, ক্রীড়া, কোতুক ভুলোকে সম্ভব, একে একে সমস্তই রঘুনাথের জন্ম ব্যবস্থা করিয়া দেখিলেন যে রঘুনাথের মন সেই বাতুলের মতই রহিয়াছে। ‘গৌর-বিরহে’ রঘুনাথের উন্মাদ দশা, চোখে ধারা, মুখে হা ছতাস্।

জগতে সর্বাপেক্ষা প্রবল আকর্ষণ ‘নারী’। শেষ চেষ্টা হিসাবেই তাঁহারা রঘুনাথের বিবাহের আয়োজন চিন্তা করিলেন। অপূর্ব সুন্দরী এক কন্যার সন্ধান করিয়া বিশেষ আড়ম্বর ও ঘটাইয়া রঘুনাথের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাহাতেও রঘুনাথের মন আকৃষ্ট হইল না। স্ত্রীকে বিসম্বদ সর্পের মতই মনে করিয়া তাঁহাকে পরিহার করিয়াই চলিতে লাগিলেন। রঘুনাথের এই আচরণে জ্যেষ্ঠতাত ও মাতা-পিতা সর্ব প্রকারে বলহীন হইয়া পড়িলেন। এত দিনে তাঁহারা সুনিশ্চিত ভাবে বুঝিলেন যে, গৌর-প্রেমের পাগলকে পার্থিব বিলাস বৈভব ও অঙ্গরাসম স্ত্রী দ্বারা মুগ্ধ করা যায় না।

হিরণ্য, গোবর্দ্ধন অতুল বৈভব ও বিবিধ সুখ সম্পদের অধিকারী হইয়াও রঘুনাথের মানসিক দশা দেখিয়া তাঁহারা সর্বদা ছুঃখে ও ব্যাকুল চিন্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রাণে এক মুহূর্তও শান্তি নাই। এদিকে রঘুনাথ এখন গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টায় পাগল। তিনি সুযোগ পাইবামাত্রই পুনঃ পুনঃ পলায়ন করেন। তাঁহার পিতা বহুবার বহু কষ্টে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া অধিকতর স্নেহ ও সতর্কতার সহিত তাঁহাকে রক্ষণা বেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

“বার বার পলায় তিহো নীলাঙ্গি যাইতে।

পিতা তারে বাঁধি রাখেন আনি পথ হইতে ॥”

আহা ! গৌরহরির “অনপিত-অর্পণ” লীলায় প্রেম ধারণের আদর্শ পাত্রটিকে কি ভাবেই যে দৃঢ়-ভিত্তিক করা হইতেছে তাহা কিশোর শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্যবাতুল চেষ্টা দেখিয়া কিছুটা অনুমান করা যায় ।

(উপরোক্ত ঘটনাটি ১৪৩১ শকাব্দের মাঘ মাসে)

দ্বিতীয় বার গৌর দরশনে :

(১৪৩৬ শকাব্দ কা্তিক মাস)

‘নদীয়া-জীবন গোরা শান্তিপু্রে আসিয়াছেন’ এই সংবাদ শুনিবা-
মাত্র রঘুনাথের হৃদয়ে ‘গৌর-বিরহ-যাতনা’ শতগুণ বদ্ধিত হইল ।
সন্ন্যাস আবরিত (রাই-কানু একাকৃতি) শ্রীগৌরাজের সহিত শান্তিপু্রে
প্রথম মিলনের সেই সুখময় স্মৃতি তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত
করিয়াছিল । পুনশ্চ তিনি গৌরহরির সহিত মিলনের জন্ত অত্যন্ত
উৎকণ্ঠিত হইয়া সকাতির পিতার চরণে জানাইলেন । যথা—

“আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ ।

অনুথা না রহে মোর শরীর জীবন ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

হিরণ্যদাস ও গৌবর্দ্ধনদাস শচীত্বলাল গৌরহরির আবির্ভাব
হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের মধুর হইতে
সু-মধুর লীলাবলীর রসাল বর্ণনা অশেষ বিশেষ ভাবেই শুনিয়া
ছিলেন । সন্ন্যাস গ্রহণের পর এই চারি পাঁচ বৎসরের বিশেষ
বিশেষ ঘটনা ও লীলাবলীও তাহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে । যথা—

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ, সু-প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও সন্ন্যাসীদের অধ্যাপক শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌমের নব-জীবন ; ‘অনর্গল রসবেত্তা,’ ‘মহাভাগবত প্রধান’ রায় রামানন্দ ও উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রবল গৌর অনুরাগ ও তাঁহাকে আত্মসাৎ করিবার অলৌকিক লীলা ; দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময়ে ঐশ্বরীয় শক্তির প্রকাশ (যথা—গমন পথে গৌরহরি এক এক জনকে এমন শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন যে সেই সেই ব্যক্তি যাহাদের স্পর্শ করিতেছেন এবং তাঁহারাও যাহাদের স্পর্শ করিতেছেন সকলে মহাশক্তিধর হইয়া দক্ষিণাভ্যে সর্বত্র প্রেমধন বিতরণ করিয়াছেন) ; ‘জীবে দয়া’ ও ‘ভগবানে প্রেম’ প্রকট করিয়া কঠিন হৃদয় জীবদিগকে মোহিত করিয়াছেন । তাঁহার তর্কেও এমন মাধুর্য্য যে প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ করিতেন না, নিজেকে কৃত-কৃতার্থ বোধ করিতেন । কাহাকেও আপনার দৈন্ত্যে, কাহাকেও আপনার ঔদার্য্যে, কাহাকেও আপনার মধুর চরিত্রে বশীভূত করিয়াছেন । ‘তুকারামের’ গায় এক এক মহা ভক্তরূপ বিভিন্ন ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন । ‘বারমুখী’র গায় বেশ্যাকে পরম বৈষ্ণবী করিয়াছেন, ‘নরোজীর’ গায় দস্যুর নিজ হস্তে অস্তিমকৃত্য করিয়া অপার করুণা দেখাইয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি ।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া হিরণ্য গোবর্দ্ধনের মনে সু-দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে শচীভূলাল গৌরহরি স্বয়ং ভগবান । পরম স্মৃতিবান তাঁহাদের পুত্র ‘রঘুনাথ’ সেই ‘সচল ভগবানের’ দর্শনে যাইবার অনুমতি চাইতেছে । তাঁহারা কি আর বাধা দিতে পারেন ? এই সঙ্গে আবার তাঁহাদের মনে একটি ক্ষীণ আশার রেখার উদয় হইল যে গৌরসুন্দর অন্তর্য্যামী, তিনি জানেন ‘রঘু’ আমাদের নয়নের মণি, প্রাণের প্রাণ । রঘুর বিহনে আমরা প্রাণে মরিব । তিনি পরম

করণ। তিনি কৃপা করিলে আমাদের অঞ্চলের নিধি (রঘু) সুস্থ চিত্তে আদর্শ গৃহীর জীবন-যাপন করিতে পারে।

যাহা হউক পুত্রের প্রতি মমতা এবং গৌর দর্শনের জন্য রঘুনাথের উন্মাদ দশা দেখিয়া তাঁহারা রঘুনাথকে পুনরায় শান্তিপু্রে যাইতে অনুমতি দিলেন।

পরম বিচক্ষণ পিতা পূর্বের মত প্রচ্ছন্নরূপে সুদৃঢ় প্রহরার ব্যবস্থা করিলেন যেন 'রঘু' পলায়ন করিতে না পারে। তাহার পর শ্রীল অদ্বৈত ও গৌরপরিকরবৃন্দের জন্য যত, দধি মিষ্টান্ন, ভোজা ও বস্ত্র ইত্যাদি অতি উপাদেয় বিবিধ উপচৌকন এবং পর্যাপ্ত রক্ষী, সেবক, ব্রাহ্মণ ও ধন-রত্নাদিসহ তাঁহাদের নয়নমণি রঘুনাথকে গৌরহরি দর্শনের জন্য শান্তিপু্রে পাঠাইলেন। বিদায় কালে মাতা ও পিতা সপ্রেম ভাষণে বলিলেন—“বাপধন! তুমি আমাদের নয়নের তারা, তুমি আমাদের পরাণের পরাণ, তোমার পথ পানে চাতকের মত তাকিয়ে রইলাম। খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে।”

ওদিকে রঘুনাথের মনে চার পাঁচ বৎসর যাবৎ গৌর-বিরহে ঝুরিতে ঝুরিতে যে গৌর-অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই অনুরাগের চক্ষু দিয়া রঘুনাথের এবারের গৌর দর্শন অতি অপক্লপ।

প্রথম বারে শান্তিপু্র পৌঁছানোর পর তিনি দেখিয়াছিলেন, কীর্ত্তন তরঙ্গে শান্তিপু্র তখন ডুবু ডুবু। এবার, রাস্তাতেই যাহা দেখিতেছেন তাহাতেই রঘুনাথের মনে হইতেছে যেন সমস্ত গৌড়দেশ প্রেম তরঙ্গে ভাসিতেছে। নদীর প্লাবনের ঞায় চতুর্দিক হইতে জন প্রবাহ প্রেম-বারিধি গৌরহরির মধুর মধুর লীলাবলী শ্রবণ করিয়া উন্মাদের ঞায় উচ্চৈঃস্বরে 'জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ' ধ্বনি দিতে দিতে শান্তিপু্র মুখে ছুটিয়াছে।

রঘুনাথ নিজ 'পরাণ নাথের' এই লোকাকর্ষী মাধুর্য ও ঐশ্বর্য দেখিয়া মনে মনে আরও গভীর আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনিও

পরমানন্দে গৌর-মহিমার জয় দিতে দিতে দৌড়াইতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়াই একাকী ছুটিয়া শান্তিপুর আসিয়া গৌর-চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ‘এত দিনে কৃপা হ’ল বলে’—দর্শন মাত্র কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রঞ্জিয়া গৌরহরি পরম বাৎসল্যের সহিত রঘুনাথকে উঠাইরা বক্ষে ধারণ করিলেন।

গৌর-বিরহী রঘুনাথের অনুপম রূপ-লাবণ্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া গৌর-আনা-প্রভু সীতানাথ পরম তৃপ্ত ও মুগ্ধ হইলেন। তিনিও পরম বাৎসল্যের সহিত রঘুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। রঘুনাথের সহিত প্রেরিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনের প্রীতি উপহার সমূহ যথস্থানে রাখিবার জন্য নিজ ভৃত্যবর্গকে নির্দেশ দিলেন। রঘুনাথের জন্য বাসা নির্দেশ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ যাহাতে নিরবিচ্ছিন্ন গৌর-সঙ্গ ভোগ করিতে পারে তাহার যথোচিত সু-ব্যবস্থা করিলেন। এবারেও প্রত্যেক দিন গৌরহরির আহারের অবশেষ রঘুনাথের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন।

‘রঘু’ মাতা পিতাকে বাক্যদান করিয়া আসিয়াছে ‘শীঘ্র ফিরিব’। সেই কারণে, এই পরমানন্দ পরিবেশের মধ্যেও—‘বাড়ী ফিরিতে হইবে,’ বাড়ীতে পিতা-মাতার দেওয়া প্রহবার পীড়া এবং ‘গৌর-বিরহ জ্বালা’ ভোগ করিতে হইবে এই সব চিন্তা রঘুনাথের মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। লোকাভিরাম গৌরহরির করুণায় তিনি এখন মনে প্রাণে জানিয়াছেন যে গৌরহরির ‘ইচ্ছা’ এবং ‘কৃপা’ ছাড়া তাহার ছুঃখ দূর হইতে পারে না। অথচ, গৌরহরিকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। তাই, তিনি মনে মনে গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ জানাইতেছেন—

(১) বাড়ীর প্রহরীর হাত হইতে উদ্ধারের উপায় কর—

(২) তোমার এই সুখময় সঙ্গ ছাড়া ক’রে আমাকে আর রেখো না। শীঘ্র নীলাচলে তোমার শ্রীচরণে স্থান দাও।

যাঁহার সর্বজ্ঞতা হইতে নিখিল সর্বজ্ঞদের সর্বজ্ঞতা সেই সর্বজ্ঞ
চুড়ামণি সোনার গৌরাজ রঘুনাথের হৃদয়ের আবেশ কোন্‌দিকে তাহা
বুঝিয়া একদা রঘুনাথকে একটি প্রবাদ সুলভ উপদেশে বলিলেন—

“স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল ।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভব সিন্ধু-কুল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া ।
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া ॥
অন্তুর্নিষ্ঠা কর বাছে—লোক ব্যবহার ।
‘অচিরাতে’ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

এই পয়ারে বিধৃত বাক্যাবলীর যথা শ্রুত অর্থ—

ভবসিন্ধু হইতে সহসা পরিত্রাণের উপায় হয় না । এ জন্ম
সাধনার প্রয়োজন । স্থির হও । উন্মাদের আচরণ করিও না ।
বাড়ী ফিরিয়া যাও । লোক দেখান মর্কট-বৈরাগ্য* পরিহার কর ।
বিষয়ে অনাসক্ত হও । লোক দেখান বাছ-বৈরাগ্য করিও না ।
শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্বক তোমাকে উদ্ধার করিবেন ।

* মর্কট অস্বাভাবিক কামার্ত্ত । আবার এতদূর ক্রোধাক্রম যে রাজ্যাদি
কিছু না থাকিলেও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরের প্রাণ বিনষ্ট করে
এবং নিজেও প্রাণ হারায়, আবার এতদূর লুদ্ধ যে কিসে পরের খাচদ্রব্য
অপহরণ করিবে এই অভিসন্ধিতে সর্বদা ফিরে । মর্কট বা বানর বাস করে
বনে বৃক্ষের শাখায় এবং গৃহও প্রস্তুত করে না । উলঙ্গ থাকে, নিরামিষ
খায় । এইরূপ যাঁহারা কাম ক্রোধাদির নিরন্তর বশবর্ত্তী হইয়া বাহ্যতঃ
বিরক্তের স্থায় বেশাদি ধারণপূর্বক বিচরণ করে তাহাদিগের সেই বৈরাগ্যকে
‘মর্কট-বৈরাগ্য’ বলে ।

প্রিয়ের প্রিয়ে অধিক প্রীতি :

“প্রভুর শিক্ষাতে তিঁহ নিজ ঘরে যায় ।”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

শান্তিপু্রে সাতদিন সাতরাত্রি অখণ্ড ভাবে ‘গৌর’ ও ভুবন পাবন ‘গৌরগণের’ সঙ্গ সুখা লাভ করিয়া রঘুনাথ রঙ্গিয়া গৌরহরির প্রীতিময় গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক উপদেশ শ্রবণ করিয়া গৌরানন্দ-সঙ্গহারা হইয়া নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার রঘুনাথের বিপরীত আচরণ। তিনি প্রথম দর্শনেই মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ-ভাতের সহিত হাসি মুখে মধুর সন্তোষণ ও প্রিয় নন্দ্য আলাপ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর দাস দাসী অতিথি অভ্যাগত সকলকে যথাযোগ্য প্রিয় সন্তোষণে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। সু-মধুর পরিহাসের সহিত পত্নীর উল্লাস বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। স্বকার্য সাধনের জন্ত অন্তর বাহিরের ভাব সম্বন্ধে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে প্রকাশ ও অপ্ৰকাশ করিয়া রঘুনাথ তাহার আচরণ ব্যবহারটিকে সুন্দর ভাবে ফুটাইয়া তুলিলেন। ইহার আচরণে পিতা মাতা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। হিরণ্য গোবর্দ্ধনের শোকছুঃখময় ত্রিয়মাণ সংসার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুখের বন্যায় প্লাবিত হইল।

নবদ্বীপ বিহার কালে ‘নদীয়া বিনোদিয়া’ গৌরহরির জনগণমন-লোভনীয় গাহ’স্থ লীলার সু-রসাল সংবাদ (আমাদের) রঘুনাথ অনু-শীলন করিয়া প্রাণ-শচীতুল্যালিয়া গৌরহরির সেই লীলা চরিত্রের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানের দ্বারা নিজের সংসার গ্রন্থি মোচনের পথ দেখিতে পাইতেছেন। এখন সেই আদর্শে নিজ পরিবারবর্গ ও সপ্তগ্রামবাসীদের সহিত কৃত্রিম আত্মীয়তা স্থাপনের জন্ত তাহাদিগকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া সকলের সহিত অনুকূল আচরণ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে, রঘুনাথের জন্ত পূর্বে যে প্রহার ব্যবস্থা ছিল তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল।

‘রঘুনাথের’ এই গাহ’স্থা জীবনের নীতি কি ছিল তাহা কবিরাজ গোস্বামী দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছেন—

“ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব কৰ্ম ।
দেখি তার পিতা মাতা আনন্দিত মন ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

সেই সময় কুলপ্রথা অনুসারে এই গাহ’স্থ আশ্রমেই রঘুনাথ কুল-
গুরু শ্রীল যত্নন্দন আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । কবি-
কর্ণপুর শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বলিয়াছেন—

“আচার্য্য যত্নন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ ।
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যাদিগুণ প্রাণাধিকো মাদৃশাং ॥”

অনুবাদ : (গৌরপার্বদ) শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়তম প্রেমবান্
যত্নন্দন আচার্য্যের শিষ্য নিখিল গুণের আধার রঘুনাথদাস আনাদের
প্রাণাধিক ।

পুরশ্চরণ :

শ্রীল রূপ গোস্বামী এবং শ্রীল সনাতন গোস্বামী* শ্রীগৌরাজ চরণ
প্রাপ্তির উপায় স্বরূপে ‘কৃষ্ণ’ মন্ত্রে পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন । অন্যতম
আচার্য্যবর্ষ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীও ইন্দ্রসম রাজ্য ও অপ্সরাসম
স্ত্রী হইতে মুক্তিলাভ এবং সচল নীলাচলনাথ গৌরহরির শ্রীচরণ
প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ অনুরূপ পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন । গৌর-
আনা-গোস্বামী অদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য শ্রীল যত্নন্দন আচার্য্য এই

* কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ ; অচিরাতে গাইবারে চৈতন্য চরণ ।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ

পুরস্চরণ কার্যে নিজ শিষ্য রঘুনাথকে সর্বতোভাবে সাহায্য
করিয়াছিলেন ।

এই গৃহস্বাস্থ্যে থাকিয়া তিনি একদিন সংবাদ পাইলেন—

‘ঝারিখণ্ড পথে গৌর যায় সিংহ ব্যাঘ্র কেন্দ্রে লুটায় ।’

আবার কিছুদিন পরে খবর পাইলেন—

‘কৃষ্ণ প্রেমের উন্মাদ মূর্তি শ্রীগৌরানন্দ ব্রজবনে পরিক্রমা
করিতেছেন ।’

আবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন—

‘বৃন্দাবন হইতে পুরী প্রত্যাগমন পথে প্রয়াগে শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গীকার
আত্মসাৎ করিয়া ব্রজে পাঠাইয়াছেন ।’

আবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন—

‘সনাতন গোস্বামিপাদকে কৃপা আত্মসাৎ ও অঙ্গীকার করিয়া
ভাঁহাকেও ব্রজে পাঠাইয়াছেন ।’

এবং

‘কাশীবাসী দশ হাজার সন্ন্যাসী ও ভাঁহাদের প্রধান আচার্য
শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে স্বচরণে আনুগত্য দান করিয়া ‘মরতি
মন্ত্র-প্রম-বৈচিত্র্য’ গৌরহরি নীলাচল প্রত্যাগমন পথে গমন
করিয়াছেন ।’

আবার কিছুদিন পরে সংবাদ পাইলেন—

‘ব্রজবনে (কৃষ্ণ)-বিরহিনী-উন্মাদিনী প্রাণ-গোরায়ায় নীলাচলে
প্রত্যাগমন করিয়াছেন ।’

তৃতীয় অধ্যায়

বিপদে :

হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস সপ্তগ্রাম মুলুকের * মোক্‌ররা বলে কর আদায় ও তহশীল আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে জনৈক মুসলমান ঐ মুলুকের চৌধুরী † সূত্রে শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া দিল্লী সরকারকে কিছুই দিতেন না। সমস্তই আত্মসাৎ করিতেন। সরকার তাহাতে বিব্রত বোধ করেন। শাস্তি বিঘ্নিত না করিয়া কিরূপে ঐ মুলুক হইতে নিশ্চিত, নিয়মিত বাৎসরিক 'কর' আদায় হয় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস দিল্লী সরকারকে জানাইলেন যে সপ্তগ্রাম মুলুকের রাজস্ব আদায় হউক বা না হউক প্রতিবর্ষে তাঁহারা রাজ সরকারকে বার লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। প্রবল প্রতাপী প্রভূত ধনশালী, মহা বিচক্ষণ, সপ্তগ্রামের বাসিন্দা ও ঐ মুলুক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচিত হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসের এই প্রস্তাব দিল্লী সরকার সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে, সেই মুলুকের প্রাক্তন মুসলমান শাসনকর্তা যখন দেখিলেন যে তিনি নিজের অধিকার হারাইলেন, এবং দিল্লী সরকারও প্রতিবর্ষে নিয়মিত ভাবে রাজস্ব পাইতেছেন এবং হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাস অত্যন্ত সম্মান ও যোগাতার সহিত মুলুকের শাসন কার্যেরও পরিচালনা করিতেছেন তখন ক্রোধ ও ঈর্ষ্যায় তিনি

* স্থায়ী বন্দোবস্ত।

† চৌধুরী যাহারা রাজস্ব আদায়ের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া বাদশাহের কার্য করিতেন।

নানা প্রকার কুচক্র ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি বাদশাহের মনে সু-দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইলেন যে সপ্তগ্রাম মুলুকের ভূমি রাজস্ব বিশ লক্ষ টাকা আদায় হয়। এ ছাড়া, ব্যবসা ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের কর (Taxes) আরও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় হয়। সুতরাং হিরণ্য গোবর্দ্ধনকে মাত্র বার লক্ষ টাকায় ঐ মুলুক 'মোকররা' দেওয়ায় সরকারের বহু ক্ষতি হইতেছে।

তখন বাদশাহ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উক্ত বিচ্যুত মুসলমান শাসনকর্তার পরামর্শ মতে পর্যাপ্ত সৈন্য সহ একজন উজীরকে পাঠাইলেন। সতসা তাহারা সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইল।

ধীর, স্থির, পরম গম্ভীরায় হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস জানিলেন সৈন্য সহ উজীরের সপ্তগ্রামে পদার্পণ। এ সংবাদ প্রাপ্তি নাট্রেই প্রত্যক্ষ অপমান ও 'ভাগ্য বিপর্যায়' এড়াইবার জন্য তাহারা সুকৌশলে প্রচ্ছন্ন রহিলেন।

যবন সেনা সহ উজীর হিরণ্যদাসের আলায়ে প্রবেশ করিল। বহু অনুসন্ধানেও হিরণ্যদাস কিম্বা গোবর্দ্ধনদাস কাহাকেও পাইল না। কূটনীতি বিশারদ উজীর নাবালক রঘুনাথকেই বাঁধিয়া লইয়া গেল। উজীর আশা করিল যে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের নয়নের মণি এই রঘুনাথ, ইহার উদ্ধারের জন্য তাহারা অবশ্যই আত্ম প্রকাশ করিবে। আরও বিচার করিল যে রঘুনাথ সত্যবাদী, সরল বালক, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা যদি ইহার জানা থাকে, তবে ইহাকে তাড়না ও তর্জন গর্জন দ্বারা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

নামময়জীবন ভুবনপাবন ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত কিশোর রঘুনাথ অচঞ্চল চিত্তে সর্ব প্রকার তর্জন গর্জন সহ্য করিলেন। শুধু তাহাই নয়, ভক্তির প্রতিমূর্তি রঘুনাথ একদিন সেই কুচক্রী

তুড়ুক্কে (তুরস্ক দেশীয় মুসলমান শাসনকর্তা) মধুর কণ্ঠে অতি বিনয় সহকারে বলিলেন—

“তাত ! আপনি এবং আমার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতা যেন তিনটি আপন ভাই। আমি জানি ঝগড়া ও মিলন আপনাদের মধ্যে হামেনাই লেগে আছে। আজ আপনাদের ঝগড়া কালই আবার দেখতে পাব তিন জনের মধ্যে পরম শ্রীতি ও মিলন। আমি যেমন পিতার পাল্য তেমনি পিতৃকুল্য আপনাদের পাল্য নই কি? পালক কখনও পাল্যকে হাড়না করে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ব্যবহারিকতায় আপনি প্রবীণ ও সর্কোস্তম। আমার প্রতি আপনার এ সব আচরণ শোভা পায় না।”

অষ্টটন-ঘটন পটীয়সী শুভ্রিদেবীর রূপা কটাক্ষে রঘুনাথের মুখে অপূর্ব শক্তির বাকস্ফূর্তি হইল, তাহা জানিয়া কুচক্রী তুড়ুক্কের হৃদয় মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে নির্মল হইল। তাহার নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সেই ধারায় দাড়ি ভিজিয়া গেল।

“এত শুনি নেই স্নেহের মন আর্দ্র হৈল।

দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে, কঠিতে লাগিল।”

--চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

ঐ ‘তুড়ুক্কে’ই অতঃপর রঘুনাথের মুক্তির চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিলেন। এবং অকপট হৃদয়ে রঘুনাথের নিকট নিজের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

“দেখ, বাপ্ রঘু ! তোমার জেঠার বুদ্ধিনাশ হইয়াছে। এই মুলুকের কেবল ভূমি রাজস্বের লভ্যাংশই আটলক্ষ টাকা। আমি এখানের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্তা। আমি নির্বিরোধে তোমার জেঠার অনুকূলে নিজ অধিকার ছাড়িয়াছি। আবার, আমাদের যেরূপ শ্রীতির সম্বন্ধ তাহাতে ঐ লভ্যাংশের আমিও ভাগীদার ! সম্প্রতি যে

ঘটনা ঘটয়া গেল মন হইতে তাহা মুছিয়া দাও । আজ হইতে সত্য সত্যই তুমি আমার ‘পুত্র’ । এখন তুমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী যাও । আমি যাহাতে সম্মান ও উচিত মর্যাদায় জীবন যাপন করিতে পারি সে ব্যবস্থার ভার তোমার জেঠার উপরই ছাড়িয়া দিলাম । তোমার জেঠাকে আমার এই সব কথা বলিবে । সত্বর তাঁহার সহিত আমার মিলন করাও । যথাকালে যথাযোগ্য সম্মান ও বিষয় সম্পর্কে একটা সন্ধি করা যাইবে ।”

রঘুনাথ সগৌরবে বাড়ী ফিরিলেন । রঘুনাথের দর্শনে ও অস্বাভাবিক প্রভাব শ্রবণে যাহারা লুকাইয়া ছিলেন ক্রমে তাহারা যথাসময়ে সকলে মিলিত হইল । মা বাবা ও জ্যেষ্ঠতাত সকলে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন । প্রথম সুখ-মিলন পরে, সুযোগ মত রঘুনাথ তাহার জ্যেষ্ঠতাতকে বলিলেন—

“তাত ! আপনি পরম বিচক্ষণ, স্বভাব দয়ালু ও দানবীর । ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্তা যাহাতে সম্মান ও মর্যাদার সহিত বাকি জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা আপনার সুবিবেচনার উপরে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন । তাঁহার সহিত সত্বর আপনি মিলিত হউন ইহাও তাঁহার নিবেদন ।”

রঘুনাথের নির্ভীকতা, সহিষ্ণুতা, বিচক্ষণতা, ব্যবহারিক পারদর্শিতা ও সর্বোপরি সুমধুর চরিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাকে ‘অপমান’ ও ‘ভাগ্য-বিপর্যয়’ হইতে রক্ষা করিল । অতঃপর রঘুনাথের প্রতি হিরণ্য গোবর্দ্ধনের স্নেহ ও মমতা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল ।

বিশ্বের সৃজনকারিণী মায়াদেবীর গুরু নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত রঘুনাথের এ কোন্ বিশ্বয় !

চতুর্থ উরঙ্গ

নিতাই প্রসঙ্গে :

হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় বিভিন্ন প্রয়োজনে আৰ্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রান্তের ভিখারী হইতে পরম জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত প্রভৃতি সর্ব স্তরের লোকের সর্বদা গতায়ত ছিল। সুতরাং গৌরহরির বিভিন্ন লীলাবলীর সংবাদ অতি স্বাভাবিকভাবেই রঘুনাথ জানিতে পারিতেন। ইহার উপর আবার রঘুনাথের উৎসাহদানে ও তাঁহার দ্বারা পুরস্কৃত হইবার আশায় বহু লোক কেবল গৌরহরির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রঘুনাথকে দিবার জন্ত ব্যস্ত হইল। এই সময় রঘুনাথের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ‘রাম’, ‘কৃষ্ণ’ ও ‘গৌর’ লীলার অভিনয়, কবিপাঠ, ‘কৌতুন’ আদি নানান্ উৎসবে সমস্ত সপ্তগ্রাম মুখরিত হইল।

সপ্তগ্রামের বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারী সকলের নিকট রঘুনাথের চিত্তাকর্ষক পরম মধুর গাহ’স্থ্য জীবন প্রায় দুই বৎসর অতীত হইলে পর একদা রঘুনাথ শুনিলেন যে—

‘অভিন্ন-চৈতন্য-তনু’, প্রেমদাতা, অবধূত নিতাইচাঁদ গস্তীরা-বিহারী ‘সচল জগন্নাথ’ গৌরহরির আজ্জায় ‘নাম’ ‘প্রেম’ বিতরণ করিতে করিতে পানিহাটি গ্রামে আসিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রই গৌরহরির সেই কৃপাবাগী স্বরণে আসিল—

“বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।

তবে তুমি আমা পাশে আসিও কোন্ ছলে ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

সেই স্মৃতিতেই রঘুনাথের চিত্তকে নূতন ভাবে আলোড়িত করিতে লাগিল। কে যেন তাঁহার প্রাণে বলিয়া দিল—“রঘুনাথ ! তোমার সুদিন আগত। ছরায় যাও। নিতাই সোনার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।”

রঘুনাথ ‘নিতাই’ ও তাঁহার প্রেমদান লীলার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য অতি যোগ্য ও সু-চতুর কয়েক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। অল্প কয়েকদিন মধ্যেই তিনি বিস্তারিত বিবরণ পাইলেন। যথা—

প্রথম সংবাদ :

গম্ভীরাবিহারী গৌরহরি সহজ করুণ নিতাইটাদকে তাঁহার গণ সহ গৌড়মণ্ডলে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য :—কলি জীবের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্বক কে কোথায় পতিত আছে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকলকে ‘নাম’ ‘প্রেম’ দান করিতে হইবে। যথা—

“কৃত পাপী ছরাচার নিন্দুক পামণ্ডী আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।”

দ্বিতীয় সংবাদ :

নিতাইটাদের সঙ্গে আসিয়াছেন—‘রামদাস’, ‘গদাধর দাস’, ‘রঘুনাথ’, ‘কৃষ্ণদাস পণ্ডিত’, ‘পরমেশ্বর দাস’, ‘পুরন্দর পণ্ডিত’ এবং ‘বাসু ঘোষ’। ইহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল ও শ্রীনিতাইটাদের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্শদ। পথে আসিবার কালেই নিতাইটাদ এই পার্শদগণের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা অতি অদ্ভুত। যথা—

“পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব পার্শদ করিলেন প্রেমময় ॥

প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য 'রামদাস' ।
তান্ দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ ॥
মধ্য পথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
আছিল প্রহর তিন বাহু পাসরিয়া ॥

হইল রাধিকা ভাব গদাধর দাসে ।
'দধি কে কি নিব' বলি মহা অটুহাসে ॥

'রঘুনাথ বৈষ্ণু উপাধায়' মহামতি ।
হইলেন মূর্ত্তিমতি যে হেন রেবতী ॥

'কৃষ্ণদাস' 'পরমেশ্বর দাস' দুই জন ।
গোপাল ভাবে হৈ হৈ করে সর্বক্ষণ ॥

'পুরন্দর পণ্ডিত' গাছেতে গিয়া চড়ে ।
মুঞিরে অঙ্গদ বলি লাক দিয়া পড়ে ॥

এই মত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্ত ধাম ।
সভারে দিলেন ভাব পরম উদ্দাম ॥” —চৈঃ ভাঃ

তৃতীয় সংবাদ :

পানিহাটি গ্রামে ভাগ্যবান রাধব পণ্ডিতের বাড়ীতে অবধূত
নতাইচাঁদ সগণে আসিয়া প্রেমদান লীলা আরম্ভ করিয়াছেন ।
সেখানে নিতাইচাঁদের অভিমেক লীলা । জম্বীরের গাছে কদম্ব ফুল ।
'নিতাই' নর্ত্তনে প্রত্যহ 'গৌর আবির্ভাব' ইত্যাদি মন-প্রাণ
উন্মাদনকারী লীলাবলীর বর্ণনা অস্ত্রে সংবাদদাতা পুলক অশ্রু কলেবরে
গদগদভাষে নিবেদন করিল যে—

ভাগবত বর্ণিত 'গোপী-প্রেম' নৃ-লোকে হয় না। কিন্তু সেই গোপী-প্রেম নিতাইচাঁদ আচণ্ডালে দান করিতেছেন। যথা—

“যে দিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় ।
সে দিকে মহা-প্রেমভক্তি বৃষ্টি হয় ॥

যাহারে চাহেন সেই প্রেম মূর্ছা পায় ।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায় ॥

দরশন মাত্র সর্ব জীব মুক্ত হয় ।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময় ॥”

—চৈঃ ভাঃ

উপসংহারে সংবাদদাতা নিবেদন করিল, বিধি পুরশ্চরণের অপেক্ষা নাই, স্থান, কাল, পাত্র বিচার নাই, নিতাইচাঁদ যারে তারে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম ধনে ধনী করিতেছেন। আর—

“কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্যাটনে ।
ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্ণ বিনে ॥

যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ সঙ্কীর্ণ ।
তথায় বিহ্বল হয় শত শত জন ॥

গৃহস্থের শিশু সব কিছুই না জানে ।
তাহারাও মহা মহা বৃক্ষ ধরি টানে ॥
ছঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া ।
'মুঞিরে গোপাল' বলি বেড়ায় ধাইয়া ॥
হেন সে সামর্থ্য একো শিশুর শরীরে ।
শত শত জন মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥”

—চৈঃ ভাঃ

‘রঘুনাথ’ এই সব সংবাদদাতাদিগকে অপ্রত্যাশিত পারিতোষিক দানে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন ।

নিতাই মিলনে :

(১১৪০ শকাব্দে বা ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী)

‘সচল-জগন্নাথ’ গৌরহরির আদেশে অবধূত নিতাইচাঁদ পানিহাটি আসিয়া পরম সূকৃতিবান রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিতেছেন । আর ভক্ত অভক্ত সকলের বিশ্বয় উৎপাদনকারী লীলা-মত্ততায় পরমানন্দ দান করিতেছেন । এ সংবাদ হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস উভয়েই প্রায় প্রত্যহই পাইতেছেন । আবার ‘রঘুনাথের’ আহার বিহার ক্রীড়া কৌতুক রঙ্গ-রহস্য ইত্যাদির ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখিয়া তাঁহাদের মনও প্রফুল্ল । তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ যে বিপুল বৈভবের সুব্যবহার করিতে পারিবে এবং ‘সপ্তগ্রাম মুলুক’ পরিচালনায় ধৈর্য্য, বিচার বুদ্ধি ও অসাধারণ দক্ষতা যে রঘুনাথের আছে তাহার প্রমাণ তাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন ।

সময় ও সুযোগ বুঝিয়া রঘুনাথ একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার সমীপে বিনীত নম্র কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—“জ্যেষ্ঠা মহাশয় ! আমাদের মুলুকের অন্তর্গত পানিহাটি গ্রাম । সেখানে পরম দয়ালু স্বভাব নিতাইচাঁদ আগমন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের ভবনে অবস্থান করিতেছেন । আমার বাসনা, একবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসি । আপনারা সানন্দে অনুমতি দিলে কৃতার্থ হই ।”

রঘুনাথের আবেদন তাঁহারা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং পানিহাটি যাইবার অনুমতি দান করিলেন ।

রঘুনাথ পরম হৃষ্ট হইলেন। তাঁহার অন্তরের বলবতী আশা পূর্ণ হইল। রাঘব পণ্ডিতকে উপঢৌকন দিবার জন্ত ঘৃত, দধি, বিবিধ প্রকারের মিষ্টান্ন, বিবিধ উপাদেয় ফল, ভোজ্য, বস্ত্র ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া প্রহরী, সেবক ও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া রাজ-মর্যাদায় তিনি নিত্যানন্দের দর্শনে ঘাইবার ব্যবস্থা করিলেন। হাসি মুখে ও সুমিষ্ট সম্ভাষণে পিতা, জ্যেষ্ঠভাতা, মাতৃদেবী ও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। নিজ প্রিয়াকে সরস সম্ভাষণে আনন্দদান করিয়া তাহার নিকটও সানন্দ বিদায় অনুমতি গ্রহণ করিলেন। শুভ মুহূর্ত্তে প্রাণ-মন উন্মাদনকারী ‘গৌরহরির’ জয় দিতে দিতে তিনি নিজ ভবন হইতে বাহির হইলেন।

(২)

‘পানিহাটি’ গ্রামটিও হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসের শাসিত মুলুকের অন্তর্ভুক্ত স্থান। রঘুনাথ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষমূলে পিণ্ডা বাঁধান আছে এবং তাহার উপরে চাঁদনিতাই বসিয়া আছেন। তাঁহার অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে যুগপৎ সেই স্থান অলঙ্কৃত আছে। পিণ্ডার উপরে ও তলে বহু ভক্ত। নিতাইচাঁদ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের শ্রীঅঙ্গের অপরূপ জ্যোতি দর্শনে রঘুনাথ বিস্মিত হইলেন। স্বাভাবিক দৈন্ত্যে আপনাকে অযোগ্য মনে করিয়া দূর হইতেই রঘুনাথ ভুলুগ্গিত হইয়া প্রণাম করিলেন। যথা—

“গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে ;
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় ক’রে

তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ;
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত ।

দণ্ডবৎ হৈঞা সেই পড়িলা কথো দূরে ।”

রঘুনাথ সকলেরই পরিচিত । রঘুনাথের প্রতি গৌরহরির কৃপা ইতিপূর্বে সকলেই দেখিয়াছেন । অতুল বৈভবের অধিপতিদের একমাত্র ছল্লালকে অষ্ট-সাত্ত্বিক বিকারে ভূষিত ও ভুলুপ্তিত দেখিয়া সকলের হৃদয়ে প্রেমানন্দ যেন শতগুণ বদ্ধিত হইল । কিছুক্ষণ পরে জনৈক সেবক নিতাইচাঁদকে প্রেমস্বরে বলিলেন—

“দেখ, দেখ প্রভু নিতাই, ঐ অদূরে রঘুনাথ তোমায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেছে ।”

এই কথা শ্রবণ মাত্রেই পরম কৌতুকী নিতাইচাঁদ অতি উৎফুল্লিত মনে ছুটিয়া গিয়া প্রথমে রঘুনাথের মস্তকে নিজ রাঁতুল চরণের স্পর্শ দান করিলেন এবং তাঁহাকে পরম প্রেমে উঠাইয়া স্বীয় বক্ষে ধারণ-পূর্বক প্রেম মধুর স্বরে বলিলেন—

“চোরা ! এতদিন পরে দেখা দিলি ! দাঁড়াও আজ তোমায় হাতের কাছে পেয়েছি । চুরির উচিত দণ্ড বিধান করি ।”

রঘুনাথ মনে-প্রাণে জানেন যে তিনি ঘোর বিষয়ী, যুগ্য এবং সংসারের কীট । সুতরাং নিজেকে পরম প্রভাবশালী নিতাইচাঁদের দর্শনেরও অযোগ্য মনে করেন । তিনি সর্ব সমক্ষে নিতাই সোনার এই প্রীতি ও সোহাগ মাখা আচরণে নিজেকে অতি বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন ।

নিতাইচাঁদ রঘুনাথকে ‘চোরা’ সম্বোধন করিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করিলেন । তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিল—
“কেন রঘুনাথকে চোরা বললেন ? তাঁর কি চুরি করেছে ? দেখা ত হয় নাই । কেমন করে চুরি করল ?”

ব্যবহারিক রাজ্যের হিসাবে জানা যায় যে গুরু, শিক্ষক বা সহায়কের সাহায্যেই শিক্ষা লাভ হয়। পারমাণ্বিক রাজ্যেও কি এক নিয়ম? উত্তর: হ্যাঁ। 'বিষয়'কে পাইবার জন্য মূল আশ্রয় তত্ত্বের আনুগত্যে যাইতে হয়। আর এই লোক চমৎকার লীলার গৌর 'বিষয়' এবং নিতাই 'আশ্রয়'। পূর্বে রঘুনাথ দুইবার নিতাই-টাঁদের বিনা আনুগত্যে গৌরহরির সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লীলার মর্ঘ্যাদায় গৌরসুন্দর প্রতিবারেই মিষ্ট ব্যবহারে রঘুনাথকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। যাহার ধন তাহাকে না বলিয়া লইবার চেষ্টা করিলে তাহাকে চুরি বলা হয়। রঘুনাথের সে দোষ অবশ্যই ঘটিয়াছে।

নিতাইটাঁদের মনের ভাব 'চোরা' আমার ধন আমায় না বলে ভোগ করতে চাও? আজ তোমায় দণ্ড দোব।

(৩)

(এ চুরির কি দণ্ড হইতে পাবে, তাহার প্রত্যক্ষ আচরণ)

রাই-কানুর ভাব মিলিত বিগ্রহ গৌরহরির অভিন্ন তনু টাঁদ নিতাই বলিলেন—

'দধি, চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে।'

অপূর্ব এ 'দণ্ড'!

'দধি চিড়ার মহোৎসব।'

মহতের 'দণ্ড' যে প্রতিকূলে কৃপা তাহা অনেকেরই শোনা আছে। ঐ প্রসঙ্গে নলকুবেরের প্রতি নারদের এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির

প্রতি নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ বলরামের দণ্ডদান স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিকূলে কৃপা প্রকাশ পাইয়াছে। নলকুবেরের প্রতি দণ্ডদান 'পুরাণের' সংবাদ। সে দৃষ্টান্তের উল্লেখ শুধু স্মরণীয় করুণার কথা। আর পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি দণ্ড বিধান ১৪৪০ হইতে ১৪৪২ শকাব্দের কোন এক অগ্রহায়ণ শুক্লা ষষ্ঠী (ওড়ন ষষ্ঠী) তিথিতে ঘটিয়াছে। স্বরূপ দামোদর, দাস গোস্বামী আদি পরিকরবৃন্দ স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন।

কিন্তু রঘুনাথের প্রতি এই দণ্ড বিধান—

তাৎকালীন গোড়ের অগণিত ভক্ত সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। শত শত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী যাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভক্তি সম্পর্কশূন্য, যাহারা বিভিন্ন ও দূর দূর গ্রামে থাকিয়া নিজ নিজ গৃহকর্মে ব্যাপ্ত ছিলেন, ইহাদের সকলকে এই 'দণ্ড' ছলে আকর্ষণ পূর্বক নিতাইটাঁদ সমীপে উপনীত করা হইয়াছিল। তাহার পরই 'নিতাই দর্শন' এবং 'নিতাই গৌরের করুণামৃত' তাঁহারা হেলায় প্রাপ্ত হইলেন। ফলে তাহাদের জন্ম জন্মান্তরের তাপ কালিনা দূর হইয়া গেল।

শ্রীল রঘুনাথদাসকে নিতাই সোনার আনুগত্য ও অগণিত বৈষ্ণব সেবার সুযোগ দান করা হইল। এই ঘটনা ১৪৪০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে আর আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পূর্বে গৃহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রঘুনাথ নীলাচলে শ্রীগৌরানন্দ চরণ লাভ করেন।

আবার এই দণ্ডকে উপলক্ষ করিয়াই ভাবী কালের জীবের জন্ম শ্রীনিত্যানন্দ আনুগত্যই যে সাধনার পথ, তাহা উন্মুক্ত করা হইল এবং আচরণ দ্বারাও তাহা প্রচারিত হইল।

এ যুগের সাধন কি ?

কলি জীব মাত্রেই গৌরহরির করুণা রাজ্যের বাসিন্দা। তিনি নিজ প্রয়োজনেই বুঝি কলিজীবকে অপ্রাকৃত শ্রীতিরসে মজ্জিত করিয়াছেন। সেই অপ্রাকৃত প্রেমধন বিচার বুদ্ধির অলক্ষ্যেই তাহা-দিগকে দান করা হইয়াছে। এই প্রাপ্ত বস্তুর 'বোধ' ও 'সংরক্ষণই' এ যুগের সাধন।

(৪)

দণ্ড মহোৎসব ও গৌর আবির্ভাব :

“দধি চিড়া ভাল মতে খাওয়াও মোর গণে”

— চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

এই সু-রসাল দণ্ড শ্রবণে রঘুনাথ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। মহোৎসব পূর্ণ করিবার জন্ত বিপুলভাবে আয়োজনের আদেশ দিলেন। উচ্চ আনন্দ কোলাহলে শত শত লোক চিড়া, দধি, ছুফ, কলা, গুড়, নন্দেশ ও মালসা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্ত ছুটিলেন।

“শাসনকর্তার অপূর্ব দণ্ড”

“দণ্ডাদেশ পালনে শ্রীরঘুনাথের সোল্লাস অহুমোদন” বিহ্য গতিতে এই অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব ছুইটি বার্তা প্রায় সমস্ত সপ্তগ্রাম মুলুকে ছড়াইয়া পড়িল।”

অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দিক হইতে গ্রামের পর গ্রামের লোক

‘ভিড়’ করিয়া ভারে ভারে চিড়া দধি ছুঙ্ক গুড় কলা ও মালসা * এবং রঙ্গ দেখিবার জন্য বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারীর জনপ্রবাহ পাণিহাটি গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

“মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন।

আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গমন ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

শত শত কলসে ছুঙ্ক, শত শত ভারে দধি, স্তূপে স্তূপে চিড়া, ভারে ভারে গুড়, কান্দি কান্দি কলা এবং শত সহস্র মালসা সেই গঙ্গাতীরের বটবৃক্ষমূলে (অঢাপিও সেই বটবৃক্ষ বর্তমান) আনিয়া উপস্থিত করিল। দ্রব্য সস্তারের মধ্যে চিড়া দুই ভাগ করা হইল। সেই চিড়া একভাগ ঘনাবর্ত ছুঙ্কে ভিজান হইল অপর ভাগ দধিতে। পরিমাণ মত কলা ও গুড় মিশ্রিত করিয়া শত শত মালসায় ভরিয়া রাখা হইল।

ইতিমধ্যে অগণিত জন সমাবেশ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল বর্ণের বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী নিতাইচাঁদ ও তাঁহার পরিকরবৃন্দকে সর্বদিক হইতে বেঠন করিয়া জলে ও স্থলে আশ্চর্য্য উন্মাদনায় চঞ্চল ও উল্লাসময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। কৌতুকী দৃষ্টিতে নিতাইচাঁদ স্মিতহাস্যে সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন।

আদেশ হইল প্রত্যেককে এক মালসা দধি চিড়া ও এক মালসা ছুঙ্ক চিড়া দাও।

মূল পরিবেশক কুড়ি জন এবং তাহাদিগকে সাহায্যের জন্য শত শত স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত হইল। পিণ্ডার উপরে আটটি মালসা

* মালসা :—মাটির পাত্রে চিড়া, দধি, ছুঙ্ক আদি দ্বারা যে ভোগ নিবেদন করা হয় তাহাকে মালসা বলে।

স্বতন্ত্র করিয়া সর্ব প্রথমে রাখা হইয়াছে। ঐ স্থান ছাড়িয়া পিণ্ডার অপর অংশ, চবুতরা সম্মুখে বিরাট বটচ্ছায়ায় বিশাল মুক্ত প্রাক্গণে, ভাগ্যবতী সুরধনীর নীরে ও তীরে—উপরে বর্ণিত বিচিত্র ও বিপুল জন সমাগম প্রত্যেককে একটি দুধ চিড়ার মালসা ও অপরটি দই চিড়ার মালসা দেওয়া হইল। সকলে নিজ নিজ সম্মুখে মালসা রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রখ্যাত রাঘব পণ্ডিত সেই স্থানে শুভ বিজয় করিলেন। দণ্ড মহোৎসবের ঘটনা ও সু-গভীর তাৎপর্য অনুভব করিয়া তিনি বিস্মিত ও আনন্দে আত্মহারা হইলেন। ঐ দিন নিতাইচাঁদের ‘রাঘব ভবনে’ মধ্যাহ্ন ভিক্ষার দিন স্থির ছিল। সেই উপলক্ষে তিনি নিতাইচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “অবধূত ! কি ব্যাপার ? তুমি না আজ আমার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন করবে ? সেখানে প্রসাদ প্রস্তুত। ভুলে গেছ না কি ?” নিতাইচাঁদ রাঘব দর্শনে অধিক উল্লসিত হইলেন। মধুর হাসিয়া বলিলেন, “দেখ রাঘব ! আমি ও আমার সঙ্গীগণ সকলে ‘গোপ’। পুলিন ভোজনেই আমাদের পরমানন্দ। তুমিও এসেছো, খুব ভাল হয়েছে। তুমি আমাদের সাথে পুলিন ভোজনে যোগ দাও। তোমার বাড়ীর প্রসাদ রাত্রে গ্রহণ করব।” এই বলিয়া তাঁহার জন্তুও দুইটি মালসা আনাইলেন।

কোন কিছু ভাল হইলেই স্বভাবতই নিজ প্রিয়জনকে তাহার অংশ দিতে সকলেরই প্রাণে বাসনা জাগে। নিতাইচাঁদেরও জাগিল—আজিকার এই পুলিন ভোজনে এই জনগণের অনাস্বাদিত আনন্দ-তরঙ্গ এ ভাবে কখনও হয় নি। ভবিষ্যতে কি হইবে সে বিবেচনার প্রয়োজন নাই। এ ব্যাপারে আমার প্রাণ-রমণ সচল-জগন্নাথ গৌরহরিকে অবশ্যই আনিব। তিনি ধ্যানস্তিমিত নেত্রে স্থির বদ্ধাসনে বসিয়া নীলাচল বিহারী গৌরহরিকে প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ করিলেন।

এস আমার প্রাণ গৌর
তোমার রঘুনাথের দণ্ড মহোৎসবে

‘একবার এস হে
একবার এস হে
একবার এস হে
একবার এস হে’

‘ধ্যানে তবে প্রভু, মহাপ্রভুরে আনিল ।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিল ।’

—চৈঃ চঃ

নিতাই ডেকেছে তারে
‘আর কি প্রভু বইতে পারে
আর কি প্রভু রইতে পারে’

তারে লৈয়া সবার চিড়া দেখিতে লাগিল ॥
“সকল কুণ্ডী হোলনার চিড়া এক এক গ্রাস ।
মহাপ্রভুর মুখে দেয় করি পরিহাস ॥”

তখন “হাসি প্রভু আর এক গ্রাস লৈয়া ।
‘একলা খেতে ভাল লাগে না
বলে খাও নিতাই সোনা একলা খেতে ভাল লাগে না’
তার মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া”

‘এই মত নিতাই বেড়ায় সকল মণ্ডলে’
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব লকলে ॥*

কি করিয়া বেড়ায় নিতাই
‘কেউ জানতে পারে না
কেউ জানতে পারে না’

* জলে স্থলে বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী যে যেখানে ছিল প্রত্যেকের নিকট—

“কি করিয়া বেড়ায় ইহো কেহ নাহি জানে ।

মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥”

যাঁরে দেখা দেন কৃপা করে

সেই তাঁরে দেখতে পারে যারে দেখা দেন কৃপা ক’রে

মহাপ্রভুর দর্শন পান কোন ভাগ্যবানে ।

(প্রেমনেত্রের বিকাশ না হইলে এ সব প্রত্যক্ষ হয় না । রাঘব পণ্ডিত আদি যাঁহারা চিত্তিত পরিকর তাঁহারা সকলেই গৌর আগমন প্রত্যক্ষ করিলেন ।)

অলৌকিক শক্তির প্রভাবে চতুর্দিকের সমবেত জনতা মুহুমুহু জয়, জয় ধ্বনি দিতে লাগিল ।

এই লীলা অন্তে নিতাইচাঁদ গৌরাজ্ঞ সুন্দরকে সঙ্গে লইয়া চবুতরা উপরে উঠিলেন । সেখানে পূর্বেই আটটি মালসা স্থাপন করা হইয়াছে । গৌরসুন্দরকে নিজ দক্ষিণে বসাইয়া চারটি মালসা তাঁহাকে দিলেন ও বাকী চারটি নিজের সামনে রাখিলেন । তাহার পর চতুর্দিকে অবস্থিত জনসমুদ্রের প্রতি আর একবার শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া সকলকে প্রসাদ গ্রহণের আদেশ দিলেন । গৌরহরির নিজ জন যাঁহারা তাঁহারা সকলেই প্রচ্ছন্ন লীলাটি মানস নেত্রে প্রত্যক্ষ করিলেন । এবং সমবেত অগণিত জনসমুদ্র তাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই মুহুমুহু ‘নিতাই’ ‘গৌরের’ জয় দিতে দিতে পুলিন ভোজন করিতে লাগিলেন ।

ভাগ্যবান রঘুনাথদাস অবনত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া অঝোর নয়নে ঝরিতেছেন । তিনি পুলিন ভোজনে বসেন নি । আচমনান্তে নিতাইচাঁদ—

‘চারি কুণ্ডার অবশেষ রঘুনাথে দিল’

পরম দৈন্তে তিনি (রঘুনাথ) তাহা গ্রহণ করিলেন ।

ব্রজভূমির পুলিন ভোজন কৃষ্ণ বলরামের নিত্য সিদ্ধ পরিকর-সুন্দরের মধ্যেই সজ্জ্বলিত হইয়াছিল । আর এই পুলিন ভোজন ?

ইহা হইল অগণিত জন সাধারণের সঙ্গে । যাহারা কামিনী ও কাঞ্চনের নফর, সু-মন্দ, মন্দমতি ও ভক্তিহীন কলিজীব তাহারা সকলে আজ পুলিন ভোজনের সহচর । এ কাঞ্চ্য ব্রজলীলার প্রকাশ পায় নাই ।

“প্রেমধন দান কবি বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী
খণ্ডাইব সবাকার দুঃখ ।”

.গৌরহরির এই সার্থক বকণাবাণী প্রভু নিতাই মাধ্যমেই আচরিত ও প্রকাশিত হইল ।

দণ্ড মহোৎসবের রাত্রিতে

‘নিতাই নৃতনে’, ‘বাঘব ভবনে’, ‘শচীমাব বন্ধনে’ ও ‘শ্রীবাসের অঙ্গনে’ এই চারিটি স্থানে নিগম-নিগূঢ় অবতার গোবর্ণনমির নিত্য অবস্থান ।

সন্ধ্যা সমাগমে বাঘব ভবনে কীর্ত্তন আৰম্ভ হইল । অতি গূঢ় চাঁদনিতাই প্রথমে তাঁহার পার্শ্বদ ও ভক্তবৃন্দকে নৃত্য কবাইলেন, তাবপর নিজে নৃত্য করিলেন । যথা—

‘বাঘব মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আৰম্ভিল ।
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ বায় ।
শেমে নৃত্য কবে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥”

(তাঁহার) সেই অনির্বচনীয় ঘটনা দর্শনে বঘুনাথ কৃত-কৃতার্থ হইলেন ।

সু-মধুর নৃত্য অস্ত্রে নিতাইচাঁদ কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন । তাবপর তিনি গৌরহরির জন্ম নিজ দক্ষিণে একটি আসন এবং পার্শ্বদ ও ভক্তবৃন্দকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া ভোজন লীলাবন্ধে বস হইলেন । মহাপ্রভু শুভাগমন করিয়া আসনে

রাঘবের এই দর্শন করিয়া রাঘব পণ্ডিত গৌরসুন্দর আশীর্ষিত
 করিলেন। শাল্যর, বিবিধ ব্যঞ্জন, মাংস প্রকার পিঠা, পুষ্করী, কাম
 প্রভৃতি সমস্ত মিষ্টান্ন প্রভৃতি বহু প্রকারের উপাসনায় উপাসিত হইয়া
 পরম পরিপাটির সহিত রাঘব স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া ছই ভাইকে
 পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। ভক্তবৃন্দকেও অ্যকণ্ঠ
 হইয়া ভোজন করাইলেন। রাঘব পণ্ডিত ছই ভাইকে (নিতাই গৌর) মাল্য
 পরিহায়া শ্রীঅক্ষ চন্দন চর্চিত করিলেন। বিড়া (পান) খাওয়াইলেন
 ও চরণ বন্দনা করিলেন। ভক্তবৃন্দেরও অনুকম্প পরিচর্যা করিলেন।

‘রাঘবের মহাক্রুপা রঘুনাথ উপরে’

নিতাই গৌরের সু-দুর্লভ অবশেষ পাত্রটি রঘুনাথকে দিয়া বলিলেন,
 “রঘুনাথ। গৌরসুন্দর স্বয়ং এখানে আবিভূত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ
 করিয়াছেন। আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি তাঁহার সেবার এই
 অবশেষ তোমাকে দিলাম। তুমি নিশ্চিত হও। তোমার (গৌর-
 হরির শ্রীচরণ প্রাপ্তির বাধক) সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইল।

(বাস্তবিক তাহাই হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৪৪০ শকাব্দের
 জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীতে। রঘুনাথ এবার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া
 পাঁচ দশ দিনের মধ্যেই গৃহত্যাগ পূর্বক নীলাচলে পলায়নের
 সুযোগ পাইয়াছিলেন।)

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ‘পানিহাটি’ গ্রাম, সেই ‘জাহ্নবী’
 এবং সেই ‘বটবৃক্ষ’ অত্যাপি বর্তমান।

“অত্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।

কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥”

কাল সত্য ‘দণ্ড মহোৎসব’ লীলাটি অনুভূতি স্মৃতির গোচরে
 আনবার জন্য আজও সেই পানিহাটি গ্রামে জাহ্নবীতটে বটবৃক্ষমূলে



পানিহাটি গ্রামে গঙ্গা-তটে প্রখ্যাত 'বটবৃক্ষ'

অন্যত্রিংশৎসংখ্যক পুস্তকের প্রেরণা যোগেশ্বরী কবিতায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আসিয়া বৈষ্ণব সাধু, ভক্ত, কৃষ্ণকৃষ্ণ সমাগত হইয়া যাহা যোগেশ্বরী 'দশ মহোৎসবে' যোগদান করিয়া ত্রৈকালিক সত্যের মহদনুভূতি লাভ করেন।

(নাথময় জীবন শ্রীপাদ রায়দাস বাবাজী মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে প্রতি বৎসরই পানিহাটিতে এই উৎসবে বহু গোস্বামী সন্তান এবং অগণিত ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্তন করিয়াছেন। আজও অগণিত ভাগ্যবান যাহারা সেই স্মরণ মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই অনুভব আছে যে ঐ দিন সু-মধুর লীলাটি যেন প্রকট হইত।)

নিতাইচাঁদের আশীর্বাদ

দশ মহোৎসবের পরের দিন। প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া নিতাইচাঁদ স্বপারিকরে বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। এবং রাঘব পণ্ডিতও সেখানে উপস্থিত আছেন। রঘুনাথ সেখানে আসিয়া দৈন্য প্রণতি জ্ঞাপন করিতে কবিতা সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। রাঘব পণ্ডিত পূর্ব দিনের পুলিন ভোজনের স্মৃতিকথারই আলাপনের দ্বারা রঘুনাথকে পরম আত্মীয়ের ব্যবহার ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। ভক্তির স্বভাবে রঘুনাথের সর্বদাই অভাব বোধ। তিনি নিজেকে দীন হীন ও সঙ্কলের দয়ার পাত্র ও সর্ববিষয়ে অযোগ্য বোধ করেন। তিনি সন্নিহিত রাঘব পণ্ডিতের সমীপে নিবেদন করিলেন, আপনাব কৃপানুগ্রহে পাইলে 'এ দাস' প্রভু নিতাইয়ের শ্রীচরণে নিজ অভিলাস জ্ঞাপন করে। মধুর হাসিয়া অবধূত নিতাই অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ সজল নয়নে গদগদ ভাষে বলিলেন—

“তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায় ।
তুমি কৃপা করিলে তাঁরে, অধমেও পায় ॥”

“মোর মাথে পদ ধরি, কর আশীর্ব্বাদ ।
‘নির্ব্বপ্নে চৈতন্য পাও’ কর আশীর্ব্বাদ ॥”

পরম গন্তীর নিতাই গুণমণি সজল নেত্রে অপলক দৃষ্টিতে
রঘুনাথের শ্রীবদন দেখিতে লাগিলেন । রঘুনাথের নিবেদন এখনো
শেষ হয় নাই । তিনি পুনরায় বলিতেছেন—

“অধম পামর মুঞি হীন জীবধম ।
মোর ইচ্ছা হয় পাও চৈতন্য চরণ ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে চায় ।
অনেক যত্ন কৈলু তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥

যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া ।
পিতা মাতা ছুই জন রাখেন বান্ধিয়া ॥”

মুখের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই মনের আবেগে রঘুনাথ
ভূমিতে লুপ্তিত হইয়া উচ্চৈশ্বরে কাঁদিতে লাগিলেন ।

পরম করুণ নিতাইচাঁদ সহস্র মুখে নিজ পার্শ্বদবৃন্দকে উদ্দেশ্য
করিয়া বলিতেছেন—

‘প্রেমধনে ধনী হইলে মায়ার সৃষ্ট নিখিল পদার্থে স্বাভাবিক
অরুচি জন্মে’—তারই প্রতিমূর্ত্তি ঐ রঘুনাথ । এই রঘুনাথের মাতা
পিতা আদর্শ গৃহী । এঁদের জাগতিক বৈভব অতুলনীয় । এই
সব বস্তুকে মলমূত্রবৎ ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাজ চরণ লাভের জন্য
ইহার প্রাণ ব্যাকুল । রঘুনাথের গৃহ হইতে পলাইবার চেষ্টার
কথা তোমরা শুনিয়াছ । গৌরাজ প্রেমের ‘সচল’ মুরতি এই

রঘুনাথ—প্রাণভরে দেখে নাও । রঘুনাথ নাম ধরে ঐ সামনে দাঁড়িয়ে আছে ।

নিতাইটাদের এই সব আনন্দ উচ্ছ্বাসের কথায় রঘুনাথ মর্মে মর্মে লজ্জিত হইলেন । নিতাইটাদ এইবার রঘুনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—

‘তুমি করাইলে এই পুলিন ভোজন

ইহা পরম মঙ্গল মহৎ সেবা নিহেতুক কৃপাকারী গৌরহরি সেই উৎসবে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে পুলিনে চিড়া তুধ ও দই চিড়া এবং রাত্রে (ঐ) রাঘবের ভবনে প্রসাদ অঙ্কি কার করিয়া তোমাকে তাহার অদশেম দিয়াছেন । এর পরও তোমার আবার উদ্ধারের প্রার্থনা ? নিশ্চিন্তে এখন বাড়ী যাও ।

“‘অচিরে’ ‘নির্বিঘ্নে’ পাবে চৈতন্য চরণ ॥”

গৌরহরি তোমাকে ‘স্বরূপের’ আনুগত্যে নিজ অন্তরঙ্গ সেবা সৌভাগ্য দান করিবেন ।

নিতাইটাদের হৃদকর্ণ রসায়ন আশীর্ব্বাদ বাণী শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ পুলকিত ও গস্তীর হইলেন । সকলের চরণ বন্দনা করিয়া ভুলুপ্তিত হইয়া প্রণাম করিলেন । পুনরায় তাঁহাদের শ্রীচরণে নীরব প্রার্থনা জানাইয়া ধীরে গৃহের পথে পা বাড়াইলেন ।

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরহরি বৃন্দাবন যাইবার জন্ম যে উন্মাদ চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আজ নিতাইটাদের কৃপা আশীর্ব্বাদে রঘুনাথের সেইরূপ নীলাচলে গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ প্রাপ্তির জন্ম উন্মাদ চেষ্টা প্রকাশ পাইল । ফলে, অঝোর নয়নে, স্থূলিত চরণে, মুখে নিরন্তর—হা নিতাই ! হা গৌর ! কৃপা কর বলিতে বলিতে বাড়ীর পথে চলিলেন ।

নিতাই মদির পানে—

দ্বিতীয় বার শান্তিপু্রে গৌরচরিকে দর্শন করিয়া যে রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়াছিলেন, আর এবার ‘নিত্যানন্দ’ দর্শন করিয়া সেই রঘুনাথই বাড়ী ফিরিয়াছেন কিন্তু একই রঘুনাথের ভিন্নাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

রঘুনাথের মাতা, পিতা, স্ত্রী, দাস দাসী সকলেই তাঁহার পাণিহাটি গমন জন্মিত এই কয়দিন কেবল রঘুনাথের গুণ ও ধীর গন্তীর মধুর স্বভাবের কথাই আলাপ করিতেছিলেন। এবং তাঁহারা আশা পোষণ করিতেছিলেন যে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় রঘু সত্বর পরমানন্দে ফিরিতেছেন।

রঘুনাথ সত্বর ফিরিয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণ রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়াছেন কিন্তু এ কি? তাহার বেশভূষা ছিন্নভিন্ন, ধূলি ধূসরিত, মস্তকের চুল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চোখে জলের শুষ্ক রেখা।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন ও তাঁহাদের পরিজনবর্গ সকলেই ব্যাকুল হইলেন। কাহারও মুখে কথা আসিতেছে না। সকলেই ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া রঘুনাথের নিকট আসিয়া বার বার দেখিতে লাগিলেন। ইহাদের এই ব্যাকুলতায় রঘুনাথ কোন রূপে নিজেকে সংযত রাখিয়া ব্যাকুলস্বরে বলিলেন, আমাকে বাহিরে থাকিতে দিন। রঘুনাথ দুর্গা মণ্ডপেই আশ্রয় লইলেন।

“সেই হৈতে অভ্যস্তুরে না করে গমন।

বাহিরে দুর্গা মণ্ডপে করেন শয়ন ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

ভুবন পাবন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কৃপা কটাক্ষ পাইবার পর হইতেই রঘুনাথের বৈরাগ্য ও বাড়ী হইতে বার বার পলায়নের চেষ্টা তাঁহার মাতা পিতার সু-পরিচিত। কিন্তু এইবারের চেষ্টা দেখিয়া

আর তাহার নির্জন বাসের আচরণ দেখিয়া মাতা পিতা ও পত্নীর মনে অন্তরূপ ধারণা হইল। রঘুনাথ গৌরবিরহে বিলাপ ও প্রলাপ করিতেছেন। পলায়নের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে বাতুল চেষ্টা করিতেছেন। এইবার বোধহয় সুনিশ্চিত বিপদ আসিতেছে অনুমান করিয়া রঘুনাথের মাতা পিতা ও পত্নী অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় ও দুঃখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার অঞ্চলের ধন, নয়নমণি যে কোন মুহূর্ত্তে হয়তো চিরদিনের জন্য পলায়ন করিবে। স্নেহময়ী জননী এই চিন্তায় অন্ধ পাগলিনী হইলেন। তিনি একদিন স্বামীকে বলিলেন—

“রঘু বাতুল হইয়াছে। নচেৎ কি এত সুখ ভোগ ছাড়িয়া অনাহারে অনিদ্রায় দুর্গামণ্ডপে পড়িয়া থাকে? এবং পলাইতে চায়? তাহাকে কিছুদিন পটুড়ুরি দিয়া হাতে পায়ে বান্ধিয়া রাখ। সে পলাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না।”

স্ত্রীর ঐ করুণ বিলাপ শুনিয়া গোবর্দ্ধনের দুঃখ শতগুণ বদ্ধিত হইল। তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে রঘুনাথ এখন তাঁহাদের আয়ত্নের বাহিরে। তিনি সখেদে জবাব দিলেন—

“অপ্সরাসম নারী, ইন্দ্র সম বৈভব যাহাকে বাঁধিতে পারিতেছে না, সামান্য দড়ি তাহাকে ক্রুরপে বাঁধিবে? রঘুনাথ যে সে পাগল নয়। পাণিহাটিতে অবধূত নিতাই ইহাকে অতি উগ্র গৌরাজ প্রেম মদিরা পান করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আটক রাখে।

‘চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।

চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে?’

গৃহীর পুত্র সুখের মত বিষয় সুখ আমাদের ভাগ্যে আর নাই। আমরণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন যাইবে। তবে যতক্ষণ রঘুনাথ আমাদের

কাছে আছে ততক্ষণ রঘুনাথকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার সব চেষ্টাই আমরা করিব।

সেই দিন হইতে প্রহরীর সংখ্যা বাড়াইলেন। প্রহরীর দল দিবারাত্র পালা করিয়া প্রহরা দিতে লাগিল। ওদিকে রঘুনাথ নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টায় রত থাকিলেন।

পঞ্চম উরঙ্গ

সংসার শৃঙ্খল মোচন :

রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ করিয়া গোড়ীয় ভক্তগণ ‘সচল জগন্নাথ’
দর্শনের লালসায় প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন—

‘প্রতি বর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস ।

তাঁহা সভা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥’

—চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

ব্রজরামাগণের কৃষ্ণভাবনাময় চিত্ত, আর গৌরপরিকরদের
গৌরভাবনাময় চিত্ত । গোড়ীয় ভক্তবৃন্দ নিরন্তর গৌরনাম, গৌরের
রূপ গুণ লীলা প্রসঙ্গ বা শ্রীহরি সংকীৰ্ত্তনের জনক শ্রীগৌরহরির
নাম কীৰ্ত্তন করিতে করিতে পরমানন্দে গোড়দেশ হইতে পদযাত্রা
করিয়া সুদূর নীলাচলে যাইতেন ।

রঘুনাথ মনে মনে স্থির করিলেন—‘আর না এইবার বৎসাত্রায়
অদৃষ্টে নীলাচলে যাইব । গোড়ীয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে যাইতে
পারিলে পরমানন্দ হয় । কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে সে আশা নাই ।’
তাই তিনি মনে মনে গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন
জানাইলেন—হে প্রাণনাথ ! হে কৃপানিধি ! হে পরম করুণ ।
তোমার নিতাই সোনার আশীর্ব্বাদ বাক্য সফল কর । তিনি তো
বলিয়াছেন—

“অচিরে’ ‘নির্বিঘ্নে’ পাবে চৈতন্য চরণ”

পানিহাটি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর রঘুনাথের নিদ্রা নাই ।

দিবারাত্র গৌর-বিরহে, অনাহারে, অনিদ্রায় কখনও কখনও উচ্চৈশ্বরে কখনও বা ধীরে ধীরে 'হা গৌর ! প্রাণ গৌর ! আর কতদিনে কৃপা হবে' বলিয়া হায় হায় করিয়া নিরন্তর ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন । রঘুনাথের দশা দেখিয়া তাঁহার পিতা মাতা ও স্ত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । এমন কি রক্ষীগণও তাঁহার সহিত কাঁদিয়া আকুল হইতেছে ।

একদা তিন প্রহর রাত্রি অতীত হইল । তখনও রঘুনাথ কাঁদিয়া জাগিয়া রাত্রি কাটাইতেছেন । রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিল । রক্ষীরা রঘুনাথকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু, রঘুনাথের তীব্র ব্যাকুলতায় তাহারাও কাঁদিতে লাগিল । প্রভাত হইতে প্রায় চারদণ্ড কাল বাকী, এমন সময় হঠাৎ দুর্গা মণ্ডপের আঙ্গিনায় এক ব্যক্তি স্নেহ মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন—

‘বাপ্ রঘুনাথ ।’

সুপরিচিত স্বর শ্রবণে রঘুনাথ চমকিত হইলেন । নিজেই মনের ভাব প্রশমিত করিয়া দুর্গা মণ্ডপের বাহিরে অঙ্গনে আসিলেন । দেখিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু ।

সম্মুখে শ্রীগুরু মূর্তির দর্শনলাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিলেন । আদেশের অপেক্ষায় করযোড়ে নতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন । রঘুনাথের দীক্ষাগুরু শ্রীল যত্নন্দন আচার্য মহাশয়, নিশান্তে অকস্মাৎ কেন দর্শন দিতে আসিলেন ? রঘুনাথের ব্যাকুল হৃদয়ে কত প্রশ্ন জাগিল । ঘটনাটি—

‘আজ কয়দিন হইল আচার্য মহাশয়ের ঠাকুর সেবার ব্রাহ্মণ সেবাকার্য ছাড়িয়া দিয়াছেন । তিনি এই কয়দিন অন্যান্য পূজারী দ্বারা তাঁহার নিত্য ঠাকুর সেবার কার্য সমাধা করিয়াছেন । সে সেবা তাঁহার মনঃপুত হইতেছে না । সুতরাং প্রাক্তন ব্রাহ্মণ সেবককেই তিনি পাইতে ইচ্ছা করেন । তাঁহার মনের আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস যে রঘুনাথ অনুরোধ করিলে উক্ত সেবক (ব্রাহ্মণ) তাহার বাক্য অবশ্যই

রক্ষা করিবে। ঐ ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে অন্তত কাজে চলিয়া যাইবার পূর্বেই তাহার সহিত রঘুনাথের সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়। এই কারণেই তিনি একটু রাত্রি থাকিতেই রঘুনাথের নিকট আসিয়াছেন।

রঘুনাথ ধীর ও স্থির হইয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে উপরোক্ত বিবরণ শুনিলেন। রঘুনাথের রক্ষীগণও অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া সব শুনিলেন। ইত্যবসরে রঘুনাথ শ্রীগুরুদেবের সহিত যেন আলাপ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ হইতে রাস্তায় নামিলেন। গুরু শিষ্য উভয়েই উক্ত ব্রাহ্মণ সেবকের বাড়ী অভিমুখে স্বচ্ছন্দ গতিতে রওনা হইলেন।

রক্ষীগণ রাত্রি জাগরণে ক্লান্তও হইয়াছিল, সেইজন্য তাহারা জানে আর অল্পক্ষণ পরেই দিবাভাগের রক্ষীরা কার্যে যোগ দিতে আসিবে। রাত্রির প্রহরীরা সারা রাত্রি রঘুনাথের হৃদয়-বিদারক বিলাপ শুনিয়াছে। রাত্রির অবসান হইতে দেৱী নাই। শ্রীগুরুদেবের আগমনে ও সঙ্গ প্রভাবে এবং বিষয়ান্তরের অভিনিবেশে রঘুনাথকে এখন স্বাভাবিক ও প্রফুল্ল দেখা যাইতেছে। আচার্য্য মহাশয় রঘুনাথের সঙ্গে আছেন। তিনি নিজ কার্যে রঘুনাথকে লইয়া যাইতেছেন। তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তিনি অবশ্যই রঘুনাথকে এই দুর্গা নগরে রাখিয়া যাইবেন। ইহাদের সঙ্গে আমাদের যাওয়া অশোভন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া রক্ষীদের কেহই রঘুনাথের সঙ্গে গেল না। স্বাভাবিক ক্লাস্তিতে সেইখানেই তাহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের বাড়ীর পূর্বদিকে আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী। আবার আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী ছাড়িয়া আরও কিছুটা পূর্বে গেলে উক্ত ব্রাহ্মণ সেবকের বাড়ী। গুরু শিষ্য আলাপ করিতে করিতে শ্রীল যত্নন্দন আচার্য্যের বাড়ীর নিকট আসিলে পর অতি বিনয় দৈন্তে রঘুনাথ বলিলেন—“শ্রীগুরুদেব ! এ আর এমন কি কাজ ? আমাকে আজ্ঞা দিন এবং আপনি স্বচ্ছন্দে বাড়ী গিয়া নিত্য কর্ম সমাপন

করুন।” আচার্য্য রঘুনাথের বাক্য সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করিয়া রঘুনাথকে আজ্ঞা দিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রঘুনাথের মন ও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ‘জয় গৌর’ ‘জয় নিতাই’ ধ্বনি দিতে দিতে ভাবিলেন—এই ত দেখিতেছি প্রাণ গৌরের সেই কৃপাবাগী—

‘সে ছল সে কালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে’

—আজ সফল হইল। আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর আসিয়াছি। আবার প্রহরী মুক্তও। এই সুযোগ। ইহার সুব্যবহার করিতে হইবে। তখনও প্রভাত হয় নাই। আঁধার রহিয়াছে। দুই একটি পাখী জাগিয়া উষা আগমনের সূচনা করিতেছে মাত্র। নগরে তখনও কেহ জাগে নাই। পথ জনশূন্য। রঘুনাথ দ্রুতগতিতে পূর্ব মুখেই চলিলেন।* তাঁহার মুখে ভগ্নস্বরে ‘হা নিতাই! হা গৌর! রক্ষা কর।’ কেবল এই মধুর শব্দ সকল উচ্চারিত হইতেছে আর লক্ষ অবিরল ধারা। শ্রীগৌরাজ চরণ পাইবার উন্মাদ ব্যাকুলতায় তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে দুঃএক বার বলিতেছেন—

‘হা পদাধর কূল দাও’

‘সীতানাথ বল দাও’

নিজ প্রহরী হস্তে ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া সমানবেগেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। পথ বিপথ দৃষ্টি নাই। অনুসন্ধান নাই। জল জঙ্গল তৃণ কণ্টক প্রভৃতির উপর দিয়া গৌর-প্রেমে-উন্মত্ত-উৎকণ্ঠিত রাজপুত্র রঘুনাথ মুক্ত চরণে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

* এই গমন পথে, শ্রীগুরুদেবের ব্রাহ্মণ সেবককে কার্য্যে ষোগদান করিতে অহরোধ করিয়াছিলেন কি না তাহা গ্রন্থে উল্লেখ নাই। আদর্শ চরিত শ্রীরঘুনাথ সম্ভবতঃ তাহা করিয়াছিলেন।

“অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায় ।
দিখিদিখি ফিরি বলে গ্রাম না তাকায় ॥
জল জল তৃণ কণ্ঠক কঙ্করা—
নাহি মানে, ধায় মাত্র, বাতুলের পারা ।”

—ভক্তমাল

‘অনর্পিত-অর্পণ লীলায়’ ‘গৌর-প্রেম’ রক্ষার আদর্শ ‘আধার’ রঘুনাথের এই গমন যেন রাস রজনীতে কৃষ্ণকান্তাদের বাতুল গমন ভঙ্গীর সঙ্গে সাদৃশ আছে ।

এই ভাবে গৌর-বিরহ-পাগল রঘুনাথ পনের ক্রোশ পথ চলিয়া সন্ধ্যাকালে পথে এক গোয়ালার গো-বাথানে উপস্থিত হইলেন ।

“পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে ।
সন্ধ্যাকালে রহিল এক গোপের বাথানে ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

পবম সুকৃতিবান সেই গোপ জনগণ-মনলোভা রঘুনাথকে শ্রান্ত ক্লান্ত ও উপবাসী দেখিয়া অপত্যস্নেহেই অশেষ বিশেষ অনুরোধ পূর্বক তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইলেন । ঐ গোপের একান্ত অনুরোধে তাহাকে কৃতার্থ করিয়া সে রাত্রি ঐ গোয়াল ঘবেই যাপন করিলেন । ‘যে কোন মুহূর্ত্তে হয় তো বা নিজ রক্ষীদের হাতে ধরা পড়িব’—এই ভয়, রঘুনাথের মনকে চঞ্চল করিতে লাগিল । তিনি সমস্ত রাত্রি নিতাই গৌরের গুণ ও কৃপা স্মরণ পূর্বক কাঁদিয়া জাগিয়া অতিবাহিত করিলেন ।

রঘুনাথের অদর্শনে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের ভবনে :

এ দিকে অরুণোদয়ের পর দিবাভাগের প্রহরীরা উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে রাত্রির প্রহরীরা অবসন্ন দেহে নিদ্রামগ্ন ।

ছুর্গামগুপ গৃহে রঘুনাথ নাই। তাহারা রাত্রির প্রহরীদের জাগাইল। তাহাদের মুখে রঘুনাথ ও তাঁহার শ্রীগুরুদেবের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কয়েকজন প্রহরী সর্বপ্রথমে ছুটিয়া আচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী গেল। রঘুনাথের অনুসন্ধান রত প্রহরীদের দেখিয়া আচার্য্য যত্নন্দন নিজেকে বিভ্রত বোধ করিলেন। তিনি বিস্মিত হইয়া রক্ষীদের বলিলেন—‘সে কি? রঘুনাথ এখনো বাড়ী যায় নাই?’ রক্ষীরা সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া উর্দ্ধ্বাসে ছুর্গামগুপে ফিরিয়া আসিয়া “রঘুনাথ পলাইয়াছে” এই নিদারুণ সংবাদ অন্যান্য রক্ষীদের জানাইল।

এ ধারে শ্রীযত্নন্দন আচার্য্যও রঘুনাথের জন্ম চিন্তিত হইয়া গোবর্দ্ধনদাসের বাড়ীতে আসিলেন। রঘুনাথের জন্ম তিনি নিজেকে দোষী মনে করিলেন। অমল চরিত বাসুদেব দত্তর সঙ্গ প্রভাবে তিনিও একজন ‘গৌর-অনুরাগী ভক্ত’; নিজ শিষ্য রঘুনাথের জন্ম তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। গৌর-ভক্ত স্বভাবে তিনি ব্যাকুল প্রাণে সজল নয়নে মনে মনে শ্রীগৌরাজ্ঞ চরণে নিবেদন করিলেন—

‘হে দীন দয়াল ! হে স্বভাব করুণ ! এবার নির্বিঘ্নে (তোমার) রঘুনাথকে শ্রীচরণে স্থান দিয়া আমাকে বিনামূল্যে কিনিয়া নাও ।’

দিবা ও রাত্রির উভয় রক্ষী দল শঙ্কিত হৃদয়ে হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসকে “রঘুনাথ পলাইয়াছে” এই ভয়ঙ্কর সংবাদটি জানাইল। তাহাদের সকলের মুখ ভয়ে শুষ্ক, চক্ষে জল।

গস্তীর আশয়, বিচক্ষণ ও ধীর স্বভাব ভ্রাতৃদ্বয় গস্তীর হইলেন। অন্য সমস্ত ভৃত্য রক্ষীদের ডাকাইয়া একত্রিত করিলেন। কয়েকজনকে সপ্তগ্রাম নগরের মধ্যে অনুসন্ধান পাঠাইলেন। এবং নগরের দক্ষিণ দিকের পথে, যত যত গ্রাম, প্রান্তুর ও জঙ্গল পড়ে সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার উপযোগী রক্ষী, পাইক, পেয়াদা ও অশ্বারোহী পাঠাইলেন। এ দিকে অন্দর মহলে রঘুনাথের মাতা

ও স্ত্রী এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয় বিদারক করুণ ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহাদের দশা অবর্ণনীয়।

‘রঘুনাথ দক্ষিণে যান্ নাই’। সূতরাং হিরণ্য গোবর্দ্ধনদাসের বিচক্ষণ পাইক পেয়াদা সকলে অনুসন্ধান করিয়া বিফল হইল। ভগ্নমনোরথে একে একে সকলে ফিরিয়া আসিয়া নতমুখে হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ওদিকে নীলাচলের পথে গোবপ্রেমেব পাগল গোঁড়ের ভক্ত-বৃন্দের দল যে রথযাত্রার উপলক্ষ করিয়া গোঁড় দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন সে সংবাদ হিরণ্য গোবর্দ্ধন জানেন। তাঁহাদের প্রধান পরিচালক প্রখ্যাত সেন শিবানন্দেব নিকট একখানি অতি বিনয় পূর্ণ চিঠি সহ দশজন অশ্বারোহী রক্ষী তৎক্ষণাৎ পাঠাইলেন। চিঠিতে বিশেষ প্রার্থনা—

“আমাদের প্রাণ, নয়নের মণি ‘রঘু’ যদি আপনাদের সঙ্গ লইয়া থাকে তাহা হইলে নিজ ভৃত্য জ্ঞানে কৃপাপূর্বক রঘুকে (এই) রক্ষীদের সহিত ফেরত পাঠাইয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কবিত্তে কৃপা আজ্ঞা হয়।”

অশ্বারোহী রক্ষীদল মেদিনীপুন্ডের অন্তর্গত ঝাকডাতে (দক্ষিণ দেশগামী পথপার্শ্বে অবস্থিত) গোঁড়-ভক্ত গোষ্ঠীসহ সেন শিবানন্দেব সাক্ষাৎ পাইল। তিনি হিরণ্য গোবর্দ্ধনের প্রেরিত পত্র পড়িয়া এবং রক্ষীদের মুখে রঘুনাথের পলায়নের বিস্তারিত সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ‘রঘুনাথ সেন শিবানন্দেব সঙ্গ লন নাই’ এই সংবাদ বহন করিয়া অশ্বারোহী রক্ষীদল হিরণ্য গোবর্দ্ধনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল।

হিরণ্য গোবর্দ্ধন এখন রঘুর প্রাণের আশঙ্কায় অস্থির ও অধীর হইলেন। সম্ভব অসম্ভব সর্বপ্রকারের সন্দেহের বশে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। রঘুর মাতা প্রায় পাগলিনী হইয়া গেলেন।

তাঁহার স্ত্রীর ঘন ঘন মূৰ্ছা হইতেছে। গোবর্দ্ধনদাস নিজ হৃদয়ের তাপ ও দুঃসহ দুঃখ যত্নে প্রশমিত করিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধুর সুস্থতা বিধানের জন্ত সর্ব প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নীলাচলের পথে :

পূর্ববর্ণিত গো-বাথান হইতে প্রভাতে যাত্রা করিয়া বার দিনের দিন রঘুনাথ নীলাচলধামে প্রবেশ করিলেন।

“বার দিনে চলি গেলা স্ত্রীপুরুষোত্তম”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

গৃহত্যাগ করিয়া প্রথম দিনে তিনি পূর্ব মুখে তিরিশ মাইল আসিয়াছেন। আজ দিক্ পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণ মুখে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ‘ছত্রভোগ’ পর্য্যন্ত রাজপথ ধরিয়া দ্রুত গমন করিলেন। তাহার পর নীলাচল-ধামের পথ ধরিয়া সর্বদাই সাধারণের অব্যবহৃত রাস্তা ও কুখ্যাত গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি গমন করিতেছিলেন।

(প্রথম দিন) পূর্বদিকের পথে গমনের যে গমনভঙ্গী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে সেই ধারাতেই বারটি দিন ও বারটি রাত্রি নিরন্তর ‘হা নিতাই’ ! ‘প্রাণ নিতাই’ ! ‘হা গৌর’ ! ‘প্রাণ গৌর’ ! ‘কাছে নাও’ বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পথে জল, জঙ্গল, কণ্টক, পর্বত আদি কোন দিকেই গৌরপ্রেমের উন্মাদ রঘুনাথ ফিরিয়া চান নাই। পথের কোন কষ্টই তাঁহার কষ্টকর বোধ হইতেছে না।

‘পথে তিন দিন মাত্র করিল ভ্রমণ’

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

প্রথম দিন, গোপের একান্ত অশুয়োধে, গো-বাথানে কিঞ্চিৎ
হৃৎ পান করিয়াছিলেন। পরে উন্মাদের গতিতে গমনের পথে
অস্বাচক ভাবে একদিন চর্বন যোগ্য কিছু খাবার এবং অপর
একদিন সম্ভবতঃ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিশেষ কোন ভাগ্যবানের অশু-
য়োধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাবার জন্ত রঘুনাথের কোন অশুসন্ধান
বা চেষ্টাই ছিল না।

নীলাচলে গৌর-রঘুনাথ মধুর মিলন—

“দেখিয়া শ্রীমন্দির— (রঘুনাথের) নয়নে গলয়ে নীর
হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈশ্বরে ॥”

দূর হ'তে শ্রীমন্দির দেখে—	ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
প্রাণ গৌর তুমি কোথায় আছ—	ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
হা গৌর ব'লে কাঁদতে কাঁদতে—	(বলে) এইত এলাম নীলাচলে
নীলাচল-বাসী নরনারী—	এইত এলাম নীলাচলে
তোমাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি—	কাঁদতে কাঁদতে চলিল রে
কোথা গেলে তার দেখা পাব—	উপনীত সিংহ দ্বারে
	উপনীত সিংহ দ্বারে
	যারে দেখে শুধায় তারে
	যারে দেখে শুধায় তারে
	ব'লে দাও নীলাচল-বাসী
	ব'লে দাও নীলাচল-বাসী
	ব'লে দাও নীলাচল-বাসী

“যার রসে তনু চরচর গৌর-কিশোরবর
নাম যার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥”

যাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
সে যে আমাদের শচীসুত গুণধাম— যাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম এই নীলাচলে
আমরা ডাকি তারে শচীছলল ব'লে—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম এই নীলাচলে
কোথা আছে সে ন্যাসিরতন
কেঁদে কেঁদে রঘুনাথ শুধায়— কোথা আছে সে ন্যাসিরতন
গৌর-বরণ গেরুয়া পিধন— কোথা আছে সে ন্যাসিরতন
কোথা আছে দাও বলি
গৌর বরণ যুবা সন্ন্যাসী— কোথা আছে দাও বলি
আমি তার দরশনে অভিলাষী
গৌর-বরণ নবীন সন্ন্যাসী— আমি তার দরশনে অভিলাষী
ব'লে দাও গো দয়া করি
করজোড়ে মিনতি করি— ব'লে দাও গো দয়া করি

“হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ।

কহে মুঞি আকিঞ্চন ছুরাচার মন্দহীন
কাঁহা মুই রঘুনাথদাস ।

‘যাহার দর্শনমাত্র উলসিত সর্ব গাত্র
তাঁর পদরেণু মোর আশ ॥”

একি অসম্ভব কথা—

কোন্ গুণে তার দেখা পাব
মুই ছুরাচার মন্দহীন— কোন্ গুণে তার দেখা পাব

বামনের চাঁদ ধরিতে আশ্—

রঘুনাথদাস গোসাঞি—

জগন্নাথের সিংহদ্বারে—

প্রাণের রঘু ডাকে তারে—

রঘুনাথ কাদে সিংহদ্বারে—

টান পড়েছে প্রাণে প্রাণে—

স্বরূপ রামানন্দ সনে—

নিভৃত গন্তীরা-ভবনে—

স্বরূপ রামরায় বলে একি একি—

অকস্মাৎ এমন করে—

বডই ব্যাকুল প্রাণে—

জগন্নাথের সিংহদ্বার পানে—

কে টানে আমায় সিংহদ্বারে—

তৈছে মোর অভিলাষ

তৈছে মোর অভিলাষ

এত বলি গড়ি যায়

এত বলি গড়ি যায়

এত বলি গড়ি যায়

আর কি প্রভু রইতে পারে

আর কি প্রভু রইতে পারে

আর কি প্রভু রইতে পারে

আর কি প্রভু রইতে পারে

কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নিরুজনে

কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নিবুজনে

কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে ছিলেন নিরুজনে

অকস্মাৎ উঠিলেন চমকি

অকস্মাৎ উঠিলেন চমকি

কেন প্রভু চঞ্চল হ'লে

কেন প্রভু চঞ্চল হ'লে

প্রাণ গৌর বলেন মধুর স্বরে

প্রাণ গৌর বলেন মধুর স্বরে

কে টান্ছে আমায় প্রাণে প্রাণে

কে টান্ছে আমায় প্রাণে প্রাণে

আর ত রইতে নারি ঘরে

আর ত রইতে নারি ঘরে

অগ্নি উঠি চলিলেন গৌরহরি

অকস্মাৎ গমন দে'খে

স্বরূপ রামরায় ছুটলেন ছরা করে

প্রাণ গৌরহরির পিছে পিছে—স্বরূপ রামরায় ছুটলেন ছরা করে

রঘুনাথের আকর্ষণে

(গৌর) উপনীত সিংহদ্বারে

উপনীত সিংহদ্বারে

রঘুনাথ দেখলেন তাঁরে

রঘুনাথ নিজ পরাণ নাথে—

দূর হ'তে দেখতে পেয়ে

দূর হ'তে দেখতে পেয়ে

নয়নে দর্দব্ ধারে—

কৈদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে.

কৈদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

অভিমানে আকুল হয়ে—

কৈদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

এতদিনে দয়া হ'ল কি ব'লে—

কৈদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

এত দিনে মনে পড়েছে ব'লে--

কৈদে উঠলেন দ্বিগুণ বেগে

রঘুনাথের কাছে বাহু প্রসারি—

ছুটে গেলেন গৌবহরি

ছুটে গেলেন গৌবহরি

প্রেমে ছলছল ছুটি আঁখি—

ছুটে গেলেন গৌবহরি

গৌর যান আলিঙ্গিতে

ভাসি ছুঁটি নয়ন ধারে—

রঘুনাথ বলেন কাতরে

রঘুনাথ বলেন কাতরে

আমি অস্পৃশ্য বিষয়ী-সেবী—

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

আমি তোমা-স্পর্শের যোগ্য নই—

আমায় তুমি ছুঁয়ো না প্রভু

দৈন্য-ভ্রুশনে বিভূষিত

দৈন্য-ভ্রুশনে বিভূষিত

প্রাণ গৌর-গণ যত—

দৈন্য-ভ্রুশনে বিভূষিত

এ দৈন্যে কৃষ্ণ বশ—

এ দৈন্য আর কোথায় আছে ?

আমরা গৌর গৌরবে বলতে পারি—

এ দৈন্য আর কোথায় আছে ?

গৌর-গণ বিনে এ জগতে—

এ দৈন্য আর কোথায় আছে ?

মানিলেন না শচীনন্দন

রঘুনাথের কোন বারণ—

এস আমার রঘু ব'লে—

দৈন্য সম্বরণ করে ব'লে—

ও আমার প্রাণের রঘু—

তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন—

কৃপাশক্তি সঞ্চারিয়ে—

যাঁর প্রাণ তাঁকে দিয়ে, রঘুনাথ স্থির হ'লেন ।

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়)

মানিলেন না শচীনন্দন

বাহু পশারি নিলেন কোলে

বাহু পশারি নিলেন কোলে

বাহু পশারি নিলেন কোলে

কর দৈন্য সম্বরণ

কর দৈন্য সম্বরণ

কর দৈন্য সম্বরণ

রঘুনাথে স্থির কৈলেন

রঘুনাথে স্থির কৈলেন

রঘুনাথ স্থির হলেন

— — —

রঘুনাথের নীলাচল বিহার—

* শকাব্দ ১৪৪০ হইতে ১৪৫৫ পর্য্যন্ত

“ষোড়শ বৎসর কৈল ‘অস্তুরজ সেবন’ ।
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥”

—চৈঃ চঃ আদি ১০ম

আর, গোড়ীয় ভক্তবৃন্দ—

‘বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি’

* দাক্ষিণাত্যে শালিবাহন নামে একজন পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন । তিনি ‘শক’ নামক একটি প্রবল জাতিকে যুদ্ধে জয় করেন । ঐ সময় হইতে প্রচলিত বৎসরের নাম শকাব্দ । সৌর বর্ষারম্ভে শকাব্দ বর্ষ আরম্ভ হয় ।

ষষ্ঠ উরঙ্গ

স্বরূপের পুত্র ও ভৃত্যরূপে :

'রঘুনাথ' গম্ভীরার-গুপ্তনিধি-গৌরহরির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুও তাঁহাকে নিজ জন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 'রঘু' এখন মহাপ্রভুর নিজ বস্তু। রঘুনাথ স্থির হইলে পর গৌরহরি তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—

'এই রঘুনাথে আমি সঁপিছু তোমারে ;
'পুত্র' 'ভৃত্য' রূপে ইহায় কর অঙ্গীকারে ।'

'এত কহি রঘুনাথের হস্তে ধরিল ;
স্বরূপের হস্তে তারে সমর্পণ কৈল ।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

স্বরূপ-দামোদর সন্ন্যাসী। সচল-জগন্নাথ গৌরহরি তাঁহার রঘুনাথকে অর্পণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন—

“ 'পুত্র' ও 'ভৃত্য' রূপে ইহাকে অঙ্গীকার কর”

সেইদিন হ'তে রঘুনাথে—

ও স্বরূপের রঘু বলে—

আদর ক'রে ডাক্তেন প্রভু

আদর ক'রে ডাক্তেন প্রভু

আদর ক'রে ডাক্তেন প্রভু

(শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়)

অযাচক বৃত্তিতে :

ভক্তবৎসল গৌরহরি গোবিন্দকে বলিলেন—

‘পথে ইহঁা করিয়াছে বহুত লজ্বন ;
কত দিন কর ইঁহার ভাল সন্তুর্পণ ।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

‘রঘুনাথ’ গৌরহরির (উপরোক্ত) স্নেহ বাৎসল্যে পূর্ণ হৃদয় হইয়া প্রথম পাঁচ দিন গোবিন্দের দেওয়া গৌরহরির ‘অধরামৃত’ গ্রহণ করিলেন । তাহার পরই তিনি বিচার করিলেন যে নিজের দক্ষ উদর পূতির জন্য পরম-দুর্লভ গৌর-পরিকরদের শ্রম ও সময় আমার জন্য নষ্ট হইতেছে । তাই ষষ্ঠ দিন হইতে তিনি সিংহদ্বারে রাত্রি দশ দণ্ডের পর নিষ্কিঞ্চন অযাচক বৃত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিতেন ।

সে সময়ে প্রথা ছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকগণ রাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমনের সময় সিংহদ্বারে কোন নিষ্কিঞ্চন অযাচক দেখিলেই, তাঁহাকে মহাপ্রসাদের ভিক্ষা দিতেন । রঘুনাথ দিবা বাত্র ছাযার ন্যায় স্বরূপের অনুগমন করিতেন । কেবল রাত্রি দশ দণ্ড কালে স্বরূপের কৃপাদেশ গ্রহণ করিয়া সিংহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেন । অযাচক থাকিয়া জগন্নাথ সেবকদের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ যাহা পাইতেন তাহা কাশী মিশ্রালয়বাসী ‘সচল জগন্নাথ গৌরহরি’কে নিবেদনপূর্বক স্বরূপের অনুমতি গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন ।

“মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ;
যাহা দেখি শ্রীত হয় গৌর-ভগবান ।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

(ভগবানের ছয়টি ঐশ্বর্য্য । তাহাদের মধ্যে ‘বৈরাগ্য’ও একটি ঐশ্বর্য্য । বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যটি অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের মুকুটমণি ।)

স্বাভাবিক শ্রীতিতে গৌরহরি একদিন গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“রঘুনাথ এখানে প্রসাদ পায় না ?”

গোবিন্দ উত্তর করিলেন—

“রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া অবাচক বৃত্তিতে যাহা পান তাহাই গ্রহণ করেন।”

একদিন ঠাকুর হরিদাসের আবাসেও (পুরীধামে সিদ্ধ-বকুল তলে) সনাতন গোস্বামীকে গৌরহরি বলিয়াছেন—

“তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন।

এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন ॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

(সনাতন। তোমার এই দেহ দ্বারা আমি অনেক কাজ করাইব। আমি অনেক সঙ্কল্প করিয়াছি ; সে সকল সঙ্কল্প সিদ্ধির পক্ষে তোমার দেহই আমার সর্বপ্রধান উপায়।)

গৌরহরির এই আন্তরিক অভিপ্রায় রঘুনাথের প্রতিও প্রযোজ্য। রঘুনাথের সিংহদ্বারে অবাচক বৃত্তি দেখিয়া তিনি সর্ব জীবন জগুই উপদেশ দিলেন—

“বৈরাগীর ধর্ম্য সদা নাম সঙ্কীৰ্তন ;

মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ।

বৈরাগী হইয়া যেন করে পরাপেক্ষা ;

কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা

বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস ,

পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ।

‘বৈরাগীর কৃত্য সदा ‘নাম সঙ্কীৰ্ত্তন’ ;
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

গৌরহরি বলিলেন—

বৈরাগীর ‘ধৰ্ম্ম’

‘সদা নাম সঙ্কীৰ্ত্তন’

বৈরাগীর ‘কৃত্য’

‘সদা নাম সঙ্কীৰ্ত্তন’

(তাৎপর্য্য : কলিজীবের ও কলিযুগের ‘সাধ্য’ ও ‘সার্থনের’
মুখ্য কৃত্য ও মুখ্য ধৰ্ম্ম ‘নাম সঙ্কীৰ্ত্তন’ । নিজ নিজ ‘ইষ্টের’ সুখ-
তাৎপর্য্য-ময় স্বভাব লাভের বাধক—পরাপেক্ষা, জিহ্বার লালসা,
প্রভৃতি সবকিছুই নাম সঙ্কীৰ্ত্তন অবলম্বন করিলে সমূলে দূর হইবে ।)

স্কন্ধ পুরাণে পাওয়া যায়—

“দানব্রততপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যা স্থিতাঃ,
রাজসুয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানশ্রাধ্যাত্মবস্তনঃ ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সৰ্ব্বপাপহরাঃ শুভা,
আকৃষ্টা হরিণা সৰ্ব্বা স্থাপিতাঃ শ্বেষু নামষু ।”

এবং—

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও তাঁহার বিবচিত “বৃহদাগবতামৃত”
গ্রন্থে বলিয়াছেন—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারেঃ—
বিরমিতনিজধৰ্ম্মাধ্যানপূজাদি যত্নম্ ।
কথমপি সক্রদাত্তং মুক্তিদং প্রাগিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

আবার, বিংশ-শতাব্দীর সঙ্কীৰ্ত্তন যজ্ঞের নব উদগাতা শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় “নাম সঙ্কীৰ্ত্তন”কে ‘লালন’ ‘পালন’ পূর্বক ‘বিশ্ব-জন-মনে নাম সঙ্কীৰ্ত্তনের অপূর্ব প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভাগ্যবান পাঠক ও ভাগ্যবতী পাঠিকাবৃন্দের আনন্দ বর্ধনের জন্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল :

শ্রীনাম সাধনার সূত্র সংক্ষেপ :

জপ,—হবে কৃষ্ণ হরে রাম
ওরে ভাই বে,এই ত’ কলিযুগেব মূলমন্ত্র—জপ, হবে কৃষ্ণ হরে রাম
ঘোব-কলিযুগে, এই ত’ পবিত্রাণেব মূলমন্ত্র--জপ, হবে কৃষ্ণ হবে রাম
কলি—যুগোচিত এই নাম-ধর্ম
এ যে, বেদেব নিগূঢ় মর্ম— কলি— যুগোচিত এই নাম

শ্রীনামের চিন্ময় অবয়ব :

আ’মবি—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—অভেদ নাম নামী
‘আ’মবি—নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ—
চৈতন্য বস-বিগ্রহ-নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ
‘অভেদ নাম নামী’—
এ নাম, অখিল বসের ধাম— জপ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম
—এই, নাম বই আর সাধন নাই রে

শ্রীনামের প্রভাব :

মধুর হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তনে—পাপ হরে আর তাপ হরে |
পাপ-তাপ সব পলায় দূরে |

যদি কেহ, নাম ব'ল্ব মনে করে আগেই তার, পাপভম সব পলায় দূরে
সূর্যোদয়ের পূর্বে, অন্ধকার-রাশির মত আগেই তার, পাপ-তাপ-সব

পলায় দূরে

চিত্ত দর্পণ মার্জন করে

অনাদিকালের, ছর্ব্বাসনা-মালিছ-পূর্ণ চিত্ত-দর্পণ মার্জন করে

চিত্ত দর্পণের সম্মার্জনী

মধুর-হরিনাম-সঙ্কীর্তন—

চিত্তদর্পণের সম্মার্জনী

চিত্ত দর্পণ মার্জন করে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

প্রাকৃত, ভোগ-বাসনা হ'তে তুলে ল'য়ে—

শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

কায়মনোবাক্য দ্বারায়—

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্ব-সাধন-শক্তি দিয়ে—

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

‘সর্ব-সাধন শক্তি দিয়ে’—

শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন-সর্ব-সাধন শক্তি দিয়ে

শ্রীকৃষ্ণ-অনুশীলন করায়

সর্বাত্মাকে স্নিগ্ধ কবে

প্রেমামৃত-সিঞ্চন ক'রে—

সর্বাত্মাকে স্নিগ্ধ কবে

ভাব-ভূষণে ভূষিত করে

কম্প-অশ্রু পুলকাদি—

ভাব-ভূষণে ভূষিত কবে

এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে

দারুণ, সংসার-বন্ধনের একমাত্র কারণ—

এই, দেহাভিমান যায় রে দূবে

এই প্রাকৃত,— দেহাভিমান ঘুচায়ে দেয় রে

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

এক শক্তিমান্ আর সকলি শক্তি—

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

একা, পুরুষ 'কৃষ্ণ' আর সব প্রকৃতি—

এই তত্ত্ব জাগায়ে দেয় রে

ধরনীতে নাম মূর্তির প্রকাশ :

‘প্রচারিতে এই নাম ধর্ম

স্বমাধুর্য্য আশ্বাদিতে—

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

প্রচারিতে নিজ নাম-মহিমা—

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

‘প্রচারিতে নিজ-নাম-মহিমা’—

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

আশ্বাদিতে নিজ-মাধুর্য্য-সীমা—প্রচারিতে-নিজ-নাম মহিমা

শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ

আ’মরি—হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—কোনকালে কেউ পায় নাই—হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—‘চিরকালের অনর্পিত’— হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—‘গোলকে গোপনে ছিল’— হইল সেই করুণার বিকাশ

যে করুণা—‘ব্রহ্মাদির অনুভব ছিল না’— হইল সেই করুণার বিকাশ

কোটি কল্প—‘কঠোর সাধনেও কেউ যার সন্ধান পায় না—

হইল সেই করুণার বিকাশ

আ’মরি—কলিকাতাবের সৌভাগ্য বশে— হইল সেই করুণার বিকাশ

করুণার-বারিধি শ্রীগোবিন্দ—

মনে মনে বিচার করিলেন

আমি—“চিরকাল নাহি কবি প্রেমভক্তি দান !” রে

আমি ভুক্তি, মুক্তি দিয়েছি বটে

অষ্ট প্রকার সিদ্ধিও দিয়েছি

চতুর্বিধা মুক্তিও দিয়েছি
 জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি
 যথা যোগ্য সাধন ফলে—
 জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিও দিয়েছি
 কিন্তু,— সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
 যে ভক্তি আমায়,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধে—
 সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই,
 যে ভক্তি আমায়,—পুত্র, সখা, প্রাণপতি করে—
 সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
 যে ভক্তি আমায়,—বশ ক'রে অধীন করে—
 সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
 আমায়—বশ ক'রে অধীন করে—
 আমার—ঈশ্বর অভিমান ঘুচাইয়ে—
 আমায়, বশ ক'রে অধীন করে
 সে ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই

“মাতা যৈছে পুত্র ভাবে করেন পালন।” রে !
 অতি হীন জ্ঞানে করেন তাড়ন ভৎসন ॥ রে !!
 সখা শুদ্ধ সংখ্য করে কক্ষে আরোহণ। রে !

বলে—তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম ॥ রে ! রে !!

আপনাকে বড় মানে আমায় সম হীন। রে !
 তার প্রেমে বশ আমি হই ত' অধীন ॥ রে ! রে !!

আমি,—এ ভক্তি ত' কা'কেও দেই নাই
 আমি—চিরকাল নাহি করি (এই) প্রেমভক্তি দান। রে !
 এই—ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ রে ! রে !!

জীব,—কখনও স্থির হতে নারে
 ষতই সাধন করুক না কেন— জীব, কখনও স্থির হতে নারে

অহৈতুকি ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

প্রেম-লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হতে নারে

আমি,—যারে তারে যেচে দিব

অহৈতুকী ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

প্রেম-লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

ব্রজ-জাতীয়, সম্বন্ধ ভক্তির আশ্রয় না পেলে—

জীব, কখনও স্থির হ'তে নারে

আমি, যারে তারে যেচে দিব

এই, প্রতিজ্ঞা করিলেন শ্রীগোবিন্দ—

“আমি,—যারে তারে যেচে দিব

আজ, তাই হরি ব্রজবিহারী, শ্রীনবদ্বীপে অবতরি,

নাম ধরি গৌরহরি”

নাম ধরি গৌরহরি

শ্রীরাধাভাব কাস্তি ধরি—নাম ধরি গৌরহরি

আপনি যেচে বলে দিয়েছেন

বল,—“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

বল,—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

ধর,—পর হরিনামের মালা

ওরে, ও কলিহত জীব—

ধর,—পর হরিনামের মালা

দূরে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা—

ধর,—পর হরিনামের মালা

আ' মরি কি করুণা রে

করুণার বালাই ল'য়ে মরে যাই—

আ' মরি কি করুণা রে

আজ, আপনি যেচে বলে দিয়েছেন

আপনার প্রাপ্তির উপায়— আজ, আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন
আপনাকে,—বশ ক'রে অধীন করার উপায়—

আজ, আপনি যেচে ব'লে দিচ্ছেন

‘নিজ গুণে গাঁথি নাম চিন্তামণি,

জগজনে পরাওল হার ॥ রে !

আরে, কলি-তিমিরাকুল অখিল লোক দেখি

বদন চাঁদ পরকাশ । রে ! রে !

বদন চাঁদের প্রকাশ ক'রলেন

কলিঘোর,—তিমিরে জগৎ আচ্ছন্ন দেখে—

বদন চাঁদের প্রকাশ করলেন

আরে,—‘কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন

ধরম করম গেল দূর । রে !

অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,

আমার,—গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥’ রে !!

আরে,—“কলি ঘোর পাপাচ্ছন্ন অন্ধকারময় । রে !

পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ।” রে ! রে !!

আবার,—“লোচনে প্রেম সুধারস বরিষণে,

জগজন তাপ বিনাশ ।” রে !

কলিহত পতিত জীবের—

গোবিন্দ গৌরাঙ্গ হয়ে—

জগবাসী নর-নারীর—

সকল তাপ দূর করিলেন

সকল তাপ দূর করিলেন

সকল তাপ দূর করিলেন

সকল তাপ দূর করিলেন

‘ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব । রে ।

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা জীব ॥’ রে ! রে !

তুই রূপে করেন কৃপা

‘অন্তর্যামী’ আর ‘ভক্তশ্রেষ্ঠ’—

তুই রূপে করেন কৃপা

অন্তর্যামী রূপে করেন প্রেরণা

গুরু-রূপে জানান উপাসনা—

অন্তর্যামী রূপে করেন প্রেরণা

আরে,—“মহৎ কৃপা বিনে কোন কার্য সিদ্ধ নয় । রে !

কৃষ্ণ কৃপা দূরে রহে সংসার না হয় ক্ষয় ॥” রে !

তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই

শ্রীগুরু পদাশ্রয় বিনা ভাই— তাপ জুড়াবার আর উপায় নাই

গুরু মৃত্তিতে ভূরি দান :

কেউ,— শুনেছ কি কোন কালেতে

আ’ মরি কি আত্মদান

যাই রে দানের বলিহারি

কি ব’লব করুণার কথা

যে,— বিষয়-বিষ পীতে ছিল

তারে,— নাম-অমিয়া পিয়াইল

যে, বিষয়-বিষ পীতে ছিল—

তারে,— নাম-অমিয়া পিয়াইল

বিষয় বিষ-ভাণ্ড কেড়ে ল’য়ে—

তারে,— নাম-অমিয়া পিয়াইল

বিষয়-বিষ-ভাণ্ড কেড়ে ল’য়ে—

আয় বলে, বাছ পশারিয়ে হিয়ায় ধ'রে—

বিষয়-বিষ-ভাণ্ড কেড়ে লয়ে

নিজ—সেবায় লুকু কৈল

যে রিপু সেবায় মত্ত ছিল—

তারে—নিজ সেবায় লুকু কৈল

তারে,—দিল নিজ সেবা অধিকার

মাযার,—লাগি খাওয়া স্বভাব যাব—

তারে—দিল নিজ সেবা অধিকার

নাম গ্রহণে শ্রীগুরু উপদেশ :

‘খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয়। বে।

ইথে,—কাল দেশ নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়।’ রে।

হেলায় শ্রদ্ধায় নিলে নাম—

আ' মরি—পূরে ভাই মনস্কাম

আ' মরি—পূরে ভাই মনস্কাম

স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

পরিপূর্ণ কৃষ্ণভোগের—

স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

নামে, বুক ভ'রে যায় অভাব মিটায়—স্বভাব জাগায়ে দেয় রে সুখে

প্রতিশ্রুতি দান :

অপরূপ,—নাম সঙ্কীর্ণনের মহিমা

“নাম সঙ্কীর্ণন হইতে পাপ সংসার নাশন। রে!

চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম ॥ রে ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদগম প্রেমামৃত আশ্বাদন । রে !

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥ রে ॥

মধুর হরিনাম সঙ্কীৰ্তন—

চিত্তশুদ্ধি করবার তরে—

হরি, নাম সঙ্কীৰ্তনের মত—

মধুর—হরিনাম সঙ্কীৰ্তনে—

ভুক্তি-মুক্তি বাসনা রূপ—

চিত্তদৰ্পণের সম্মার্জনী

চিত্তদৰ্পণের সম্মার্জনী

এমন উপায় আর নাই ভাই,

এমন উপায় আর নাই ভাই

এমন উপায় আর নাই ভাই

চিত্তদৰ্পণ মার্জন করে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

অজ্ঞানতা যায় রে দূরে

শাস্ত্র প্রসঙ্গে শ্রীগুরু উপদেশ :

‘কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম রে !

সেই হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম ॥ রে ॥

অজ্ঞানতমের নাম कहিয়ে কৈতব ।’ রে !

কৈতব ব’লতে কপটতা

‘অজ্ঞান তমের নাম कहিয়ে কৈতব । রে ।

ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥’ রে ॥

ইহাকেই বলে অজ্ঞানতা

কৃষ্ণ ভ’জে চতুর্বর্গ বাসনা— ইহাকে বলে অজ্ঞানতা

‘তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান । রে !

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ।’ রে ॥

শুদ্ধা সাধ্বী ভকতি দেবী—

ভুক্তি মুক্তি বাসনা থাকতে—

মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ণনে—

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক---

এই ভুবন মঙ্গল নাম গানে—

শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিব অনুকূল—

পরিপূর্ণ, কৃষ্ণ প্রাপ্তিব অনুকূল-

যত বহিস্মুখ চিত্তবৃত্তি—

প্রাকৃত, ভোগ বাসনা হ’তে তুলে ল’য়ে—

কায় মনো বাক্য দ্বারায়—

সর্ব সাধন শক্তি দিয়ে—

শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ণন —

সর্ব বিচার জীবন শক্তি নাম—

মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ণন--

সে হৃদয়ে কখনও যান না

সে হৃদয়ে কখনও যান না

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয় না

ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে

ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে

ত্রিতাপ জ্বালা যায় রে দূরে

সর্ব অমঙ্গল হবে

সর্ব অমঙ্গল হবে

সকল মঙ্গল উদয় কবে

সকল মঙ্গল উদয় কবে

সকল মঙ্গল উদয় কবে

শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণপদে উন্মুখ করে

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

সর্ব সাধন শক্তি দিয়ে

শ্রীকৃষ্ণ অনুশীলন করায়

সর্ব সাধন শক্তি দিয়ে

সর্বাত্মাবে স্নিগ্ধ করে

সর্বাত্মাবে স্নিগ্ধ করে

প্রেমামৃত সিঞ্চন করে—

সর্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে—

কম্প অশ্রু পুলকাদি—

সর্বাত্মাকে স্নিগ্ধ করে

ভাব ভূষে। ভূষিত করে

ভাব ভূষণে ভূষিত করে

ভাব ভূষণে ভূষিত কবে

গোপী, ভাবামৃতে লুক করে

শ্রীনামের বীৰ্য্যশক্তি :

কর্ম-যোগ-জ্ঞান-সাধন ফলে—

মহামন্ত্র—মহাশুর তাই—

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন—

এই বত্রিশ অক্ষর ষোল নাম—

এ যে, ব্রজলীলা রস-ধাম—

কারুণ্য তারুণ্য লাবণ্যামৃত ধাম—

ব্রজলীলা রসের উপাদান—

মহামন্ত্র মহাশুর

তাইতে বলি মহাশুর

পূর্ব পূর্ব যুগে

যে ধনের পায় নাই সন্ধান

যে ধনের পায় নাই সন্ধান

অনায়াসে করেন দান

অনায়াসে করেন দান

অনায়াসে করেন দান

শ্রীকৃষ্ণ লীলা-রস-ধাম

শ্রীকৃষ্ণ লীলা-রস-ধাম

তাই, মহামন্ত্র এত শক্তিমান

তাই মহামন্ত্র এত শক্তিমান

অপরূপ এ নাম রহস্য

এ নাম, যুগল বিলাস ধাম

এ নাম, যুগল বিলাস ধাম

এই, নামেই করেন অবস্থান

এই, নামেই করেন অবস্থান

শ্রীনামের দ্বিতীয় লীলা মূর্তি :

‘হরে কৃষ্ণ’ নাম নিজ স্বরূপ—

মহা,—রাস বিলাসের পরিণতি—

রাই কানু একাকৃতি—

মূর্তি অদভূত—

ভানুসুতা মণ্ডিত নন্দসুত---

মূর্তিমন্ত প্রেমবৈচিত্র—

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ—

‘হরে কৃষ্ণ’ নাম নিজ স্বরূপ--

পরাণ গৌরাক্ষ দেখায়
 পরাণ গৌরাক্ষ দেখায়
 দেখায় প্রাণের গৌর-মূর্তি
 দেখায় প্রাণের গৌর-মূর্তি
 দেখায় প্রাণের গৌর-মূর্তি
 দেখায় প্রাণের শচীসুত
 দেখায় প্রাণের শচীসুত
 দেখায় প্রাণের শচীসুত
 দেখায় প্রাণের শচীসুত
 দেখায় মধুর গৌরদেহ
 দেখায় মধুর গৌরদেহ
 দেখায় চিতচোরা গোরা
 দেখায় চিতচোরা গোরা

নামের লীলা মূর্তির প্রাপ্ত-লোভ জাগলে :

যুগলের সুখদাত্রী

নিগম নিগূঢ় শ্রীচৈতন্যের

সেই আশা পুরাইতে
 যোগমায়া লীলা শক্তি
 যোগমায়া লীলা শক্তি
 অভিন্ন স্বরূপের করিলেন প্রকাশ
 অভিন্ন স্বরূপ কে বল ভাই
 অভিন্ন স্বরূপ কে বল ভাই
 ব’লেছেন ব’সে পানিহাটিতে

নিগম নিগূঢ় শ্রীচৈতন্য আমার	ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে
মহা মহা উল্লাসেতে	ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে
অভিন্ন স্বরূপের কথা	ব'লেছেন ব'সে পানিহাটিতে

“(শুন) শুন রাঘব তোমায় আমি নিজ গোপ্য কই। হে!
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥” হে !!

প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরসুন্দর	এক আত্মা ছই কলেবর
রাঘবের করে ধরি	এক আত্মা ছই কলেবর
নিজ গূঢ় মরম কথা	আবেশে বলেন গৌবহরি
	আবেশে বলেন গৌরহরি

‘এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমাবে।

সেই করি আমি এই বলিল তোমানে ॥’

যেমন নাচায় তেমনি নাচি	আমি, নিতাইচাঁদের খেলার পুতুল
	আমি, নিতাইচাঁদের খেলার পুতুল

রহো লীলার নব যুগল :

রাই কানু মিলিত গোরার	অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ
	অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ
	গোদাবরী তীরে রামরায় দেখে
এই ‘রসরাজ’ ‘মহাভাব’ প্রত্যক্ষে,	গোদাবরী তীরে রামরায় দেখে
	রামরায় মূরছিত
দেখি নিতাই গোর জড়িত	রামরায় মূরছিত

দেখি, নিতাই গৌর আলিঙ্গিত
দেখি, নিতাই গৌর বিলসিত

রামরায় মূরছিত
রামরায় মূরছিত

নব যুগল মূর্তি'র প্রমাণ প্রসঙ্গ :

“সর্কোপরি তত্ত্ব নিতাই গৌরাজ স্বরূপ ।
রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ ॥

যা' দেখি রায় রামানন্দ মূরছিত ।

দেখি নিতাই রমণ গৌরা

রাম রায় পড়ল ধরা

রাম রায় পড়ল ধরা

রাম রায় মূরছিত

শ্রীনাম লীলার নব যুগল মূর্তি'র প্রসঙ্গ :

শ্রীগুরু চরণে দিয়ে মাথা
নরহরির চিতচোরা

অনুশীলনে গৌর রহস্য ভাগের তরে

ঐ মূর্তি হৃদে ধর সদা

ঐ মূর্তি হৃদে ধর সদা

প্রাণ ভ'রে গান কর

প্রাণ ভ'রে গান কর

রহস্যের উৎপত্তি তথায়

ব্রজ, নিকুঞ্জ বিহারে প্রবেশ না হলে

নদীয়া বিহার বুঝা যায় না

যে যুগল বিলাস বুঝবে

‘বিলাস-বিবর্তে-বিলাস রঙ্গ—

তার, ভোগ ক'রতে সাধ হবে

ব্রজে যা' পায় নাই তা'—

তার, ভোগ ক'রতে সাধ হবে

তার, ভোগ করতে সাধ হবে

তার, নদীয়া লীলায় লোভ হবে

সে ভোগে যখন সাধ জাগে

তখন আস্তে হয় নদীয়াতে

তখন আস্তে হয় নদীয়াতে

গৌরগণের আনুগত্যে—

আমার, চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গ

বিবর্তে-বিরহ-রঙ্গ আমার

চিতচোর প্রাণ গৌরাঙ্গ

শ্রীনামের রহোলীলার মর্শ্বকথা :

পরম করুণ শ্রীগুরুদেব
অহৈতুকী কৃপা স্বভাবে
সাধ্য সাধন নির্ণয় করা

দয়া ক'রে দিলেন এই নাম
দয়া ক'রে দিলেন এই নাম
দয়া ক'রে দিলেন এই নাম
দয়া ক'রে দিলেন এই নাম
সাধ্য সাধন নির্ণয় করা

সাধ্য—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম

সাধন—হরে কৃষ্ণ হরে রাম

সাধ্য-সাধন-নির্ণয় করা নাম

আবার—অতিগূঢ় রহস্য আছে এই নামে

আশ্রয় জাতীয় সাধন ক্রমে—

আবার—অতিগূঢ় রহস্য আছে এই নামে

নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়

তাই, আগে নিতাই পিছে গৌর

নিতাই আশ্রয়, গৌর বিষয়

শ্রীসেবা বিগ্রহ নিতাই আমার
হৃদয়ে গৌর উদয় হয়ে
গৌর স্বরূপের এই ত' স্বভাব

গৌর, হৃদয়ে উদয় হ'য়ে গুণে কাঁদায়ে

আমার, গৌরগুণে বুঝে বুঝে

আমার, গৌরগুণে কাঁদা বিনে, দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

গৌর গুণে যে বা বুঝে

'হরে কৃষ্ণ রাম' নাম

ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
ভূমি প্রস্তুত ক'রে দেয় রে
নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়
নিশিদিশি গুণেতে কাঁদায়
প্রাকৃত ভোগ বাসনা ঘুচায়

প্রাকৃত ভোগ বাসনা ঘুচায়
এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে

এই, দেহাভিমান যায় রে দূরে
আর কোন উপায় নাই রে

দেহাভিমান যায় না কোন সাধনে

ব'লেছেন ঠাকুর নরোত্তম
নিত্যলীলা তারে স্মরে
নিত্যলীলা তারে স্মরে

যদি ভোগ ক'রতে চাও
নিশিদিশি জপ কর
নিশিদিশি জপ কর

শ্রীনামের গৌরঙ্গ লীলা :

দেখে, আবির্ভাব এক সোনার মুরতি
মহারাস বিলাসের পরিণতি

সে যে আমার গৌর মুরতি
সে যে আমার গৌর মুরতি
সে যে আমার গৌর মুরতি

রাই কাহ্নু একাকৃতি
 'হরে কৃষ্ণ' নামের স্বরূপ
 রাই সম্পূটে বংশীধারী
 রাই কিশোরী ঢাকা বংশীধারী

মহাভাব প্রেম রস বারিধি

মূরতি অদভূত
 ভানুসুতা মণ্ডিত নন্দসুত
 মূরতিমন্ত প্রেমবৈচিত্ত

পরস্পর বুকু ধ'রে হারাই হারাই

নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ

পরস্পর, বুকু ধ'রে আত্মহারা

রাই কাহ্নু, কাহ্নু রাই
 রমণী রমণ, রমণ রমণী

কিশোরী কিশোর, কিশোর কিশোরী

মহাভাব রসরাজ, রসরাজ মহাভাব

সে যে আমার গৌর মূরতি
 দেখে প্রাণের গৌরহরি
 দেখে প্রাণের গৌরহরি
 দেখে প্রাণের গৌরহরি

দেখে গৌর গুণনিধি

দেখে গৌর গুণনিধি

দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের শচীসুত

দেখে প্রাণের নদের নিমাই

দেখে প্রাণের নদের নিমাই

দেখে মধুর গৌর দেহ

দেখে মধুর গৌর দেহ

দেখে চিতচোরা 'গোরা'

দেখে চিতচোরা 'গোরা'

শুধু কেবল তাই নয়

দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা

দেখে, বিরুদ্ধ স্বভাবে মাতোয়ারা

'বিলাস বিবর্ত্ত রূপ

দেখে, নিগম নিগূঢ় গৌর রূপ
দেখে, নিগম নিগূঢ় গৌর রূপ

স্বকপের সঙ্গেই ধামেব প্রকাশ
শ্রীযমুনা শুবধনী

গৌর মুরতি দেখেই
ব্রজ দেখে নদীয়া
ব্রজ দেখে নদীয়া
ব্রজ দেখে নদীয়া

শ্রীবাস মণ্ডল শ্রীবাস অঙ্গন

শ্রীবাস মণ্ডল শ্রীবাস অঙ্গন
তার, মাঝে নাচে শচীনন্দন
তার, মাঝে নাচে শচীনন্দন
চারিদিকে ঘিরে নাচে
চারিদিকে ঘিরে নাচে

পারিষদ সব গোপীগণ

নিগূঢ় গৌরাজ্ঞ লীলার

অপরূপ রহস্য ভাই
অপরূপ রহস্য ভাই

সখা সখী মিলিত

গৌর পরিকর যত
গৌর পরিকর যত

নিগূঢ় গৌরাজ্ঞ লীলা

এ যে, আশ মিটান লীলা রে
এ যে, আশ মিটান লীলা রে

সখা সখী সঙ্গে যুগল বিশোরেব

সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল
সকলের সাধ পূর্ণ হ'ল

রাধা ভাব কান্তি ধ'রে

শ্যামেব বাসনা পূর্ণ হ'ল
স্বমাধুরী আশ্বাদিল
স্বমাধুরী আশ্বাদিল

রাইএরও বাসনা পূর্ণ হ'ল
আমাদের কিশোরীর মনে সাধ ছিল

“নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশে।”

সদাই তোমা ল'য়ে ফিরিতাম

রসময়ের গঠন পেয়ে

পরাণ বঁধু বুক ধ'রে

শচীভুলালে হেরি

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম

যদি পুরুষাকৃতি পেতাম

আজ সেই সাধ মিটিল

আজ সেই সাধ মিটিল

দেশে দেশে ফিরে গো

দেশে দেশে ফিরে গো

সবাই বলে গৌরহরি

সবাই বলে গৌরহরি

শ্রীনাথের নদীয়া লীলায় নব যুগল বিগ্রহের নব লীলা

সবাই বলে গৌরহরি

তা-তো নয় তা-তো নয়

ও যে আমাদের প্রাণ কিশোবী

ফিরছে বঁধুকে বুক ধরি'

ফিরছে বঁধুকে বুক ধরি'

আর কেউ লখিতে নাচ্ছে

বঁধুর বিরহ সহিতে নারি

বঁধুকে বুকে ধ'রে বেড়াইছে

বুকে রেখে উপরে খেবে

.....

.....

.....

.....

.....

.....

আর কেউ লখিতে নাচ্ছে

বড় সাধে বেড়াইছে

বড় সাধে বেড়াইছে

যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল

যুগলের সাধ পূর্ণ হ'ল

বলদেবেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

বড়ই বাধা ছিল

বড়ই বাধা ছিল

তার কেবল সম্বন্ধ বাধা

তার কেবল সম্বন্ধ বাধা

সকলই ত' বলাই আমার

সকলই ত' বলাই আমার

যোগপীঠ বলাই আমার

পুষ্প শয্যা বলাই আমার

এ দিকে কোন বাধা নাই

কেবল সম্বন্ধ বাধা

কেবল সম্বন্ধ বাধা

বলরামের সাধ উঠিল

বলরামের সাধ উঠিল

কি করে সাধ পূর্ণ হবে

মনে মনে ভাবিল

আমারই ত' স্বরূপ বটে

অন্তরঙ্গ সেবা করে

যুগলকিশোরের

অনঙ্গমঞ্জরীতে

শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপে

অনঙ্গের ভাব কান্তি নিল

অস্তুরঙ্গ সেবা করে

আমি ত' প্রবেশ ক'রব

আমি ত' প্রবেশ ক'রব

বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

বলাইএর সাধ পূর্ণ হ'ল

অনঙ্গেরও বাসনা পূর্ণ হ'ল

শ্রীনাম মূর্তির নীলাচল লীলা

জগ, জীবের স্বরূপ করি' প্রকাশে

গোরাঙ্গ স্বরূপে

একলা, পুরুষ কৃষ্ণ আর সব প্রকৃতি

নিরপেক্ষ শক্তি যে

যদি নিরপেক্ষ শক্তি থাকে

এক মাত্র পুরুষ জগতে

বিলাসী গোরা সুখে বিলসে

বিলসে সঙ্কীর্ণ মহারাসে

বিলসে সঙ্কীর্ণ মহারাসে

জগন্নাথ নাম পূর্ণ হ'ল

জগন্নাথ নাম পূর্ণ হ'ল

সেই কথা সার্থক হ'ল

সেই কথা সার্থক হ'ল

পুরুষ শব্দ বাচ্য সে

পুরুষ শব্দ বাচ্য সে

সেই ত' নন্দভূলাল বটে

সেই ত' নন্দভূলাল বটে

সেই ত' নন্দভূলাল বটে

পুরুষ শব্দ বাচ্য হয়

এক কৃষ্ণ শক্তিমান—

এতদিন কেবল কথায় ছিল—

গোপীভাব জাগায়ে দিয়ে—

সঙ্কীৰ্ত্তন রাস রঙ্গে—

দর্শন স্পর্শন আলিঙ্গনে—

এম্নি, মধুর গৌর নাগরালি—

বথাগ্রে গৌরেন কীৰ্ত্তন রঙ্গ-

বথাগ্রে গৌর নটন দেখে—

নিরন্তর গৌর স্বরূপ ভোগের লাগি—গৌর পবিকরত্বে লোভ হ'ল

শ্যাম নাগবে করিল আলি

কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়

কৃষ্ণ বিনা আর কেউ নয়

জগভরি সব শক্তি

সকলেই প্রকৃতি সত্তা

সকলেই প্রকৃতি সত্তা

শ্রীভাগবতে এ তত্ত্বের প্রকাশ

গৌরান্দ্র স্বরূপে সার্থক হ'ল

গৌরান্দ্র স্বরূপে সার্থক হ'ল

গৌর বিলসিল সব সঙ্গ

গৌর বিলসিল সব সঙ্গ

গৌর বিলসিল সব সঙ্গ

গৌর বিলসিল সব সঙ্গ

আনের কথা কি বা বলব

নাগরে করিল আলি

নাগবে করিল আলি

তার নিদর্শন মনে কর ভাই

তাব নিদর্শন মনে কর ভাই

জগন্নাথ শ্যাম হইল লুক

জগন্নাথ শ্যাম হইল লুক

গৌর পবিকরত্বে লোভ হ'ল

না হবে বা কেন রে

এ যে, নাগরীর নাগরালি

এ যে, নাগরীর নাগরালি

বেদে যারে পুরুষ বলে — নাগর যদি নাগরী হ'ল
 জীবের সামান্য পুরুষ অভিমান — সেই নাগর যদি নাগরী হ'ল
 স্থাবর, জঙ্গম গুল্ম লতা যত — কেমন ক'রে থাকবে বল
 হেরি, রসময় শচীসুত — কেমন ক'রে থাকবে বল
 বিশ্ব মধুরে মাতিল — সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
 সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
 সবার স্বরূপ হ'ল জাগ্রত
 বিশ্বন্তর নাম পূর্ণ হ'ল
 বিশ্বন্তর নাম পূর্ণ হ'ল

পরিকর সঙ্গে গৌর স্বরূপের খেলা
 অপূর্ণ রাসরস পূর্ণলীলা — পরিকর সঙ্গে গৌর স্বরূপের খেলা

শ্রীগুরু কৃপায় সাধক দেখে
 এই সঙ্কীর্ণন মহা মহা রাসলীলা — শ্রীগুরু কৃপায় সাধক দেখে
 দেখতে দেখতে দেখে অপরূপ
 দেখে, গৌর স্বরূপে আবার নব লালসা
 মহারাস রঙ্গে ভোরা সেই — গৌর স্বরূপে আবার নব লালসা

গৌরাজ স্বরূপে যুগলের — একে ত' বিবর্ত দশা
 আবার, তায় উঠেছে ভোগ লালসা একে ত' বিবর্ত দশা
 বিবর্তে বিলাস চেষ্টা
 ভোগ্য ভোক্তা এক ঠাই — কেমনে পূরণ হবে বল
 দুই স্বরূপ না হইলে — কেমনে পূরণ হবে বল
 কেমনে পূরণ হবে বল

ভোগীর ভোগ লালসা দেখে

শ্রীগৌর সেবা বিগ্রহ--

ভোগদাতৃ স্বরূপ

বিবর্ত্তে ভোগ লালসা মিটাইতে—

অভিন্ন চৈতন্য তনু—

আশ্রয় জাতীয় ভাবে—

বিবর্ত্তে বিলাসের ভোগরূপ—

গৌর স্বরূপ নিতাইয়ে দেখে'—

দৌহে মিলিল বাহু পসাবি'—

ভোগ্য ভোক্তা মুরতি—

মহাভাব নিতাই রসবাজ গোরা—

আর কি রইতে পাবে

আর কি রইতে পাবে

আর কি রইতে পাবে

আসি দাঁড়াইল সন্মুখে

আসি দাঁড়াইল সন্মুখে

আসি দাঁড়াইল সন্মুখে

আসি দাঁড়াইল সন্মুখে

প্রকট নিত্যানন্দ রূপ

প্রকট নিত্যানন্দ রূপ

সন্মুখে ভোগ্য স্বরূপ দেখে

বাহু পসাবি' ধ'বল বুকে

বাহু পসাবি ধ'বল বুকে

হল পরস্পর জডাজডি

হল পরস্পর জডাজডি

হল পরস্পর জডাজডি

হল পরস্পর জডাজডি

রামরায়, মূৰ্ছিত গোদাবরী তীরে

এই, বিবর্ত্তে বিলাস বঙ্গ হেবে— বামরায় মূৰ্ছিত গোদাবরী তীরে

বামরায় মূৰ্ছিত ধরণীতে

দেখি এই নব উৎসবে—

রামরায় মূৰ্ছিত ধরণীতে

স্বভাবে বিলাস দেখেছ বটে

বামরায় ব্রজের বিশাখা সখা—

স্বভাবে বিলাস দেখেছ বটে

কিন্তু, তাব ত' অনুভবে নাই

বিবর্তে বিলাস রঙ্গ ঘটে—

দেখি, বিলাস অনুভব অতীত

শ্রীগুরু কৃপাদত্ত নাম রহস্যের—

তার মুখোদগীর্ণ নামের—

তার ত' অনুভবে নাই

রামরায় মুরছিত

রামরায় মুরছিত

নাম রহস্যের এই পরিণতি ভোগ

এই পরিণতি ভোগ

একদিন রহস্য পুছে ছিলাম

একদিন রহস্য পুছে ছিলাম

কৃপা করে ব'লে ছিলেন

'ভঙ্গ' আর 'জপ' রইল

শ্রীনামের লীলা পূতি :

সাধ্য সাধন নির্ণয় করা বইল

একান্তে নাম আশ্রয় কর

নাম সব বলে দেবে—

একান্তে নাম আশ্রয় কর

এখন, যা' বলায় তাই ত' বলি

পাগলা প্রভু মহাবলী—

এখন, যা' বলায় তাই ত' বলি

এই নাম যে আশ্রয় করে

অপরূপ রহস্যময়—

এই নাম যে আশ্রয় করে

শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ-পদাশ্রয়ে—

এই নাম যে আশ্রয় করে

সে, 'নিতাই-গৌরানন্দ-বিলাস' ভোগ করে—

এই নাম যে আশ্রয় করে

নরহরির চিতচোরা—
 দেখে, 'নিতাই-রমণ' গোরা
 দেখে, 'নিতাই-রমণ' গোরা

আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি
 'হৃদে ধরি' শ্রীগুরু মুরতি—
 'হৃদে ধরি' শ্রীগুরু মুরতি—
 আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি
 আমাদের, জীবনে মরণে গতি —
 এই, নামদাতা মহাদানী—
 হৃদে ধরি শ্রীগুরু মুরতি
 হৃদে ধরি শ্রীগুরু মুরতি
 আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি

নিতাই-গৌরাঙ্গ-বিলাস-ভোগে মাতি—
 আয় ভাই, প্রাণ ভ'রে গান করি

“ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ।
 জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥”

“নিতাই গৌর রাধেশ্যাম”—
 নামের বর্ণে বর্ণে পূর্ণামৃত —
 অমৃত হ'তেও পরামৃত—

আ'মরি কি মধুর নাম
 আ'মরি কি মধুর নাম
 আ'মরি কি মধুর নাম
 আ'মরি কি মধুর নাম

(১)

(১) '(কলি জীবকে) বিধি ব্যবস্থা দিয়ে জড়িত করলে তারা পারবে না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা দরকার । 'নাম সর্বগক্তিমান', সেই পেয়াদার হাতে ফেলে দিলে নামই ঠিক করে নেবে । নাম রূপ বীজ ফেলা হলো—এখন সে বীজকে নাড়া-চাড়া করতে নেই ;

দরকার—‘শ্রবণ কীর্তনরূপ জল ঢালা’। জল পেলেই বীজ হ’তে চারা
 বের হবে এবং দিনে দিনে বাড়তে থাকবে—তখন স্বতঃই বিধি পালন
 করবে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় গোড়ে নাম-প্রেম
 প্রচার করতে এসে বিধি নিষেধ না দিয়ে সংকীর্ণের ব্যবস্থা
 করলেন। কারণ, গানে সর্পও খল স্বভাব ত্যাগ করে। সামবেদ
 গানে ভগবান্ আকৃষ্ট হন। গানের শক্তি অসীম।

(২) আর যাঁরা প্রচার কার্যে ব্রতী হবেন তাঁদের কিছু কর্তব্য
 আছে। কথায় আছে খুঁটোর জোরে ‘মেড়া’ যুঝে। আচারহীন
 প্রচারে কোন কাজ হয় না। / যাঁরা উপদেশ করবেন, তাঁদের আগে
 ভগবানে পূর্ণ মাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া চাই। আমিত্ব থাকতে,
 পুরুষকার থাকতে, ভগবানের কৃপা আসে না। এটি মনে-প্রাণে
 বোঝা চাই। গীতায় ভগবান কি দেখালেন—অর্জুনের নিজ গাণ্ডীব
 তুলিবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই।

(শ্রীপাদ বামদাস বাবাজী মহাশয়)

সংশয় নিরসনে :

নীলাচলে প্রথম মিলনের দিনেই “সচল জগন্নাথ” গৌরহরি
 নিজের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিশ্চল আধার ঐ রঘুনাথকে স্বরূপের
 করে সমর্পণ করিয়াছেন। রঘুনাথকেও তিনি কৃপাদেশ করিয়াছেন—

“প্রাণের রঘু ! আজ হইতে স্বরূপ (স্বরূপ-দামোদর) তোমার
 ‘পিতা’ ও ‘প্রভু’।”

(তাৎপর্য্য :---সর্ব বিষয়ে পরম সমর্থ পিতা থাকিলে পুত্রের
 আর অন্যের নিকট চাহিবাদ কিছুই থাকে না। তদ্রূপ হে রঘু!

স্বরূপই তোমার সর্বস্ব জানিবে । তুমি আজ হইতে স্বরূপের ‘পুত্র’ (পাল্য ও উত্তরাধিকারী) । এই প্রাপ্ত বস্তুর মর্যাদাবোধ ও ভোগের জন্য আজ হইতে তুমি স্বরূপের ‘ভৃত্য’ । অতঃপর তোমার ‘সাধন’ হইল ‘স্বরূপের আদেশ পালন ও ছায়ার স্থায় সঙ্গী হইয়া তাহার সুখ-তাৎপর্য-ময় আচরণ’ ।”)

গম্ভীরার গুণনিধি গৌরহরির কৃপা প্রেরণায়, রঘুনাথ একদিন স্বীয় প্রভু ‘স্বরূপের’ মাধ্যমে তাঁহাকে (গৌরহরিকে) প্রশ্ন করিলেন—

“কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ ;
কি মোর কর্তব্য ? মুঞি না জানি উদ্দেশ ।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু কর উপদেশ ।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এই প্রশ্ন শুনিয়া মধুর হাস্যের সহিত গৌরসুন্দর বলিলেন—

“রঘু ! তোমার ‘সাধ্য’, ‘সাধন’ ও ‘তত্ত্ব’ সবই ঐ “স্বরূপ-দামোদর” । আবার—‘আমি তত নাহি জানি ইঁহে যত জানে’
(চরিতামৃত)

এই কথা বলার পরই পুনরায় হাসিয়া বলিতেছেন—

“তথাপি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা যদি হয় ;
আমার এই বাক্য তুমি করহ নিশ্চয় ।”

(চরিতামৃত)

পরম কোতুকী গৌরহরি রঘুনাথকে বলিতেছেন—

“গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ।”

(চরিতামৃত)

কি ব্যাপার ? রঘুনাথকে এ কথা বলার তাৎপর্য ? ব্রজরামা-দের প্রতি ‘যোগ’ উপদেশের মতই এই সব উপদেশাবলী ‘নিরর্থক’

মনে হয় না কি ? শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে জাগে যে এ সব উপদেশ কোন গূঢ় অর্থে বলা হইয়াছে—

‘ভক্তিরস’ কৃষ্ণাকর্ষিণী সূতরাং ভক্তিরস বড় সু-কোমলা । শুষ্ক-বৈরাগ্যের ‘কাঠিন্য’ ক্রমে দেহেই অভিনিবেশ বাড়াইয়া দেয় । প্রচুর স্বাচ্ছন্দ্য তাই করে । প্রাকৃত বিষয়ে ঔদাসীন্য আনে না । এ কারণ, শুষ্ক বৈরাগ্য ভক্তি রক্ষণে বাধা সৃষ্টি করে । ‘ভক্তিরসে’র গাঢ় আশ্বাদনের লোভ উদিত হইলে (নিখিল , প্রাকৃত বস্তুতে স্বাভাবিক অরুচি জন্মে । প্রাকৃত বস্তুতে ঐরূপে স্বাভাবিক অরুচি বা ভক্তি হইতে উথিত বৈরাগ্য জাত হইলে সে সাধকের গ্রাম্যবার্তা শোনারও প্রবৃত্তি হয় না এবং নিজেও গ্রাম্য কথা বলে না । অস্থি, মাংস ও চর্মের আধারে বায়ু, পিত্ত, কফ, মল, মূত্র, কীটের আধার ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ শরীরকে আচ্ছাদনের জন্য ভাল ভাল বস্ত্রের প্রয়োজন প্রবৃত্তি জাগে না । জিহ্বার লালসায় ভাল খাটবাব আগ্রহও থাকে না । ভক্তি-মহারাণীর করুণায় তুমি ‘স্বভাবে বৈরাগী’ । তোমার জীবন আদর্শে—‘সাধক-জীব’ ভক্তি বৃদ্ধির অশুকুল আচরণে আসক্তি এবং ভক্তির প্রতিকূল বস্তু যত্নে পরিহার কবিয়া নিজ নিজ সাধন পথে চলিবে । আরও শোন—

“অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে”

স্বাবর-জঙ্গমাদি সর্বত্র তোমার ‘উষ্ট’ স্ফূর্ত্ত হয় । সূতরাং তোমার দৃষ্টিতে কেহই ‘অমানী’ নয়, হইতেও পারে না । নিজ ‘অভিষ্টের’ প্রকাশ জানে তুমি সকলকেই মাগ্য দিতেছ ।

‘কৃষ্ণ’ এবং ‘কৃষ্ণনাম’ অভিন্ন স্বরূপে থাকিয়া মহা-চৌরের কার্য সাধন করিতেছে । তোমার গ্যায় বিশুদ্ধ আধার পাইয়া নাম নিজ উল্লাসে (প্রয়োজনেই) তোমার জিহ্বায় অখণ্ড ভাবে নৃত্য করিতেছেন । সাধক জীবের ইহাই সাধন । ‘নিরন্তর জিহ্বাতে নাম উচ্চারণ’ । ‘নামের’ করুণায় ধীরে ধীরে সেই স্বয়ং ‘নামই’ (সাধকের)

হৃদয়ে আপন আসনের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবেন । তখন সেই জীব
‘নিজ ইষ্ট নাম’—অচেতন সচেতন সর্ব অবস্থায় হৃদয়ে স্মরণ ও
জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে । ঐ অবস্থার গাঢ়তা ভাব আসিলে
সর্বত্র ‘অভিষ্টের’ সাক্ষাৎ পথে অগ্রগতি হইবে । তখন (স্বভাবে)
অমানীকে মান দান সম্ভব হইবে । প্রাকৃত হিসাবের পথ বুঝিয়া ভজন
পথে অগ্রসর হইতে হইবে । ইহাই সাধক জগতে গ্রহণীয় । এখনো
গৌরহরির বঙ্গা শেষ হয় নাই । অতঃপর তিনি বলিলেন—

‘ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে’

(চরিতামৃত)

এই সু-গস্তীর বাণী অনুভব করিবার জন্য বিশেষ ‘ধীর’* হইতে
হইবে । শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় যথা নতি আমরা আলোচনা
করিতেছি—

রঘুনাথের ‘প্রভু’ বা সর্বস্ব হইতেছেন ‘স্বরূপ’ । স্বরূপ-দামো-
দরের ‘সেবা’ বঃ তাঁহাকে সুখ দিতে হইলে তাঁহার প্রিয় (উপাস্ত)
গৌরসুন্দরকে সুখী করিতে হয় । গৌরহরিকে সুখী করিতে হইলে
‘রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ’ বা ‘রাধাকৃষ্ণের সেবা’ (সুখ বিধান) করিতে
হইবে ।

শ্রীরঘুনাথ অনুভব করিলেন—গৌর স্বরূপে রাধা ও কৃষ্ণের নিত্য
স্থিতি, কখনও ছাড়াছাড়ি নাই । তিনি নীলাচলে । সুতরাং নীলাচল
ও ব্রজভূমি অভিন্ন । সু-রসিক ভক্তবৃন্দ এই নীলাচলকে নদীয়ার
‘চোরা-কুঠরী’ বলেন । স্বরূপের আনুগত্যে একীভূত রাধাকৃষ্ণেরই
সেবা করিতেছেন রঘুনাথ ।

* চৈতন্য চরিত্র (হয়) এই পরম গস্তীর ।

সে বুঝে, তাঁর পদে যার মন ‘ধীর’ ॥ (চরিতামৃত)

“রাত্রি দিনে করে তেঁহো ‘নাম সঙ্কীৰ্ত্তন’ ।

ক্ষণ মাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ।”

—চরিতামৃত অস্ত্য ৬ষ্ঠ

আগে ত’ (পরিপূর্ণ) প্রাপ্তি, তাহার পরই তো ‘মানস-সন্তোষ’ ! তাই, ষোড়শ বর্ষ ব্যাপী তিনি ‘অন্তরঙ্গ-সেবা’ করিবেন নীলাচলে । তাহার পর বাকী জীবন ঐ ‘অন্তরঙ্গ-সেবার-বিরহ’ শ্রীকৃষ্ণতটে ভোগ করিবেন । সেই অবস্থায় গৌরাঙ্গ সেবার উপকরণ হিসাবে ‘শ্রীরাধা-কৃষ্ণের’ নাম-রূপ-গুণ-লীলা বন্দনা দি করিবেন ।

ঠাকুর হরিদাসের চরিত্রেও “সচল জগন্নাথ” শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার উপাস্য । কিন্তু, তাঁহার তিরোভাবের পূর্বদিন পর্য্যন্ত ‘এ-তথ্য’ গোপন ছিল । তিনি নিজে ছাড়া অন্য কেহই জানিতেন না ।

ঠাকুর হরিদাসের আজীবন অন্য কোন স্মরণ মনন ছিল না । তিনি প্রত্যহ কেবল তিন লক্ষ ‘মহামন্ত্র’ (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥) ‘নাম’ গ্রহণ করিতেন ।

(এই মহামন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব দশমী দশায় রাধারাণীর শ্রীমুখে । কৃষ্ণ বিবহিনী-উন্মাদিনী রাইমণি প্রথম ‘হরে’ উচ্চারণে শুনিতে পাইলেন যেন ‘কৃষ্ণ’ কদম্ব বনে বংশী বাজাইতেছেন । পর পর নাম স্মরণে পূর্বরাগ হইতে পর পর সব লীলাই তিনি ‘প্রকট’ অনুভব করিলেন । শেষ ‘হরে’ স্মরণে মহারাস বিলাস ভোগ করিলেন । তাঁহার চরম বিরহ দশার অবসান ঘটিল ।)

‘ঠাকুর হরিদাসের’ দেহ অবসানের দিন ভক্তবৃন্দ জানিতে পারিলেন “তাঁহার সেব্যনিধি” গস্তীরার গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । এবং ঐ ‘মহামন্ত্র’, ‘রূপ’ ও ‘কীর্ত্তন’ করিয়া তিনি আজীবন গৌরশুন্দরেরই সেবা করিয়াছেন । এবং ভাবীকালের সাধকদের প্রতি তাহার করুণা রঞ্জুটি রাখিয়া গিয়াছেন । সেটি তাঁহার জীবন সাধনার ‘জীবন্ত

বাণী'। তাঁহার 'সাধ্য' ও 'সাধন' বস্তু ছিল শ্রীহরিনাম। এই নামেরই পূর্ণ-মূর্তি 'শ্রীশ্রীগৌরানন্দসুন্দর'।

'হরে কৃষ্ণ নাম সাধন ফলে

প্রাণ যায় গৌরানন্দ বলে

'সাধ্য' সাধন' নির্ণয় হল

ঠাকুর হরিদাসের চবিত্তে—

সাধ্য সাধন নির্ণয় হল

অনুমান নয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ

(শ্রীপাদ বামদাস বাবাজী মহাশয়)

'ভজন-চতুর' ঠাকুর হরিদাসের কৃপাস্নাত শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীকে রঞ্জিয়া গৌরহরি (তাই) বলিয়াছেন—

'ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে'

(এই প্রসঙ্গ হইতে) সাধক জীবের কি আদর্শ পথ ?

* সাধকের একমাত্র কাম্য বা লক্ষ্য শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান। সাধক চিন্তা করিবেন নন্দসুত হরিই শ্রীগুরু রূপ ধারণ করিয়া এই মর-জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার আগমনের মুখ্য হেতু— শ্রীহরিবিলাস দেহে, আনুগত্যে শ্রীহরি-নাম-রূপ-গুণ-লীলা আশ্বাদন। শ্রীগুরুদেবের প্রতি যদি এই ভাব জাগ্রত না হয় তবে তাহা হইবে 'আত্ম-সুখ'।

দুই দিকে নজর রাখা চাই—

* (১) শ্রীগুরুদেবই আমার সর্বস্ব।

(২) তাঁহার সুখের জন্যই তাঁহার অভিষ্ট মূর্তির স্মরণ মনন আদি। এই দুইটির একটিকেও বাদ দিলে চলিবে না।

গৌরহরি উপসংহারে বলিলেন—

'তূনাদপি সুনীচেন তরোবপি সহিষ্ণুনা

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তাৎপর্য :—প্রাণের রঘু! এই বাক্যের মূর্তি বিগ্রহ তুমি এবং তোমার জীবন আদর্শ ভুবন পাবন ঠাকুর হরিদাস।

সাধকের (সমাগত) জীবনে ‘উচ্চ হরি সঙ্কীর্তনই’ প্রথম কর্তব্য। এই সঙ্কীর্তনের করুণায় অমানীকে মান দানের স্বভাব জাগিবে। তাহার পর ঐ সঙ্কীর্তন কৃপাতেই তরুর স্বভাব জাগিবে। তরু যেমন নিজের মাথায় রৌদ্র রষ্টি সহ্য করিয়াও অন্যকে আশ্রয় দেয় ও পালন করে, নিজে শুকাইয়া মরিলেও স্থানুর স্বভাবেই কাহারও নিকট জল-কণাও প্রার্থনা করে না ও সহজেই পরম সহিষ্ণুতাগুণে অবস্থান করে। সাধকও তেমনি ‘পরোপকারী ও পরম সহিষ্ণু’ স্বভাব লাভ করিবে। সেই নাম সঙ্কীর্তন সাধন ফলেই পরবর্ত্তী কালে ‘দীনতা’ স্বভাব করিবে।

তৃণ অতি তুচ্ছ পদার্থ, তাহার দীনতাও তুচ্ছ। তৃণেব মাথায় পা দিলে সে নিজের অসামর্থ্যতার জন্যই পদাঘাতের চাপ সহ্য করিয়াও নম্রতা ধারণ করে। কিন্তু যখন সে চাপ সরিয়া যায় তখন সে আবার মাথাটি যথাসাধ্য উন্নত করে। প্রাকৃত বস্তুর স্বভাবই এমনি দীনতার আচরণের চিহ্ন পরিস্ফূট হইলেও তাহা কপটতা।

কিন্তু ‘চিন্ময় উপচার’ নাম সঙ্কীর্তনের করুণায় জীবের হৃদয় কোমল হইতেও সুকোমল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ‘ভক্তিরস’ আসিয়া উদ্ভিত হয়। জীবের সর্ব কাঠিন্য দূর হইয়া যায়। তাহার পরই ‘দীনতা’ বা যথার্থ নম্রতা আসে।

গৌরহরির উপদেশাবলীর ভঙ্গী ও সু-রসাল তাৎপর্য অল্পভব করিয়া রঘুনাথ অত্যন্ত উল্লসিত চিত্তে গৌরহরির শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তিনিও রঘুনাথকে কৃপালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। এবং আর একবার স্বরূপের স্থানে সমর্পণ করিলেন। এবার একটি বিশেষ অধিকারও দান করিলেন। যথা—

“অন্তুরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে” (চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

পিতার কল্যাণে :

ওদিকে রঘুনাথের বিরহে হিরণ্যগোবর্ধন পরিবারবর্গের সহিত শোকে মুহুমান হইয়া আছেন ।

পাঁচ সাত মাস যাবৎ ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর তাঁহারা হতাশ হইলেন । দুর্গম পথে রঘুনাথ একাকী নীলাচল যাইতে পারে ঃকপ সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই । এই কারণে তাঁহারা নীলাচলে অনুসন্ধান করেন নাই । গোড়ের ভক্তবৃন্দ নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । ব্যাকুল উদাসী গোবর্ধনদাস একদা প্রখ্যাত সেন শিবানন্দের নিকট পত্র বাহককে পাঠাইলেন । তাঁহার মনের ভাব, যদি কোন দৈবে রঘুনাথ সত্য সত্যই নীলাচল গিয়া থাকে তাহা হইলে সেন শিবানন্দের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া যাইবে । পত্র বাহক যথা সময়ে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রঘুনাথ নীলাচলে শ্রীগোরাঙ্গের শ্রীচরণ সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন । এবং স্বরূপের পুত্র স্থানীয় হইয়া গৌরহরির সেবা করিতেছেন । যথা—

“রাত্রি দিনে করে তেঁহো ‘নাম সঙ্কীর্্তন’,
ক্ষণ মাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এবং রঘুর বৈরাগ্য যাজন সম্বন্ধে শুনিলেন—

“পরম বৈরাগ্য, তার নাহি ভক্ষ্য.পরিধান ;
যেছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ ।
দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ,
নিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ।
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ ;
কভু উপবাস কভু করেন চর্কণ ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

‘আঃ আমার রঘুনাথ বাঁচিয়া আছে। মনের আনন্দে আছে। সকলের প্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। রঘুনাথের জন্ম কুল পবিত্র হইল। আমরা ধন্য হইলাম।’—

মনে মনে এই সব বিচার করিয়া পরম বিচক্ষণ ও গম্ভীর আশায় গোবর্দ্ধনদাস রঘুনাথের জন্মই নিজেরা নীলাচলে গেলেন না। কিন্তু রঘুনাথের মাতা বা স্ত্রীকে নীলাচলে পাঠাইলেন না।

অল্প কয়েক মাস পরেই গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের ‘বাৎসরিক উৎসবে’ নীলাচল যাত্রা করেন। গোবর্দ্ধনদাস তাঁহাদের সহিত দুইজন সেবক, দুইজন ব্রাহ্মণ এবং চারি শত টাকা পাঠাইলেন।

নীলাচলে পঁছছিয়াই সেবক ও ব্রাহ্মণদ্বয় হিরণ্যগোবর্দ্ধনের শিক্ষা অনুসারে রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—

‘আপনার জ্যাঠামশাই, পিতা, মাতা ও স্ত্রী আপনার অদর্শনে মৃত-প্রায়। কিন্তু, আপনি তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাজ চরণ সেবায় অধিক আনন্দ পাইতেছেন এই অনুভবে তাঁহারা নিজেরা আসিলেন না। আমাদের পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা আপনার সুখেই সুখী হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এই সুখময় গৌর গণের সঙ্গ ছাড়িয়া আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না। আপনি এইটুকু কৃপা করুন—

আপনার আহাৰ্য্য ও বস্ত্রাদি, শরীর রক্ষার জন্ম যাহা অবশ্য প্রয়োজন সেই দ্রব্যগুলি যখন যতটুকু দরকার গ্রহণ করুন। আমরা এখানে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিয়া সেগুলি আপনাকে যোগান দিই। এইটুকু অঙ্গীকার করিয়া পিতা-মাতার মনে সুখ দান করুন।’

(নিজ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পরিজন সকলের স্মৃতি রঘুনাথের মনে ক্ষণিকের জন্ম উদয় হইল। তাহাদের দুঃখে সাস্থনা ও হৃদয়ে বল দিবার জন্ম মনে মনে গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন জানাইলেন। তাঁহার পিতার বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা, ও নিৰ্ম্মল পুত্রস্নেহ জানিয়া মনে মনে প্রশংসা করিলেন। প্রকাশ্যে

ব্রাহ্মণ ও সেবকদের বলিলেন—“অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রেম শ্রীগৌরাজ চরণ কমলের সেবায় আমি এখানে আসিয়াছি। পিতা মাতার পুণ্যে ও আশীর্ব্বাদেই তাহা পাইয়াছি। তাঁহাদের শ্রীচরণে শত শত দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবেন। অপ্রাকৃত আনন্দের মধ্যে অন্য কোন বিজাতীয় বস্তুর প্রতি আমার রুচিও নাই এবং প্রয়োজনও নাই। আপনারা বাড়ী ফিরিয়া যান।”

রঘুনাথের এইরূপ উত্তর পাইবার পর একজন ব্রাহ্মণ ও একজন সেবক (গোবর্দ্ধনদাসের পূর্ব্ব আদেশ মতে) রঘুনাথের ঐ সু-দৃঢ় অভিমত ও স্বভাব বৈরাগী রঘুনাথের নীলাচলবাসের মধুর মধুর আচরণ সমূহের বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। অবশিষ্ট দুই জন মুদ্রাসহ নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের শোকাতুরা মাতা, বিরহিনী স্ত্রী, মহা দুঃখী পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত নীলাচল হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ ও সেবকের মুখ হইতে গত এক বৎসর যাবৎ রঘুনাথের নীলাচল বাসের বিভিন্ন সংবাদ ও ঘটনা গভীর মনোযোগেব সহিত শুনিলেন। কোন অজ্ঞাত করুণায় তাঁহাদের হৃদয়ের ভার লাঘব হইল। এত শোক তাপ ও দুঃখের মধ্যেও তাঁহারা প্রত্যেকেই একটা অনীর্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ করিতে লাগিলেন। অতঃপর রঘুনাথের প্রসঙ্গই তাঁহাদের জীবাৎ হইল।

এই কারণেই যাবৎ-জীবন হিরণ্যগোবর্দ্ধন নীলাচলগামী গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সঙ্গে প্রতি বৎসরই সেবক পাঠাইতেন। ঐ সেবক নীলাচলে রঘুনাথের অগোচরে গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সহিত চারিমাস কাল নীলাচলে অবস্থান করিয়া রঘুনাথের নব নব বিবিধ চেষ্টা ও বিভিন্ন আচরণের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া হিরণ্যগোবর্দ্ধনের গোষ্ঠি মধ্যে বর্ণনা করিতেন।

গর্ভধারিনী মাতা ও জন্মদাতা পিতার পারমাধিক কল্যাণ

কামিনায় রঘুনাথ ছুই বৎসর কাল গৌরহরিকে মাসে ছুইবার নিমন্ত্রণ করিতেন। সেই নিমন্ত্রণে প্রতিমাসে যে কৌড়ী ব্যয় হইত তাহা তিনি পিতার প্রেরিত সেবকদের দ্বারা নিৰ্ব্বাহ করাইতেন।

ভক্তি রাণীর করুণায় একদা রঘুনাথের অকস্মাৎ বিচার আসিল—
“ধিক আমাকে ! বিষয়ী পিতার ধন দ্বারা প্রাণ-গৌরের সেবা করিতেছি। ইহা কি বিশুদ্ধ আচরণ ? গৌরহরির মুখেও ত উল্লাস দেখি না। তাছাড়া, আমার এ আচরণের ফল তো ‘প্রতিষ্ঠা।’”

এইরূপ বিচার মনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করিলেন এই ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। দৃঢ়চিত্ত রঘুনাথ অতঃপর পিতার ধনে গৌরহরিকে ভিক্ষাদান বন্ধ করিলেন।

পর পর ছুইটি নিমন্ত্রণ বাদ পড়ায় গৌরহরি একদা সহাস্ত্রে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“স্বরূপ ! কি ব্যাপার ? তোমার রঘু আমার মহাপ্রসাদের নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা।”

‘স্বরূপ’ নিমন্ত্রণ বন্ধের হেতুর বিবরণ দিলেন।

এবার, রঞ্জিয়া গৌরহরি মুছ মধুর হাসিয়া বলিলেন—

‘বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥’ —চরিতামৃত

আর একবার প্রকাশ পাইল যে, প্রেমধন রক্ষার আদর্শ পাত্র রঘুনাথ।

বৈরাগ্যের ক্রম প্রকাশ :

গৌড়দেশীয় ভক্তবৃন্দ (প্রতি বর্ষে) যে চারি মাস নীলাচলে থাকিতেন সে কয় মাস প্রতি দিনই বিরাট উৎসব হইত। নদীয়া

ও নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রায় সকলেই সেই উৎসবে প্রসাদ পাইতেন। রামাই শঙ্কর, আদি গৌরগোষ্ঠির সেবকবৃন্দ এই সব উৎসবে হাট বাজার, জল, বাসন প্রভৃতি সর্বপ্রকার কার্যের সেবক ও সাথী। এবং সেই সব উৎসবে তাঁহারাও প্রসাদ পাইতেন।

আবার প্রতি বৎসরের বাকী সাত আট মাস সময়ের মধ্যে—

(১) নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ যে সব দিন গৌরহরিকে সগোষ্ঠি নিমন্ত্রণ করিতেন

এবং

(২) রঘুনাথ ভট্ট, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আদি ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিতেন—

সেই সব ভক্তের হাট বাজার, জল, বাসন মার্জন, কাঠ, রশুই আদি সর্ব প্রকার প্রয়োজনাবলীর সু-সমাধানের জন্য গৌর-গোষ্ঠির সেবকবৃন্দ (রঘুনাথ রামাই শঙ্কর আদি) নিযুক্ত থাকিতেন। ঐ সব দিনগুলিতে উৎসব স্থানে “রঘুনাথ” ও অন্যান্য সেবকবৃন্দ প্রসাদ পাইতেন।

চতুর্থ বর্ষের প্রথমদিক হইতে সিংহদ্বারের ভিক্ষাবৃত্তিও তিনি ত্যাগ করিলেন। ঐ বৃত্তিতে দুইটি প্রধান অন্তরায় আসিতেছে (রঘুনাথ) ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিলেন। যথা—প্রথমতঃ উত্তম উত্তম বস্তু দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ* প্রস্তুত হয়। এসব সু-স্বাদু উপাদান জিহ্বার প্রাকৃত সংস্কারের লালসাকে বাড়াইয়া দিতে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় :—সিংহদ্বারে অযাচক বৃত্তিতে দাঁড়াইয়া থাকা কালে মন্দির হইতে জগন্নাথের সেবক ও বিভিন্ন ভক্ত সামনে দিয়া গমন

* জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদে যে অপ্রাকৃত আনন্দ থাকে সাধক-দশায় ‘জীব’ তাহা সঠিকভাবে ধরিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু ও রন্ধন পরিপাটি বোধই প্রসাদ গ্রহণ সুময়ে সাধক ভোগ করে। যেমন ভোগ, তদনুরূপ দৃষ্টি ও ক্রিয়া হইবে।

করে। এসব সেবকেরা দৃষ্টিপথে পড়িলেন মনে আশা জাগা স্বাভাবিক যে, 'ইনি আমায় কিছু দেবেন।' তিনি তাহা না দিয়া চলিয়া গেলে মনে হয়—'কৈ দিল না ত?' আবার পরক্ষণে অন্য একজনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তিনি হয়ত খুব সামান্য দিলেন, ফলে মন প্রসন্ন হইল না। আবার হয়ত অন্য কেহ পরিমাণে বেশী দিলেন কিন্তু তাহার সহিত অন্য কোন একটা ত্রুটী মনে আসিতে পারে। ইত্যাদি 'বিবিধ মানসিক উদ্বেগ' এবং সর্বোপরি এসব ভুবন-পাবন জগন্নাথ সেবকদের 'নিন্দা' বা 'প্রশংসা' রূপ বিচার—অপরাধের জনক।

(সাধক দশায়) 'জিহ্বার লালসা' ও 'ঈশ্বরের সেবকবৃন্দের আচরণে বিচার' এ দুইই স-যত্নে বর্জনীয়। সেই কারণেই এই 'অযাচক বৃত্তি' অনর্থের জনক, ইহা আচরণের দ্বারা (সাধককে) বুঝাইয়া ইহা—হইতে কম অপরাধের পথে জীবন নির্বাহ ব্যবস্থা করিলেন।

অতঃপর রঘুনাথ ছত্রে ছত্রে মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। সে সময় বহু ধনী বিষয়ী ব্যক্তি ভিক্ষুককে কিছু দান করা পুণ্য কার্য হিসাবে নিজ নিজ ব্যয়ে অন্তর্হত স্থাপন করিয়াছিলেন। এসব ছত্রে দিবসের মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট সময় থাকিত, সেই সময় যে কোন ভিক্ষুক, উদাসী কিম্বা 'অযাচক' উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হইত। সিংহদ্বারের মত বিশেষ পরিপাটির প্রসাদ থাকিত না। ছত্রের এই প্রকার অন্তে জীবন ধারণ হয় এবং জিহ্বার লালসা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই সব 'ছত্র' বিষয়ীদের অর্থে পরিচালিত। বিষয়ীর সংস্পর্শ ঘটিলেই 'ভক্তিদেবী' সঙ্কুচিত হইয়া দূরে পলায়ন করেন। ভক্তি-ধনের উল্লাস বর্ধন করিতে হইলে 'বিষয়' এবং 'বিষয়ীর সম্পর্ক'ও ত্যাগ করিতে হইবে। এই আদর্শ স্বীয় আচরণের দ্বারা সাধক-জীবের আদর্শ পথ প্রদর্শকরূপে রঘুনাথ অতঃপর ছত্রে ছত্রে ভিক্ষা ত্যাগ করিলেন।



5/1/23

ইহার পর রঘুনাথ যে আদর্শের পথ গ্রহণ করিলেন সেটি সু-
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সিংহদ্বারে অযাচক বৃষ্টি ত্যাগ, ছত্রে ছত্রে
ভিক্ষা ত্যাগ অস্ত্রে জীবন ধারণের যে উপায় অবলম্বন করিলেন
তাহা কোন সাধারণ বা অসাধারণ সাধকের স্বপ্নেও আসিতে পারে
না। রঘুনাথের আত্মিক আদর্শ এক পরম বিচিত্র রূপে দেখা দিল।

অতঃপর রঘুনাথ রাস্তায় রাস্তায় নিষ্কিণু পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত
'অন্ন-মহাপ্রসাদ' হইতেই জীবন ধারণের আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে
লাগিলেন।

পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বহুবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ
বিক্রয় হয়। যাহারা ঐ সমস্ত 'প্রসাদ' বিক্রয় করেন তাহাদিগকে
'পসারী' বলা হয়। যে সব 'অন্ন-মহাপ্রসাদ' ছই তিন দিনেও বিক্রয়
হইত না—তাহা দান করিলেও কেহ লইবে না জানিয়া 'পসারীরা'
ঐসব 'অন্ন-মহাপ্রসাদ' রাজপথের পার্শ্বে গাভীদের মুখের সামনে
ঢালিয়া দিতেন। কিন্তু সেগুলির এমন অবস্থাস্থুর ঘটিত যে গাভী-
গণেও ঐসব মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিত না। রাস্তাতেই পড়িয়া থাকিত।
আমাদেব রঘুনাথ রাত্রির বিরল লোক চলাচলের সময় ঐ অন্ন-মহা-
প্রসাদই কুড়াইয়া নিজ কুটিরে লইয়া আসেন। বহু পরিমাণে জল
দিয়া সেই সকল পর্য্যুসিত 'অন্ন'গুলি ধুইয়া আহাৰ্য্য অন্ন সংগ্রহ
করেন। লবণ দিয়া ঐ 'অন্ন' ভোজনে প্রাণ রক্ষা করিতে
লাগিলেন।

রঘুনাথ ও স্বরূপ একই কুটিরে বাস করেন। রঘুনাথের মহা
প্রসাদে (আলোকিক) নিষ্ঠা ও জীবন ধারণের অভূতপূর্ব চেষ্টা
দেখিয়া স্বরূপ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। 'হা গৌর। প্রাণ গৌর।'
বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সংগ্রহ করা এই অভূতপূর্ব মহাপ্রসাদে
স্বরূপের অত্যন্ত লোভ জন্মে। সেই লোভে একদিন তিনি রঘুনাথের
নিকট হইতে কিঞ্চিৎ 'ঐ মহাপ্রসাদ' চাহিয়া লন। আশ্বাদনে চমৎ
কৃত ও বিস্মিত হইয়া তিনি বলিলেন—

“এছে অমৃত খাও নিতি নিতি ,
আমা সবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি ?”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এই অপরূপ সংবাদ একদা গস্তীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির কর্ণ গোচর হইল। মহাভোগী গৌর। অশেষ বিশেষ ভোগের জন্মই এই ‘ছন্ন অবতার। তিনিও লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই রাত্রেই হঠাৎ স্বরূপের বাসায় আসিলেন। প্রণয় কোন্দলে ‘স্বরূপ’ ও ‘রঘুনাথ’ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

‘তোমরা ত’ খাসা (সু-উত্তম) বস্তু খাও। আমায় কেন অংশ দ ও না ? এই বলিয়াই ঠিক লোভাতুরের আগ্রহে স্বহস্তে রঘুনাথের সংগৃহীত ধৌত মহাপ্রসাদের একটি ‘গ্রাস’ গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণের জন্ম পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিতেছেন দেখিয়া স্বরূপ তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন। গৌরহরি উল্লাসেব সন্তিত বলিলেন—

“নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ;
এছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ

সোনার গৌরান্দ্র মহাপ্রভুর ‘এই প্রশংসা’ কি অতি স্তুতি ?

ব্যবহারিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে—

নিজ প্রিয়ের প্রতি ‘প্রীতির ক্ষুধা’ যেমন যেমন বাড়ে তাহার সম্পর্কীয় বস্তুতেও সেই পরিমাণে স্বাদ বা অনুরাগও সহগামী হইয়া থাকে। এ ছাড়াও মহাজনদের বাক্যও আছে—

‘প্রেম ভুখা-প্রাণ গৌরান্দ্র উপচারের বাধ্য নয়।’

সুতরাং গৌরও তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—স্বরূপের উপরোক্ত প্রশংসা যথার্থ ও তাঁহাদের অন্তরের অনুভব।

সপ্তম উরস

ভূমিকা

‘পরমকরণ গৌরহরির ভক্ত অসংখ্য । তাঁহারা প্রত্যেকেই ‘পতিত-পাবন’, প্রত্যেকেই ‘পরম প্রেমিক’, প্রত্যেকেই ‘পরম-রসিক’ । প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়া সময় সময় যেমন মরুভূমিকেও ভাসাইয়া ডুবাইয়া ফেলে, তদ্রূপ গৌরহরির নীলাচল বিহারকালে, গৌর-ভক্ত-বৃন্দ প্রত্যেকেই রাধা প্রেমের প্রবাহ বহাইয়া সংসার কূপে পতিত জনগণের কৃষ্ণ বিমুখতারূপ শুষ্ক নীরস চিত্তকে বা অভক্ত পতিতদের চিত্তকে প্রেমে পরিপ্লাবিত করিয়াছেন ।*

‘সচল-জগন্নাথ’ গৌরহরিকে দর্শন করিতে নীলাচলে যান নাই— এমন গৌড়ীয় ভক্ত অতি বিরল ; সকলের কথা ‘গ্রন্থে’ বিস্তারিত লিখিত নাই । মহাজনগণ সূত্ররূপে কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন ।

“দাস গোস্বামী” এমন এক অপূর্ব ‘মহান-চরিত্র’ যে তিনি স্বরূপ-দামোদরের আনুগত্যে গৌর-গোষ্ঠি মধ্যে সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ ব্যাপী— নীলাচলবিহারী গৌরহরির ‘অনুরক্ত সেবা’ এবং সঙ্গ-সুখ লাভ করিয়াছিলেন । ফলে, তৎকালে (ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে) যে সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দ † চার ব্রহ্মের বিহার ভূমি মধুর নীলাচলে

* অগণ্য ধন্য চৈতন্যগণানং প্রেমবন্থযা ।

নিষ্ঠোহধন্যজন-স্বাস্ত-মরুৎ শব্দনূপতাম্ ॥

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

† ‘সচল ব্রহ্ম গৌরহরি । অচল ব্রহ্ম জগন্নাথ । দুই স্বরূপের দুই দান— সচল দানে নাম-ব্রহ্ম, অচল দানে অন্ন-ব্রহ্ম । মধুর-নীলাচল মণি—‘চার’ ব্রহ্মের বিহার ভূমি ।’

আসিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই 'পুত্র' ও 'ভৃত্যরূপে সেবা করার সৌভাগ্য (তিনি) লাভ করেন। এ হেন সু-দুর্লভ সৌভাগ্য অন্ত কোন গৌর পরিকরের ভাগ্যে ঘটিয়াছে এমন কথার উল্লেখ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সু-মহান চরিত্রের দিক্‌দর্শনে সহায়তা করে, এইরূপ কয়েকটি গৌর ভক্তবৃন্দের চরিত্র (আংশিক প্রসঙ্গাবলী) এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইতেছে। যে কয়েকটি প্রখ্যাত চরিত্র গ্রহণ করা হইল তাঁহাদের তালিকা—

- ১) শ্রীরূপ প্রসঙ্গে
- ২) শ্রীসনা তন প্রসঙ্গে
- ৩) রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে
- ৪) গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গে
- ৫) বল্লভ ভট্ট প্রসঙ্গে
- ৬) ঠাকুর হরিদাস প্রসঙ্গে
- ৭) জগদানন্দ প্রসঙ্গে
- ৮) রঘুনাথ ভট্ট প্রসঙ্গে
- ৯) বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসঙ্গে

শ্রীরূপ প্রসঙ্গে :

গৌরহরির সন্ন্যাসের সপ্তম কি অষ্টম বর্ষে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া দশ মাস ঠাকুর হরিদাসের কুটিরে অবস্থান করেন। গৌরহরির স্বরূপাদির সঙ্গে নিত্য তাঁহাকে দর্শন দানে ও মধুর প্রসঙ্গে কৃতার্থ করিতেন। রঘুনাথ গৌরহরির সন্ন্যাসের নবম বর্ষে নীলাচলে

আগমন করেন। সুতরাং তিনি শ্রীকৃপের দর্শন পাইয়াছিলেন কি না সঠিক বলা যায় না।

শ্রীকৃপের সহিত গৌরহরির বিবিধ ইষ্ট গোষ্ঠি, যথা—যঃ কৌমার হরঃ শ্লোক প্রসঙ্গ, 'প্রিয় সোহয়ং' শ্লোক প্রসঙ্গ, ঠাকুর হরিদাসের কুঁটারে গৌরহরি ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ সম্মুখে প্রখ্যাত 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' নাটকদ্বয় আশ্বাদন প্রসঙ্গ আদির 'মর্ম্ম' বা তাৎপর্য সহিত স্বরূপ গোস্বামী নিজ প্রাণ প্রিয় পুত্র ও ভৃত্য রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন। স্বরূপের করুণায় তিনি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন যে—

(১) নিগম নিগূঢ় শ্রীচৈতন্যের মনোবৃত্তি প্রকাশ শ্রীকৃপের হৃদয়ে।

(২) গৌরের মনোবৃত্তি মুরতি ধরে শ্রীকৃপ গোস্বামী রূপে বিহরে বসু নিরু স্ভাবে এবং গৌরহরির দ্বিতীয় দেহ স্বরূপের উপদেশ ক্রমে শ্রীকৃপ গোস্বামীকৃত নিম্নলিখিত ইষ্টবন্দনা শ্লোক দুইটি তাঁহার দাবৎ জীবন প্রত্যহ প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাপ্রথম ইষ্ট বন্দনা রূপে সুস্বরে সৃকণ্ঠে গীত উচ্চারণ করিয়াছেন।

(১) অনপিতচরীং চিরাং করুণয়াবতীণঃ কলৌ

সমর্পযতু মূনতোজ্জলরসাং সভক্তি শ্রিয়ম্।

হারঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

—বিদগ্ধমাধব ১।২

অনুবাদ :—চির অনপিত উন্নত উজ্জলরসবিশিষ্ট নিজের সেই ভক্তি দান করিবার নিমিত্তে কৃপায় যিনি (এই) কলিয়ুগে অবতারণ হইয়াছেন, স্বর্ণ হইতেও মনোরম দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, আমার হৃদয়নিকেতন শচীছল ল গৌরহরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে স্ফূরিত হউন।

(২) নিজপ্রনয়িতাং সুখামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
 কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ ।
 স লুপ্তিততমস্ততিশ্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
 বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্য বিচ্যস্তু ॥

—ললিতঃ মাধব ১।২

অনুবাদ :—যিনি জগতে (মায়া কবলিত) জীবের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া নিজ বিষয়ক প্রেম রূপ সুখা বিতরণ করিতেছেন, যিনি সমুদার ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি জগতের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছেন, এবং জগৎবাসীর মনকে স্বীয়, রূপ, গুণ, লীলা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন সেই শচীমায়ের নয়নতারা গৌরহরি সকলের চিত্তে অনির্বচনীয় সুখ দান করুন ।

সনাতনকে নিমন্ত করিয়া গৌরহরি বলিয়াছেন—

‘কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ ‘কীর্তন’ ।’

গৌরহরির মনোবৃত্তি শ্রীরূপ গোস্বামী—সনাতন গোস্বামীর প্রতি ‘কর—শ্রবণ’ ‘কীর্তন’ রূপ আদেশটি তাঁহাব জন্মও প্রযোজ্য, ইহা মানিয়া লইয়া, তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার কীর্তন জন্ম তিনটি অষ্টকে গৌরহরির তিন অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন । প্রথম অষ্টকে গস্তীরার গুপ্তনিধির পুরুষোত্তম ধামে অবস্থানকালীন বর্ণনা, দ্বিতীয় অষ্টকে পুরুষোত্তম হইতে জননী দর্শনের জন্ম গোড়ে আগত গৌরের বর্ণনা এবং তৃতীয় অষ্টকে আবার নীলাচল বিরাজমান বিরহিনী গৌর কিশোরীর বর্ণনার স্থান পাইয়াছে ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রজে যাইবার পর যেদিন রূপ বা সনাতন সঙ্গে থাকিতেন সেদিন তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া চোখের জলে মুখ বুক ভাসাইয়া ঐ অষ্টক তিনটি আবৃত্তি করিতেন এবং যেদিন একাকী থাকিতেন সেদিন নিজেই ঐ অষ্টক তিনটি রূপ, সনাতন

ও গৌরের বিরহ প্রশমন জন্য চোখের জলে ভগ্ন কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেন।

বর্তমান কালেও দেখা যাইতেছে যে, কি গৃহী কি সন্ন্যাসী সমস্ত বৈষ্ণবেই প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরু-বন্দনা আদি কীর্তন পাঠ করেন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে জাগে যে, গৌরহরির প্রকট বিহার সময় হইতে এ ধারা প্রবর্তিত। এবং সে সময়ে বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীকৃপা গোস্বামী কৃত নিচে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যষ্টক তিনটি প্রত্যহ কীর্তন বা পাঠ করিতেন।

শ্রীচৈতন্যষ্টক

(১)

সদোপাস্ম্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমল্লুজকাঠৈঃ প্রণযিতাং
বহদ্ভির্গৌর্বাণৈর্গিরিশপষমেষ্টিপ্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্ত্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুগদিশন্
ন চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্ম্যতি পদম্ ॥ ১ ॥

শিব-বিরিঞ্চি আদি দেবতা নিকর ।
নরবপু ধরি যাঁরে সেবে নিবস্তুর ॥
স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণে যিনি ।
নিজ ভজন প্রণালী উপদেশ দানি'—
কৃতার্থ কবিলি ; সেই সৌন্দর্য্য আধার ।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ১ ॥

সুরেশানাং ছুর্গ ; গতিরতিশযেনোপনিষদাং
 মুনীনাং সর্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা ।
 বিনির্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাশুজদৃশাং
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ত্যতি পদম্ ॥ ১

ইন্দ্রাদি সুরবর ভয়ত্রাতা যিনি ।
 উপনিষদ বেদাদির লক্ষ্য যাবে যানি ॥
 মুনিঋষি সাধু-হৃদি-সরবস ধন ।
 ভক্তের সদনে যিনি মধুময় হ'ন ।
 ব্রজবালা সকলের যিনি প্রেমসার ।
 কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ২ ॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈতদযিতঃ
 প্রপন্ন শ্রীবাসো জনিতপরমানন্দগবিমা ।
 হরিদীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেকতবলঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্ত্যতি পদম্ ॥ ৩ ॥

যাঁর কৃপাপাত্র স্বরূপ মহামতি ।
 যিনি হ'ন অদ্বৈতের প্রিয়তম অতি ॥
 ভক্তবর শ্রীবাস যাহাতে প্রপন্ন ।
 পরমানন্দের যিনি বাড়াইলা মাণ্ড ॥
 মায়াহারী দীনগতি জগত ঈশ্বর ।
 উদ্ধারিতে গজপতি করুণা বিস্তার ॥
 সর্বগুণনিধি যিনি অবতার সার ।
 কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৩ ॥

রসোদ্দামা কামাৰ্বুদমধুরধামোজ্জ্বলতনু
 র্ঘতিনামুক্তংসস্তুরনিকরবিছোতিবসনঃ ॥
 হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবমাঙ্গিকরুচা
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্যতি পদম্ ॥ ১

ভক্তিরসানন্দাবেগে উনমত যিনি ।
 অঙ্গ কান্তি হয় অৰ্বুদ কন্দর্প জিনি ॥
 মুনিঋষি শিরোমণি সর্ব অর্থ সার ।
 প্রভাত অরুণরশ্মি বসনাভা য়াঁর ॥
 কনক কান্তি যিনি অধর কান্তি য়াঁর ।
 কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৪ ॥

হরেক্ষেত্ৰাচৈঃ স্কুরিতরসনো নামগণনা-
 কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।
 বিশালাক্ষা দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভূজেঃ
 স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোৰ্যাস্যতি পদম্ ॥ ২ ॥

উচ্চারিতে হরেক্ষেত্র য়াঁহার রসনা ।
 নৃত্য করে অবিরত হ'য়ে একমনা ॥
 গ্রন্থিকৃত কটিসূত্র নাম গণিবারে ।
 সুশোভিত সুন্দর বাম করে ধরে ॥
 বিশালাক্ষ আজানুলম্বিত ভূজ য়াঁর ।
 কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৫ ॥

পয়োরাশেশ্তীরে স্কুরুপবনমালীকলনয়া
 মূহূৰ্ন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ ।

কচিং কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যশ্চতি পদম ৬ ॥

হেরিয়া সমুদ্র তীর রমা উপবন ।
পদযে হইত ঝাঁর স্মৃতি বৃন্দাবন ।
অধৈর্য্য হইয়া নৃত্য প্রেমানন্দ ভবে ।
বসনা ঝাঁহাব সদা কৃষ্ণনাম কবে ॥
ভকতি রসিক সেই 'বস অবতার' ।
কবে দিবে দর্শন চৈতন্য আমার ॥ ৬ ॥

বথাকটস্থানাধিপদবি নীলাচলপতে-
বদভ্রপ্রেমোন্মিস্কুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ ।
সহর্ষং গায়ন্তিঃ পবিতৃততনুবৈষ্ণবজ্ঞৈঃ ।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যশ্চতি পদম্ ॥ ৭ ॥

বথাকট জগন্নাথ দেবের সম্মুখে ।
যখন বৈষ্ণব পথে নৃত্য কবে সুখে ॥
তা' সবার সঙ্গী হ'য়ে নৃত্যোল্লাসে যিনি ।
পুলকে বিবশ অঙ্গ দিবস যামিনী ॥
মনের হরিষে যি'হো নাচে বহুবার ।
কবে দিবে দর্শন চৈতন্য আমার ॥ ৭ ॥

ভুবং সিঞ্চনশ্ৰুতিভিবভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাক্ষো নীপস্তবকনবকিঞ্জক্জযিভিঃ ।
ঘনশ্বেদস্তোমস্তিমিততনুকংকীর্তনসুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপিদৃশোর্যশ্চতি পদম্ ॥ ৮ ॥

ধবাতল সিক্ত করি প্রেমাশ্রু ধারায় ।
 কীর্ত্তন আনন্দে যিঁহো জগত ভাসায় ॥
 কদম্বকেশর জিনি পুলক শরীরে ।
 সর্ববর্ণরীর সিক্ত ঘন ঘর্ম্মনীরে ॥
 নয়নানন্দকর প্রেম মুরতি যাঁহান ।
 কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার ॥ ৮ ॥

মধীতে গৌরাজ্ঞ স্বরণপদবামঙ্গলতবঃ
 কনৌ বোবি শ্রুতক্ষুব্দমলধীবষ্টকমিদম ।
 পনানন্দে সত্ত্বস্তদমলপদ'স্তোজযুগলে
 পবি দ্বাবা তন্য সুবতু নিতবাং প্রেমলহবা । ৯ ॥

বুদ্ধিমান সুধীজন শ্রদ্ধাসত্কাবে ।
 চৈতন্য অষ্টক যদি নিত্য পাঠ কবে ॥
 শ্রীগৌরাজ্ঞ-প্রেম হৃদে উজলিবে তা'ন ।
 কাপ গোসাঞির এই প্রার্থনা সাব ॥ ৯ ॥

শ্রীকাপ গোস্বামী নীলাচলে দশমাস অবস্থান স্থলে
 গৌরহরির যে সকল মধুব নবুব লীলা ও শ্রীঅঙ্গে বিকাবা-
 বলি সচক্ষে দর্শন কবিযাছিলেন, সেইগুলি, 'অক্ষবে
 যতনুব প্রকাশ কবা যায় তাহা গ্রহ অষ্টকে দখা যায় ।

গৌর সঙ্গ হাবাইয়া শ্রীকাপ ও শ্রীনাথন তাঁহাদেব
 ব্রজবাস কালে 'প্রতিটি দিন' ৫৫ অষ্টকটি আবৃত্তি
 কবিতেন ও ব্রজের 'রজে' 'ডায়াডি দিয়া উঠে সবে ক্রন্দন
 করিতেন ।

এবহ উপনামেন একমাএ উপায় 'মিলন প্রসঙ্গ'

তাই, নিজেদের গৌর বিরহ উপশমের জন্য শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন এই 'মহৌষধি' নিত্য পান করিতেন ।

আমাদের রঘুনাথ তাঁহার ব্রজবাস কালে 'শ্রীরূপ হৃদকেতন' ও 'শ্রীসনাতনের গতি' গৌরহরির বিরহ জ্বালা উপশম জন্য স্বরচিত গৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু এবং শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বিরহ জ্বালা উপশম জন্য এই অষ্টকটি নিত্য বা অপতিত ভাবে আবৃত্তি করিয়া ব্রজের রজে গড়াগড়ি যাইবেন ।

(২)

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমাভযজন্তে দ্যুতিভরা
দক্ষুঃ কৃষ্ণাঙ্গংমথবিধিভিরুংকীর্তনমযৈঃ
উপাস্যঞ্চ প্রাহর্ষমখিলচতুর্থাশ্রনজুষাং
স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১ ॥

কলিযুগে সুধীগণ 'নাম যজ্ঞে' যাঁরে ।
ভক্তিভরে নিরবধি উপাসনা করে ॥
কৃষ্ণ হ'য়ে গৌর যিনি রাধাকান্তি ভারে ।
চতুর্থাশ্রমী পরম হংস নিত্য পূজে যাঁরে ।
পবন পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ১ ॥

চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদনপদং
জয়োদঘোষৈঃ সম্যগ্ বিরচিতশচীশোকহরণঃ ।
উদঞ্চমার্ভুৎদ্যুতিহরতুকুলাঞ্চিতকটিঃ
স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥

হরিনাম সংকীৰ্তনে ভক্ত গৃহে গৃহে ।
 স্বনাম ঘোষণা করি ফিরে রাত্রি দিবে ॥
 শোকাতুরা জননীৰ দুঃখ গেল দূরে ।
 অরুণ বসন যাঁর কটিশোভা করে ॥
 পরম পুরুষ সেই পরমেষ্টি গুরু ।
 শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ২ ॥

অপারং কস্মাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকৌ
 রসস্তোমং হৃদ্বা মধুরমুপভোক্তুং কনপি যঃ ।
 রুচং স্বামাবব্রে ছ্যতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৩ ॥

ব্রজবালা রূপকান্তি শুধা অপহরি ।
 আশ্বাদিতে মধুরস মনপ্রাণ ভরি ॥
 স্বরূপ গোপন করি' গৌররূপে যিনি ।
 মাতাইলা চরাচর অখিল মেদিনী ॥
 পরম পুরুষ সেই পরমেষ্টি গুরু ।
 শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু । ৩ ।

অনারাধ্য প্রীত্যা চিরমসুরভাবপ্রণঃয়িনাং
 প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি ।
 অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দমধুরঃ
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥

তামসী দেবতাসেবী বুদ্ধিজ্ঞানহারা ।
 অসুরের ভাবযুক্ত ব্রাহ্মণ যাঁহারা ॥

(তা'দের) অনুপাশ্রয় হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর ।
 শুদ্ধমতি দ্বিজ পূজ্য নিত্য নিরন্তর ॥
 সতরু আনন্দময় পরমেষ্ঠি গুরু ।
 শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোবে দয়া কর ॥ ৪ ॥

গতির্যঃ পুণ্ড্রাণাং প্রবৃষ্টিঃ শিবদ্বীপমতিমা ।
 ভবেনালংকুর্কবন্ ভুবনমতিত° শ্রোত্রিয়কুলম ।
 পুনাত্যঙ্গীকারাদভুবি পরমহংসাশ্রমপদং
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ রূপযতু । ৫

পুণ্ড্র-দশ ভক্তগণ নিহে তনুভানি
 নদীয়া নতিমা বাণি নিহে প্রাণানি ॥
 বেদোজ্জল বিষ্ণু'বান তংগে শনমিয়া
 জগৎপূজ্য তহলেন বংশ উচ্চলি ॥
 অঙ্গীকার কবি পরমহংসাশ্রম ।
 পবিত্র করিলা শক্তি শিখাইলা উত্তম ।
 পবম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু
 শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোবে দয়া কর । ৫

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুনমিহ নামামৃতরসং
 দৃশোদ্বীরা বস্তং বমতি ঘনবাম্প্যানুমিষতঃ ।
 ভুবি প্রেম্ণস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লাসিততনু
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ রূপযতু ॥ ৬ ॥

‘তদিনামামৃতরস’ পান কবি’ মুখে ।
 অশ্রু ছলে উঘারয়ে সেই রস আঁখে ॥

প্রেমে উল্লসিত তনু প্রেমতত্ত্বসার ।
 জগজনে শিক্ষা দিতে চেষ্টা অনিবার ॥
 পরম পুরুষ সেই পদ্মেষ্ঠি গুরু ।
 শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৬ ॥

তনুমা বিক্ষুব্বন্ নবপুরটভাসং কটিলসং-
 করঙ্কালঙ্কারস্তু রূপগজরাজাঙ্কিতগতিঃ ।
 প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্মাল্যরুচিভিঃ
 স দেবশৈচতন্যাকৃতিরতিতরুং নঃ কুপয়তু ।

[পথে গমন করিলে সকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে, এই ভাবে যিনি কখনও কখনও তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন।] ৩৭কালে যিনি অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল শ্রীমতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, ষাঁহার কটিতে নাবিকেল মালাব জলপাএ মলঙ্কারের মত শোভা পাইতেছে। যুবক গড়রাজের মত যিনি শ্রাবণের তেলিয়া ছলিয়া চলিয়াছেন।

[তীর্থপথে দেবালয়ে দেবালয়ে] শ্রীভগবানের প্রসাদ ও মাল্যাদি নির্মাল্যে অনুরাগ দেখাইয়া যিনি আপন প্রিয়বর্গকে—
 “তোমরাও এইরূপে ভগবান্নির্মাল্যে আদর করিও” এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, সেই চৈতন্যকৃতি দেবতা আমাদের প্রতি অতিশয় করুণা বিস্তার করুন।’ —শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

স্মিতলোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
 গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।

পদালম্বুঃ কংবা প্রণযতি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশৈচতন্ত্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়া ॥ ৮ ॥

সর্বশোক হরে যঁর কটাক্ষ কৃপায় ।
ভুবন মঙ্গল ভাষে জীবেরে নাচায় ॥
পদাশ্রয়ে হয় যঁব কৃষ্ণা প্রেমোদয় ।
সর্বঅবতাব সার গোবরসময় ॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠি গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৮ ॥

শচীসূনোঃ কীর্তিন্তুবকনবসৌরভ্যনিবিভং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পঢ়াষ্টকমিদম্ ।
সলক্ষ্মীবানেতং নিজপদসবোজে প্রণযিতাং
দদানঃ কল্যাণী মনুপদমবাধং সুখযতু ॥ ৯ ॥

“গোবা” গুণগন্ধবাহী পুণ্য পঢ়াষ্টক ।
প্রীতমনে যেইজন পাঠ করিবেক ॥
পরম কল্যাণ তার হইবে নিশ্চয় ।
দয়াময় শ্রীগৌরান্গ দিবে পদাশ্রয় ॥ ৯ ॥

(৩)

উপাসিতপদাস্বুজস্বমনুরক্তকদ্রাদিভিঃ
প্রপত্ত পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ ।
সমস্তনতমগুণীশুরদভীষ্টকল্পক্রমঃ
শচীসুত । মযি প্রভো । কুরু মুকুন্দ । মন্দে কৃপাম্ । ১

রুদ্রাদি দেবতাগণ নররূপ ধরি ।
 যঁার পদ সেবা কৈলা বহু যত্ন করি ॥
 জগন্নাথক্ষেত্রে যিনি ভ্রমেন আনন্দে ।
 অতীষ্ট ফল দেন নিজ ভক্তবৃন্দে ॥
 মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বস্তুর ।
 মন্দ আমি মহাপ্রভু ! মোরে দয়া কর ॥ ১ ॥

হু বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
 ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্বভৌমাদয়ঃ ।
 পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতে' নমস্তে পরং
 শচীসুত । ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ২ ॥

স্বকপবর্ণনে যঁার সমর্থ না হয় ।
 সার্বভৌমাদি পণ্ডিত নিচয় ॥
 ব্যাস বৃহস্পতিসম সূক্ষ্মবুদ্ধি সুধী ।
 গুণানুসন্ধানে যঁার না পান অবধি ॥
 মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বস্তুর ।
 মন্দ আমি মহাপ্রভু । মোরে দয়া কর ॥ ২ ॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্বিরপ্যাহিতং
 স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্গুরুতরাবতারাস্তুরে ।
 ক্ষিপন্নসি রসাস্বুধে ! তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
 শচীসুত । ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৩ ॥

বেদ উপনিষদে নাই যে রত্ন ভাণ্ডার ।
 কৃষ্ণ অবতারে যাহা না হ'ল বিস্তার ।

সেই প্রেম ভক্তি রত্ন দিয়া অকাতরে ।
 ধন্য কৈলা ভবে যিঁহো কলির জীবেরে ॥
 মোর প্রভু শচীশুত সেই বিশ্বস্তর ।
 মন্দ আমি মহাপ্রভু মোরে দয়া কর ॥ ৩ ॥

নিজপ্রণয়বিস্মুরনটনরঙ্গবিস্পাপিত
 ত্রিনেত্র । নতমগুলপ্রকটিতানুরাগামৃত ।
 অহঙ্কাতকলঙ্কিতোদ্ধতজনাদিদুর্কোষ হে !
 শচীশুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৪ ॥

সঙ্কীর্ণনে নৃত্য করি বিবিধ প্রকার ।
 বিমোহিত করি যিনি শিব অবতার ॥
 সঞ্চারিলা অনুরাগামৃত ভক্ত প্রাণে ।
 অহঙ্কারী মূঢ়জন কে বুঝিবে তানে ॥
 মোর প্রভু শচীশুত সেই বিশ্বস্তর ।
 মন্দ আমি মহাপ্রভু মোরে দয়া কর ॥ ৫ ॥

ভবন্তি ভুবি যে নরাঃ কলিতদ্বক্ষুলোৎপত্তয়-
 ত্তমুদ্ধরাসি তানপি প্রচুরচারুকারুণ্যতঃ ।
 ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাস্রিতস্ত্বামহং
 শচীশুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৬ ॥

নীচজাতি নীচজনে দয়া করি যিনি ।
 কেশে ধরি উদ্ধারিলা মহাপাপী জানি ॥
 যাঁহার করুণা বলে হইলা নিস্তার ।
 পাপাচারী পাষণ্ডী যত ছুরাচার ॥

মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বস্তব ।
মন্দ আমি মহাপ্রভু । মোবে দয়া কব ॥ ৫ ॥

মুখানুজপরিস্থলনমৃহুলবান্ধুলীরস-
প্রসঙ্গজনিতাখিলপ্রণতভৃঙ্গবঙ্গোৎকর ।
সমস্তজনমঙ্গলপ্রভবনামরত্নানুধে ।
শচীসুত । মগি প্রভো । কুক মুকুন্দ । মন্দে কৃপাম্ ॥ ৬ ॥

যার, মুখপদ্ম বিনিঃসৃত সুধাবস ধ বা ।
নিরবধি পান করি ভকত ভ্রমবা ॥
প্রম'নন্দে বিগলিত নিভা 'নবন্দন ।
ভুবন মঙ্গল যিনি নাম রত্নাকর ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বস্তর ।
মন্দ আমি মহাপ্রভু । মোবে দয়া কব ॥ ৬ ॥

মৃগাক্ষমধুরানন । স্মুরদনিদ্রপদেঙ্গণ ।
স্নিতস্তবক সুন্দনাধব । বিশ্বটোবস্তট
ভূগোদ্ধতভুৎঙ্গমপ্রভ । মনোতকোটিছ্যাতে ।
শচীসুত । মগি প্রভো । কুক মুকুন্দ । মন্দে কৃপাম্ ॥ ৭ ॥

পূর্ণচন্দ্র সমতুল ষাঁহাব বদন
প্রফুল্লপঙ্কজ জিনি বিশাল নন ।
অধরোষ্ঠ মধুহাস্য কুসুমে শোভিত ।
পরিসর বক্ষঃস্থল আজানুগম্বিত ।
উদ্ধত ভুজঙ্গ সম বাহুর গঠন ।
কোটি কন্দর্প জিনি কান্তি সুশোভন

মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বস্তুর ।
মন্দ আমি মহাপ্রভু ! মোরে দয়া কর ॥ ৭ ॥

অহং কণককেতকীকুম্ভগোর ! ছুষ্টঃ ক্ষিতৌ
ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেহপি তে ।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ! হ্রাং ভজে
শচীসুত ! ময়ি প্রভো ! কুরু মুকুন্দ ! মন্দে কৃপাম্ ॥ ৮ ॥

কণক কেতকী গোর জীবন আমার ।
নানা দোষে ছুষ্টমতি মুই পাপাচার ॥
অদোষ দরশী প্রভু দোষ না দেখহ ।
সেই গুণে ভজি তোমা মুঞি অহরহ ॥
মোর প্রভু শচীসুত তুমি বিশ্বস্তুর ।
মন্দ আমি মহা প্রভু ! মোরে দয়া কর ॥ ৮ ॥

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ! ভবৎপদাক্ষেযু যে
নিবিষ্টমনসো নরাঃ পরিপঠন্তি পদ্মাষ্টকম্ ॥
শচীহৃদয়নন্দন ! প্রকটকীর্তিচন্দ্র ! প্রভো ।
নিজপ্রণয়নির্ভরং বিতর দেব ! তেভ্যঃ শুভম্ ॥ ৯ ॥

হে 'ধরণী-মণ্ডলোৎসব-কীর্তিচন্দ্র' !
শচীহৃদয়নন্দন আনন্দকন্দ ॥
এই পুণ্য স্তোত্র যিনি পড়িবেন নিত্য ।
প্রেমসম্পত্তি দানে কর' তারে মত্ত ॥

নোট :—এই তিনটি শ্রীশ্রীচৈতন্যষ্টক রত্নের যে বঙ্গানুবাদ
(পয়ারে) দেওয়া হইল, সেগুলি পরম ভাগবত—

বৈষ্ণবকুলভূষণ শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ মহাভারত রচয়িতা প্রখ্যাত শ্রীল হরিদাস গোস্বামীর স্বরচিত পয়ার।

(২) দ্বিতীয় অষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকের বাংলা পয়ার উক্ত শ্রীল হরিদাস গোস্বামীকৃত না পাওয়ায় অন্যতম প্রখ্যাত বৈষ্ণবকুলভূষণ শ্রীল অতুলচন্দ্র গোস্বামীর বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

(৩) শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী রচিত এই—শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টক রত্ন তিনটির সংস্কৃত টিকা শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ করিয়াছেন।

(৪) এই অষ্টক তিনটি “অমৃতের প্রস্রবণ” ও ইহাতে অনন্ত সুরসাল ‘দিক’ আছে। এই শ্রীগ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক বোধে আমরা সে সব আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

—••—

ইতিহাস—এই গ্রন্থে ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠায় বিদ্রুত

‘ললিত মাধব’ ও ‘বিদগ্ধ মাধব’ সম্বন্ধে—

এই উভয় গ্রন্থই আংশিক বচিত হইয়া নীলাচলে ঠাকুর হরিদাসের কুটিরে আলোচিত হইয়াছিল। গ্রন্থদ্বয় সর্ব সাধারণের জ্ঞাত আগ্রপ্রকাশ করে ‘গৌরহরির অপ্রকটেব পরে।

(২) শ্রীসনাতন প্রসঙ্গে—

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সপ্তগ্রামে অবস্থান কালেই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর অপূর্ব জ্ঞান, ভক্তি ও নানা সু-মধুর ‘চতুরাবলী’র প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়াছেন। সে সবে মধ্য রঘুনাথের মনে বিশেষ রেখাপাত করিয়াছিল। যথা—

(ক) স্থান কানাই নাটশালার নিকট গৌড় নগর :

শ্রীসনাতন বাদশাহের মন্ত্রী। তিনি দেখিলেন লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া 'নদীয়া জীবন' শ্রীগৌরাজ 'বৃন্দাবন' যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। তিনি গৃহী ও যবনসেবী। আর 'গৌরহরি' বর্তমানে সন্ন্যাসবেশধারী। তাঁহার উপদেশের সমক্ষেত্র কোথায়? 'ভক্তি রসেব' বিচিত্র লীলায় তিনি বলিয়াছিলেন—

যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি *
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি।

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬

(খ) স্থান : কাশীধাম (চন্দ্রশেখরের বাড়ী) ।

(১) বিচিত্র চরিত্র সন্ন্যাসী গৌরহরির সহিত প্রথম মিলনে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিলেন—
কে আমি ?
প্রশ্নের কি অপূর্ব চতুনা।

তখন শ্রীল সনাতন রাজমন্ত্রী। তিনি সর্ব-শাস্ত্র-বিদ এবং আচার্য্যবর্ষা। তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে “বেদ” ঈশ্বরের নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত। নিঃশ্বাসের গ্রহণ বা ত্যাগের জন্য ‘মন’ বা ‘বুদ্ধির’ প্রয়োজন হয় না। “কে আমি” প্রশ্নের ‘বেদ নিদ্দিষ্ট’ উত্তর সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সমস্ত কথা সবিশেষ আমার জানা আছে। আমার সৌভাগ্যে আজ যখন স্বয়ং ভগবানকে সম্মুখে পাইয়াছি তখন তাঁহার শ্রীমুখে এই “চিরন্তন” প্রশ্নের যে উত্তর পাইব তাহা মন, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা প্রকাশ পাইবে। সুতরাং স্বয়মাগত নিঃশ্বাস ‘প্রসূত বেদবাক্য’ হইতে অবশ্যই উত্তম ও মধুর হইবে। এবং তাহা ঘটিয়াছে। যথা—

পাঠান্তর লোকেব সংঘটি। তাৎপর্য্য অসংখ্য লোক।

জাব--তত্ত্বতঃ কৃষ্ণদাস (প্রসিদ্ধ ভাষা--স্বরূপে কৃষ্ণদাস)

(১) আবার--

‘কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপ ত্রয় ?

ইহা নাহি জানি কেমন হিত হয় ?

সাধ্য সাধনা তত্ত্ব পুচ্ছিতে না জানি ,

কৃপা করি ‘সব তত্ত্ব’ কহত আপনি ? চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

শ্রীমদাত্মতন্ত্র উপন্যাস প্রণেতা কবি দ্বিবার সময় প্রসঙ্গত
গৌরহরি বলিলেন—

কৃষ্ণনাম সংকীর্ণন কলিযুগের ধর্ম ।

পাতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন ;

‘প্রেমভক্তি’ দিল লোকে লক্ষ্য ভক্তগণ ।

ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ;

এমে ‘যে নাচে গোক করে মন্দীওন ।’ — চৈঃ চঃ মধ্য ১০শ

গৌরহরির এই বাক্য শ্রবণ মনেই পবন উল্লাসের সঞ্চিত
শ্রাবণ মন ভঙ্গীপূর্বক প্রশ্ন করিলেন—

“কেনে জানির কলিতে কান অবতান ?”

‘ভ্রম ভগবান’ গৌরহরি শ্রীমদাত্মতন্ত্রের এই প্রশ্নে মনে মনে
বুঝিলেন--

‘রক্ষা নাই, আজ ধরা পড়িলাম’ । তবুও সু-কৌশলে
তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিলেন না । গৌরহরির পরাজিত
অবস্থা দেখিয়া “প্রণয়” উল্লাসে শ্রীমদাত্মতন্ত্র বলিলেন--

... ..—“যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ ;

পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদান-সংকীৰ্ত্তন ।

কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় ;

সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয় ।” —চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি শ্রীবঘুনাথের পূর্ব হইতেই প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা । অথচ চাম্বুষ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেনি । এক্ষণে নীলাচলে, ‘নিজ মনোমত গোষ্ঠি মধ্যে সেই ‘সনাতন গোস্বামী’কে পাইয়া তাঁহার আনন্দের সীমা নাই ।

শ্রীকপ গোস্বামী নীলাচল হইতে গমন করিবার দশদিন পরেই ঝাড়িখণ্ড পথে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছেন । যথা,—

“প্রভু কহে—ইহা রূপ ছিল দশ মাস ,

ইহা হৈতে গোড়ে গেলা হৈল দিন দশ ।” —চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর দেহে ‘কুণ্ডবসা’ বৃত্তান্ত, অগ্নিসম সমুদ্রের উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া যমেশ্বর টোটায় গমন , সনাতন জগদানন্দ প্রসঙ্গ, ঠাকুর হবিদাসের উপস্থিতিতে সনাতন গৌবহবি প্রসঙ্গ আদি বঘুনাথ কতক স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং অবশিষ্টগুলি নিজ প্রভু স্বরূপের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছেন ।

একটি ঘটনা—

গৌরহরি শ্রীসনাতনকে তাহার নিজের যাজনের জন্য কৃপাদেশ করিয়াছেন—

‘কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কব শ্রবণ কীর্ত্তন ,

অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন’ ।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

গৌরহরির এই উপদেশ অথবা কৃপাদেশ অনুযায়ী শ্রীল সনাতন গোস্বামী অপতিত ভাবে “শ্রবণ” ও “কীর্ত্তন” করিয়াছেন । যথা—

(১) নীলাচল ও বৃন্দাবনের মধ্যে সর্বদা পদব্রজগামী পত্র বাহক

সেবকদল এবং বৈষ্ণবদের যাতায়াত ব্যবস্থা তাহারই আয়াস ও যত্নে স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাবে গৌর ও গৌর-পরিকরবৃন্দের নীলাচল বিহারের প্রতিটি সংবাদ শ্রবণ করিতেন।

(২) গৌরহরির নীলাচল বিহারের যতটুকু অংশ তিনি ও শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন সেগুলির একটি অষ্টক এবং অন্যান্য শ্রুত লীলাবলীর দুইটি অষ্টক এই প্রকারে তিনটি অষ্টক * শ্রীকৃষ্ণ দ্বারে প্রণয়ন করাইয়া উভয় ভ্রাতা

“সঃ চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশ্যোঁর্ষাশ্চ্যতি পদম্”

‘কীর্তন’ করিতেন ও ব্রজের ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেন।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী। শ্রীগৌরাজের অদর্শনে ব্রজে গমন পূর্বক তিনিও ঐ ‘শ্রবণ’ ও ‘কীর্তন’ যাজনে তাঁহাদের (শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতনের) পরম আদরের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

আর একটি সু-গম্ভীর ঘটনা—

সে দিন ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পথে, প্রান্তরে ও নদীতটে যত যত মন্দির ও বিগ্রহ ছিলেন সমস্ত ভগ্নস্বূপে পরিণত। দিল্লীর কাছে হিন্দুর প্রিয় মথুরাপুরীতে তখন একটিও মন্দির দাঁড়িয়ে ছিল না। সবই আগস্তক ধর্ম বিদ্বেষের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে অতি করুণ এক শ্মশানশয্যায় লুটিয়ে পড়েছিল। গৌরসুন্দর সে দিনের ভারতের ঐ নিদারুণ পরিবেশে দিল্লীর পাশে এবং মথুরার ছায়ার কাছে বৃন্দাবনেই তাঁহার প্রচারের পটভূমি স্থাপনের জন্য করোয়া কন্বাধারী নিষ্কিঞ্চন শ্রীসনাতন গোস্বামীকে আদেশ দিলেন—

“কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা প্রবর্তন।

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ

* ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে এই অষ্টক তিনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রতি উপরি উল্লিখিত বিভিন্ন আদেশের মধ্যে অন্যতম আদেশ—

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিবে

এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরু প্রেবণায় আমাদের কিঞ্চিৎ নিবেদন :

আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য হচ্ছে ভারত। খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর মধ্যে ভারতের কয়েকটি অংশ রাজনৈতিক কারণে সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় দ্রব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। দারণ, থার্কিহেও অর্থাৎ জৈন বৌদ্ধদের আমলে এবং অশোকের সময়টি ছাড়া খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতবাসীর জীবন রাজনৈতিক বোঝে এক সম্বন্ধে ইতিহাসের নজীর সহযোগী সাম্প্র্য দেয় না তবে, বৌদ্ধ জৈন ও পৌরাণিক ধর্মবোধে এক একটি সঙ্ঘের ভাবতায় সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিক বোধ ভারতের একটি অখণ্ড রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজদের ভারত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবাসীর জীবন আকাশে এর উদ্ধে আন ঐতিহাসিক নজীর নাই।

ভারত একটি 'তত্ত্ব'। ভারতের বিশেষ একটি মাত্ত্বিক রূপ আছে এই 'অনুভব' ও 'উপলব্ধি' পঞ্চদশ শকে সচল জগন্নাথ গোরহবির আচারে ও প্রচারে মূর্ত হযে উঠেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনই সেই অখণ্ড সংস্কৃতির সচল মূর্তি।

বুদ্ধ শঙ্করের পরবর্তী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত উদার ভারততত্ত্ব আমাদের মহান ভারতের অখণ্ড ঐতিহ্য সুদৃঢ় করে রেখেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত ভারত তত্ত্ব বিশ্বইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে সব মনীষী জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে বৃহত্তর মানবতার পরিপোষক উদার সংস্কাররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাঁরা অনেক

ভাল কথা বললেও আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরণ পূর্ণ অভিমতের পীঠভূমিতে তা প্রচার করেছেন। আর একথা মনে করার কারণও আছে যে, তাহার বেশী নূতন কথার রূপ অন্তত দেখা যায় না।

(তখন) যাঁরা ছিলেন দেশের রাজশক্তি ও শাসক, তাঁদের স্বপ্নে ও কাজে তখন প্রতিজ্ঞাই ছিল দেশটিকে অহিন্দুর দেশে পরিণত করতে হবে। সেকালে 'বিগ্রহ' ও মন্দিরের ধ্বংস সাধন করা অহিন্দু রাজশক্তির একটি ধর্মীয় অঙ্গই ছিল। এ হেন রাজশক্তি বা ধর্ম বিধ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ স্বরূপ দিল্লীর নিকট বৃন্দাবনে ভক্তিবাদ প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের আদেশ দান করিলেন, এই আদেশ দাতা ও আদেশ পালন কর্তার স্বরূপ 'বৈভব' চিন্তা ও অনুশীলন এ যাবৎ উপযুক্ত রূপে না হওয়ার ফলে আজ দেশে ও জগতে ঘোর অশান্তির দাবানল।

প্রসঙ্গতঃ লিখি—

নবদ্বীপের কাজীর নির্দেশের বিরুদ্ধে জনতার যে অভ্যুত্থান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নেতৃত্বে হয়েছিল ইহাও রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ। ঘটনাটি—

'গৌরহরির নদীয়া বিহার কালে, একদিন সন্ধ্যার সময় নদীয়ার বিচারপতি চাঁদকাজী নদীয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। ইতিপূর্বে তিনি অপূর্ব হরিনামের কথা শুনিয়াছেন। নদীয়ার ছুঁই লোকে নিমাই পণ্ডিতের নামে তাঁহার কর্ণে অনেক কথাই লাগাইয়াছে। সেদিন নদীয়ার পথে বাহির হইয়াই কাজীর কর্ণে উচ্চ হরিনামের সঙ্কীর্ণ ধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহার লোকজন দ্বারা সঙ্কীর্ণের যুদ্ধ মন্দিরা সহ বৈষ্ণব দলকে তর্জন শাসন করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

বৈষ্ণবদিগকে শাসন করিয়া দিলেন, যেন এমন কর্ম্ম আর কেহ না করে। এবং ভয় দেখাইয়া বলিলেন—

“ক্ষমা করি যাও আজি, দৈবে হৈল ষাতি ।
আব দিন লাগি পাইলেই লৈব জাতি ॥”

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ

পবধর্ম্যে অসহিষ্ণু অহিন্দু রাজার ভয়ে নদীয়ার ভক্তবৃন্দ
শঙ্কিত হইয়া শচীতুলাল গৌরহবিব নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে
মনতুঃখ জানাইলেন—

“কাজিব ভযেতে আর না কবি কীর্তন ।
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন ॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্তস্থানে ।
গোচরিল এই ‘তুই’ তোমাব চরণে ॥”

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ

আমাদের গৌবগুণমণি এই কথা শুনিয়া মাত্র বজ্রনাদে হুস্কান
কবিতা বলিলেন—

“(হবিদাস) নিত্যানন্দ । হও সাবধান ।
এই ক্ষণে চল সর্ব বৈষ্ণবের স্থান ॥
সর্ব নবদ্বীপে আজি কবিমু কীর্তন ।
দেখ মোর কোন কর্ম্ম কবে কোন জন ॥”

—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ

তানপর তাহার নিকট আবেদনকারী বৈষ্ণবগণকে লক্ষ্য করিয়া
বলিলেন—

“দেখো আজি পোড়াও কাজিব ঘর দ্বার
কোন কর্ম্ম কবে দেখ বাজা বা তাহার ।
প্রেম ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল ।
পাষণ্ডী গণের হইব আজি কাল ॥

হে আমার ভাই সব তোমরা শীঘ্র যাও এবং—

সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন ॥”

এবং সকলকে বলিবে যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোতুক রঙ্গ দেখিবার জন্য যার যার বাসনা তাহারা সকলে (আজ সন্ধ্যায়) যেন—

‘একো মহাদীপ লই আসিবেক সেই ॥

তিনি আজ কি করিবেন তাহারও পূর্বাভাষ দিলেন । যথা—

‘ভাজিয়া কাজির ঘর কাজির ছয়ার ।

কীর্তন করিমু, দেখো কোন্ কৰ্ম্ম করে ॥’

অতঃপর কাজির অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত নবদ্বীপবাসীগণের মনে সকল প্রকার সংশয় নিরসনের জন্য বলিলেন—

‘অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস ।

মুঞি বিচ্যমানো কি ভয়ের প্রকাশ ?’

উপসংহারে বলিলেন—

‘তিলান্ধেকো ভয় কেহ না করিহ মনে ।

বিকালে আসিব ঝাট করিয়া ভোজনে ॥’

—চৈঃ ভাগবত

সন্ধ্যাকাল আগতপ্রায় । নিজ গৃহের আঙ্গিনা হইতে প্রচণ্ড হুঙ্কার করিয়া ‘গৌরহরি’ হরিধ্বনি করিতে করিতে দীপ জ্বালিবার সঙ্কেত করিলেন । সহস্র কণ্ঠে গগনভেদি হরিধ্বনি উখিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল । নদীয়া নগরীর চতুর্দিক দীপালোকে উজ্জ্বলিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল । নদীয়া বিনোদিয়া গৌরহরি নিজ মন্দির হইতে বাহির হইয়া কীর্তন করিতে করিতে গঙ্গার ধারে পথ লইলেন । এই পথ দিয়া কাজির ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । মহাপ্রভু আজ মনের আনন্দে সর্ব লোক সমক্ষে নব নব ভাবে মধুর নৃত্য ভঙ্গীর সহিত কীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন—এবং তাঁহার পশ্চাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি হরিধ্বনি

করিতে করিতে চলিয়াছে। সঙ্কীৰ্ত্তন পিতা গৌরহরির অগ্রে কীৰ্ত্তনের দল চলিয়াছে। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সৰ্বাগ্রে, তারপর ঠাকুর হরিদাস, তারপর শ্রীবাস পণ্ডিতের দল। এই রূপে ভক্তগণের দল সহ পশ্চাতে গৌরমুন্দর চলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ‘গদাধর’ ও ‘চাঁদ নিতাই’ আছেন। ক্রমে ক্রমে এই অপূৰ্ব সঙ্কীৰ্ত্তনের শোভাযাত্রা গিয়া কাজির বাডীর চৌহদ্দি ঘিরিয়া ফেলিল। অগণিত জনের উদ্দাম কণ্ঠের হরি ধ্বনিতে স্থানীয় লোক চমকিত।

কাজী ভয় পাইয়া নিজ প্রাসাদে বিশেষ প্রকোষ্ঠে আত্মগোপন করেন। গৌরহরি তাঁহাকে ডাকাইলেন। ভীত ত্রস্ত কাজী দীনতার সহিত আসিতেই গৌরহরি সম্মুহ কথা বলিতে লাগিলেন। স্বল্প দর্শন ও অঙ্গ স্পর্শ প্রভাবেই কাজীর হৃদয়েন ভাব একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

নেত্র হইতে কাজির জলধারা পড়িতে লাগিল। তিনি তাঁহাব কৃপা-ভিক্ষা করিলেন।

কাজির বংশধরগণ ধারাবাহিক ক্রমে আজ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুব অনুগত ভক্ত।

‘দেখ মোর কোন কৰ্ম্ম করে কোন জনে’

উপরে বর্ণিত বাণীগুলি সুধু ধৰ্ম্ম নিষ্ঠার বাণী নিশ্চয় নয় তীক্ষ্ণ কৰ্কশ রাজ প্রতাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী। এবং অনেকেই জানেন, এই বাণীতে সংগ্রাম পদ্ধতির যে পরিচয় আছে ‘বারদোলিৰ জনতা’ ছবছ সেই ভাবে সেই প্রকারে সত্যই ঘরে ঘরে দেউটি জ্বালিয়ে ইংরাজ সরকারের অনাচারের নির্দেশ তুচ্ছ করেছিল।

গৌরমুন্দরের রাজনৈতিক ধারণা ও উদ্দেশ্যের দিক দর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়—

বাংলার নবাব হোসেন সাহ উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সে পরিকল্পনার প্রতিবাদ ক'রে অসহযোগ করতে কুণ্ঠিত হননি গৌরকৃপাস্নাত শ্রীসনাতন গোস্বামী হোসেন সাহেরই মন্ত্রী “সনাতন।”

‘লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করতে হলে মুসলিম রাজশক্তির কোপ ভাজন হবার পরিণামও স্বীকার করে নিতে হবে’—

এ বাস্তব সত্যটুকু গৌরহরির নিশ্চয় অজানা ছিল না। তাঁরই নেতৃত্বে অখণ্ড-ভারত-বোধ এবং মূর্তি ও মন্দিরের খাতক সেই ভয়ানক বিদ্বেষের প্রতিরোধ জাগ্রত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাস বচয়িতা পণ্ডিতেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ‘লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার পরিকল্পনার’ বৃহত্তর তাৎপর্য ঠিক বিচার করে বুঝতে পারেননি কিম্বা বিচার করতে ভুলেই গেছেন তাহা মনীষীবৃন্দের অশুশীলনের বস্তু।

কি ছুঁর্তাগ্য। এ হেন সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আমাদের মনে কোন রেখাপাত করেনি। অথচ, দেশের, জাতির, সমাজের কল্যাণ ও মানসিক উন্নতির সহজ উপায় ঐতিহাসিক ভগবান গৌরহরি ও তাঁহার ভক্ত পরিকরবৃন্দের চরিত্র স্কুলে, কলেজের পাঠ এবং সভা সমিতিতে আলোচনা।

(৩)

রায় রামানন্দ প্রসঙ্গে :

‘রঘুনাথ’ নীলাচলে প্রবেশের প্রথম দিন হইতেই প্রত্যহ ‘রামরায়ের’ দর্শন লাভ করিতেছেন। রামরায় ও স্বরূপ দামোদর গৌরহরির যে কিরূপ অন্তরঙ্গ তাহা রঘুনাথ খুব ভাল ভাবেই অনুভব করিয়াছেন।

রঘুনাথ সপ্তগ্রামে অবস্থান কালে গোদাবরী তীরে গৌরহরি ও

রামরায়ের দশরাত্রি ব্যাপি প্রখ্যাত মিলন প্রসঙ্গ সংবাদ পাইয়া-
ছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে রঘুনাথের মনে একটি খটকা—

গোদাবরী তীরে মধ্যাহ্ন কালে, রামরায় গৌরসুন্দরের প্রথম
দর্শন লাভ করেন। সে সময় তিনি তাঁহাকে ‘সন্ন্যাসী স্বরূপ’
দেখিয়াছেন। কিন্তু সেই দিন রাত্রি হইতে পর পর দশরাত্রি
—রাত্রির প্রথম প্রহর হইতে শেষ প্রহর পর্য্যন্ত তিনি গৌরহরির
সন্মিকটে উপবেশন করিয়াছেন, পরম ঘনিষ্ঠতায় ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন
এবং সর্বদাই তিনি সন্ন্যাসী স্বরূপের পরিবর্তে দেখিয়াছেন—

“কাঞ্চন প্রতিমার গৌরকান্তিতে আচ্ছাদিত—গোপবেশ
বেতুকর শ্যামসুন্দর”—

এই ঘটনাও রঘুনাথের খটকার হেতু নয়।

তারপর দশম রাত্রিতে রামরায় গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন
করিলেন—

“এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ;
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ।
পহিলে দেখিছু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ ;
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ।”

এবং প্রার্থনা জানাইলেন—

“অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার ।”

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

রঞ্জিয়া রসিয়ঃ গৌরহরি স্মিত হাস্যে বলিলেন—“তুমি পরম
ভাগবত। আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াও তুমি তোমার ইষ্টদেবকেই
দেখিতেছ ইষ্টে গাঢ় অভিনিবেশ জন্ম আমার কপ দেখিতে পাইতেছ
না।”

রামরায় নিজ সংশয়ের নিজেই মনে মনে মীমাংসা করিয়া পরে গৌরহরিকে উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌরহরির চাতুরী-পূর্ণ আত্মগোপন চেষ্টা দর্শনে, প্রণয় কোপ সহকারে তিনি বলিলেন—

“প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি ;
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।”

এই বলিয়াই নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন—

“রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার ;
নিজরস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ।
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আশ্বাদন ;
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ।”

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

এখন কপটতা ছাড়। নিজমুখে স্বীকার কর।

গৌরহরির হাসি এবার আরও কৌতুকময় হইল। তিনি আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলিলেন—

“প্রিয় রামরায় ! তুমি যাহা অনুমান করিয়াছ তাহা আংশিক সত্য। যাহা হউক, প্রথমেই তুমি প্রার্থনা করিয়াছ “অকপটে কহ” কিন্তু, বন্ধু ! এ ত’ বলার নয়, এ কেবল চোখে দেখার জিনিষ। তোমাকে দেখার চোখ দিচ্ছি, এবার চেয়ে দেখ। যথা—

“তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ—
“রসরাজ মহাভাব” ছই এক রূপ।”

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

রঘুনাথের খট্কা—এর পরের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া—

“দেখি রামানন্দ হৈলা ‘আনন্দে মুচ্ছিতে’

‘ধরিতে না পারে দেহ’ পড়িলা ভূমিতে ।’

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

রঘুনাথের মনের প্রশ্ন—রামরায় সম অধিকারী এমন কোন্
‘রসরাজ’ ও এমন কোন ‘মহাভাব’ স্বরূপ দ্বয়ের—‘বিলাস’ বা
একীভূত অবস্থা দেখিলেন যাহার ফলে তাঁহার অবস্থা—

“ধরিতে না পারে দেহ ও আনন্দ, মুর্ছা”

তারপর ‘সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হইল মন ।”

—চরিতামৃত মধ্য ৮ম

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর স্বল্লাক্ষরে বর্ণিত এই ঘটনার উদঘাটন
দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীপাদ রামদাস রাবাজী মহাশয়ের কীর্তনে ও
প্রসঙ্গের মধ্যে । খুব সংক্ষেপে তাহা নীচে বর্ণিত হইতেছে ;
যথা—

(১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী গৌরহরির সন্ন্যাস বেশ
“শ্রীনিত্যানন্দ” :

(২) “বিবর্ত্তে বিলাস রঙ্গ ঘটে” এ অশুভব রামরায়ের ছিল না ।
তাই গোদাবরী তীরে “রসরাজ গৌর” ও “মহাভাব নিতাই” এই দুই
এর একত্র মিলন দর্শনে রামরায়ের “আনন্দ মুর্ছা” ।

(২)

রঘুনাথ বিশিষ্ট জমীদারের পুত্র । বাল্যে ঠাকুর হরিদাসের
কৃপা তাঁহার উপর প্রবলভাবে বর্ষিত হইয়াছে । জাগতিক বিষয়
বৈভবকে শূকরী বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্য করুণা

বাতুল। ফলে, তিনি রাজোচিত বৈভব হইতে দূরে পলাইয়া আসিয়াছেন।

রায় রামানন্দও রাজতুল্য পুরুষ। কিন্তু তিনি তাঁহার বিষয় বৈভবকে নিজ ভোগের উপকরণ করেন নাই। রায় রামানন্দের এই অসাধারণ সামর্থ্যটি তিনি নীলাচলে আসিবার পর হইতেই দেখিতেছেন।

সেই অপূর্ব প্রভাব রাজর্ষি রামরায় একটি অপার্থিব গুণের পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন জানিয়া রঘুনাথ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন।

ঘটনাটি—

একদা শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ ও লীলার কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছায় প্রহ্মম মিশ্র গৌরহরির পরামর্শে রামরায়ের প্রাসাদে গমন করেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রামরায় বাডীতে নাই। তাঁহার সেবকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে—

রায় এখন নিভূতে উড়ানে আছেন। নৃত্যগীতে নিপুণা পরমা সুন্দরী কিশোর বয়স্কা দুইটি “দেবদাসী”কে * রায় রামানন্দ নিজের ‘রচিত’ জগন্নাথ বল্লভের নাটকের অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেছেন। অর্থাৎ জগন্নাথ বল্লভ নাটকে যে সকল গান আছে ও আলাপ প্রসঙ্গ আছে সে গুলির প্রকাশ ভঙ্গীর সময় সুর তান লয় যোগে গান করার প্রণালী ও অন্যান্য উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি রামরায় স্বয়ং দেবদাসীদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছেন।

শুধু ইহাই নয়। রামরায় সেই দেবদাসীদ্বয়কে—

“স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গমর্দন ;

স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সন্মার্জন।

* যে সকল অবিবাহিতা কন্যা নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাতে নৃত্য গীতাদি করে তাহাদিগকে দেবদাসী বা দেবকন্যাও বলা হয়। নৃত্যগীতে তাহাদিগকে নিপুণ করা হয়। কিশোর বয়সেই তাহাদের শিক্ষাদান এবং অপরূপ সৌন্দর্য্য মণ্ডিত দেহের অধিকারীও তাহারা।

স্বহস্তে পরাগ বস্ত্র, সর্বাক্ষ মণ্ডল ।

তবু নির্বিষ্কার রায় রামানন্দের মন ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৫ম

আবার এই ‘নির্বিষ্কার’ অবস্থা যে কি ধরনের তাহার পরিচয় পাওয়া যায় গৌরহরির বাক্যে । যথা—

“নির্বিষ্কার দেহ মন কাষ্ঠ পামাণ সম ;

আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্বিষ্কার মন ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৫ম

অচল জগন্নাথ দেবের চিত্ত বিনোদনের জন্ম রামরামের এই নিভৃত পরিচর্যা পরিপাটির কথা শ্রবণে রঘুনাথ বিস্ময়ে হতবাক হইয়াছিলেন ।

এ যে কি অবস্থা ।

গদাধর পণ্ডিত প্রসঙ্গে :

রঘুনাথ গৃহে অবস্থান কালেই শ্রীগৌরাজের নদীয়া বিহান লীলায় গদাধরের গৌর অহুরাগ ও তাঁহার অপূর্ব প্রীতি সেবার মধুর মধুর প্রসঙ্গাবলী শুনিয়াছেন । গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আগমন করিলে গদাধর পণ্ডিত প্রথম সুযোগে নীলাচল আসেন এবং বাকী জীবন যাহাতে গৌর-সঙ্গহারা হইতে না হয় এই আশায় এবং আশয়ে তিনি “ক্ষেত্র সন্ন্যাস” গ্রহণ করিয়াছেন । নীলাচলবাসী গদাধরের প্রাণের প্রতিমা গৌরহরি স্বহস্তে শ্রীগোপীনাথের বিগ্রহ

আবিস্কার করিয়া গদাধরকে তাহা উপহার দেন। গৌরের প্রীতি ও প্রীতির দান হিসাবে তিনি গোপীনাথ সেবা অঙ্গীকার করেন।

গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণের পর পঞ্চম বর্ষে ‘বিজয়া দশমী’ তিথিতে নীলাচল হইতে গোড় দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। জননী ও জাহ্নবা দর্শনান্তে তিনি শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন। এইরূপ ঘোষণায় বহু ভক্ত ও তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন। তিনি দেখিলেন গদাধর পণ্ডিতও তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চলিয়াছেন।

“ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ”

এই বাক্য বলিয়া গৌরহরি গদাধরকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

“যাঁহা তুমি সেই নীলাচলে ;

ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতলে।”

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

তখন গৌরহরি পরম স্নেহে ও অমিয়া ভাষে বলিলেন—

“প্রাণ গদাই ! এখানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর।”

এবার অভিমানে উত্তেজিত কণ্ঠে গদাধর জবাব দিলেন—‘কোটি সেবা ত্বৎপদদর্শন’।

গৌরহরি গদাধরের প্রীতি ও অভিমান দর্শনে অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ভঙ্জিতে বলিলেন—

“তুমি এখানে থাক তাহাতেই আমার সন্তোষ। আর তুমি গোপীনাথ সেবা ও ধাম ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে গেলে সকলে আমাকেই দোষ দিবে।”

গৌরহরির এই বাক্য শুনিয়া গদাধর হৃদয়ে আহত হইলেন এবং প্রণয় ক্রোধ ও অভিমানে বলিলেন—

“.....সব দোষ আমার উপর ;

তোমা সঙ্গে না যাইব, যাহব একেশ্বর।

আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি ;
প্রতিজ্ঞা সেবাত্যাগ দোষ, তার আমি ভাগী ।”

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

প্রেমমাথা মধুর মধুর উপরোক্ত বাক্যগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৌরহরির সঙ্গে ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে পথ চলিতে লাগিলেন । গৌরহরি আপাতত নীরব রহিলেন ।

“পণ্ডিতের চৈতন্য প্রেম বুঝন না যায় ;”

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

কটক পর্য্যন্ত এই ভাবে গদাধর পণ্ডিত (একক) গমন করিলেন । গৌরহরির অন্তরে সন্তোষ আর বাহিরে প্রণয় রোষ । তিনি গদাধর পণ্ডিতকে নিকটে ডাকাইয়া এখন আর এক ভঙ্গী গ্রহণ করিলেন । গদাধরের দুটি হাত ধরিয়া প্রণয় রোষে বলিতেছেন,

“দেখ গদাধর ! ‘ক্ষেত্র সন্ন্যাস’ ও গোপীনাথ সেবা ছাড়িয়া বহু দূর আসিয়াছ । তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল । তুমি আত্ম-সুখ বাসনায় আমার সঙ্গে থাকিতে চাও । কিন্তু তোমার আচরণে আমার দুঃখ এবং তোমার দুইটি ধর্ম্য নষ্ট হইতেছে । আমার সুখ ও আন্তরিক ইচ্ছা তুমি নীলাচলে ফিরে যাও । এরপর যদি কিছু বল বা আমার ইচ্ছা পূরণ না কর তবে আমার শপথ রইল ।”

“এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা,
মুচ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা ।”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

গদাধর মূরছিত মহানদী কূলে
হা গৌর ! প্রাণ গৌর বলে’ গদাধর মূরছিত মহানদী কূলে

“পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিল ।”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ

রঘুনাথ যখন দ্বিতীয় বার গৌরদর্শনে শান্তিপু্রে যান, তখন তিনি সেখানে এই নিবিড় ‘গৌর-গদাধর প্রণয়’ প্রসঙ্গটি শুনিয়াছিলেন।

টোটায় গদাধর পণ্ডিত ; (সিদ্ধ) বকুলতলে ঠাকুর হরিদাস ; জগন্নাথ বল্লভে রামরায় ; জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গোপীনাথ আচার্য্য ; স্বর্গদ্বারের বেলাভূমিতে (আজও সেখানে ‘সাতাসন’ মঠ বর্তমান) স্বরূপ পুরুষোত্তম আদি অনেক মূর্ত্তিই অবস্থান করিতেছেন। আইটোটা সন্নিকটে পরমানন্দ পুরী ও প্রায় সকলের কেন্দ্রস্থলে কাশীমিশ্রালায়ে নীলাচল বিহারী গৌরচন্দ্র বিরাজমান। রঘুনাথ স্বরূপের কুটিরে অবস্থান করেন।

ইহাদের দর্শন ও সঙ্গ প্রভাবে রঘুনাথের মনে একদিন (অতীতের) শ্রুত ঘটনায়) গৌরান্ধ বিচ্ছেদে গদাধরের কটকের মহানদীতটে মুচ্ছা, তাৎকালীন সার্বভৌমের চিন্তা ও পরে যথা কর্তব্য বিধানের চেষ্টায় ও আলোচনায় মহনীয় সিদ্ধান্ত জাগরুক হইল। যথা—

“কৃষ্ণের আমি সর্বোত্তম প্রিয় পাত্র ও ভক্ত” উক্তবের এই অভিমান নষ্ট করিবার জন্য পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাঁহাকে ‘ছলে’ ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। অনুরূপ ঘটনাই বুঝি সমন্বিত হইয়াছে।

১৪৩১ শকে দোল যাত্রার পূর্বে গৌরহরি নীলাচল বিজয় করেন। * চৈত্রে সার্বভৌম বিমোচন ও বৈশাখে দক্ষিণ দেশ বিজয়ে যান। সেই সময় গৌরহরি ভট্টাচার্য্যের আজ্ঞা চাহিলেন—

- “মাঘ শুক্ল’ পক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ;
- ‘ফাল্গুনে’ আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।
- ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ;
- প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল।
- ‘চৈত্রে’ রহি কৈল সার্বভৌম বিমোচন ;
- ‘বৈশাখে’র প্রথমে দক্ষিণে যাইতে হৈল মন।”

“আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে যাইব ;
তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব ।”

—চরিতামৃত মধ্য ৭ম

গৌরহরির এই বাক্য শ্রবণে সার্বভৌম অত্যন্ত কাতর হইয়া
গৌরহরির শ্রীচরণ ধারণ পূর্বক বলিয়াছিলেন—

“শিরে বাজ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়,
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না হয় ।”

—চরিতামৃত মধ্য ৭ম

অর্থাৎ সার্বভৌমের একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর । তিনি অবলীলাক্রমে
গৌরহরিকে বলিলেন, “যদি চন্দনেশ্বর মরিয়া যায় তাহাও সহ
করিতে পারি কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে অসহ ।

আর একদিনের ঘটনা—

গৌরের শ্রীতি সেবার পরম বৈরী তাঁহার ভামাতা অমোঘ
বিষুচিকা রোগে আক্রান্ত হয় । ক্রমে মৃত্যু পথের পথিক হয় ।

এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সানন্দে ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন—

“সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ।”

—চরিতামৃত মধ্য ১৫শ

এ হেন সার্বভৌম যখন গৌরহারা গদাধরের মহানদী তটে
বিরহ দশায় মুচ্ছা দর্শন করিলেন তখন তাঁহার চোখের সামনে
ভাসিয়া উঠিল ভাগবতের চিত্র :

রাম রজনীতে একাকী বিজন বনে কৃষ্ণহারা মুচ্ছিতা শ্রীরাধা ।

গদাধরের গৌর বিরহ দর্শনে শ্রীল বাসুদেব সার্বভৌমের
অভিমান দূর হইল ।.....

অপর এক ঘটনা :

নরেন্দ্র সরোবর তীরে প্রায় প্রত্যহই গদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। নীলাচল বিহারী গৌরহরি ও তাঁহার পার্শ্বদ্বন্দ্ব এবং ভক্তদ্বন্দ্বও সে পাঠ শুনিতেন যান। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীও স্বরূপের আনুগত্যে ‘পাঠ’ শ্রবণ করিতে যান।

সেখানে—ভাগবত বক্তা—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রধান শ্রোতা—গৌরহরি (বিরহিনী রাধা)

এই ঘটনার মধ্যে রঘুনাথের মনে একদা একটি ভাবের উদয় হইল যে—

“রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট”

এই বাক্য সার্থক হইয়াছে এই নীলাচলে এই পাঠের মধ্যে।

এখানে রাধারাগী কি এক স্বরূপে বক্তা অপর স্বরূপে শ্রোতা ? অপর দিকে যিনি বক্তা তিনিই শ্রোতা। আসল কথা হইল উভয়ে যদি এক স্বভাবের না হয় তবে এক স্বরূপকে অন্য স্বরূপ সেবা ক’রে সুখী করতে পারে না।

রঘুনাথ আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন যে—

ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি “ভক্ত চরিত্রই” পুনঃ পুনঃ পাঠ হইতেছে। কিন্তু, ব্রজরামাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলা, প্রসঙ্গ কোন দিনই পাঠ হয় না। রসিক ভক্তদ্বন্দ্ব এ তথ্যের গভীর মর্মে উদঘাটন করিবেন।

অপর একটি কথা; নিখিল বিশ্বের ভগবৎ বহির্মুখ জীবের প্রতিনিধি ধ্রুব ; আর নিষ্কাম পুরুষদের প্রতিনিধি প্রহ্লাদ। হরিভজন সকলেরই বাসনা পূরণের একমাত্র সুগম ও সহজ উপায়। প্রহ্লাদ চরিত্রের দিক (১) অশুর পুরীতে থেকেও সে “নিষ্কাম”। (২) (ক) ভগবত উন্মুখতার মূল সাধুর “সন্তোষ” (খ) ভগবত বিমুখতার মূল সাধুর “অসন্তোষ”।

বল্লভ ভট্টের প্রসঙ্গে :

বল্লভ ভট্টের মনে অভিমান ছিল যে তিনি যেরূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত জানেন তেমনটি কেহই জানে না। আবার বেদের সার সম্বলিত মহাপুরাণ শিরোমণি যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহার যথার্থ অর্থবোধ একমাত্র তাঁহারই মনে পরিস্ফুট হইয়া আছে। অন্য কাহারও হয় নাই। এইরূপ মনোবৃত্তি ও অহঙ্কার লইয়া তিনি নীলাচলে গৌরহরির নিকট আসিয়াছিলেন। সু-চতুর, সর্বজ্ঞ চূড়ামণি, অযাচিত কৃপাকারী, পরম করুণ গৌরহরি দৈন্য করিয়া তাঁহাকে নিজপরিকরবৃন্দের গুণ মহিমা বর্ণন পূর্বক ভট্টের গর্ব অহংকারে আচ্ছন্ন চিত্তের মালিন্য ক্ষালন করিবার জন্য একদা (ভট্টকে) বলিলেন—

আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। আমার মন নিৰ্ম্মল ছিল না। অদ্বৈত আচার্য্যের সঙ্গপ্রভাবে আমার চিত্ত নিৰ্ম্মল হইয়াছে। অদ্বৈত আচার্য্য সাধারণ জীব নহেন। তিনি ‘মহাবিশু’ বা ঈশ্বর তত্ত্ব। নিখিল শাস্ত্রেই অদ্বৈত আচার্য্যের অসাধারণ অভিজ্ঞতা। তাঁহার মত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা কোন জীবে সম্ভব নয়। শাস্ত্রের মৰ্ম উপলদ্ধিতে, শাস্ত্রসম্মত আচরণে, শ্লেচ্ছাদি জীবেও কৃষ্ণভক্তি প্রদানে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই বা জগতেও সম্ভব নয়।

“সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নহে যঁার সম ;
অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম ।
যঁাহার কৃপায় শ্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি ;
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি ?”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৭ম

পরে নিতাই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

(ঈশ্বরের অভিন্ন তনু) নিত্যানন্দ—অবধূত বেশ ধারণ

করিয়াছেন। তিনি সাধারণ জীবের মধ্যে থাকিয়াও অসাধারণ পুরুষবর্ষ্য। তিনি কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, কখন বা নৃত্য করেন; সর্বদাই মহাভাগবত, উন্মাদবৎ অবস্থা। দূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিলেও 'জীব' কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হয়। প্রেমধনে ধনী হয়।

“নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ ঈশ্বর,
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমেব সাগর।”

—চরিতামৃত অষ্টম ৭ম

৩ট্ট। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মহিমা শোন—

সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, উপনিষদিক, বেদান্ত এই 'কয়টি দর্শনে' সার্বভৌম সাক্ষাৎ রহস্যপতিতুল্য।

ওধু ইহাই নহে, তিনি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। সার্বভৌমের কৃপাতেই আমি জানিয়াছি জীবের একমাত্র অভিধেয়, একমাত্র কর্তব্য কৃষ্ণভক্তি। এবং ভক্তিযোগই সুগম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথ।

ভট্ট ! এখন রায় রামানন্দের কথা শোন—

তিনি (১) 'মহাভাগবত প্রধান' (২) অনর্গলরসবেত্তা ও প্রেমসুখানন্দ।

“এসব শিক্ষাইল মোরে রায় রামানন্দ।

অনর্গলরসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ ॥”

অনর্গলরসবেত্তা—রসতত্ত্ব সম্বন্ধে বাধাশূন্য অভিজ্ঞতা। তদ্ব-
বিচারে প্রতিপক্ষ কোন কূট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে তাহার মামাংসায়

রামরায়ের যুক্তি প্রণালীতে বাধা (অর্গল) পড়ে না। যে কেহ যে কোন প্রশ্নেরই উত্থাপন করুক না কেন, প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই 'রামরায়' তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন। আবার তিনি এমন ভাবে তাঁহার যুক্তি প্রণালী প্রদর্শন করেন যে নিজেই সকল রকমের সম্ভাবিত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া এমন ভাবে সে সমুদয়ের সু-মীমাংসা করিয়া দেন যে, আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহার রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এত অধিক এবং তাঁহার তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রণালী এতই প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ যে, যে কেহই অবাধে সেই যুক্তি প্রণালীতে প্রবেশ করিয়া অনায়াসে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে।

প্রেমসুখানন্দ—ইষ্ট-সুখ-তাৎপর্যাময়ী সেবা দ্বারা নিজে-ব ইষ্টের সুখ বিধানই ষাঁহার একমাত্র সুখ, অন্য কোন কার্যেই ষাঁহার সুখ জন্মে না, তিনিই “প্রেমসুখানন্দ”। ইহা ‘রস’ সম্বন্ধে সু-অনুভব অবস্থা।

ভট্ট। এখন তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ঐ স্বরূপের অবস্থা শোন—

ইনি প্রেম রসের সাক্ষাৎ মূর্তি। ইহার দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই ভক্তিরসের পরিপাকে ‘প্রেমে’ গঠিত।

(ব্রজের যে সব রসতত্ত্ব মহা মহা সাধকের বাক্যে ও অনুভবে-দ গোচর ছিল এবার সে সব মূর্তি ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়াছে।)

ভট্ট! এখন বকুলতলে সদা অবস্থিত ‘হরিদাসে’র কথা শোন—

এ যাবৎ জগতে বিভিন্ন মহাশয়বৃন্দ ‘পূজা’ বা ভগবত সেবার জন্ত যে সমস্ত উপচার ও উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন সে সবই সৎ-চিত্ত-আনন্দ হইতে ভিন্নতর।

ঠাকুর হরিদাসের সেবা উপকরণ কেবল ‘চিন্ময়-আনন্দরস’।

এখন সংক্ষেপে উপসংহার করিতেছি, শোন—জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারী তাহাছাড়া আর আর যে সব ভক্তবৃন্দ গোড়দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জীবের দরজায় দরজায় গমন করিয়া আচার ও প্রচার করিতেছেন যে—

এ যুগের 'ধর্ম্য'.....সদা নাম সংকীর্তন

এ যুগের 'কৃত্য'.....সদা নাম সংকীর্তন

সচল জগন্নাথ গৌরহরির শ্রীমুখে এই সব ভুবন পাবন গৌর-পরিকরবৃন্দের মহিমা শ্রবণে অভিমানী ভট্টের * হৃদয় নির্মল হইল।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই সব প্রসঙ্গের সময় গৌরের সান্নিধ্যেই (নিজ সেবা কার্যে) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়াই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্য খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ বর্ণন করিয়াছেন।

* চৈঃ চৈঃ শ্রীগ্রন্থে বল্লভ ভট্টের গৌর নিষ্ঠা সু-প্রতিষ্ঠিত। যথা—

নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া।

আনন্দিত হৈয়া ভট্ট দিল দিব্যাসন,

আপনি বরিল প্রভুর পদ প্রক্ষালন।

সবংশে সেই জল মস্তকে ধবিল,

নূতন কোপীন বহির্কাস পবাইল।

গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ মহা পূজা কৈল,.....

(পবে ভোজনান্তে—)

“মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শযন, আপনি ভট্ট কবেন প্রভুর পান সম্বাহন।” এ হেন অধিকারীর মনের অভিমান গৌরহরির এক অপূর্ব ভঙ্গী। যেমন ঋষি দুর্কাসাকে দিয়া রাজা অম্বরীশের ‘অধিকার’ ও ‘অবধি’ প্রকট হইয়াছে। সেইরূপ বল্লভ ভট্টের মনে অভিমান ও অহঙ্কার দান করিয়া গৌরহরি তাঁহার নদীয়া ও নীলাচলের পরিকরবৃন্দের ‘অধিকার’ ও ‘অবধি’ স্বমুখে প্রকাশের পটভূমিকা করিয়াছেন। বল্লভ ভট্ট যে অনন্ত ভাবনিধি গৌরহরির অতি প্রিয় পরিকর তাহার প্রমাণ তিনি (ভট্ট) আজ সু-প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য।

নিগূঢ় চৈতন্য লীলা বুদ্ধিতে কার শক্তি ?

ঠাকুর হরিদাসের প্রসঙ্গে :

ঠাকুর হরিদাস যে সময় বলরাম আচার্য্যের আশ্রয়ে টাঁদপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় বালক রঘুনাথ প্রত্যহই তাঁহার দর্শনে যাইতেন। ঠাকুর হরিদাসের পুত্র বৈরাগ্যময় জীবনের আচরণ দেখিয়া বাল্যেই তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহারই কৃপা কটাক্ষে ও আদর্শে আজ রঘুনাথের এই নিষ্কিঞ্চন বেশে স্রুপের আনুগত্যে নীলাচলে গৌরহরির শ্রীচরণ সরোজ লাভ ও মধুর সমাবেশ দর্শন। সেই ঠাকুর হরিদাস আজ নীলাচলবাসী। এ কারণেই রঘুনাথের মনে অনির্বচনীয় আনন্দ। তিনি প্রত্যহই ঠাকুর হরিদাসের শ্রীচরণ দর্শনে যান। তাঁহাদের এই মধুর মিলনের রঙ্গ সুখ অণ্ডে কে বুঝিবে ?

কয়েক বৎসর এইরূপ সুখে অতিবাহিত হইলে পর, একদা ঠাকুর হরিদাসের অপ্রকট দিন সমাগত হইল। সে দিতেন বিরহ মিলনের আনন্দে রঘুনাথের যে অবস্থা তাহা অবর্ণনীয়। ঐ দিনটি রঘুনাথের কত সুখের, আবার কত দুঃখের। সে রহস্যে কে প্রবেশ করিবে ?

ঐ দিন রঘুনাথ স্বচক্ষে দেখিলেন ও স্বকর্ণে শুনিলেন যে—

“নাথ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া”

এই মহাবাক্যটির আদর্শ ঠাকুর হরিদাস। তিনি আজীবন মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হবে বাম রাম রাম হরে হরে) কীর্তন ও জপ করিতেন। সেই হরিদাসই যখন (স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণের পথ অঙ্গীকরে করিয়া) ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেব শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে এবং জিহ্বায় ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম

উচ্চারণ করিতে করিতে দেহের ঐহিক প্রাকট্য সম্বরণ করিলেন তখন সবিস্ময়ে সকলেই বুঝিলেন—

“হরে কৃষ্ণ নাম সাধন ফলে—প্রাণ যায় গৌরাজ্জ বলে—”
ঠাকুর হরিদাস তাঁহার এই মধুর ও সুচতুর পন্থায় ‘সচল জগন্নাথ গৌরহরির উপাসনাটি প্রাণের কত গভীর স্তরে রক্ষা করিয়াছিলেন রঘুনাথ তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া মুগ্ধ ও লুদ্ধ হইয়াছিলেন ।

শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন তইতে একটি মনোরম গোবর্দ্ধন শিলা ও একটি গুঞ্জামালা সঙ্গে আনিয়াছিলেন । তিনি শ্রীতির উপহার নিদর্শন করিয়া ঐ ‘শ্রীশিলা’ ও ‘মালা’ গম্ভীরার গুপ্তনিধি গৌরহরিকে প্রদান করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ-বিরহিনীর ভাবমগ্নিত শ্রীগৌর তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত উক্ত গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালাকে কখনও মস্তকে ধারণ, কখনও নাশায় তাহাদের আত্মান, কখনও চক্ষে দর্শন, কখনও বক্ষে ধারণ করিতে করিতে তন্ময় হইতেন । তৎকালীন অবস্থায় নিরন্তর প্রেমাশ্রুতে পরিসিক্ত ঐ শ্রীশিলা ও মালা দুইটিকে পরম রঞ্জিয়া গৌরহরি রঘুনাথকে আদর করিয়া উপহার দিয়া কৌতুক পূর্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

“এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ;
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ।
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ-প্রেমধন ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৬ষ্ঠ

এই ঘটনাটি ঠাকুর হরিদাসের নির্ঘ্যানের পূর্বে কি পরে আজ সঠিক ধরা শক্ত । যাহা হউক ‘গৌরহরি’র এই স্নেহের দান ও

স্মৃতির নিদর্শন 'গোবর্দ্ধন শিলা' ও 'গুঞ্জামালা' রঘুনাথ পরমানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে সু-চতুর পন্থায় নিজ প্রাণনাথ গৌর-
হরির উপাসনার পরম সহায় হইবে তাঁহারই শ্রীতির দানে গুঞ্জামালা
ও গিরিধারী । গৌরহরির সঙ্গসুখস্মৃতি বিজড়িত এই গিরিধারী
ও গুঞ্জামালা তাঁহার (গৌর বিরহে) ব্রজবাসের কালে বিরহ জ্বালা
প্রশমনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল । যথা—

“গৌরাজের পদাম্বুজে	রাখে মনোভৃঙ্গরাজে”
	প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
আপন প্রাণের ভোগের কথা	প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
‘শ্রীচৈতন্য স্তবকল্পবৃক্ষে’	প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
	কবিরাজের গলা ধরে কাঁদে
স্তবকল্পবৃক্ষ বর্ণন ক’রে	কবিরাজের গলা ধরে কাঁদে
	গৌর হবে না কি নয়ন গোচর
রথের আগে নটন পর	গৌর হবে না কি নয়ন গোচর
	কাঁদে আর্তনাদ ক’রে
রঘুনাথ দাস গোসাঞি	কাঁদে আর্তনাদ ক’রে
রাধাকুণ্ড তীরে ব’সে	কাঁদে আর্তনাদ ক’রে
(কৃষ্ণদাস) কবিরাজের গলা ধরে	কাঁদে আর্তনাদ ক’রে
প্রাণ গৌরাজের নীলাচল বিহার বলতে বলতে—	

কাঁদে আর্তনাদ ক’রে

(বলে) বল বল কবিরাজ

সোনার গৌরাজ প্রভু	আর কি আমি দেখতে পাব
গৌরের নীলাচল বিহার	আর কি আমি দেখতে পাব
	আর কি আমি দেখতে পাব

বলে এই দেখ কবিরাজ
 বলে, এই দেখ কবিরাজ
 গুঞ্জা গিরিধারী দেখায়ে
 এই আমার প্রভুর গুঞ্জামালা
 এই শিলা প্রভুর বক্ষে ছিল—এই আমার প্রভুর গলার
 গুঞ্জামালা

এই কথা বলতে বলতে
 'গুঞ্জা' 'গিরিধারী' বৃকে ধ'রে—
 বাহু প্রসারি জড়িয়ে ধ'রে
 ভাবাবেশে বলে রে

আর ছেড়ে দেব না
 আর ছেড়ে দেব না
 পেয়েছি তোমায় চিত-চোর
 গৌর অঙ্গ সঙ্গ ভোগ করে
 গুঞ্জা গিরিধারী বৃকে ধ'রে
 গৌর অঙ্গ সঙ্গ ভোগ করে

না হ'বে বা কেন রে
 না হ'বে বা কেন রে
 সে যে প্রাণ গৌরাজের বৃকে ছিল
 গৌর অঙ্গ সঙ্গ ভোগ করে
 আবার ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
 আবার ব্যাকুল হয়ে কাঁদে রে
 হা গৌর ! প্রাণ গৌর । বলে
 (বলে) পাব কি গৌরাজ ধনে
 আমার প্রভু স্বরূপের সনে (বলে) পাব কি গৌরাজ ধনে

“স্বরূপে সদাই ধেয়ায়”

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

জগদানন্দ প্রসঙ্গে : ✓

টাদ নিতাই, প্রভু সীতানাথ, পণ্ডিত গদাধর, পণ্ডিত জগদানন্দ আদি পরম গম্ভীর গৌর পরিকরবৃন্দ সেই ভাবপূর্ণ গৌরহরিকে “নাগর” স্বরূপে ভাবনা করিয়া নিয়তই স্মরণ মনন করেন— তাঁহাদের আচরণ অনুষ্ঠান ও সেই সব মধুর রসের বিচিত্র বিচিত্র লীলাবলীর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন ‘দাস রঘুনাথ’।

অপরূপ মধুর-রসের লীলা-সহচর পণ্ডিত জগদানন্দকে রঘুনাথ নীলাচল প্রবেশের প্রথম দিন হইতেই সুদীর্ঘ মোড়শ বৎসর ব্যাপী পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়াছেন। সুধু দর্শনই নয়—‘পুত্র’ ও ‘ভৃত্য’র ন্যায় তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্যও তিনি বহুবার পাইয়াছিলেন। যথা—

“রসূয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই ‘রঘুনাথ’
উহা সবায় দিতে চাহো কিছু ব্যঞ্জন ভাত।”

এই “নাগরী” ভাবের আন্বাদক পণ্ডিত জগদানন্দের যে সকল সুমধুর প্রেমময় চেষ্টাগুলি রঘুনাথের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে আমরা সে সবের কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিব।

(১)

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী একবার ঝাড়িখণ্ড পথে নীলাচলে আসেন। পথে জল হাওয়ার দোষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডুরসাহ্য। নীলাচলবাসীদের প্রাণ-স্বরূপ সচল জগন্নাথ গৌরহরি প্রত্যহ

সেই সনাতনকে বলাৎকারে আলিঙ্গন করেন । সনাতনের শ্রীঅঙ্কের কণ্ডুর 'রক্ত' 'রস' গৌরহরির সর্ব্বাঙ্গে লাগে । সুতরাং সনাতন মরমে মরিয়া যান । একদা তিনি জগদানন্দ পণ্ডিতের নিকট নিজের মনোব্যথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

“পণ্ডিত । তুমি জান যে প্রভুকে একবার দর্শন করিয়া পরে রথের চাকার তলায় এই পাপ শরীর বিসর্জন দিবার বাসনায় আমি নীলাচলে এসেছিলাম । সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আমার সে বাসনায় বাদ সাধিলেন । তোমরা সকলেই দেখিতেছ আমার সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু বস । শত শত নিষেধ সত্বেও তোমার পরাণ বঁধু গৌরহরি বলাৎকারে আমায় আলিঙ্গন করেন । আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের বীভৎস কণ্ডু হইতে সর্ব্বদা নিঃসৃত রক্ত ও রস তাঁহার শ্রীঅঙ্কে লাগিতেছে । এ দৃশ্য দেখিয়া আমার ও তোমাদের সকলের প্রাণ ছুঁথে যেন ফাটিয়া যায় । মৃত্যু হইতেও মর্মান্বিত এই যন্ত্রনা হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাই তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না ।

গৌরের প্রেয়সী জগদানন্দ আবেশে আবিষ্ট সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন—

“তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন ;
রথযাত্রা দেখি তাহা করহ গমন ।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

এই ঘটনার পর অপর একদিন সনাতন গোস্বামী সৈদন্ত্যে গৌরহরিকে বলিলেন—

প্রভু ! তুমি—

“বীভৎস স্পর্শিতে নাহি কর ঘৃণা লেশ”

—চরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ

কিন্তু সেই অপরাধে আমার সর্বনাশ ঘটিতেছে। কৃপা পূর্বক তুমি অনুমতি দাও আমি ব্রজে যাই। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দেরও যুক্তি লইয়াছি।

মর্যাদা পুরুষোত্তম গৌরহরি এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধেই যেন গর্জন করিয়া বলিলেন—

কি ? এত বড় স্পর্ধা ?

“কালিকান বড়ুয়া জগা ঐছে গব্বী হৈল ।
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ?”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

গৌরহরির ক্রোধ দর্শনে তীক্ষ্ণধী সনাতন বিস্মিত চমৎকৃত ভাবিলেন—

জগদানন্দ প্রভুর অতি আপন জন, এ কারণেই ঐ কপ তিরস্কারের ভাষা। আমি দেহত্যাগের সঙ্কল্প কবিয়াছিলাম প্রভুর মতে তাহা অন্যায়। তিনি তাহাব জন্ম আমায় তিরস্কার করেন নি। যুক্তি দ্বারা আমার অন্যায় বুঝাইয়া দিয়া আমার গৌরব ও মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহার শ্রীচরণ ত্যাগ করিয়া স্বাতন্ত্র্য স্বার্থসুখ রক্ষা করিবার আশায় ব্রজ গমনে ইচ্ছা কবিয়াছি। সম্ভবত ইহাও প্রভুর মনঃপুত নয়। তবু তিনি আমাকে তিরস্কার করিলেন না। অতঃপর তিনি নিজ ছুর্ভাগ্যকেই স্মরণপূর্বক গৌরহরিকে বলিলেন—

“জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল !”

“জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান ।”

(১)

“চৈতন্যের ‘প্রেমপাত্র’ জগদানন্দ ধন্য ।

যারে মিলে, সে-ই মানে ‘পাইল চৈতন্য’ ॥”

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

এ হেন পণ্ডিত জগদানন্দ একদা প্রখ্যাত পুরুষ সেন শিবানন্দের * গৃহে উপস্থিত হইয়া সেখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । তিনি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাও করিতেন এবং কাঞ্চনপল্লীর প্রখ্যাত জমিদার ছিলেন । ঐ সময় একমাত্রা (ষোল সের) চন্দনাদি তৈল সংগ্রহ করিলেন । গৌরের ভাব-প্রেয়সী জগদানন্দ মনে করিয়াছিলেন যে বায়ু ও পিত্তাধিক্য জনিত তাঁহার পরাণ বঁধু গস্তীরা-বিহারী গৌরহরির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে । এই জন্য তিনি তাঁহার কথা শোনে না—ভাল খান না—ভাল পরেন না—উত্তম শয্যায় শয়ন করেন না । এই চন্দনাদি তৈলটি নীলাচলে গিয়া তিনি গৌবহরিকে মাথাঠবেন । তাঁহার মস্তক সুশীতল এবং স্থির হইবে । এই আবেশে প্রমত্ত হইয়া তিনি ঐ চন্দনাদি তৈলের কলসটি—

“নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া”

তাহার পর গৌরহরির সেবক গোবিন্দকে আদেশে ন সুবে বলিলেন—

“প্রভু অঙ্গে দিও তৈল”

গোবিন্দ মহা বিপদে পড়িলেন, কারণ শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসী ও কঠোর ব্রতধারী । গৌরহরির শ্রীচরণে যাহা হউক একদিন তিনি নিবেদন করিলেন—

* ইহাই পুত্র মহাকবি কর্ণপুত্র শিবানন্দ সেনের আদি নিবাস মালঞ্চ আর স্বস্তুরালয় কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া । শ্রীনিত্যানন্দের প্রয়াশঃ অবস্থান ইহার গৃহে হইত । জগদানন্দ শিবানন্দের সহিত দূর সম্পর্কেই আত্মীয় ছিলেন ।

“তোমার ‘জগদানন্দ’ গৌড়দেশ হইতে এক কলস ‘চন্দনাদি তৈল’ অতি যত্ন পূর্বক আনিয়াছেন। ঐ তৈল ব্যবহার করিলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ নাশ হয়, ধাতু পুষ্ট হয়, শরীরে বল বৃদ্ধি হয়। এই তৈল প্রত্যহ একটু করিয়া ভূমি মস্তকে ব্যবহার কর, ইহাই পণ্ডিতের একান্ত বাসনা।”

রঙ্গিয়া গৌরহরি গোবিন্দকে বলিলেন—“তোমাদের পণ্ডিত প্রেমে অন্ধ হইয়া এই কার্য্য করিয়াছে। সে কি জানে না যে সামান্য তৈল ব্যবহারেও সন্ন্যাসীর অধিকার নাই। তাহাতে আনার জগদানন্দের আনীত তৈলটি পরম সুগন্ধি। ইহার ব্যবহারও ৩৩০৮ লজ্জার কথা। এক কাজ কর—ঐ তৈল জগন্নাথের প্রদীপ জ্বালিবার জন্ত সেখানে পাঠাইয়া দাও—তাহাতে তাঁহার কষ্ট করিয়া তৈল আনার শ্রম সফল হইবে।”

গৌরহরির উত্তর শুনিয়া গোবিন্দ বেশ চিন্তিত হইলেন। তিনি নিশ্চয় করিয়া জানেন যে, এই কথা শুনিলে ‘জগদানন্দ’ অত্যন্ত দুঃখ পাইবেন। কিন্তু উপায় কি? তাই, যথা সময়ে গোবিন্দ অত্যন্ত ভীত হইয়া গৌরহরির অভিমত জগদানন্দকে জানাইলেন।

বিচিত্র প্রেম। পণ্ডিত জগদানন্দ গৌরহরির এই আদেশ শুনিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। তাঁহার তাৎ কালিক ভাব দেখিয়া গোবিন্দের ভয় অধিকতর হইল। তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জগদানন্দও নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলেন। এই ভাবে দশ দিন চলিয়া গেল, এ সম্বন্ধে আর কোনও কথাই হয় নাই। জগদানন্দের সহিত গোবিন্দের নিত্য দেখা হয়—তিনিও কিছু বলেন না—গোবিন্দও কিছু বলিতে সাহস করেন না। কিন্তু জগদানন্দের মুখের ভাব দেখিয়া গোবিন্দ বুঝিতে পারেন তিনি মহাপ্রভুর বাক্যে ও ব্যবহারে মর্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছেন। গোবিন্দ মনে মনে ভাবিলেন যে, আর একবার প্রভুকে বলিয়া দোখ। দাম্পত্য কলহে সেবকের যে ছুর্দশা—গোবিন্দের আজ সেই দশা। যাহা হউক অপর

একদিন অত্যন্ত বিনয় ও অহুরোধপূর্বক গোবিন্দ গৌরহরিকে ভয়ে ভয়ে ভগ্নশ্বরে বলিলেন --

“পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকান”

এবার, গৌরহরি সক্রোধে বলিলেন—

“মর্দনিয়া রাখ এক করিতে মর্দনে”

“ছিঃ । এই সুখ ভোগের জন্য কি সন্ন্যাস গ্রহণ ? ইহাতে আমার সন্ধান, আর সকলে তোমাদিগকেও পরিহাস করবে । সুগন্ধি তৈল মাথিয়া রাস্তায় বাহির হইব, আর ঐ গন্ধ পাইয়া লোকে মনে করিবে আমি নিশ্চয়ই গোপনে বিলাসিতা করি এবং সেই বিলাস রঞ্জনের নিমিত্তই ঐ তৈল ব্যবহার করিয়াছি ।” গোবিন্দ সবই বোঝেন । তিনি নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন ।

এই ঘটনার পরের দিন সকাল । জগদানন্দ প্রত্যহ সকালে যেমন দর্শনে আসেন তেমনি আসিয়াছেন । তাঁহাকে দেখিয়া গৌর হরি নিজেই বলিলেন—

“পণ্ডিত । তৈল আনিলে গোড় হইতে ,
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে ,
জগন্নাথে দেহ লঞা, দীপ যেন জ্বালে ,
তোমার সকল শ্রম হইব সফলে ।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

পণ্ডিত জগদানন্দ গোবিন্দের মুখে গৌরহরির এই অভিমত পূর্বেই শুনিয়াছিলেন । তখন তিনি মৌনী ছিলেন, কোন কথা বলেন নি । তিনি অভিমানী ভক্ত । তাঁর মনের ভাব—সেবকের মারফৎ এই সংবাদ ! দেখা যাইবে তুমি আমার বাসনা পূরণ

করিতেছ কি না? আজ স্বকর্ণে গোবিন্দর মুখে শোনা কথার আবৃত্তি ‘গৌর’ মুখে শুনিলেন। তিনি প্রণয় রোষে বলিতেছেন—

“আমি গোড় হইতে তৈল আনিয়াছি—এ মিথ্যা কথা তোমায কে বলিল? আমি তৈল আনি নাই।” এই কথা বলিয়াই তিনি কল্পিত কলেবরে দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলসটি বাহিরে আনিয়া ‘গৌরহরি’র সম্মুখে কলসটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই আচরণ দ্বারা প্রণয় রোষজনিত অভিমানটিই ব্যক্ত করিলেন যে—

“আমি তোমার জন্য তৈল আনিয়া যে অন্যায় করিয়াছি তাহান প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি দেখ!” অতঃপর ক্রোধে গর্গর্ করিতে করিতে নিজ কুটির গমন পূর্বক দরজা বন্ধ করিয়া ভূ-শয্যা গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে দুই দিন ও দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল।

বিদগ্ধ চূড়ামণি গৌরহরি তৃতীয় দিন সকালে স্বয়ং জগদানন্দের দরজায় উপস্থিত হইয়া প্রেম মধুর স্বরে বলিতেছেন—

“পণ্ডিত। ওঠ! অবুঝ হইও না। আজ মধ্যাহ্নে তোমার হাতের রান্নার প্রসাদ গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

স্বপ্ন দর্শনবৎ জগদানন্দের সব অভিমান মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল তিনি উঠিলেন। পূর্ণ উদ্যমে, অতি সত্বর রান্নার যোগাড়ের জন্য ব্যস্ত হইলেন। এই অল্প সময়ে বহুবিধ অন্ন ব্যঞ্জনের যোগাড়ের জন্য ঐ দিন রঘুনাথ ও রামাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জগদানন্দের মনে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করিয়াছিলেন। তিনি আজ মনের সুখে ভোজ্যাদি প্রস্তুত করিলেন—বহু প্রকার শাক, মোচার ঘন্ট, সুক্র, লাফ বা ব্যঞ্জন কিছুই বাকি রাখিলেন না। মোট কথা—যে সমস্ত ব্যঞ্জে গৌরহরির প্রীতি ও তৃপ্তি হয় সে সমুদয় ব্যঞ্জনই রন্ধন করিলেন।

প্রথম দর্শনেই অভিমানী ‘জগদানন্দ’কে উল্লাস দিবার আশয়ে গৌরহরি মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ করিয়া ‘একক’ জগদানন্দের কুটিরে আসিলেন। জগদানন্দের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কারণ, আজ

তিনি মনের তৃপ্তিতে 'নিজ পরাণ নাথকে' ভোজন করাইতে পারিবেন। যথাযথ পরিপাটীর সহিত জগদানন্দ গৌরহরিকে ভোজনে বসাইলেন। রঙ্গিয়া গৌরহরি ঈষৎ মধুর হাসিয়া রসিকতার সহিত বলিলেন—

“দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন ;

তোমায় আমায় একত্র আজি করিব ভোজন ॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

এই বলিয়া শ্রীহস্ত উদ্ভোলন করিয়া তিনি আসনে বসিয়া বহিলেন।

কত নিবিড় মধুর-রসের এই বাবহার।

লজ্জিত হইয়া প্রেম গদ গদ বচনে জগদানন্দ বলিলেন—

“আপনি প্রসাদ লউন পাছে মুঞি লইব ;

তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ?”

—চরিতামৃত অন্ত্য ১২শ

গৌরহরি প্রসাদ পাইতেছেন। পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় জগদানন্দ নিকটে বসিয়া প্রতিটি বস্তু পরম প্রেমভরে পরিবেশন এবং ভোজনে উৎসাহ দান করিতেছেন। ভোজন করিতে করিতে পরিহাসপটু গৌরহরি বলিতেছেন—

“ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ ?”

আজ জগদানন্দের মান ভঞ্নের জন্যই এই ভোজন রঙ্গ। সুতরাং পণ্ডিত যত কিছু পরিবেশন করিতেছেন রসিকশেখর গৌরহরি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক সে সমস্ত গ্রহণ করিতেছেন। সাধারণতঃ প্রত্যহ মধ্যাহ্নে গৌরহরি যে পরিমাণ প্রসাদ গ্রহণ করেন

আজ তাহা হইতে অনেক বেশীই গ্রহণ হইল । তবুও জগদানন্দ ফাল্গু হইতেছে না দেখিয়া অতি কাতরে গৌরহরি বলিলেন—

“দশ গুণ খাওয়াইলে এবে কর সমাধান”

বক্ষা কর । আর খাওয়াইও না ; পেট ফাটিয়া গেল । জগদানন্দ । তোমার হাত ধরি আর কিছু দিও না ।

অতঃপর জগদানন্দ প্রেমানন্দে গৌরহরিকে আচমন, তাহার পর মাল্য ও চন্দনে ভূষিত করিলে পর গৌরহরি জগদানন্দের মুখের দিকে কৃপা দৃষ্টি করিয়া সহস্র বদনে প্রেম গদ গদ স্বরে বলিলেন—

“জগদানন্দ । তুমি আমার সামনে বসে এবার ভোজন কর ।”

স্বামীর সম্মুখে পতিব্রতা স্ত্রী ভোজন করেন না । আজ আবার গৌরহরি গুরু ভোজনে ক্লান্ত । সত্বর তাঁহার বিশ্রাম দলকায় বিবেচনায় জগদানন্দ বলিলেন—

“প্রভু যাই করুন বিশ্রাম ,
মুগ্ধ এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান ।
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই ‘রঘুনাথ’ ;
ইহা সভায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ১২শ

অভিমান জনিত প্রণব রোষ উপশমিত হইয়াছে । আর ভয়েব কোন কারণ নাই জানিয়াও গৌরহরি প্রেমের বিশেষ পরিপাকে গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—

“গোবিন্দ ! তুমি ইহাই রহিবে ,
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ১২শ

পরে, ‘হরে কৃষ্ণ’ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি নিজ বাসায় গমন করিলেন ।

মহাপ্রভু গোবিন্দকে পাহারা দিতে রাখিয়া গেলেন। জগদানন্দ জানেন যে ভোজনাশ্তে গোবিন্দ পাদসেবন না করিলে গৌরহরির পূর্ণ বিশ্রাম হয় না। আজ আবার অতিরিক্ত ভোজন হইয়াছে। তাই প্রেমপরিপাটিতে তিনি গোবিন্দকে বলিলেন—

“তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ-সম্বাহনে ;
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

এবং তোমার জন্ম প্রসাদ ধরা থাকিবে। প্রভু নিদ্রা গেলে পর তুমি আসিবে। এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে গৌরহরির পাদ সম্বাহরনে জন্ম সত্ত্বর পাঠাইলেন। তাহার পরে তিনি রামাই, নন্দাই, গোবিন্দ এবং রঘুনাথের জন্ম প্রসাদ বণ্টন করিয়া নিজে গৌরহরির অবশেষ পাত্র গ্রহণ করিলেন।

গোবিন্দকে সত্ত্বর আসিতে দেখিয়া গৌরহরির সন্দেহ হইল। পরে গোবিন্দের মুখে সত্য তথ্য জানিয়া মূঢ় হইলেন। অতঃপর তিনি গোবিন্দকে পুনরায় জগদানন্দের কুটিরে পাঠাইলেন। জগদানন্দের কুটির হইতে প্রত্যাগত হইয়া গোবিন্দ বলিলেন—

জগদানন্দ সত্য সত্যই প্রসাদ পাইতেছেন। এখন মহাপ্রভু স্বচ্ছন্দে নিদ্রা গেলেন।

এই প্রসঙ্গে দাস গোস্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব কবিরাজের পয়াররূপে মূর্তি ধরিয়াছে—

“জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?

জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২শ

রাই-কানুর ভাববিগ্রহ হইয়াও গৌরহরি শ্রীকৃষ্ণবিরহে জর্জরিত। ফলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছে। আবার তাঁহার আদেশে শুষ্ক কলার খোলা পাতিয়া গোবিন্দ শয্যা রচনা করিয়া দেন।

ইহা দেখিয়া ভক্তবৃন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। প্রেমান্বিত 'জগদানন্দ' 'গৌরহরিব' দৈহিক কষ্ট দূরীকরণ নিমিত্ত এক অপক্লপ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যথা—

স্বপ্ন বস্ত্র আনি গিরি দিয়া রঙ্গাইল ;
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা পুরাইল ।'

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৩শ

সেই অভিনব বিছানাটি সেবক গোবিন্দের হাতে দিয়া বলিলেন—
“প্রভুকে শোয়াইও ইহায—”

প্রেমের রীতিন বিচিত্র গতি। জগদানন্দ জানেন গোবহবি তাঁহার দেওয়া এই শয্যা স্বীকার করিবেন না। তবুও তাঁহার মন বোঝে না। এইরূপ প্রেম চেষ্টায় যে সুখ তাহা প্রেমিকেরাই বুঝিতে পারে। জগদানন্দ মনে প্রাণে অনুভব করিলেন যে গোবিন্দের কথায় গৌরহরি ঐ শয্যা অঙ্গীকার করিবেন না। তাই তিনি গৌরহরিব 'দ্বিতীয় দেহ' স্বরূপ গোস্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া নির্জনে লইয়া গিয়া মহা অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেন—

“প্রাণ প্রিয় স্বরূপ। আমি নূতন শয্যা প্রস্তুত করিয়া গোবিন্দের হাতে দিয়াছি। আজ তুমি সেই আমার প্রাণ বঁধুকে শয়ন করাইও। জগদানন্দের ভয়ে স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার অনুবোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিলেন। জগদানন্দ কিছুটা আশ্বস্ত হইলেন।

গৌরহরির শয়ন কালে আজ স্বরূপ গোস্বামী জগদানন্দের দস্ত শয্যাটি পাতিয়া দিলেন। ‘সর্বজ্ঞ’ গৌরহরি তুলার শয্যা বালিশ ইত্যাদি দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্বক গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ইহা করাইল কোন্ জন ?”

(চরিতামৃত)

গোবিন্দ ভয়ে চুপ করিয়া আছেন। স্বরূপ গোস্বামী বলিলেন—

“শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি”

প্রণয় রোষে গৌরহরি বলিলেন—

খাট এক আনহ পাড়িতে !’

অতঃপর ঐ সব তুলার বিছানা অপসারণ করিয়া যথা পূর্ব কলার শরলার শয্যা গ্রহণ করিলেন। স্বরূপ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গৌরহরির মন বিষয়াস্তুরে আকৃষ্ট করিলেন।

পর দিনের প্রভাত। জগদানন্দ স্বরূপ ও গোবিন্দের মুখে রাত্রির ঘটনা শুনিলেন। তিনি অতীব গম্ভীর হইলেন। তাঁহাকে মুখ দিতে, কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল স্বরূপ কদলীর শুষ্ক পত্র বহু পরিমাণে আহরণ করিয়া আনিলেন। সে গুলি নখ দ্বারা চিরিয়া চিরিয়া অতি সূক্ষ্ম করিলেন। গৌরহরির দুইখানি বহির্বাসের মধ্যে ঐ সকল সূক্ষ্ম শুষ্ক কদলী পত্রগুলি বিছাইলেন এবং তাহা দ্বারা একখানি যেন তোষক ও অপরটি লেপ তৈয়ার করিলেন। একখানি ভূমিতে পাতিয়া তাহার উপর শয়ন ও অপরটি গায়ে দিবেন। এই ব্যবস্থা করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় এই অভিনব শয্যাটি গৌরহরিকে দেখাইলেন। জগদানন্দের অভূত পূর্ব উৎকর্ষার প্রেম চেষ্টা দেখিয়া তাহার এই শয্যাটি গৌরহরি অঙ্গীকার করিলেন।

“জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাছুঃখী”

—••—

(৪)

মধুর রসের ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দ । তিনি গৌরহরির সন্ন্যাসব্রত তীব্র হইতে তীব্রতর দর্শন করিতে করিতে মহা ব্যাকুল হইয়াছেন । গৌরহরির কঠোরতা ক্রমশঃ ঘন হইতে ঘনীভূত হইতেছে । জগদানন্দের পক্ষে তাহা স্বচক্ষে দর্শন ও সহ্য করা অসম্ভব হইল । তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িলেন । তিনি ক্রোধে ও মহাছুঃখে মনে মনে বিচার করিলেন—

‘নীলাচলে থাকিব না’ প্রাণনাথের এ অবস্থা চক্ষে আর দেখিব না, বৃন্দাবন পলায়ন করি ।” পর মুহূর্তে তাঁহার চিন্তা জাগিল “গৌরহরিকে না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব ?” উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি বিষম চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন । অন্তবেদ ক্রোধ ও ছুঃখ বাহে প্রকাশ না করিয়া তিনি গৌরহরির নিকট বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । ‘সর্বজ্ঞ’ ও ‘রসিক-শেখর’ গৌরহরি প্রেমাবেশে বলিলেন—

“মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি :
আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিকারী ?”

চরিতামৃত অন্ত্য ১৩শ

আমার সঙ্গে চাতুরী ! আমার উপর ক্রোধ করিয়া মথুরা যাইতে চাও । না ! না ! আমি তোমাকে মথুরা যাইবার অনুমতি দিব না । দিব না ।

‘জগদানন্দ’ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ‘গৌরহরির’ নিকট হইতে মথুরা যাইবার আদেশ আদায় করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের ভাব—“আমার অব্যাহতি নাই। অন্তিম দশা দেখাইয়া তবে ছাড়িবে। কি শঠ!” যাহা হউক, নিজ উদ্দেশ্য সাধন জন্য পুনরায় তিনি স্বরূপকে বলিলেন—

“দেখ স্বরূপ! আমি যেমন ‘আই’ * দর্শনে নবদ্বীপে যাই ও ফিরিয়া আসি, সেইরূপ একবার বৃন্দাবন যাইতে চাই। আমি বলবার বলিয়াছি। আমার কথা বিশ্বাস করে না। অনুমতি দেয় না। তুমি একথা বলিয়া ব্যবস্থা করে দাও।”

‘স্বরূপ’ সুযোগ ও সময় বুঝিয়া ‘গৌরহরিকে ‘জগদানন্দকে’ বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি দিতে প্রার্থনা করিলেন। গৌরহরি ঈষৎ হাসিয়া সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিলেন।

‘গৌরহরি ও ‘জগদানন্দ’ প্রেমকোন্দলে কে প্রবেশ করিবে ?

দাম্পত্য কলহে—অভিমান পড়ি। জগদানন্দ ব্রজের পথে গমন করিলেন। তাঁহার মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা তাঁহারই স্বর্বাচিত ‘প্রেমনিবর্ত’ গ্রন্থে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই অপূর্ব ও মধুর পদ দুইটি ‘বসুনাথের পবন আদর্শের ধন। নীচে উদ্ধৃত হইল।

গৌরাঙ্গ তোমার. চরণ ছাড়িয়া, চলিহু শ্রীবৃন্দাবনে
পূর্ব লীলা তব, দেখিব বলিয়া, হইল আমার মনে।

* শতীমাতা:ক বৈষ্ণববা ‘আই’ বলিতেন।

কেন সেই ভাব, হইল আমার, এখন কান্দিয়া মরি ।
তোমারে না দেখি প্রাণ ছাড়ি যায়, না জানি এবে কি করি ॥

ও রাজ্জা চরণ, মম প্রাণ ধন, সমুদ্র বালিতে রাখি ।
কি দেখিতে আইনু, নিজ মাথা খাইনু, উড়ু উড়ু প্রাণ পাখী ॥

যত চলি যাই, মন নাহি চলে, তবু যাই জেদ করি ।
প্রেমের বিবর্ত, আমারে নাচায়, না বুঝিয়া আমি মরি ॥

গৌরাজ্জের বঙ্গ, বুঝিতে নারিনু, পড়িনু ছুঃখ-সাগরে ।
আমি চাই যাহা, নাহি পাই তাহা, মন যে কেমন করে ॥

গৌরাজ্জের তরে, প্রাণ দিতে চাই, না হয় মরণ তনু
মবিব বলিয়া, পড়িয়া সমুদ্রে, খাই মাত্র হাবু ডুবু ।

সে চন্দ্র বদন, দেখিবার লোভে, শীঘ্র উঠি সিন্ধু তটে ।
পুন নাহি দেখি, প্রাণ উড়ি যায়, চলি পুনঃ টোটা বাটে ॥

গোপীনাথাজ্জনে, দেখি গৌরা মুখ, পড়ি অচেতন হৈঞা ।
পণ্ডিত গোসাজ্জি, মোরে লঞা রাখে, দেখি পুনঃ সংজ্ঞা পাঞা

গৌর গদাধর, বসিয়া ছুজনে, বলেন আমার কথা ।
অমনি কান্দিয়া, যাই গডাগডি, না বিচারে যথা তথা ॥

ক্ষণেক বিরহ, না সহিতে পারি, গৌর মোর হৃদে নাচে ।
মরিতে না দেয়. বাঁচিলে কোন্দল, কিসে মোর প্রাণ বাঁচে ?

হেন অবস্থায়, গৌর পদ ছাড়ি, মোর বৃন্দাবন আসা ।
এ বুদ্ধি হইল, কেন নাহি জানি, ইহ পরকাল নাশা ॥

আজ্ঞা লইলু যাইতে, আজ্ঞা না পালিলে, তাতে হয় অপরাধ ।
গোরাচাঁদ মুখ, না দেখিয়া মরি, সব দিকে মোর বাধ ॥

‘গোরাপ্রেম’ যার, শঙ্কট তাহার, প্রাণ লৈয়া টানাটানি ।
গদাধর গণে, এইত হৃদশা, সব করে কানা কানি

(২)

ভাঙি রে বৃন্দাবন যাওয়া হইল না
গোরামুখ না দেখিয়া, গৌররূপ ধেয়াইয়া
পথ ভুলে যাই অন্য দেশ ।
সেখান হইতে ফিরি, পুন যদি ধীর ধীরি
পুন আসি দেখি সে প্রদেশ ॥

এইরূপে কত দিনে, যাব আমি বৃন্দাবনে
না জানি কি হবে দশা মোর ।
বৃক্ষতলে বসি বসি কাটি আমি অহনিশি
কভু মোর নিদ্রা আসে ঘোর ॥

স্বপ্নে বহু দূর গিয়া সিন্ধুতটে প্রবেশিয়া
দেখি গোরার অপূর্ব নর্তন ।
গদাধর নাচে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ নাচে রঙ্গে
গায় গীত অমৃত বর্ষণ ॥

নৃত্য গীত অবসানে, গোরা মোর হাত টানে
বলে 'তুমি' ক্রোধে ছাড়ি গেলে ।
আমার কি দোষ বল তব চিত্ত সূচঞ্চল
ব্রজে গেলে আমি হেথা ফেলে ॥

আইস আলিঙ্গন করি তব বক্ষে বক্ষ ধরি
ছাডো মুখিঃ চিত্তের বিকার ।
মধ্যাহ্নে কবিয়া পাক দেহ মোরে অন্ন শাক
ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হউক আমার ॥

ছাড়িয়া জগদানন্দে মোব মন নিরানন্দে
ভোজনাদি নৈল কত দিন ।
কি বুঝিয়া গেলে তুমি, ছুংখেতে পড়িছু আমি
জগা মোর সদা দয়ালীন ॥

শীঘ্র ব্রজ নিরখিয়া আইস তুমি সুখী হঞা
মোরে দেহ শাকান ব্যঞ্জন ।
তবে ত বাঁচিব আমি তাতে সুখী হবে তুমি
ক্রোধে মোরে না ছাড কখন ।

নিদ্রা ভঙ্গে দেখি আমি বহুদূর ব্রজভূমি
নিকটেতে জাহ্নবী পুলিন ।
আহা । নবদ্বীপ ধাম, নিত্য গোব-লীলা গ্রাম,
ব্রজসার অতি সমীচীন ॥

আনন্দেতে মায়াপূবে প্রবেশিছু অন্তপুরে
নমি আমি আই-মাতা-পদ ।

গৌরাজের কথা বলি

শীত্র আইলাম চলি

দেখি নবদ্বীপ সুসম্পদ ।

ভাবিলাম বৃন্দাবন

করিলাম দরশন

আর কেন যাব দূর দেশ ।

গৌর দরশন করি

সব ছুঃখ পরিহরি

ছাড়ি দিব বিরহজ ক্লেশে ।

জগদানন্দের নিম্নোদ্ধৃত স্বরচিত 'নাগরা' ভাবের পদটিও রঘুনাথের নিত্য স্বাধ্যায়ের ধন ছিল ।

চাঁদ নিঙ্গাডি কেবা, অমিয়া ছানিল রে, তাহে মাজল গোবামুখ ।
মোতিম দরপণ সিন্দূরে মাজল, হেরইতে কতই সুখ ॥

ভূতলে কি উয়ল চাঁদ

মদন বেযাধ কি, নাবী হবিণী, পাতল নদীযামে ফাঁদ ।

গেও মবু ধরম, গেউ মবু মরম, গেও মবু কুলশীলমান ।

গেও মবু লাজ ভয়, গুক গঞ্জনা চায়, গৌরা বিহু অথির পবাণ ।

গৌর পীরিতে হম, ভেল গববিত কুলমানে অনল ভেজাই ।

জগদানন্দ কহ, ধনি ধনি তুয়া লেহ মনি যাঙ লৈয়া বালাই ।

(গৌর পদ কবছিন)

----- (০০) -----

রঘুনাথ ভট্ট প্রসঙ্গে :

ভূমিকা

প্রখ্যাত তপন মিশ্র, তাঁহার পুত্র “রঘুনাথ” (ভট্ট গোস্বামী) কাশীধাম হইতে দুইবার নীলাচলে আগমন করেন। প্রত্যেক বারই আট মাস যাবৎ গৌরহরির সান্নিধ্যে বাসের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস হইতে বয়সে সামান্য ছোট। নীলাচলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ঘটে। ভাবী কালে এই ঘনিষ্ঠতার মধুরতা ও গভীরতা প্রকাশ পায় উভয়ের অপেক্ষে ‘স্থান’, ‘মাস’ ও ‘তিথির’ মিলনে। শ্রীকৃষ্ণে, আশ্বিন মাসে, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ‘দাস রঘুনাথ’ ও ‘ভট্ট রঘুনাথ’ উভয়েই নিজ নিজ প্রকট লীলা সঙ্কোচন করেন। অত্যাপি শ্রীকৃষ্ণের তটে পাশাপাশি উভয়ের সমাধি দুইটি বর্তমান।

গৌরহরি নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাতায়াতের পথে বারাণসীতে প্রিয় ভক্ত তপন মিশ্রের ঘরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় রঘুনাথ বালক। বিশুদ্ধ আধার ও বয়সে, বালক নিজ গৃহেই স্বয়মাগত ভাবমণ্ডিতবিগ্রহ অপূর্বদর্শনের পুরুষোত্তম গৌরহরিকে লাভ করিয়া রঘুনাথ পরমানন্দে দুই মাস হইতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় পর্য্যন্ত গৌরহরির শ্রীচরণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কথায় ছায়ার মত থাকিয়া অখণ্ড গৌর-সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। ফলে অনির্বচনীয় প্রেমের টানে পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথ একদিন নীলাচল পলাইয়া যান। ‘সর্ব-চিত্ত-জ্ঞাতা’ ‘গৌর-হরি’ নীলাচলে তার সাক্ষাৎকারেই রঘুনাথকে গাঢ় আলিঙ্গনে কৃতার্থ ও আত্মসাৎ করিলেন। পরে, তপন মিশ্র চন্দ্রশেখর আদি

দাস গোস্বামীর সমাধি



শ্রী গোস্বামীর সমাধি

কাশীবাসী ভক্তবৃন্দেৰ কুশল জিজ্ঞাসা কৰেন। তঁৱৰপৰ অত্যন্ত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিয়া বলিলেন—

“ভাল হৈল আইলা, দেখ কমল লোচন ;
আজি আমাৰ এথা কৰিবে প্ৰসাদ ভোজন।”

চৰিতামৃত অন্ত্য ১৩শ

নিজেৰ অবশেষ পাত্ৰ দানেৰ অন্তে—

“গোবিন্দেৰে কহি এক বাসা দেওয়াইল ;
সঙ্গে স্বৰূপাদি ভক্তগণ মিলাইল।”

চৰিতামৃত অন্ত্যঃ ১৩শ

গোৱাঙ্গ, গোবিন্দ ও স্বৰূপেৰ ইচ্ছায় ‘দাস ৰঘুনাথ আটমাস ব্যাপী ভট্ট ‘ৰঘুনাথেৰ’ সেবক সাথী ও বন্ধুৰূপে নিযুক্ত হইলেন। শ্ৰান, ‘জগন্নাথ’ দৰ্শন, বিভিন্ন বৈষ্ণৱবৃন্দেৰ দৰ্শন, হাট, বাজাৰ সৰ্ব্ব কাৰ্যে সদাই ‘তুই ৰঘুনাথ’ একত্ৰে থাকেন।

ৰঘুনাথ ভট্ট মিত্ৰ ৰঘুনাথ দাসেৰ নিকট গোৱহৰিৰ প্ৰিয় খাচু দ্ৰব্যেৰ তালিকা সংগ্ৰহ কৰিয়াছেন। উভয় বন্ধু পৰামৰ্শ কৰিয়া গোৱেৰ প্ৰিয় আহাৰ্য্য বস্তু সংগ্ৰহ কৰিয়া আনিতেন। ভট্ট ৰঘুনাথ ৰন্ধনে সুপটু ছিলেন। পৰিপাটীৰ সহিত ৰন্ধন কৰিয়া মাৰে মাৰে গোৱহৰিকে নিমন্ত্ৰণ কৰিতেন। এই ৰূপে নানাৰিধ আনন্দে আটমাস অতীত হইল। অতঃপৰ একদা গোৱহৰি ভট্টকে পৰম স্নেহে স্বহস্তে নিজেৰ গলাৰ মালাটি লইয়া পৰাইয়া দিয়া বলিলেন—

‘বৎস ৰঘু ! তোমাৰ পিতামাতা কাশীবাসী। যত দিন তাঁহাৰা জীৱিত ততদিন তুমি তাঁদেৰ সেৱা কৰ এবং কাশীতে কোন বৈষ্ণৱেৰ নিকট ভাগৱত পাঠ কৰিবে। বিবাহ কৰিও না। পিতা

মাতার দেহান্তে (আবার) আমার নিকট চলিয়া আসিবে ।
এই বলিয়া মহাপ্রভু রঘুকে প্রেমালিঙ্গন ও স্নেহ চুম্বন দানে রঘুকে
তৃপ্ত করিয়া বিদায় দিলেন ।

রঘুর অবস্থা—

‘প্রেমে গর গর ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা’

চৈঃ চঃ অন্ত ১৩শ

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দের নিকট বিদায় লইয়া ভট্ট রঘুনাথ বন্ধু ‘দাস
রঘুনাথকে’ বৃকে জড়াইয়া বলক্ষণ ধরিয়া উভয়ে ক্রন্দন করিলেন ।
পরে বিগত আটমাসের নীলাচল বাসেব সুখ স্মৃতি সম্বল করিয়া
গৌর আজ্ঞা পালন করিবার ব্রত লইয়া কাশীর পথে যাত্রা
করিলেন ।

‘ভট্ট রঘুনাথ কাশী প্রত্যাগমম করিয়যা চারি বৎসর কাল ‘পিতা
মাতার সেবা করিলেন । বৈষ্ণব পণ্ডিতের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ
করিলেন । পিতা মাতা ইহ ধাম পবিত্যাগ করিলে পর তিনি গৃহ
বিত্তাদি পরিত্যাগ পূর্বক সম্পূর্ণ উদাসী হইয়া পরমানন্দে নীলাচল
যাত্রা করিলেন । মনে সুখময় আশা রহিল যে এবার উভয় বন্ধুতে
একত্রে পরমানন্দে নীলাচলে গৌরভরির সেবা সুখ ভোগ করিবেন ।

‘রঘুনাথ’ নীলাচলে আসিয়া—

গৌরাজ্ঞের দরশন পেয়ে

তোমার ক্রীতদাস এসেছে বলে

পড়িলেন লুটাইয়া

পড়িলেন লুটাইয়া

পড়িলেন লুটাইয়া

নিজ দাসে কবি কোলে

প্রাণ গৌর ভাসে নয়ন জলে

প্রাণ গৌর ভাসে নয়ন জলে

(শ্রীপাদ রামদাস)

পূর্ব বারে রঘুনাথ গৃহী ভক্তের মত নিজ অর্থ ব্যয়ে নীলাচলে বসবাস করিয়াছিলেন। এবার, উভয় বন্ধুর (দাস রঘুনাথ ও ভট্ট রঘুনাথ) শ্রীতি ক্রমশ বদ্ধিত হইয়া আরও ঘন হইল। এমন সময় হঠাৎ একদিন গৌরহরি নিজ শক্তি সঞ্চার করিয়া 'ভট্ট রঘুনাথকে' বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিলেন। দাস রঘুনাথের মত বন্ধু ও প্রাণ-মন-উন্মাদকারী গৌরান্ধ স্বরূপ এবং তাঁহার অমিয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গৌরহরির সুখের জন্য ভট্ট রঘুনাথ ব্রজের পথে যাত্রা করিলেন। একটু যান আর ফিরিয়া পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে অশ্রুসজল দৃষ্টিতে অগ্রসর হন।

অনির্বচনীয় দশা। নয় কি ?

৪৫৫ শকাব্দের পরে আবার উভয় বন্ধুতে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতে মিলিত হইয়াছিলেন।

বাণীনাথ প্রসঙ্গেঃ

(শ্রীলক্ষ্মদাস কবিরাজ তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের অন্ত্য খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে এই লীলাটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় এই ঘটনাটি দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াই তাহার গভীর তাৎপর্য অনুভব করিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

নিত্যমিলনে নিত্য বিরহ এই 'মিলা' 'অমিলা' রসের খেলায় এইরূপ ভাবপ্রমত্ত গৌরহরি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। 'জগন্নাথ' দর্শনের ছল করিয়া নানান দেশের লোক নীলাচলে 'সচল জগন্নাথ' দর্শন করিতে আসেন। সচল জগন্নাথ গৌরহরির নাম, যশ, গুণ ও প্রভাব তখন দিগন্ত ব্যাপ্ত।

ত্রি-জগতের লোক আসি করে দরশন ;
যেই দেখে সে-ই পায় কৃষ্ণ প্রেমধন ।’

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ৯ম

এই সময়, একদিন কোন এক ব্যক্তি উর্দ্ধ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া গম্ভীর ভবনে গৌরহরির শ্রীচরণে পরম উদ্বেগের স্বরে নিবেদন করিল—

‘গোপীনাথকে ‘বড় জানা’ চাঙ্গে চড়াইল’

চরিতামৃত

(চাঙ্গে চড়ান কথাটি অধুনা লুপ্ত প্রথা। গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে তাৎকালিক প্রথা অনুসারে রাজ আজ্ঞায় একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মান করিয়া অপরাধীকে তাহার উপর চড়ান হইত। মঞ্চের নিম্নদেশে শাগিত খড়্গাদি রক্ষিত হইত। উপর হইতে অপরাধীকে নিম্নে সজোরে ফেলিয়া দিয়া তাহার প্রাণ বধ করা হইত। ইহার নাম চাঙ্গে চড়ান।)

অদূরে দণ্ডায়মান ব্যাকুলচিত্ত আগন্তুকের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরহরি গম্ভীর স্বরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—

“রাজা কেন করয়ে তাড়ন ?”

চরিতামৃত

সে তখন সমস্ত্রমে নিবেদন করিল—

“প্রভু ! গোপীনাথ রায় রামানন্দের ভ্রাতা। রায়রামানন্দ যেমন রাজমন্ত্রীর শাসন কর্তা ছিলেন, গোপীনাথও সেইরূপও “মাল জাঠ্যা দণ্ডপাট” নামক অঞ্চলের শাসন কর্তা। তিনি মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের কর্মচারী। ঐ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার

গোপীনাথের উপর। তিনি রাজস্ব আদায় করিয়া নিজের স্বার্থেই ব্যয় করিয়াছেন। ফলে, রাজ সরকারের দুই লক্ষ কাহন তাহার উপর বাকী পড়িয়াছে। রাজ সরকার টাকার তাগাদা দিলে গোপীনাথ বলে যে “আমার হাতে নগদ টাকা নাই, ধীরে ধীরে নিজ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া পরিশোধ দিব। আমার দশ বারটি ভাল ঘোড়া আছে তাহাদের উচিত দাম করিয়া লওয়া হউক।” এই বলিয়া তিনি রাজদ্বারে নিজের ঘোড়াগুলি আনাইলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাত্র মিত্র সহ ঘোড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া নিজেদের বিচার মত একটি মূল্য বলিলেন। সে মূল্য গোপীনাথের মনঃপুত হইল না। তিনি নিজ ছুর্দেবে ও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া রাজপুত্রের (পুরুষোত্তম জানা) প্রতি অতি অপমান সূচক ভাষা প্রয়োগ করিলেন। বিচক্ষণ রাজপুত্র গোপীনাথের অসম্মান জনক বাক্যের কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া (পিতা) মহারাজার নিকট গিয়া বিস্তারিত নিবেদন অন্তে বলিলেন—

“পিতা ! গোপীনাথ সহজে টাকা দিবে না। আপনি আদেশ দেন, তাহাকে চাঙ্গে চড়াইলে, তখন প্রাণভয়ে টাকা দিবে।”

রাজা বলিলেন—

‘যে উপায়ে কোড়ি পাই কর সে উপায়’

বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণে গৌরহরি বলিলেন—

“রাজার ঞ্চায়্য প্রাপ্য দেয় নাই বলিয়া রাজা গোপীনাথকে নির্ঘাতন করিতেছে। তাহাতে রাজার দোষ কি? কোনও দোষ নাই।” তাহার পর প্রণয় রোষে পুনঃ বলিতেছেন--“রাজস্ব আদায় করিয়া বেশ্যা ও আমোদ প্রমোদের ব্যয় করিয়াছে। রাজদণ্ডের ভয় নাই। এ কি? চতুর ব্যক্তির প্রথমে রাজার প্রাপ্য পরিশোধ করে, পরে যাহা উদ্ভূত হয় তাহা নিজের জন্ত ব্যয় করে।”

এমন সময়ে গোপীনাথের কল্যাণকামী অপর এক ব্যক্তি ব্রহ্ম ভাবে প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল—

“গোপীনাথকে তো চাঙ্গে চড়াইয়াছেই, তাহার উপর আবার গোপীনাথের ভাই বাণীনাথ প্রভৃতি তাহার বংশের সকলকে রাজ আদেশে বাঁধিয়া লইয়া গেল।’

গৌরহরি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট চিত্তে ও ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—

“রাজা কোন অন্যায় করিতেছেন। তিনি নিজ পাওনা টাকা উত্তুলের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি বিবক্ত সন্ন্যাসী আমি কি করিতে পারি?”

গৌরহরির উদাসীন্য দেখিয়া গম্ভীরা মন্দিরে গোবদমীপে অবস্থিত স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ পরম আর্তির সহিত নিবেদন করিলেন—

“রামরায়ের গোষ্ঠী তোমার দাস। তুমি প্রভু ও রক্ষক। তোমার উদাস হওয়া উচিত হয় না।”

স্বরূপাদি সকলের মুখ হইতে এই বাক্য শ্রবণে গৌরহরি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

‘মোরে আজ্ঞা দেও সবে যাই রাজস্থানে ?

তোমা সবার এইমত রাজঠাই যাঞা,

কৌড়ি মাগি লই আমি অঁচল পাতিয়া।’

চরিতামৃত

আরও বলিলেন—

‘আচ্ছা তোমাদের অনুরোধে যদি বা আমি তাহা করিতেও ইচ্ছা করি তাহাতে কি লাভ হইবে? আমি ভিক্ষুক মাত্র। আমার কথায় রাজা নিজ প্রাপ্য ছই লক্ষ কাহন কেন ছাড়িবেন ?

এমন সময় অতি দ্রুত বেগে অপর এক ব্যক্তি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল—

খড়্গোপরি গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া

চরিতামৃত

এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে গম্ভীর মন্দিরে সমাগত সকলে ধৈর্য্যহারা হইয়া পরম ব্যাকুলতার সহিত গৌরহরির শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িয়া পুনরায় অনুনয় পূর্বক সকলে সম্বন্ধে নিবেদন করিলেন।

‘প্রভু! রক্ষা কর। প্রভু! রক্ষা কর’।

‘ছন্ন ভগবান গৌরহরি’ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—
“আমি ভিক্ষুক। আমার কোন সামর্থ্য নাই সুতরাং আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে না। তবে গোপীনাথকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সকলের ইচ্ছা হইলে আমার পরামর্শ শোন ‘তোমরা সবসমর্থবান শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণে নিবেদন কর।’”

দৈবাৎ সেই সভাতে রাজমন্ত্রী হরিচন্দন উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলের অগোচরে ক্ষিপ্রগতিতে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট গমন করিয়া নিবেদন করিলেন—

‘মহারাজ। গোপীনাথ পট্টনায়ক আপনার সেবক। প্রভু হইয়া সেবকের প্রাণদণ্ড শোভা পায় না। এছাড়া তাহার নিকট টাকা বাকী আছে। প্রাণ লইলে কি লাভ হইবে? তাহার ঘোড়াগুলির মূল্য নিরূপণ করিয়া লওয়া হউক। ও সেই মূল্য গোপীনাথের দেহ দ্বারা উত্তোল হউক। তাহার পর বাকী টাকাও যাহাতে ধীরে ধীরে উত্তোল হয় তাহাই করা ভাল। না কি?’

হরিচন্দনের মুখে এই সব বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ প্রতাপ-
রুদ্র বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

‘এ সব তুমি কি বলিতেছে? অতঃপর হরিচন্দনের মুখে বিস্তারিত ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—এ যাবত এ সবে কিছই আমার জানা ছিলনা। যাহা হউক তুমিই এখন এ কার্যের—
ভার লও। গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা হয় আর রাজ সরকারের টাকা আদায় হয় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা কর।’

‘হরিচন্দন,’ ‘জানার’ সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার সহিত আলাপে তিনি বুঝিলেন—‘চাঙ্গে ফেলা জানার আশা নয়’। ভয় দেখাইয় টাকা উত্তুলের কৌশল মাত্র। যাহা হউক অতঃপর গোপীনাথকে চাঙ্গ হইতে নামান হইল। ঘোড়াগুলি গোপীনাথের অসুমোদিত মূল্যে রাজ সরকারে খরিদ হইল। এবং বাকী টাকার জন্য গোপীনাথ একটি মুদ্রতি অর্থাৎ কতদিন মধ্যে বাকী টাকা উত্তুল দিবেন তাহা লিখিয়া দিয়া স্বপরিবারে গৃহে গমন করিলেন। এ ঘটনা তখনও গৌরহরি ও গম্ভীরা মধ্যে অবস্থিত ভক্তবৃন্দের গোচরীভূত হয় নাই।

‘যে বার্তাবহ খবর দিয়াছিল ॥

বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বাঁধিয়া’

তাহাকে ‘গৌরহরি প্রশ্ন করিলেন—

‘বাণীনাথ কি করে ; হবে বাঁধিয়া আঁল’

‘গৌরহরির পরম গম্ভীর এই প্রশ্নের জবাবে বাত্তাবহ বলিল—
‘প্রভু ! বাণীনাথের ব্যবহার অভূতপূর্ব ! অত্যাশচর্য। কারণ, প্রকাশ্যে রাজপথে, অতি অপমান জনক বন্দীদশায়, পদব্রজে গমনের অসম্মানে তাহার লজা, দুঃখ বা উদ্বেগ নাই। তিনি পরম নির্ভয়।

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।’

এই নাম তিনি অবিশ্রান্ত ভাবে মুখে উচ্চারণ করিতেছেন। এই মহামন্ত্র ‘জপ’ বা ‘কীর্তন’ যাহাই হউক না কেন ইহার সত্য রাখা শাস্ত্র বিধি এমন কি তুমিও নিজে আচরণ কর। তোমার

কৃপা নির্দেশও তাহা । এ কারণ, তোমার বাণীনাথ বন্ধন দশাতেও অশ্রুত পূর্ব চেষ্টায় মহামন্ত্র নামের সংখ্যা রাখিতেছেন । যথা—

প্রথমে দুই হাতের অঙ্গুলির রেখায় নামের সংখ্যা রাখিতেছেন । ডাইন হাতের অঙ্গুলী পর্বে দশ সংখ্যা এবং বামহাতের অঙ্গুলী পর্বে শত সংখ্যা । এক শত নাম করা হইলে অঙ্গে একটি রেখা টানেন । এইরূপ দশটি রেখা হইলে এক সহস্র নাম হয় ।”

ইহা শ্রবণে গৌরহরি পরম আনন্দিত হইলেন । বাণীনাথ যে শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় পাইয়াছে তাহা জগতে প্রকটিত হইল ।

‘সে-ই শুদ্ধ ভক্ত—তোমা ভজে তোমা লাগি ।

আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগ ভাগী ॥

এই (শুদ্ধ ভক্তের নাম) আদর্শের মূর্তি বাণীনাথ” ।

সর্ব অবস্থায় ‘আমাদের ‘আশ্রয়’ (এই ঘটনার দৃষ্টা ও শ্রোতা) রঘুনাথ, ইহা মনে প্রাণে অনুভব করিলেন ।

—————

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নদী-সাগর-সঙ্গমে ভাসি গেলা নীলাচলঃ—

(১৪৩৪শকের বথযাত্রা ; ১৪৩০শকের রথযাত্রা এবং ১৪৩৮ শকাব্দ হইতে ১৪৫৫ শকাব্দ প্রত্যকে বা (১৮বার) এইরূপে মোট বিংশতিবার গোড় দেশীয় অদ্বৈতাদি ভক্ত বৃন্দ নীলাচলে আসিয়া ছিলেন । আর রঘুনাথ ১৪৪০ হইতে ১৪৫৫ শকাব্দ পর্যন্ত ষোল বৎসর নীলাচলে বাস করেন ।)

রথযাত্রার পূর্বে প্রতিবৎসর গোড়দেশ হইতে বৈষ্ণববৃন্দ যেদিন নীলাচল প্রবেশ করেন ও গম্ভীরাবাসী গৌরহরি নিজ গোষ্ঠী সহ আঠার নালা নিকট মিলিত হন, সেই মিলনকে “ভক্ত সম্মিলন” বলা হয় । ‘রঘুনাথ’ ষোল বার এই ভক্ত সম্মিলন উৎসবে সক্রিয় ভাবে স্বরূপের আনুগত্যে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন । অত্যাপি প্রতি বৎসর গোণ আষাঢ় চতুর্দশী তিথিতে এই “ভক্তসম্মিলন লীলা” হইয়া আসিতেছে । আজকাল মিলনটি আঠার নালা নিকটে না হইয়া জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের অদূরে হয় ।

নিজেদের স্বাভাবিক প্রীতিতে এবং গৌরহরির স্নেহ আঙ্কাক্রমে যথা—

“প্রত্যকে আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে”

প্রতিবর্ষে গৌড়দেশীয় পার্বদ ও ভক্তবৃন্দ পদব্রজে, সুদীর্ঘ পথ, পরম-সুখকর-বোধে অতিক্রম করিয়া গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আগমন করিতেন।

‘বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি’

চরিতামৃত মধ্য ১ম

প্রায় প্রতিবারই শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য দলের নেতা হইয়া আগমন করিতেন।

চৈঃ চৈঃ অন্ত্যঃ ১০

এবং ‘সেন শিবানন্দ’ পথে গমন কালে ভক্তবৃন্দের স্থানে স্থানে রাত্রি যাপনের বাসস্থান, রন্ধনের কাষ্ঠাদি উপকরণ এবং বিভিন্ন নদীতে পারের নৌকা ব্যবস্থা (ঘাটি সমাধান) ইত্যাদি সর্ব প্রকার সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্ম নিজ ভৃত্যবর্গসহ সমাধান কার্যের সেবক ছিলেন—

‘শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান।

সবারে পালন করে দেন বাসস্থান ॥’ •

চরিতামৃত অন্ত্য ১ম

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের এই বাষিক নীলাচল গমন লীলাটি যেন ‘গৌরাঙ্গগণ’ নদ নদীর সমুদ্র প্রবেশের মত অর্থাৎ গৌররূপ সিদ্ধিতে মিলিত হইবার জন্ম ছুটিয়াছে। প্রত্যক্ষ দর্শী মহাজনবৃন্দ এই সু-মধুর গমন লীলাটি বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। দিক দর্শন হিসাবে আমরা সামান্য একটু স্পর্শ করিতেছি—

“কীর্তনের মহারোল

ঘন ঘন হরিবোল

অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে ।”

নীলাচল ধামে প্রবেশ মুখে ‘আঠার নালা’ । অর্থাৎ আঠারটি নালা বিশিষ্ট একটি পুল (Bridge) বর্তমান পুরী সহরের মালি পাড়া পুলিশ আউট পোষ্টের অতি নিকটে এই প্রখ্যাত আঠারনালা পুলটি আজও অবস্থিত । গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের সর্ব চিত্তাকর্ষক হরিনামের তুমুল রোল এই আঠার নালা হইতে গম্ভীরায় শোনা যাইত । সঙ্কীর্্তন ধ্বনি শ্রবণে গৌড়ীয় ভক্তদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য গৌরহরি সগণে (রামরায় স্বরূপ, গোবিন্দ, শঙ্কর, রামাই ‘রঘুনাথ আদি নিজ জন ও নীলাচল বাসী সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্য্য আদি) কীর্তন রঙ্গে অগ্রসর হইতেন ।

“হেন কালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে ।

বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে মহা রঙ্গে ॥”

চরিতামৃত মধ্য ১১

ত্রিকাল সত্য লীলাটি অহুভব করিয়া শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় প্রতি বর্ষ ভক্ত সম্মিলনী (গৌড়দেশ বাসী ও গম্ভীরাবাসী ভক্তবৃন্দের মধুর মিলন) সময়ে যে কীর্তন করেন তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল—

‘চমকিয়া উঠিলেন প্রভু

(বুঝি) আসিছেন শান্তিপুর নাথ

ঠাকুর অবধূত সনে

বুঝি আসিছেন শান্তিপুরনাথ

গৌড় দেশের ভক্ত লয়ে

বুঝি আসিছেন শান্তিপুরনাথ

অম্বনি ছরা করি গৌরহরি
(বলেন) চল স্বরূপ রামরায়
(চল) ছরা করে যাই আঠার নালায়
ছরায় কীৰ্ত্তন সজ্জা কর

গম্ভীরা হইতে

অনুরাগ তরঙ্গে হেলে তুলে
উপনীত আঠার নালায়

নদ-নদী আর সিন্ধুতে
দৌহাকার গতি রোধ হ'ল

আর কেউ চলিতে নারে

স্থির 'গৌর' 'গোরাঙ্গগণ'
বহু নয়নে গোরাঙ্গগণ
করিছেন গৌর দরশন
তু'টি নয়নে গৌরহরি
অনুরাগে দেখিছেন পরিকর
হতেছে অপূৰ্ব রঙ্গ

যায় প্রভু নীলাচল পথে
যায় প্রভু নীলাচল পথে

চলিলেন প্রাণ গৌরহরি
চলিলেন প্রাণ গৌরহরি

পরস্পরে হ'ল দরশন
পরস্পরে হ'ল দরশন

হ'ল সবার গতিরোধ
হ'ল সবার গতিরোধ

প্রতি পরিকর করিতেছে মনে
 প্রতি পরিকর করিতেছে মনে
 গৌর চেয়ে আমার প্রানে
 এই প্রকার ঐশ্বর্য্য

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য
 প্রতি পরিকর করিছেন মনে
 প্রতি পরিকর করিছেন মনে
 গৌর চাহিছেন আমার পানে

কিছু পরে হই অগ্রসর
 কিছু পরে হই অগ্রসর
 কিছু পরে হই অগ্রসর
 জনে জনে কোলাকুলি
 প্রতি পরিকর সনে মিলন

কি বলব সে মিলন কথা—

‘অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন রে ।
 দৌহে কান্দে ধরি মহাপ্রভুর চরণ রে ॥

শ্রীবাসেরে কোলে করি কাঁদেন গৌরাজ ।
 প্রেম জলে ভাসি গেলা শ্রীবাসের অঙ্গ ॥

অপরূপ প্রেমসিদ্ধ গৌরসিদ্ধ সনে ।
 অদ্বৈতাদি মহানদীর হইল মিলনে ॥

নদী সাগর সঙ্গমে
 ভাগ্যবান নীলাচল বাসী
 শ্রীগৌরাজ প্রেম-বন্যায়

উঠিল প্রেমের তরঙ্গ
 উঠিল প্রেমের তরঙ্গ
 সুখেতে সাঁতার দিচ্ছে
 সুখেতে সাঁতার দিচ্ছে

প্রতি বর্ষে গোড় দেশীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসেন। এবং চারি মাস কাল পর্যন্ত গৌরহরির সঙ্গে অবস্থান করেন। সুতরাং এই সব গোড়িয় ভক্তবৃন্দের প্রত্যেকে চারি মাস নীলাচলে বাসের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। তবে, প্রথম দিন মধুর মিলন প্রসঙ্গের অন্তে সকলে সমুদ্র স্নানে যাইতেন এবং মধ্যাহ্নকৃত্য 'গৌরহরির' 'গম্ভীরা মন্দিরে' সমাপন পূর্বক পরে সকলে নিজ নিজ বাসায় গমন করিতেন। "রঘুনাথ" "রামাই" প্রভৃতি অনুরূপ যুবক সেবকবৃন্দ পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া গোড় হইতে আগত গৃহস্থ ভক্ত ও গৌর পরিকরদের জিনিষ পত্র বহন করিয় প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক বাস ভবনে স্থাপন তাঁহাদের গৃহ সম্বার্জন, নূতন জলপাত্র সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকের জন্য পানীয় জল স্থাপন ইত্যাদি সর্ব প্রকার সেবা করিতেন।

রাঘবের ঝালিঃ

'প্রতিবর্ষে আইসে সব গোড়ের ভক্তগণ,
চারি মাস বহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন।'

চরিতামৃত্য মধ্য ১ম

গোড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দ প্রতিবর্ষে বথঘাত্রার পূর্বে নীলাচলে আগমন করেন এবং চারি মাস কাল যাবৎ গৌরহরির সঙ্গে সুখ ভোগ করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই গৌরহরিকে উপহার দিবার জন্য সুদূর গোড়দেশ হইতে অগণিত দ্রব্য সত্তার আনিতেন। নদীয়ায় যখন শ্রীগৌরসুন্দর অবস্থান করিতেন তখন যে যে দ্রবাগুলি

তাঁহার প্রিয় ছিল, গোড়বাসীরা মনে করিতেন আমাদের গৌর তেমনি স্বভাবেই নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা সেই স্মরণেই তাঁহার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত আনিতেন।

তাঁহাদের এই সব প্রীতি উপহার গৌরহরির সেবক গোবিন্দের হস্তে দিয়া তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ পূর্বক বলিতেন—

“ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞিঃ”

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

সকল ভক্ত নিজের নিজের উপহার গুলি এইভাবে গোবিন্দের হস্তে সমর্পন করিতেন। এই উপহার দান প্রসঙ্গের এক নাম—

“রাঘবের ঝালি”

বঘুনাথদাস অথগু ভাবে ষোড়শ বর্ষ প্যাপী ‘গৌর’ ও ‘গৌরগণের’ সহিত প্রত্যেকে চারমাস ব্যাপী সময় তাঁহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিতেন এবং এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত লীলাবলীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে সু-রসাল বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন এবং ঐ পরিচ্ছেদের বন্দনা শ্লোকে বলিয়াছেন—

“বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য° ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।

যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥

অনুবাদঃ—

ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সর্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধা পূর্বক প্রদত্ত ভক্তের যৎসামান্য বস্তুদ্বারাও যিনি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবকে আমি বন্দনা করি' ।

ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ আনীত দ্রব্যগুলি গোবিন্দের হস্তে অর্পণ করিতেন । গোবিন্দও যখন যে ভক্ত যে দ্রব্য দিতেন সেই দাতার নাম ও উপহার দ্রব্যের বিবরণ গৌরহরিকে শ্রবণ করাইতেন । প্রত্যেক বারই গৌরহরি উত্তর দেন—

‘ধরি রাগ’

কারণ, প্রত্যহ বিবিধ উৎসব ও আনন্দের আতিশয্যে গৌরহরির এই সব উপহার আশ্বাদনের সময় হয় না । এবং তিনি সন্ন্যাসী— বহু বার ভোজন, ও রসের আশ্বাদন নিয়ম ব্রতের বিরুদ্ধ ।

ফলে —

‘ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোন ;

শত জনের ভক্ষ্য যত হইল সঞ্চয়ন ।’

চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ১০ম

গোবিন্দ (বহু কষ্টে) সেই সব সামগ্রী সু-চিহ্নিত ও সু-রক্ষিত করিতেন । গোবিন্দের ইহাও আর একটি শঙ্কট । প্রত্যহ প্রতি ভক্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—

“আমা দত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভোজন ?”

চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ১০ম

গোবিন্দ এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া পরম ছঃখে একদিন গৌরহরির শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—

‘অদ্বৈত্য আচার্য্যাদি ভক্তবৃন্দ তোমার সেবার জন্তু যে সব দ্রব্য আমার হস্তে দিয়াছেন তাঁহার সকলেই প্রত্যহ আমার জিজ্ঞাসা করেন “আমার দ্রব্য প্রভু ভক্ষণ করিয়াছেন?”

এঁদের সকলকে প্রত্যহ প্রবোধ দেওয়া কিম্বা প্রতারণার বাক্য বলিয়া আমায় অত্যন্ত পীড়া দিতেছে।

গোবিন্দের বিষাদের হেতু ও বিষাদময় বাক্য শুনিয়া রঞ্জিয়া গৌরহরি গোবিন্দকে পরম স্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন “যাও। কে কি দিয়াছে সমস্ত আন।” এই বলিয়া তিনি ভোজনে বসিলেন। গোবিন্দ পরমানন্দে প্রত্যেকের নাম ও তাঁহার দত্ত উপহাব দ্রব্যের নাম ধরিয়া, একে একে গৌরহরির শ্রীহস্তে দিতেছেন। যথা—

‘আচার্য্যের এই পৈড (১) পানা মনুপী (১)’

এই অমৃত গোটিকা মণ্ডা এই কপূর্বকুপি।’

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০ম

এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে শত জনের প্রদত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যগুলি গৌরহরি গ্রহণ করিলেন। পরে পরিহাস পূর্বক গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘আর কিছু আছে’

গোবিন্দ সবিনয়ে উত্তর দিলেন—

“রাঘবের ঝালি মাত্র আছে”। গৌরহরি বলিলেন ‘আজ থাক তাহা পরে দেখিব।’

রাঘবের ঝালিঃ

পানিহাটি গ্রামের অধিবাসী বিখ্যাত রাঘব পণ্ডিত। এখন ট্রেনে বাসে যাওয়া যায়। আজও পানিহাটিতে রাঘব



বাঘব ভবনে মাধবী কুণ্ড

পণ্ডিতের ভবন, তাঁহার সেবিত শ্রীবিগ্রহ সমূহ ও তাঁহার সময়ের 'মাধবী লতার' বিশাল কুঞ্জটি বিরাজমান।

এই রাঘবের ভগ্নীর নাম দময়ন্তী দেবী। তিনি গৌরহরিকে মধুময় বাৎসল্যের দৃষ্টিতেই সেবা করিতেন। তাঁহার ঝালিতে যে সমস্ত দ্রব্য যাইত সে সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্য গোবিন্দ একটি বৎসর যাবৎ সযত্নে রক্ষা করিতেন এবং গৌরহরিকে প্রতিদিন আহারের সঙ্গ তাহাও অর্পণ করিতেন।

ঝালিতে যে সমস্ত দ্রব্য থাকিত তাহাদের বিবরণ—আম্র, কাসুন্দী, আদাকাসুন্দী, ঝালকাসুন্দী। নেবু, আদা, কুল ও আমের নানান্ পাকে প্রস্তুত দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্যাদি (যথা আমসী আম্র-ও তৈলাম্র)। তাহা ছাড়া পুরাতন পাটপাতাও চূর্ণ কবিয়া দিতেন। ইহার আর এক নাম শুকতা গুড়া। বাৎসল্যময়ী দময়ন্তী দেবী অনুমান করিতেন যে তাঁহার গৌরহরি 'বহু ভক্তের প্লেভ'। ভক্তবৃন্দের অনুরোধে গুরু ভোজন ও অতিভোজন আবশ্যিক হইবে। ফলে, আমদোষ ও অরুচি ঘটিবে। সেই দুইটিরই উপশমের জন্য ঔষধ পথ্য রূপে এই শুকতা কাসুন্দীর ব্যবস্থা। সর্বজ্ঞ চূড়ামনি গৌরহরি দময়ন্তী দেবীর আশয় জানিয়া অত্যন্ত স্নেহিত হইতেন। 'ঝালিতে' আরও অন্যান্য বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য রচনা সত্ত্বেও কবিরাজ গোস্বামী সর্ব প্রথমে এই কাসুন্দী শুকতাদির বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ঐ সব দ্রব্যের জন্য গৌরহরির যে উল্লাস প্রকাশ করিতেন তাহা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শ্রবণ কবিয়া লিখিয়াছেন—

“শুকতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।

এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥”

চৈঃ চঃ অস্ত্যঃ ১০ম

* লক্ষা ও সরিষা চূর্ণ দ্বারা পাকের নাম কাসুন্দী।

ঝালির অন্যান্য দ্রব্যঃ

ধনিয়ার শাঁস, মৌরির শাঁস, এবং গুণী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া চিনির পাকে পৃথক পৃথক লাড় ।

প্রত্যেকটি জিনিও পৃথক পৃথক কাপড়ের খলির (যাহাব মুখ প্রয়োজন মত খোলা যাইবে ও বন্ধ হইবে) মধ্যে রক্ষা করিতেন ।

শুষ্ককুল, কুলচূর্ণ এবং বহু প্রকারের অতি উপাদেয় আচান সমূহ এই সব আচান উপযুক্ত মাটির পাত্রে বক্ষা করিতেন ।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকার মত নারিকেলের লাড়ু, এণ্ড গুড দ্বারা প্রস্তুত আবও বিবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন, ক্ষীবেব সার, মণ্ডা অমৃত কেলি, কপূর কেলি, অর্দ্ধ পক্ষ শালিধান হইতে প্রস্তুত আতব চিড়া । ঐ চিড়াবই কিছু আবার দোভাজা (ভডম) করিয়া পুনর্বার ঘূতে ভাজা । ঐরূপ ঘূত ভাজা চিড়ার কতক অংশ কপূর ও চিনির পাকে লাড়ু তৈয়ারী ।

শানি ধানের চাউল ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ঘূত ও চিনির পাকে লাড়ু । ঐ সব লাড়ু আবার বিভিন্ন আশ্বাদ ও সুবাস জন্য কপূর, মরিচ, এলাচি, লবঙ্গ রসবাস দারুচিনি প্রভৃতি দ্বারা পৃথক পৃথক সংযোগে বিবিধ স্বাদ ও গন্ধের লাড়ু ।

‘শালি ধানের খই’ প্রস্তুত করতঃ তাহা ঘূতে ভাজিয়া চিনির পাকে কপূরাদি দিয়া বিবিধ লাড়ু ।

ফুট কলাই (ছোলা ভাজা) চূর্ণ করিয়া ঘূতে ভাজিয়া চিনি ও কপূরাদি সংযোগে বিবিধ আশ্বাদ ও সুঘ্রাণের উপাদেয় লাড়ু ।

এই পর্য্যন্ত নামোল্লেখ করার পর কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

‘কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার ।

এঁছে নানা ভক্ষা দ্রব্য সহস্র প্রকার ॥’

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০ম

ইহার পর বলিয়াছেন—

গৌরহরি প্রতিদিন সকালে দন্ত মঞ্জন করিবেন ইহার জন্য গঙ্গামাটি পাত্‌লা কাপড়ে ছাঁকিয়া সুগন্ধি দ্রব্য সংযোগে পর্পটি তৈয়ারী করিয়া দিতেন ।

আচার, চাটনি প্রভৃতি যাহাতে নষ্ট না হয়, এবং অন্ততঃ এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে তাহার জন্য পাত্‌লা পাত্‌লা মাটির পাত্রে সেই সব রক্ষা করিতেন । প্রতিটি জিনিষ একবৎসরের মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার জন্য কিছু কিছু খরচ হইবে ও অবশিষ্ট আবার সুরক্ষিত থাকিবে এই সব চিন্তা ও ব্যবস্থা করিয়া প্রতিটি দ্রব্য প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষিত হইত । তাহার পর সমস্ত দ্রব্য আবার ভালভাবে সাজাইয়া বড় ঝালি বা পেটিকা মধ্যে সুরক্ষিত হইত । ঝালি সম্পূর্ণ হইলে বন্ধন স্থলে গালা দিয়া নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দেওয়া হইত । যেন অবাঞ্ছিত কেহ খুলিতে না পারে । পানিহাটি হইতে সুপুর নীলাচল পর্য্যন্ত পদব্রজে বহন করিয়া লইবার জন্য তিন জন বোঝারী (মুটিয়া) একজনের পর একজন করিয়া ‘ঝালি’ বহন করিত । এই ঝালির রক্ষণাবেক্ষন ও ঝালি বাহকদের সুবিধার জন্য ‘মকরধ্বজ কর’ উপযুক্ত রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইতেন । তিনি প্রাণ প্রিয় যত্নের সহিত ঝালি রক্ষা করিতেন ।

‘ঝালির উপর মৌসীন মকরধ্বজ কর ।

প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥’

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১০ম

নীলাচলে আসিয়া রাঘব পণ্ডিত এই ঝালি প্রধান সেবক গোবিন্দের হস্তে সমর্পণ করিতেন। গোবিন্দের সহকারী রূপে ‘রঘুনাথ’ রামাই এই সব দ্রব্য আবার যথা যথ ভাবে রক্ষা করিতেন।

পবিত্র ঐতিহাসিক এই স্মৃতি চিত্র এবং বৈষ্ণবের মহনীয় উপাসনার মধ্যে গন্তীরার গুপ্তনিধি গৌরহরির এই সুরসাল লীলা আখ্যানটিকে জাগরুক রাখিয়া শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় কথা প্রসঙ্গে বলিতেন—

লীলা ত্রি কাল সত্য ‘কেউ কোথাও যায় নাই ।
অত্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়’

এবং তাহাই তাহার স্মরণময় জীবনের বান্ধন আলেখ্যটি হস্ত কবিয়া শ্রীরাঘবের জীবন স্মৃতিটি লিপিবদ্ধ করা যায়। ইনি প্রতি বৎসরের আষাঢ় মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই ঝালি সমর্পণ লীলাটি ঝালির দ্রব্য সহ গন্তীরা মন্দিরে গমন পূর্বক কীর্তন করিতেন। তাহার ঝালি সমর্পণের কীর্তন প্রসঙ্গটি যাঁহারা শুনিয়াছেন এবং তাৎকালীন অবস্থা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাহা তাহার জীবন প্রতিমার একটি দিক্।

নীলাচলে ‘ঝাঙ্কপিটা মঠে উপস্থিত হইয়া তাহার শ্রীগুরুদেব শ্রীলরাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের অবস্থান চিত্রপটের নিকট প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে উন্মাদ ব্যাকুল কণ্ঠে কীর্তন করিতেন—

‘আজু হবে শ্রীরাঘবের ঝালি সমর্পণ ।
হেন দিনে কোথা প্রভু শ্রীরাধারমণ ॥’

আজ কারু সঙ্গ যাব মোরা

প্রাণগৌর-লীলা গাইতে গাইতে, আজ কার্ সঙ্গে যাব মোরা
(বাঘবের) অহুরাগের কথা কইতে কইতে—

আজ কার্ সঙ্গে যাব মোরা

আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু
নিতাই গৌর প্রেমাবেশে, আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু

এস প্রাণের রাখারমণ
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল,— আজ শকতি সঞ্চার কর
আজ শকতি সঞ্চার কর
বাহু পসারিয়ে হিয়ায় ধ'রে

আজ তেমনি করে এস প্রভু
নিতাই গৌর প্রেমাবেশে, আজ তেমনি ক'রে এস প্রভু

ভাবাবেশে গাও তুমি

“দময়ন্তী-দত্ত দ্রব্যে ঝালি সাজাইয়া !

নীলাচলে আইল রাখব কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥”

যায় রাখব কেঁদে কেঁদে
(দময়ন্তী) দত্ত দ্রব্যের ঝালি মাথে যায় রাখব কেঁদে কেঁদে

রাখব ভাসে নয়ন জলে
হা প্রাণ শচীছলান ব'লে রাখব ভাসে নয়ন জলে

(মঠ হইতে গমন)

যায় রাখব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে

যায় রাঘব কেঁদে কেঁদে

ঝালি মাথে নীলাচল পথে

‘হাঁ গৌর’ বলে রাঘব কাঁদে

‘গৌর’ বলে কাঁদতে কাঁদতে

রাঘব যায় নীলাচল পথে

রাঘব যায় নীলাচল পথে

(সিংহদ্বারে উপস্থিত)

আসি রাঘব সিংহদ্বারে

আসি রাঘব সিংহদ্বারে

প্রণমিয়া শ্রীমন্দিবে

যারে দেখে সুধায় তারে

যারে দেখে সুধায় তারে

ওগো নীলাচলবাসী

(বলে) দয়া করে বলে দাও

দয়া ক’রে বলে দাও

জনে জনে রাঘব সুধায়,
বলে দাও নীলাচলবাসী ।
কাশী-মিশ্রালয়ে, আমি—

কোন পথে যাব গো ?

কোন্ পথে যাব গো ?

কোন পথে যাব গো ?

কোন পথে যাব গো ?

কোন্ পথে যাব কাশীমিশ্রের ঘরে
বলে দাও গো দয়া করে, কোন্ পথে যাব কাশীমিশ্রের ঘরে

দেখিব সে প্রাণ গোরারে
যাব কাশীমিশ্রের ঘরে

(এই পদ কীর্তন করিতে করিতে কাশীমিশ্রালাভিমুখে অগ্রসর
হইতে লাগিলেন ।)

(কাশীমিশ্রের দ্বারে উপস্থিত হইয়া)

আসি কাশীমিশ্রের দ্বারে
রাঘব সুধায় করজেড়ে
এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী ?
করজেড়ে রাঘব সুধায়- এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী ?

এ ছুট্ছে সব নরনারী এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

ব'লে 'কোথা প্রাণ গোরহরি' !
ছুট্ছে সব নরনারী
এই কি কাশীমিশ্রের বাড়ী

আমাদের দয়া করে ল'য়ে চল
ওহে কাশীমিশ্রালয়বাসী ! আমাদের দয়া করে ল'য়ে চল

* ধারা সে দৃশ্য দেখেছেন সকলের বুকে আঁকা আছে

একবার দেখ্‌ব মোরা
 জগবাসীর প্রাণ গোরা
 একবার দেখ্‌ব মোরা
 নদেবাসীর প্রাণ গোরা
 একবার দেখ্‌ব মোরা
 ল'য়ে চল কাশীমিশ্রালয়বাসী
 আমরা দেখব প্রাণে গোরাশশী ল'য়ে চল কাশীমিশ্রালবাসী ।

(গস্তীরার দ্বারে)

আসি রাঘব গস্তীরার দ্বারে
 ব্যাকুল হ'য়ে রাঘব কাঁদে

(বলে) “কোথা প্রাণ বিশ্বস্তুর গোরা নটরায় ?

(আমরা) গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায ॥’

এই গস্তীরার দ্বারে রাঘব ডাকে
 কোথা ‘প্রাণ বিশ্বস্তুর !’ বলে এই গস্তীরার দ্বারে রাঘব ডাকে

ছনয়নে বহে ধারা
 বলে কোথায় আছ প্রাণ গোরা ।
 ছনয়নে বহে ধারা

বলে কোথায় আছ বিশ্বস্তুর ?
 এই তো গস্তীরা ঘর
 বলে কোথায় আছ বিশ্বস্তুর

“কোথা প্রাণ বিশ্বস্তুর গোরা নটরায় ।

গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায ॥”

আমরা এলাম সবাই মিলে
প্রাণ গৌর ! তোমায় দেখ'ব ব'লে আমরা এলাম সবাই মিলে

“গৌড় হইতে আসিয়াছি দেখিতে তোমায়

হরিবোলা রসের বদন—
বহুদিন তো দেখি নাই
বহুদিন তো দেখি নাই

ও চাঁদবদন না হেরিয়ে—
চকোর আঁখি উপবাসী আছে
চকোর আঁখি উপবাসী আছে

“বহুদিন দেখি নাই ও চাঁদ বদন ।
বারেক করুণা করি দেহ দর্শন ॥”

যদি এনেছ নিজগুণে টেনে—
একবার দেখা দাও
একবার দেখা দাও

আসি নাই, আমরা আপন মনে
বলাৎকারে এনেছ টেনে আসি নাই আমরা আপন মনে

যদি এনেছ টেনে বলাৎকারে—একবার দেখা দাও দয়া করে

‘বারেক করুণা করি দেহ দর্শন’

তোমার কৃপা আকর্ষণে
শ্রীগোড় মণ্ডল হ'তে—

তোমার অনুগত দাসদাসী—

তোমার অনুগত দাসদাসী, যাদের পরায়েছ প্রেমের ফাঁসি,

—সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

‘শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য’

তাঁরা আগে আগে এসেছেন

“শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ দুই অগ্রগণ্য ।

আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাসাদি ধন্য ॥

বাসুদেব দত্ত মুরারি গুপ্ত গঙ্গাদাস ।

শ্রীমান সেন শ্রীমান্ পণ্ডিত অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস

মুরারি পণ্ডিত গরুড পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তু খান ।”

প্রাণগৌর তোমায় দেখ্বে ব'লে—

তোমার চাঁদমুখ দেখ্বে ব'লে

ঐ রসের বদন দেখ্বে ব'লে

হাসিমাথা হরিবোলা রসের বদন দেখ্বে ব'লে—

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

সবাই তো এসেছে

মুরারি পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তু খাঁন ।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত ভগবান্ ॥

শুক্লাশ্বর শিবানন্দ আর যত জন ।
সবাই আইলা নাম কে করে গণন ॥

কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী বসুরামানন্দ ।”

বসু রামানন্দ—

পট্টডুরি ল'য়ে এসেছেন
পট্ট ডুরি ল'য়ে এসেছেন

খণ্ডবাসী সঙ্গে ল'য়ে

এসেছেন ঠাকুর নরহরি
এসেছেন ঠাকুর নরহরি

প্রাণগৌর ! তোমা বিনে,

তারা তো আন জানেনা
তারা তো আন জানেনা

“কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী (আর) বসু রামানন্দ ।
আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র ॥”

একবার দেখা দাও

‘আইলা দেখিতে সবে তুয়া মুখচন্দ্র ।
দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য যতনে লইয়া ॥’

বাৎসল্যময়ী দময়ন্তী

সম্বৎসর ভোগ ক'র্বে ব'লে,

যতন করে দিয়েছেন
যতন করে দিয়েছেন
যতন করে দিয়েছেন

এই গন্তীরার দ্বারে রাঘব বলে, ধর ধর লও হে গোবিন্দ

আম্র কাসুন্দি, ঝাল কাসুন্দি আদা কাসুন্দি আর ।
নেবু আদা আম্র কলি বিবিধ প্রকার ॥”

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !
সময় জেনে জোগাইও

সেবা পেয়েছ কাছে থাক, সময় জেনে জোগাইও
ধর ধর লও হে গোবিন্দ ।

“আম্‌সি আম্রখণ্ড আর তৈলাম্র আমতা ।
চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা ॥”

বাৎসল্যময়ী দময়ন্তী
“চূর্ণকরি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা ॥”
আমদোষ নাশিবে ব'লে

‘চূর্ণ করি দিয়াছেন পুরাণ শুকুতা ॥
শুকুতা বলি’ অবজ্ঞা না করিহ চিতে ।

শুকুতায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে ।

ধনিয়া মল্লরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া ।
লাড়ু বাঁধি দিয়াছেন চিনি পাক দিয়া ।

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !

এই গম্ভীরার দ্বারে রাঘব বলে, ধর ধর লও হে গোবিন্দ

“কভু নাহি জানি নাম এ জন্মে যাহার ।
ঐছে নানা দ্রব্য দিল সহস্র প্রকার ॥”

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

“গঙ্গা মৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া ।
পাপড়ী করিয়া দিলা গন্ধ দ্রব্য দিয়া ॥

কহিতে না পারি নাম কতক প্রকার ।
দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি উপহার ॥”

ধর ধর লও হে গোবিন্দ !

দময়ন্তীর প্রীতির দ্রব্য

ধর ধর লও হে গোবিন্দ ।

আমি মাথায় ক'রে এনেছি

মাথায় ক'রে আমি ধন্য

প্রভুর সেবার দ্রব্য

মাথায় করে আমি ধন্য

“দিয়াছেন দময়ন্তী প্রীতি উপহার ॥

যতন করিয়া সব করাইও ভোজন ।

যেমতে পায়েন প্রীতি শ্রীশচীনন্দন ॥”

ধর ধর লও হে গোবিন্দ

“দময়ন্তীদত্ত দ্রব্য সঁপিছু তোমার ।
অবসর জানি দিও প্রাণ বিশ্বন্তরে ॥”

তোমার ভাগ্যের সীমা নাই
সদাই প্রভুর কাছে থাক, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই
প্রভুর কাছে থাক, সেবা কর, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই

আমার ভাগ্যে হ'ল না
প্রভুর সঙ্গে থাকব, সেবা ক'রব, আমার ভাগ্যে হ'ল না

হেনমতে রাঘব পণ্ডিত ঝালি সমপিল ।
ভোজন গৃহের কোণে গোবিন্দ বাখিল ॥

ঝালি সমপিলেন রাঘব পণ্ডিত
ত্রিকাল সত্য লীলায় ঝালি সমপিলেন রাঘব পণ্ডিত

রাখিলেন গোবিন্দ দাস
(গৌরের) সেবার জন্ত যতন ক'বে রাখিলেন গোবিন্দ দাস
ভোজন-গৃহের কোণে রাখিলেন গোবিন্দ দাস

ভাগ্যবান্ জনে দেখিলেন
ত্রিকাল সত্য গৌর লীলা, ভাগ্যবান্ জনে দেখিলেন

রাঘবের ঝালি সমর্পণ শেষ হ'লে
দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

অতি দৈন্যে শ্রীধর পণ্ডিত, দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে
(থোড়) মোচার ঝালি মাথায় ল'য়ে অতি দৈন্যে শ্রীধর পণ্ডিত
দাঁড়ায়ে ছিলেন এক পাশে

মনে মনে গণ্ছিলেন
কেমন ক'রে দিব আমি
এই সামান্য থোড় মোচা, কেমন ক'রে দিব আমি

এনেছেন রাঘব পণ্ডিত
এনেছেন রাঘব পণ্ডিত
কত সুখাত সুস্বাত্ৰ ড্রব্য,
দেবী দময়ন্তীর দত্ত, সুখাত্ৰ সুস্বাত্ৰ ড্রব্য,
এনেছেন রাঘব পণ্ডিত

কেমন ক'রে দিব আমি
কেমন করে দিব আমি
এই সামান্য থোড় মোচা,

তাই দাঁড়ায়ে ছিলেন একপাশে

ব্যাকুল হ'য়ে ডাকছেন,
ব্যাকুল হ'য়ে ডাকছেন
ধর পণ্ডিত আপন স্বভাবে, কোথা বা আছ হে ?

ঝালি মাথে শ্রীধর কাঁদে, কোথা বা আছ হে ?

কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত !
আপন স্বভাবে শ্রীধর ডাকেন, কোথায় আছ নিমাই পণ্ডিত !

নদীয়ার বাজারে

আর কেন যাওনা তুমি ?

আর কেন যাওনা তুমি ?

আমি নিতুই চাই পথ পানে

আর কেন যাওনা তুমি ?

থোড় মোচা ল'য়ে বাজারে ব'সে,

আমি নিতুই চাই পথ পানে

কতক্ষণে আসবে ব'লে,

আমি নিতুই চাই পথ পানে

আমি নিতুই চাই পথ পানে

কতক্ষণে আসবে ব'লে

চিতচোরা শচীনন্দন

কতক্ষণে আসবে বলে

থোড় মোচা জোর করি,

(তাই) চেয়ে থাকি পথ পানে

তুমি হাত হ'তে নিবে কাড়ি

তুমি হাত হ'তে নিবে কাড়ি

তাই চেয়ে থাকি পথ পানে

বহু দিন না দেখতে পেয়ে,

দেখতে তো পাই না

শুধা'লাম্ নদীয়া বাসিরে

শুধা'লাম্ নদীয়া বাসিরে

গৌর কেন আসে না বাজারে

শুধা'লাম্ নদীয়া বাসিরে

তারা সবাই বলে দিলে

তুমি এসেছ নীলাচলে

ভারা সবাই বলে দিলে

তাই আমি এসেছি

সবাই এসেছেন, তাদের সঙ্গে

তাই আমি এসেছি

থোড় মোচা মাথায় ল'য়ে

তাই আমি এসেছি

প্রাণ শচীছলানিয়া

আর কি নদে যাবে না ?

আর কি নদে যাবে না ?

তেম্বি করে কেড়ে নেবে না ?

আমার হাত হ'তে থোড় মোচা, তেম্বি ক'রে কেড়ে নেবে না ?

আমার হাত হ'তে কেড়ে ল'য়ে

তেম্বি করে নাচবে না ?

তেম্বি করে নাচবে না ?

আর কি নদে যাবে না ?

বহুদিন পথ দেখে

থোড় মোচার ঝালি মাথায় ক'রে

এলাম নীলাচলপুরে

এলাম নীলাচলপুরে

কোথা প্রাণ শচীছলান !

তেম্বি ক'রে কেড়ে নাও

তেম্বি ক'রে কেড়ে নাও

দময়ন্তী দত্ত ঝালি ল'য়ে

এসেছেন রাঘব পণ্ডিত
এসেছেন রাঘব পণ্ডিত
করেছেন ঝালি সমর্পণ
অঙ্গীকার করেছেন প্রভু

ঝালি সমর্পণের প্রসঙ্গে বাবাজী মহাশয়ের অনুস্মৃতিতে
অধিক বিকাশ—

আমাদের একবার দেখা দাও
শ্রীরাঘবের ঝালির প্রীতে আমাদের একবার দেখা দাও

শ্রীধরের ঝালির প্রীতে আমাদের একবার দেখা দাও

বড় আশা করে এসেছি মোরা আমাদের একবার দেখা দাও
হা গৌর । প্রাণ গৌর । আমাদের একবার দেখা দাও

একবার দাঁড়াও দাঁড়াও রসের বদন হেরি হে

আমাদের একবার দেখাও হে
কোথা আছ কাশীমিশ্র ।

তোমার গৃহবাসী গোরাক্ষী

একবার দেখাও হে
একবার দেখাও হে

কই কথা তো কইছ না
তবে কি গৌর দেখাবে না

কে প্রাণগৌর দেখাইবে ?

হায়, আরু কারু কাছে যাব

হায়, আরু কারু কাছে যাব

শ্রীগৌড় মণ্ডল হতে,

তোমরা সবাই এসেছ

তোমরা সবাই তো এসেছ

প্রভু নিতাই অদ্বৈত সাথে, শ্রীগৌড় মণ্ডল হ'তে

তোমরা সবাই তো এসেছ

এই কাশীমিশ্রালয়ে

বিহরিছ প্রাণগৌর সনে

বিহরিছ প্রাণগৌর সনে

কোথায় আছ প্রভু নিতাই ।

আমাদের একবার দেখাও হে

কোথায় আছ সীতানাথ !

আমাদের একবার দেখাও হে

কোথায় আছ ঠাকুর নরহরি ।

আমাদের একবার দেখাও হে

সে চিতচোরা মুবতি খানি,

আমাদের একবার দেখাও হে

আমাদের একবার দেখাও হে

কৈ কেউ তো কথা বইলে না

প্রাণগৌর দেখানো না

তবে আর কারে শুধাব

ওহে কাশীমিশ্রালয় বাসী !

আমাদের একবার দেখাও হে

আমাদের একবার দেখাও হে

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

আমাদের গৌর তোমাদের থাকবে

ভয় নাই আমরা ল'য়ে যাব না

ল'য়ে গিয়ে কিবা করুব
ভয় নাই আমরা লয়ে যাব না

ঐ হরিবোলা রসের বদন

আমরা একবার দেখুব
আমরা একবার দেখুব

ছদিপটে এঁকে লব

'হা গৌর ! প্রাণ গৌর !' ব'লে,

বসে বসে কাঁদব
বসে বসে কাঁদব

হা চিতচোর চূড়ামণি

একবার দেখা দাও
একবার দেখা দাও

তোমা ধনে ছদে ধরে
যাক্ সবে ঘরে ফিরে

যায় বন্ধন ঘুচুক্ সবার

তোমা লয়ে করুক্ সংসার
তোমা লয়ে করুক্ সংসার

'হা গৌর ! প্রাণ গৌর !' ব'লে
জগবাসী নরনারী

ঘরে ঘরে সবাই বুরুক্
ঘরে ঘরে সবাই বুরুক্
ঘরে ঘরে সবাই বুরুক্

এক নিবেদন শ্রীচরণে

শ্রীগুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলায়

কাল একবার দেখা দিও

কাল একবার দেখা দিও

আমরা শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে

দেখ্‌ব তোমার মার্জ্জন রঙ্গ

দেখ্‌ব তোমার মার্জ্জন রঙ্গ

নয়ন ভরে দেখব মোরা

তোমার গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা

যাই বলিগে নীলাচলবাসীবে

কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন ।

তোমরা যেও নীলাচলবাসী

কাল হবে গুণ্ডিচা মার্জ্জন ।

গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলাঃ

শ্রীধাম পুরীতে গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলাটি বাৎসরিক উৎসব।
অঢাপি রথ দ্বিতীয়ার পূর্বদিন বা আষাঢ় শুক্রা প্রতিপদের দিন
সকালে এই লীলাটি অনুষ্ঠিত হয় ।

শ্রীজগন্নাথ দেব প্রতিবৎসর আষাঢ়ের শুক্রা দ্বিতীয়ার দিন সুভদ্রা
ও বলরাম সহ রথারোহণ পূর্বক সাতদিনের জন্ত সুন্দরাচল বা
বৃন্দাবন বিহারে গমন করেন । জগন্নাথ মন্দির হইতে বিজয় কবিয়া
যে উপবনে এই কয়দিন অবস্থান পূর্বক বিহার করেন তাহাব নাম
গুণ্ডিচা বাড়ী । *

এই মন্দিরটিতে জগন্নাথ বিজয় করিবেন এ কারণ বিজয়ের
পূর্বদিন আষাঢ় শুক্রা প্রতিপদের দিন ঐ স্থানটি বিশেষ পরিপাটির
সহিত পরিষ্কার করা হয় । গৌরহরি নীলাচলে গমনের পূর্বে এই

* অন্ধ এবং কলিঙ্গে গুণ্ডিচা মানে “পর্ণ কুটির”

গুণ্ডিচা মন্দিরের মাজ্জ'ন কার্যটি জগন্নাথ দেবের পড়িছাবৃন্দই করিতেন। দেবমন্দিরের মাজ্জ'ন করা নিকৃষ্ট কার্য নয় উপরন্তু পরম ভাগ্যের কথা, ইহা প্রাচীন গ্রন্থের কোথাও বর্ণিত থাকিলেও সর্বসাধারণের তাহা অজ্ঞাত ছিল। ১৪৩৪ শকাব্দের রথ দ্বিতীয়ার দুই দিন পূর্বে গৌরহরি এই গুণ্ডিচা মাজ্জ'ন সেবাটি কাশীমিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌম, এবং প্রধান পড়িছার নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

এই কার্যটি যেন হীন কার্য তাই গৌরহরির শোভা পায় না বলিয়া তাঁহারা প্রথমতঃ নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন। যথা—

“তোমার যোগ্য কার্য সেবা নহে মন্দির মাজ্জ'ন ;
এও এক লীলা, কর যে তোমাব মন।”

চরিতামৃত মধ্য ১২শ

পরে গৌরহরির কৃপায় যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে, বহুভাগে দেবমন্দিরের মাজ্জ'না করার সেবা লাভ হয়। উহা ভাগ্য বশতই পাওয়া যায়, তখন তাঁহারা সানন্দে তাঁহার বাসনা অনুমোদন করিলেন। পরে বলিলেন—

‘কিন্তু ঘট সম্মাজ্জ'ন বহুত চাহিয়ে
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি দিয়ে।’

চরিতামৃত মধ্য ১২শ

তাঁহাদের প্রার্থনায় গৌরহরি আনন্দিত হইলেন এবং পড়িছার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। ঐ লীলার পূর্ব দিনই একশত ঘট ও একশত সম্মাজ্জ'নী কাশীমিশ্রালয়ে আনিয়া রাখা হইল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গীরার গুপ্তনিধি গৌরহরি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া শ্রীহস্তে তাঁহাদের অঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন। তাঁহাদের গলদেশে মালা পরাইয়া দিলেন। প্রধান প্রধান ব্যক্তির হস্তে এক একটি সম্বাজ্জনী ও কক্ষে এক একটি মৃৎকুণ্ড দিলেন।

(রঘুনাথ স্বরূপের আনুগত্যে ষোল বার এই বাষিক উৎসবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।)

হঠাৎ গৌরহরির ভাবান্তর উপস্থিত হইল—

“কিশোরী আবেশে আমার শ্রীশচীনন্দন।

স্বরূপ রামানন্দে বলেন মধুর বচন ॥”

বলে ‘ও ললিতা ! ও বিশাখা -’

বলে ‘শুন শুন প্রাণ সখি’

আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন

কিশোরী ভাবিত মতি গৌর বলে

আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন

স্বরূপ রামানন্দের গলে ধরি

কিশোরী-ভাবিত-মতি গৌর বলে

আজ নিশিশেষে দেখেছি সু-স্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন

এবে দেখি তার অনুকূল লক্ষণ,

আজ নিশি শেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

কাল নিশি পরভাতে,

ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

আমার পরাণ বঁধু আসবে ব্রজে
কাল নিশি পরভাতে আমার পরাণ বঁধু আসবে ব্রজে

আসবে আমার পরাণ বঁধু
বহুদিন পরে ব্রজে আসবে আমার পরাণ বঁধু

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া
প্রিয় নন্দ্য সখী সাথে চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এত বলি গোর কিশোরী
মৃৎকুণ্ড কাঁখে করি
সম্বাজ্জনী করে ধরি
বলে 'চল প্রাণ সহচরী
কুঞ্জ সজ্জা সস্তার সঙ্গে করি বলে 'চল প্রাণ সহচরী
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া
চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া
"আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া . চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এই পদ গাহিতে গাহিতে 'মঠ' হইতে গুণ্ডিচা গামী রাজপথে
চলিতে লাগিলেন ।

এই গমন লীলা শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় যে ভাবে
কীর্তন করিয়াছেন । তাহা নীচে উদ্ধৃত হইল—

নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি
 স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি
 নেচে যায় প্রাণ গৌরহরি
 স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি

হেলে ছলে যায় গৌর কিশোরী
 হেলে ছলে যায় গৌর কিশোরী
 বিংশতি ভাব হিল্লোলে
 হেলে ছলে যায় গৌর কিশোরী
 বিংশতি ভাব ভূষণ পরি
 হেলে ছলে যায় গৌর কিশোরী
 সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী
 হেলে ছলে যায় গৌর কিশোরী
 সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী

দক্ষিণে মধুমতী নরহরি
 সঙ্গে নিতাই অনঙ্গমঞ্জরী
 হেলে ছলে যায় গৌরকিশোরী

সঙ্গে নিতাই-গদাধর-নরহরি
 হেলে ছলে যায় গৌরকিশোরী সঙ্গে নিতাই-গদাধর নরহরি

নীলাচল ব্রজের পথ আলো করি
 হেলে ছলে যায় গৌরকিশোরী
 নীলাচল ব্রজের পথ আলো করি

নিকুঞ্জ সেবা সন্তার সঙ্গে করি
 হেলে ছলে যায় গৌরকিশোরী নিকুঞ্জ সেবা সন্তার সঙ্গে করি

ঘিরে পারিষদ সহচরী
 হেলে ছলে যায় গৌরকিশোরী
 ঘিরে পারিষদ সহচরী

যায় নীলাচলে ব্রজের পথে
 যায় নীলাচলে ব্রজের পথে
 যায় নীলাচলে ব্রজের পথে
 যায় নীলাচলে ব্রজের পথে

নিকুঞ্জ সজ্জা মনোরথে
 রঞ্জিনী সঞ্জিনী সাথে
 পারিষদ সহচরী সাথে

যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে
 যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে

নিকুঞ্জ সাজাবে বলে

হেলে ছলে যায় গৌর রাধা
 বলে পূরিবে আমার মন সাধা হেলে ছলে যায় গৌর রাধা

পূরাতে অপূর্ণ সাধা হেলে ছলে যায় গৌর রাধা

যায় গৌর কিশোরী হেলে ছলে
 যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে

নিকুঞ্জ সাজাবে বলে

‘গমন নটন লীলা

বচন-সঙ্গীত কলা

কিশোরী ভাবিত মতি গৌরাজের—

গমম নটন লীলা

গমন নটন লীলা

‘নটুয়া মুরতি’ ‘নটন গতি’

আজ চলে যেতে নেচে যেছে

আজ চলে যেতে নেচে যেছে

বিংশতি ভাব হিল্লোলে

আজ চলে যেতে নেচে যেছে

ভাবাবেশে যেন হ’ল নটিনী

‘গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা’

গমন নটন লীলা

গমনই নটন লীলা

নটন মুরতি গৌর আমার চলে যেতে নেচে যেছে
চলে যেতে নেচে যেছে

গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা
সঙ্গীতেতে কথা কইছে
চলে যেতে নেচে যেছে সঙ্গীতেতে কথা কইছে

কোকিল কলভাষিণী সঙ্গীতে কথা কইছে

পঞ্চম রাগ জিনি যেন কত শত কোকিল কুহরিছে
যেন কত শত কোকিল কুহরিছে
না না তাতেও তুলনা হয় না

জগৎ অমৃতময় করবে বলে যেন অমিয় সিন্ধু উথলিছে
যেন অমিয় সিন্ধু উথলিছে

আমার গৌর কিশোরী ‘হরি’ বলিছে
যেন অমিয় সিন্ধু উথলিছে

— আমার গৌর কিশোরী ‘হরি’ বলিছে

মধুর চাহনি আকর্ষণ

তারই অঁাখি মন হরিছে
একবার হরিবলে যার পানে চাইছে তারই অঁাখি মন হরিছে

একবার যার পানে চাইছে
বরজ গোপীকার
তার স্বভাব জাগায়ে দিছে
তার স্বভাব জাগায়ে দিছে
তার স্বভাব জাগায়ে দিছে

নীলাচলে যত নরনারী
সবারে কৈল গোপনারী
সবারে কৈল গোপনারী

জাগল স্বভাব বরজ বধুর
গোরা চাহনি কিবা মধুর
গোরা চাহনি কিবা মধুর
'মধুর চাহনি আকর্ষণ

যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে
কর দিয়ে নিতাই অনঙ্গের গলে

যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে

পরাণ বঁধু আসবে বলে
আজ নিশি গেলে কাল সকালে
যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে
পরাণ বঁধু আসবে বলে
যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে

স্বরূপের করে ধরি
আবেশে বলে গৌরকিশোরী
আবেশে বলে গৌরকিশোরী
বলে 'ওরে প্রাণ সহচরী

কাল আস্বে বংশীধারী
আজ দিবা শর্করী

কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি !
কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি !
কেমনেতে ধৈর্য্য ধরি !

সীতানাথ পৌর্ণমাসী
যা হ'তে এই সব খেলা,

তখন হাসি হাসি মিলিল আসি
তখন হাসি হাসি মিলিল আসি
সীতানাথ পৌর্ণমাসী,
হাসি হাসি মিলিল আসি
বলে 'কোথা যাও দিবাভাগে ?

করে ধ'রে বলে 'ও কিশোরী'
রঞ্জিনী সঞ্জিনী সাথে
সখী সঙ্গে অনুরাগে
মনোরথে ব্রজের পথে,

'কোথা যাও দিবাভাগে ?
বলে 'কোথা যাও দিবাভাগে ?
বলে 'কোথা যাও দিবাভাগে ?
কোথা যাও সঞ্জিনী সাথে ?

আবেশে বলে গৌর-কিশোরী
বলে 'শুন গো মা পৌর্ণমাসি

ছুখের নিশি পোহাল আসি
আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন
(কাল) আস্বে প্রাণের বংশীবদন

—আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন
ব্রজে আস্বে ব্রজের জীবন আজ নিশি শেষে দেখেছি স্বপন

আজ পোহাইলে ছুখের নিশি,

ব্রজে আস্বে কালশশী
ব্রজে আস্বে কালশশী

কুঞ্জ সজ্জা মনসাধে,

তাই চলেছি দিবা ভাগে

তাই চলেছি দিবা ভাগে

আজ কুঞ্জ সাজাব ।

কাল পরাণ বঁধু পাব ॥

নিকুঞ্জ সাজাব ব'লে

যায় গৌরকিশোরী হেলে ছলে

যায় গৌরকিশোরি হেলে ছলে

বলে আজ কুঞ্জ সাজাব নব সাজে

হেরিতে নব যুব রাজে

বলে আজ কুঞ্জ সাজাব নব সাজে

কাল প্রভাতে পাব প্রাণ বঁধুকে

—আজ কুঞ্জ সাজাব নব সাজে

হেলে ছলে যায় গৌরকিশোরী

রাধাভাবে ভোরা গোরা

ভাবোল্লাসে ভরা গোরা

আসিয়া গুণ্ডিচা দ্বারে

আসিয়া গুণ্ডিচা দ্বারে

স্বরূপ রামরায়ের করে ধরে

বলে 'ও ললিতে ! ও বিশাখে !

ডাক ত্বরা বৃন্দাদেবীকে

আবেশে বলে গৌরকিশোরী

যেন সম্মুখে বৃন্দাদেবি হেরি আবেশে বলে গৌরকিশোরী

শুন ওগো বৃন্দাদেবি

আজ নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আস্বে ব্রজের জীবন আজ নিশিশেষে দেখেছি সুস্বপন

ব্রজে আস্বে ব্রজের জীবন

কাল নিশি পরভাতে

ব্রজে আস্বে ব্রজের জীবন

নিশি শেষে দেখেচি সুস্বপন
 সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া
 যাও যাও ত্বরা করি
 সবাই কুঞ্জ সাজাও গিয়া

কর মঙ্গল আচরণ
 কর মঙ্গল আচরণ
 ব্রজে আসবে ব্রজের জীবন

পূর্ণ ঘট স্থাপন কর
 পূর্ণঘট স্থাপন কর
 নিকুঞ্জের প্রতি দ্বারে

বাঁধ আশ্র পল্লব সারি সারি

সাজাও সবে কুঞ্জ পথ
 সাজাও সবে কুঞ্জ পথ
 আসবে ব্রজের মনমথ
 সাজাও সবে কুঞ্জ পথ
 সুগন্ধি সুকোমল ফুলে

যেন চলে যেতে লাগেনা পায়ে
 যেন চলে যেতে লাগেনা পায়ে
 সুকোমল পুষ্প দাও বিছায়ে
 যেন চলে যেতে লাগেনা পায়ে
 বৃন্তচ্যুত পুষ্প দাও বিছায়ে

সাজাও সবে ত্বরা করি
 সাজাও সবে ত্বরা করি
 কুঞ্জে আসবে কুঞ্জবিহারী

ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে
 ব্রজের জীবন ব্রজে আসবে
 হুঃখে নিশি পোহাইলে

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

আসবে আমার প্রাণ বঁধুয়া

চল কুঞ্জ সাজাই গিয়া

এইরূপ কীর্তন রঙ্গে—

কাশীমিশ্রালয় হইতে গুণ্ডিচার প্রবেশ দ্বারে আসিয়া এখন
'গুণ্ডিচার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরে স্বরূপ রামরায়ের করে
ধরিয়া বলিতেছেন—

ও ললিতে ! ও বিশাখে !

কুঞ্জ সজ্জা কর সবে

নিজ নিজ গণ লয়ে

কুঞ্জ সজ্জা কর সবে

মনসাধে সবে মিলে

চল সাজাই নিকুঞ্জ

চল সাজাই নিকুঞ্জ

গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জন সেবাকার্য্য আরম্ভ হইল : সকলেরই
মুখে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি। সকলেরই হাস্য বদন। প্রথমে সম্বাজ্জ'নী
দ্বারা মন্দিরের নিম্ন প্রাঙ্গন পরিস্কৃত করা হইল। একেবারে শত শত
ভক্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গন (ভূমি)
হইতে সমস্ত আবজ্জ'না দূর করিয়া সকলে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ
করিলেন। স্বয়ং গৌরহরি ঝাড়ু হস্তে সকলকে কাজ শিখাইতেছেন।
সকলেই হাতে কাজ করিতেছেন ও মুখে কৃষ্ণনাম লইতেছেন।

'প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে লয় কৃষ্ণ নাম।

ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে করে নিজ কাম ॥'

শ্রীমন্দিরের ভিতর মার্জনা হইলে পর সিংহাসন এবং মন্দিরের সমস্ত দেয়ালগুলি জল দ্বারা ধৌত করা হইল। তাহার পর জগমোহনের মার্জনা হইল। গৌরহরিও সহস্র বদন। তিনি প্রেমোল্লাসে মন্দিরের মার্জনা করিতেছেন। এবং মধুর কীৰ্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন প্রতিটি গৃহের ভিত্তি, অলিন্দ, এবং বহিঃভাগ সমস্তই পরম যত্নের সহিত মার্জনা করা হইল। গৌরহরির শ্রীঅঞ্জে মন্দির মার্জনায় ধূলি লাগিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। তাঁহার শ্রীবদনে কৃষ্ণনাম, নয়নে ধারা ও হাতে ঝাড়ু। এই অপরূপ মধুর মূর্ত্তি দর্শন বহু ভক্তের কৰ্ম্মশক্তিকে লুপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে যেন কেহ স্তম্ভন করিল। গৌরহরি ভক্তবৃন্দের কাহাকেও বলিতেছেন—

তুমি এই দিকে এস

কাহাকেও বলিতেছেন —

তুমি ঐ দিকে যাও

কাহাকেও বলিতেছেন—

তুমি এই স্থান মার্জনা কব

এইরূপ কৃপাদেশ করিয়া সমস্ত ভক্তের মধ্যে এক পরমোল্লাস ও অপরূপ উন্মাদনা সৃষ্টি করিলেন।

গুণ্ডিচা মন্দিরের মার্জনা কার্যে নীলাচল ও নবদ্বীপের সকল ভক্তই আছেন। আবার, নীলাচল ধামবাসী বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী এবং জগন্নাথদেবের 'রথযাত্রা' উপলক্ষে উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ও ভারতের নানান প্রদেশ হইতে যে সব দর্শনার্থী (ধামে) আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই অপরূপ উৎসবের স্বাভাবিক আকর্ষণে যোগদান করিয়াছেন।

পরিচিতদের মধ্যে যঁাহারা বিলম্বে আসিলেন ‘গৌরহরি’ তাঁহাদের
গৃহে সম্মার্জনীর আঘাত করিয়া পরম উল্লাস সৃষ্টি করিলেন ।

শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের সমস্ত তৃণ ধূলা কঙ্কর প্রভৃতি আবর্জনারাশি
একত্র করিয়া ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ বস্ত্রে বাঁধিয়া বাহিরে নিষ্ক্ষেপ
করিবার উদ্‌যোগ করিলে পর গৌরহরি মধুর হাসিয়া বলিলেন—

‘কে কত করিয়াছ মার্জন ;
তৃণ ধূলা পরিমাণে জানিব পরিশ্রম ॥’

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

তখন ভক্তবৃন্দ নিজেদের আনীত আবর্জনাগুলি একত্র করিয়া
দেখিলেন যে আশ্চর্য ব্যাপার, সকলের আবর্জিত আবর্জনা অপেক্ষা
কুক গৌরহরির সঞ্চিত আবর্জনার পরিমাণই বেশী । যথা—

‘সবার ঝাটি আনি বোঝা একত্র করিল ।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥’

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

অতঃপর মুহূর্ত্তান্তর সহিত অমিয় বারাকণ্ঠে সচল জগন্নাথ
গৌরহরি বলিলেন—

‘মার্জনা কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে । এক্ষণে জল আনয়ন কর,
ধৌত কার্য করিতে হইবে ।’

সকলে প্রেমোল্লাসের সহিত নিকটস্থ কূপ হইতে শত শত কলস
জল আনিয়া তৎক্ষণাৎ গৌরহরির সম্মুখে ধরিলেন ।

‘জল আন’ বলি যবে মহাপ্রভু বৈল ।

তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল ॥’

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

স্বয়ং গৌরহরি ধৌতকার্যে অগ্রণী হইলেন। গুণ্ডিচার অভ্যন্তরে যে কক্ষটিতে 'জগন্নাথ' 'বলরাম' 'সুভদ্রা' আসিয়া বিরাজ করিবেন তাহার ভিতরের ছাদ খাপরাতে জলপূর্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধে নিক্ষেপ করতঃ ধৌত করিলেন। তাহার পর সমস্ত দেওয়াল জলদ্বারা ধৌত করিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ অভ্যন্তর ধৌত হইলে পর নিজ হস্ত দ্বারা সিংহাসন মাজ্জ'ন করিলেন। যথা—

'প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।

উর্দ্ধ, অধো, ভিত, গৃহ, মধ্য, সিংহাসন ॥

খাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে চালাইল।

সেই জলে উর্দ্ধ শোধি ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥'

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

নদীয়া ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দ কি কি কার্য্য (প্রতিবন্দে) করিতেন তাহা দাস গোস্বামীর মুখে শ্রবণ করিয়া কবিবাজ গোস্বঃ বিবরণ দিয়াছেন। যথা—

ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন।

নিজ নিজ হস্তে কবে মন্দির মাজ্জ'ন ॥

কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে।

কেহ ছাল 'দয় তাঁর চরণ উপরে ॥

কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান

কেহ মাগি লয়, কেহ অণ্ডে করে দা

ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দি

সেই জলে প্রাক্ষণ সব ভরিয়া রহিল

নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্বাজ্জ'ন ।
নিজ বস্ত্রে মহাপ্রভু মাজিল সিংহাসন ॥

শতঘট জলে হৈল মন্দির মাজ্জ'ন ।
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ॥

নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ।
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে ॥

পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ ।
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ॥

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী আর পুরী ।
ইহা বিনা আর সব আনে জল ভরি ॥

ঘটে ঘট ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি' গেল ।
শত শত ঘট তাঁহা লোক লঞা আইল ॥

জল ভরে, ঘট ভাঙ্গে, করে হরি ধ্বনি ।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন ॥

যেই যেই কহে, সেই কহে, 'কৃষ্ণ' নামে ।
 'কৃষ্ণনাম' হইল সঙ্কেত সর্ব কামে ॥

প্রেমাবেশে প্রভু কহে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম
 একলে কবেন প্রেমে শত জনের কাম ।

শত হাতে কবেন যেন ক্ষালন মাজ্জ'ন ।
 প্রতি জন পাশে যাই কবান্ শিক্ষণ ॥

ভাল কর্ম দেখি তারে করে প্রশংসন ।
 মন না মানিলে কবে পণ্ডিত-ভৎস'ন ।
 "তুমি ভাল করিয়াছ শিখাও অন্তরে ।
 এইমত ভাল কর্ম সেহো যেন কবে ॥"

এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হৈঞা ।
 ভালমত কবে কর্ম সবে মন দিয়া ॥

তবে প্রভু প্রক্ষালিলা শ্রীজগমোহন ।
 ভোগ-মগুপ তবে কৈল প্রক্ষালন ॥

নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গন ।
 পাকশাল আদি কৈল সব প্রক্ষালণ ॥

মন্দিরের চতুর্দিক প্রক্ষালন কৈল ।
 সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল ॥

এইরূপে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনার কার্য শেষ হইলে পর গৌরহরি ভক্তবৃন্দকে সারি করিয়া প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে বসাইলেন। মধ্যস্থলে তিনি স্বয়ং বসিলেন। বসিয়া স্বহস্তে প্রাঙ্গণের তৃণ কুটা ও কঙ্কর সকল কুড়াইতে লাগিলেন। আর হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন—

“কে কত কুড়াও সব একত্র করিব ;
যার অল্প তার ঠাঁঞে পিঠা-পানা লব ।”

—চরিতামৃত মধ্য ১২শ

গৌরহরির শ্রীমুখের কথা শুনিয়া সকলেই অতিশয় যত্ন ও আগ্রহের সহিত এই কার্য কবিত্তে বসিলেন। শ্রীমন্দিরের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা এবং বহির্দ্বারের সমস্ত পথই উত্তম রূপে পবিত্র করিয়া হইল।

তাহার এই লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দাস গোস্বামীর অনুভব কবিরাজ গোস্বামীর প্যারে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

“এই মত সবে পুরী করিল শোধন ।
শীতল নির্মল কৈল যেন নিজ মন ॥”

- চরিতামৃত মধ্য ১৩শ

গুণ্ডিচা মন্দির সম্পূর্ণ শোধন হইলে, পর ঐ মন্দির সংলগ্ন নৃসিংহদেবের মন্দির ও মন্দির সম্মুখের পথ সমস্ত পরিষ্কার করা হইল।

ইহার পর প্রেমাবেশে গৌরহরি উন্নতের ন্যায় সমস্ত আঙ্গিনায় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া গৌরমুন্দরকে বেষ্ঠন করিয়া নৃত্য কীর্তন করিতে লাগিলেন।

সে দৃশ্য অপূর্ব—

“সবাকার করে সন্মার্জনী সবার মুখে হরি ধ্বনি”

— — — —

ইন্দ্রদ্যুমে—

“শ্রীগুণ্ডিচা মার্জন করি শ্রীগৌরাজ রায় ।

পারিষদ সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রদ্যুমে যায় ॥”

গুণ্ডিচা মন্দির সংলগ্ন নৃসিংহ মন্দির ও তাহার অদূরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর । গুণ্ডিচা মার্জন লীলার অন্তে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে উপস্থিত হইলেন । এবং

কিশোরী আবেশে	‘মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে
কুঞ্জ সজ্জা আবেশে	মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে
	মত্ত গোরা ভাবোল্লাসে

লয়ে নিজগণ সহচরী	ইন্দ্রদ্যুমে যায় গৌরকিশোরী
গুণ্ডিচা মার্জন করি’	ইন্দ্রদ্যুমে যায় গৌরকিশোবী
	ইন্দ্রদ্যুমে যায় গৌরকিশোরী

লয়ে পারিষদ গোপনারী	মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী
(যেন) গোপী মণ্ডলী ঘেরা ভানুছলারী	মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী

মাঝে নেচে যায় গৌরকিশোরী

(শ্রীলরামদাসবাবাজীমহাশয়)

ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবরের বারি যমুনার বারির বর্ণের সাদৃশ্য দর্শনে
গৌরহরির যমুনার উদ্দীপন হইল । যথা—

“ইন্দ্রহ্যম্ন দেখি গোরা শ্রীযমুনা উদ্দীপনে ।

আনন্দে জলকেলি করে নিজগণ সঙ্গে ॥”

প্রায় চারি পাঁচ শত ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরহরি জলকেলি
লীলারঙ্গ করিতে ইন্দ্রহ্যম্ন সরোবরে নামিলেন । সচল জগন্নাথ
গৌরহরিই সকলের অগ্রে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন । শত শত
ভক্তবৃন্দও জলে ঝম্প দিলেন । ইহাদিগের মধ্যে শ্রীল অদ্বৈত
আচার্য্য, অবধূত নিতাইচাঁদ, শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ
ভারতী, স্বরূপ দামোদর, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রায় রামানন্দ, শ্রীবাস
পণ্ডিত, দামোদর মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই আছেন ।
সকলেরই চাপল্যের আবেশ ।

রুঙ্গিয়া গৌরহরি স্বয়ং ভক্তবৃন্দের গাত্রে বিশেষ করিয়া চক্ষু জলের
ছিটা দিতে লাগিলেন । ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার চোখে
ও সর্বক্ষে জল দিতেছেন । আবার সকলেই জল মগ্নুক বাঢ় করিতে-
ছেন । (জলের উপরে মগ্নুকবৎ প্লু তগতির আঘাতে যে অতি বিচিত্র
বাহু ধ্বনি উথিত হয় তাহার নাম জল মগ্নুক বাঢ় ।) গৌরসুন্দর জল-
কেলির রঙ্গে আজ উন্মত্ত । সরোবরের জলে স্নাত গৌরসুন্দরের
অপরূপ মাধুরীর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কবি কর্ণপুর বর্ণনা করিয়াছেন—

অরুণারুণ পাদপঙ্কজো দ্রুতচামীকর গৌরবিগ্রহঃ ।

করুণারুণ লোচনদ্বয় স্ত্রিবিধোত্তাপ বিরামকৃতঃ সদা ॥

অবিলম্ব্য ইখমঞ্জসা সরসীং সারসসালসেক্ষণঃ ।

ক্ষণবান্ জলকেলি কৌতুকে সহতৈস্তৈবমুতাংশু বহুভৌ

অনুবাদ : ষাঁহার পাদপদ্ম সমধিক অরণবর্ণ, শ্রীঅঙ্ক কমিত কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, কমল নয়নদ্বয় কাকণ্যপূর্ণ এবং রক্তাভ। যিনি আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আদিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপ বিনাশকারী সেই পদ্মনেত্র শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র উৎসবানন্দাভিলাষী হইয়া সরোবরে অবতরণ পূর্বক ভক্তগণের সহিত জলকেলি কৌতুকে অমৃতাত্ত্ব শশধরের ন্যায় দীপ্তমান হইয়াছেন।

তারপর দুই দুই জন ভক্তে জলযুদ্ধ আবস্ত হইল। গৌরহরি তখন দর্শক। কেহ হারিতেছেন, কেহ জিতিতেছেন। গৌরসুন্দর অপরূপ শোভায় জলে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছেন। শ্রীল অদ্বৈত প্রভু ও নিতাইচাঁদে একদিকে জলযুদ্ধ হইতেছে। বৃদ্ধ শান্তিপুবনাথ জলযুদ্ধে হারিয়া গিয়া নিতাইচাঁদকে অজস্র কটুক্তি বর্ষণ করিতেছেন। অন্যদিকে স্বরূপ দামোদর ও পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিতে বিষম জলযুদ্ধ বাধিয়াছে। মূবারি গুপ্ত এবং বাসুদেব দত্তেও প্রচণ্ড জলসংগ্রাম চলিতেছে। শ্রীবাস পণ্ডিতের সহিত গদাধর পণ্ডিতও ক্রীড়াসংগ্রামে মত্ত হইয়াছেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে রাঘব পণ্ডিতেরও জল ক্রীড়া যুদ্ধ তীব্র হইয়াছে। গৌরহরির সম্মুখেই রায় বামনন্দ এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বালকের ন্যায় হাতাহাতি করিয়া জলকেলি করিতেছেন। সকলেই ক্রীড়া চাপল্যে বিভাবিত হইয়াছেন। মান, সম্ভ্রম, সৈর্য্য, গান্ধীর্ষ্য কাহারও কিছুই বোধ নাই।

‘গান্ধীর্ষ্য গেল সবার হইল শিশু প্রায়’

গৌরহরি স্মিত হাস্তে কৌতুক দর্শন করিতেছেন। সার্বভৌম ও রামরায়ের চাপল্যাতিশয়্য দর্শনে গৌরহরি হাসিতে হাসিতে গোপীনাথ আচার্য্যকে বলিতেছেন—

দেখ আচার্য্য ! ভট্টাচার্য্য ও রামরায় উভয়েই প্রাচীন, মহা পণ্ডিত, দেশের অতি গণ্য মান্য লোক, পরম গস্তীর। উহাদিগের

পক্ষে এরূপ চপলতা শোভা পায় না। নিষেধ কর। লোকে
নিন্দা করিবে।

‘পণ্ডিত গম্ভীর হুঁহে প্রামাণিক জন।
বালা চাঞ্চল্য করে, করহ বর্জন ॥’

গোপীনাথ হাসিয়া উত্তর দিলেন—

‘প্রভু হে তোমার কৃপা সমুদ্রের এক বিন্দুতে ‘সুমেরু’ ‘মন্দর’
প্রভৃতি বড় বড় পর্বত ডুবিয়া যায়, এই দুইটি ক্ষুদ্র পর্বত ডুবিয়াছে
ইহা আবার কথা?’

ততঃপব গৌরহরি অদ্বৈত আচার্য্যকে ধরিয়া জলমধ্যে শোয়াইলেন।
এবং নিজে তাঁহান বক্ষস্থলে শেষশায়ী অনন্তদেবের ঙ্গোতে উপবেশন
করিলেন। অদ্বৈত প্রভুও প্রেমানন্দে নিজ শক্তি প্রকাশ পূর্বক
মহাপ্রভুকে বক্ষে ধারণ করিয়া সরোবরের জলে ভাসিতে লাগিলেন।
নয়নের আভ্রাম এই লীলা দর্শনে সমবেৎ ওক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে ‘হরি’
‘হরি’ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই সকল মান্তগণ্য লোকের
জলক্রীড়া রঙ্গটি নীলাচলবাসী ও রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত ভাগ্যবান
সকলেই দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

‘ইন্দ্রদ্যুমে জলকেলি করি গৌরবায়।

নিজগণ সঙ্গে লয়ে আইটোটায় যায় ॥’

‘ইন্দ্রদ্যুমে স্নান করি, আইটোটায় যায় গৌরহরি’

আইটোটায়—

‘আইটোটায় আসি আমার শ্রীশচীনন্দন।

নিজগণ লইয়া করেন প্রসাদ ভোজন ॥’

সচল নীলাচলচন্দ্র গৌরহরি 'গুণ্ডিচা' মন্দির হইতে ভক্তবৃন্দের সহিত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমন পূর্বক প্রেমানন্দে জলকেলি করিলেন। তাহার পর কীর্ত্তন আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অদূরে অবস্থিত মনোরম 'আইটোটায়' (যুঁই ফুলের বাগান) উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দের সহিত গৌরহরি আইটোটাতে বিজয়ের পূর্বেই কাশীমিশ্র, বাণীনাথ ও জগন্নাথদেবের প্রধান পাণ্ডা প্রায় ছয় শত লোকের ভোজনের উপযুক্ত প্রসাদ, পানা, পিঠা প্রভৃতি বহু প্রকারের অতি উপাদেয় বস্তু সমূহ সেই উদ্যানে আনিয়া রাখিতেন। জগন্নাথদেবের এই সব অতি উপাদেয় প্রসাদ দর্শনে গৌরহরি অসীম আনন্দিত। তাহার পব—

নিজগণে গৌরহরি

বসাইল সারি সারি

বসাইলা সারি সারি

মাঝে বসিলেন গৌরহরি

(শ্রীলবামদাসসাবাজীসহায়)

সাতজন পরিবেষ্টা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদের নাম, স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, বাণীনাথ পট্টনায়ক, পণ্ডিত দামোদর, কাশীশ্বর পণ্ডিত, গোপীনাথ আচার্য্য ও শঙ্কর পণ্ডিত।

নিজগণ সনে প্রাণ শচীনন্দন

মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

মহাপ্রসাদ করেন ভোজন

গৌরহরি পরিবেষ্টাদের বলিতেছেন—

'আমাকে লাফ্রা ব্যঞ্জন দাও। পিঠা, পানা, অমৃতগুটিকা, প্রভৃতি উপাদেয় ও মিষ্টদ্রব্য ভক্তবৃন্দকে দাও।'

পণ্ডিত জগদানন্দ 'মধুর রসের ভক্ত।' সহজ প্রীতির প্রগাঢ় আগ্রহে তিনি গৌরহরিকে ছলে, বলে, কৌশলে, নানান উপাদেয়

প্রসাদ ভোজন করাইতেছেন। কোন কথা বার্তা না বলিয়া উত্তম উত্তম শাক, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে গৌরহরির পাতে পুনঃ পুনঃ ঢালিয়া দিতেছেন। আবার লক্ষ্য রাখিতেছেন যে তাঁহার দেওয়া প্রসাদ নিজে গ্রহণ করিতেছেন কি অন্য কাহাকেও বিলাইয়া দিতেছেন। জগদানন্দের ভয়ে গৌরহরি সবই গ্রহণ করিতেছেন।

স্বরূপ দামোদর জগন্নাথদেবের উত্তম উত্তম প্রসাদ মিষ্টান্ন নিজ হস্তে ধারণ পূর্বক গৌরহরিকে বলিতেছেন—

‘এই মহাপ্রসাদ অন্ন কর আশ্বাদন।
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন?’

স্বরূপের প্রীতিতে তাঁহার দেওয়া প্রসাদ গৌরহরি কিছু কিছু গ্রহণ করিতেছেন। এইরূপ একবার ‘জগদানন্দ’ আর একবার ‘স্বরূপ’ গৌরহরিকে অতি যত্ন পূর্বক মিষ্ট কথায় ভোজন করাইলেন। যথা—

‘এই মত দুই জনে করে বারম্বার।
‘বিচিত্র’ এই দুই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার ॥’

পরম রঙ্গিয়া গৌরহরি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়াছেন। উত্তম উত্তম প্রসাদ নিজ পাতা হইতে ভট্টাচার্য্যের পাতায় দিতেছেন। কি করুণা।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্যও পরিবেশন করিতেছেন। গৌরহরির কৃপা পাইবার পূর্বে সার্বভৌম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। গোপীনাথ পূর্বকথা তুলিয়া হাসিতে হাসিতে ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন—

‘কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব জড় ব্যবহার
কাঁহা এই পরমানন্দ করহ বিচার ॥’

অতঃপর গৌরহরি একে একে সর্ব ভক্তের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া তাঁহাদিগকে পিঠা পানা প্রসাদ দেওয়াইতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহারা সকলেই পরিপূর্তির সহিত প্রসাদ পাইয়াছেন। তবুও গৌরহরির করুণা বর্ষণরূপ এই প্রসাদ বিতরণ অত্যন্ত উল্লাসের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

গৌর-আনা-গোসাঞি সীতানাথ এবং গৌরহরির ‘ইচ্ছা’ ও ‘ক্রিয়া শক্তির’ সচল মূর্তি অবধূত নিতাইচাঁদ রসকোন্দলের নিমিত্ত পাশা-পাশি বসিয়াছেন। সীতানাথ উচ্চ কণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেছেন—

‘আজ্জ্ এই অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেছি। জানিনা ইহাতে আমার কি গতি হইবে? প্রভু তু সন্ন্যাসী। তাঁহার অন্নদায় ঘটিবে না। আমি গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, এই অবধূতের জাতি কুল আচার কিছুই জানি না। ইহার সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন আমার ঘোর অনাচার।’

নিতাইচাঁদ হাসিয়া উত্তর করিলেন—

‘তুমি অদ্বৈত আচার্য্য।

অদ্বৈত সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য ॥

তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে।

এক বস্তু বিনে সেই দ্বিতীয় না মানে ॥

হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন।

না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥’

এইরূপ নানান রঙ্গে উছানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ লীলা সমাপ্ত হইল। গোবিন্দ গৌরহরির অবশেষ প্রথমে ঠাকুর হরিদাসের জন্তু পৃথক করিয়া রাখিলেন। অবশিষ্ট প্রসাদ হইতে সমস্ত ভক্তকে গৌরহরিব অধরাযুত দান করিলেন। তাহার পর নিজে প্রসাদ পাইলেন।

এইভাবে মন প্রাণ-মাতান উছান-ভোজন-লীলার অন্তে গৌরহরি স্বয়ং ভক্তবৃন্দকে দিব্যদর্শন মালা ও চন্দনে ভূষিত করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে বিনোদিয়া গৌরহরি সকলকে সঙ্গে লইয়া পদমানন্দে জগন্নাথ দেবের 'নেত্রোৎসব' * দেখিতে চলিলেন।

নেত্রোৎসব দর্শনে—

একাদশ দিবস পরে 'নবনৈব অভিরাম' শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সবারলোকের নয়ন গোচর হন। এই কারণেই ঐ দিন শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনার্থী উপস্থিত হন।

আইটোটা হইতে কীৰ্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগোষ্ঠী সহ সচল জগন্নাথ গৌরহরি সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। তিনি বাহু যুগল উদ্ধে উত্তোলন পূর্বক হুঙ্কার গজ্জর্ন করিয়া ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

'সচল জগন্নাথ গৌরহরি' ও 'অচল জগন্নাথ নীলাচলচন্দ্রের' চারি চক্ষুর মিলন হইল। গৌরহরির শ্রীঅঙ্গের অপরূপ ভাবাবলী দর্শনে সঙ্গের ভক্তগোষ্ঠী যেন আনন্দ পাথারে সঁতার দিতে লাগিলেন। আমাদের দাস রঘুনাথও এই গৌরভক্ত সেবক গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন।

গৌরহরি গড়ুর স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ জগন্নাথ দর্শন করেন। পনের দিন অদর্শনের পর প্রথম দর্শনে, আনন্দের

* শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার পর পনের দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন বন্ধ থাকে। ১৫দিন পরে সর্বসাধাবণে জগন্নাথদেবের প্রথম দর্শন পান সেই দিনটিকে 'নেত্রোৎসব' বলা হয়।

আতিশয্যে তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ হইল। তিনি ভোগ-মণ্ডপে (জগন্নাথ দেবের অতি নিকটে) গমন পূর্বক দর্শন করিতে লাগিলেন।

‘দর্শন লোভে করি মর্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগ মণ্ডপে যাইয়া কবে শ্রীমুখ দর্শন ॥’

গৌরহবির তাৎকালীন প্রেমাবেশেব বহিপ্রকাশের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা কবিকর্ণপুরের ভাষায়—

নয়নজলঝরৈঃ পদারবিন্দ—
দ্বয় নখচন্দ্রমসঃ পবিত্রয়ন্ সঃ।
ন হি জগতি ছুরাপমেতদন্যৎ
কিমিতি তদাভিসিষেচ সৌজ্জ্ব পদ্যম্ ॥ ৭৬ *

নয়নযুগমুবাহ শোণপদ্য—
শ্রিয়মতি কুটুমলতাং ততঃ শবাবং ॥
অসিতগিরি সুধাংশু বক্তৃচন্দ্র°
রহসি বিলোকযতোইশ্চ নিস্পৃহশ্চ ॥ ৭৭ +

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ১৫শ সর্গঃ।)

* গোবিন্দর নয়নগালিত জলঝর দ্বারা পাদপদ্য যুগলেব নখচন্দ্রকে পবিত্র কাব্য “জগন্মণ্ডলে ইহা ভিন্ন আব কিছুই ছল্লভ নয়, অর্থাৎ পাদপদ্যই ছল্লভ” এই জ্ঞানেই কি চরণাববিন্দকে অভিশিষ্ট কবিত্তে লাগিলেন ?

+ নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দেবের মুখচন্দ্রকে নির্জনে দর্শন করিয়া স্পৃহাশূন্য গৌরচন্দ্রের নেত্রযুগল রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করিল এবং শরীর কুটমল অর্থাৎ মুকুলের গায় হইল।

অল্প কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যেন ‘সচল জগন্নাথ গৌরহরি’ অচল জগন্নাথ নীলাচলচন্দ্রকে প্রেমাভিমানেরি কিছু বলিতেছেন। সে গম্ভীর অন্তরঙ্গ রস কথার অপর প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ও অনুভবী শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর আমাদের সৌভাগ্যেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

‘আমি তোমা না দেখিলে মরি ।
পালটি না চাহ তুমি ফিরি ॥’

গৌরাজ গোষ্ঠী (স্বরূপ, গোবিন্দ, রঘুনাথ আদি গম্ভীরার সেবকবৃন্দ) সার্বভৌম, শিখি মাইতি আদি নীলাচলের ভক্তবৃন্দ এবং নিতাই, নরহরি, শ্রীবাস, যুকুন্দ, বসু রামানন্দ আদি নদীয়ার ভক্তবৃন্দ কেহই অচল জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন না। জগন্নাথ দর্শনে গৌরহরি যে সুখ ভোগ করিতেছেন তাহা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ‘বিকাশ’ পাইতেছে। ভক্তবৃন্দ সেই গৌরহরিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছেন।

পরবর্তী কালে মিতবাক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ‘দাস গোস্বামীর’ সঙ্গ ও প্রসঙ্গ প্রভাবে সে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন—

‘দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা’

পুত্র ভৃত্য স্থানীয় রঘুনাথের সহিত স্বরূপ দামোদর গৌরহরির নিকটে আছেন। ক্রমে অপরাহুও উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা হইল। আরতির সময় হইল। গৌরহরির বাহ্য অবস্থা তখনও আসে নাই—

‘মুখামুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর ।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ॥’

স্বরূপ গোসাঞী গৌরহরিকে বলিতেছেন—

“প্রাণনাথ ! আগামী কাল রথ যাত্রা, আজ বাড়ী চল, কাল আবার ভাল করিয়া দেখিও । ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত । তুমি না যাইলে তাঁহারা নিজ নিজ বাসায় বিশ্রাম জন্য যাইতে পারিতেছেন না । চল বাসায় চল ।”

গৌরহরি একবার স্বরূপের প্রতি চাছিলেন মাত্র । কোন কথা বলিলেন না । এমন সময় আরতির বাজ বাজিল । আরতি আরম্ভ হইল । এবং শেষও হইল । গৌরহরির নয়ন ভঙ্গ তখনও জগন্নাথের বদন কমলে নিবিষ্ট ।

স্বরূপ গোসাঞী পুনরায় বলিলেন—

‘প্রভু ! আরতি ভোগ হইল । রাত্রি চাৰিদণ্ড অতিবাহিত হইল । চল বাসায় চল, তোমারও বিশ্রাম দরকার । ভক্তবৃন্দ বডই শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছেন, তুমি না যাইলে তাঁহারা কি করিয়া বাসায় যান্ ?’

গৌরহরি এবার করুণ নয়নে ভগ্ন স্বরে কথা বলিলেন ।

তিনি বলিলেন—

‘স্বরূপ ! আর একটু অপেক্ষা কর । আমি একটু ভাল করিয়া আমার বঁধুর বদনচন্দ্র দর্শন করিয়া লই । আজ পনেরটি দিন আমার ‘নয়ন’ উপবাসী আছে । এই ত দর্শনে আসিলাম । একটু অপেক্ষা কর ।’

পুনরায় প্রায় দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিয়া স্বরূপ বলিতেছেন—

‘হা নাথ ! রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড হইল । তোমার ভক্তবৃন্দের শ্রান্ত ক্লান্ত বদন সমূহ দর্শন কর । আজ্ আর না । চল ।’

জগন্নাথের সেবকবৃন্দ গৌরহরিকে প্রসাদী মালা দিলে তিনি পরম গৌরবে তাহা শ্রীমন্তকে ধারণ করিয়া বাসায় ফিরিলেন। গৌরহরিকে বাসায় রাখিয়া ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ বাসায় গমন করিলেন। স্বরূপ ও রঘুনাথ আরও কিছু সময় অপেক্ষা করিয়া গৌরহরিকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর তাঁহারা পিতা পুত্রে বিশ্রামের জন্ম গমন করিলেন।

“পল্লভি বিজয়”

আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া, রথযাত্রা মহোৎসব।

গৌরহরির নদীয়া ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দ স্নানাদিকৃত্য সমাপন করিয়া সকলে কাশীমিশ্রালায়ে আগমন করিলেন। তাঁহাদের জীবন সর্বস্ব গৌরহরির সঙ্গে তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ‘পল্লভি বিজয়’ উৎসব দর্শনে ছুটিলেন। শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিলেন জগন্নাথের সেবকবৃন্দ বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথকে সিংহাসন হইতে উঠাইয়া বথারোহণের জন্ম যাত্রা করাইতেছেন। পরম সূকৃতিবান মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সহ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সগোষ্ঠী গৌরহরির দর্শন মাত্রেই সকলে সসম্মুখে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ হাতাহাতি ধরিয়া শ্রীবিগ্রহদের লইয়া যাইতেছেন। মঙ্গল বাত বাজিতেছে। পাণ্ডাগণের মুখে “জয় জগন্নাথ” রব দিগন্ত কম্পিত করিতেছে। সেই সঙ্গে অগণিত দর্শকবৃন্দের উন্মাদনায়, কণ্ঠের উচ্চ জয়নাদে, গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। সেবকগণের কেহ শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণ ধরিয়াছেন, কেহ শ্রীমন্তক ধরিয়াছেন, কেহ বা স্কন্ধদেশ অবলম্বন করিয়াছেন।

দুইজন কটি দেশে স্থূল পট্টডোরি * দৃঢ় বন্ধ করিয়া তাঁহাকে
উঠাইতেছেন। পথের মধ্যে তুলার গদি পাতা হইয়াছে, তাহাব
উপর শ্রীবিগ্রহকে স্থাপন করা হইতেছে এবং উঠান হইতেছে।
শ্রীজগন্নাথের অঙ্গের আঘাতে গদিগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে,
যথা—

‘প্রভু পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড।

তুলি সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥’

—চরিতামৃত মধ্য ১৬শ

এইরূপে শ্রীবিগ্রহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন যেন নৃত্যেব
ছন্দেই ঘটিতেছে।

ভক্তগোষ্ঠীর সহিত পরমানন্দে গৌবহবি এই ‘পছণ্ডি বিজয়’ দশন
করিতেছেন। মাঝে মাঝে ‘মনিমা’ ‘মনিমা’ বলিয়া তিনি উচ্চ
ধ্বনি করিতেছেন। উৎকল ভাষায় অতি সম্মান সূচক শব্দ

* পট্টডোরি—ইহা বেশমের এক প্রকাব স্থূল চেন বা কাছী। সাদা
কাল, লাল ও হলদে বর্ণের বেশম দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। দেখিলে
বড়ই সুদৃশ্য। কুলীনগ্রামবাসীরা প্রতি বৎসব দুইগাছি পাঠাইতেন। ইহাব
এক এক গাছি লম্বায় ২৪ (চব্বিশ) হাতের কম নয়। স্টীমারেব রশিব হ্রাৎ
স্থূল। আটগাছি রসিতে একগাছি প্রস্তুত হয়। ছান্দে চাবি রসেব ফুল
উঠিতে থাকায় দেখিতে মনোরম হয়। ইহা অত্যন্ত দৃঢ় সহজে ছিঁড়িবাব নয়

‘মনিমা’। * ইহার অর্থ সর্বেশ্বর। বাঢ় কোলাহলে অবর্ণনীয় মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বয়ং স্বর্ণ নির্মিত সম্মার্জনী হস্তে পথ মার্জনা করিতেছেন এবং স্বহস্তে চন্দনের জল শ্রীজগন্নাথদেবের গমন পথে ছিটাইতেছেন।

শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও সুভদ্রাদেবী—তিন মূর্ত্তিই পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিলেন। অগণিত বাঢ়ভাণ্ড এক সঙ্গে বিপুল রবে বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র শব্দ একত্রে নিনাদিত হইল। লক্ষ কণ্ঠের জয় জয় ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

রথাগ্রে—

সচল জগন্নাথ গৌরহরি নিজ ভক্তগণের সহিত পরিবেষ্টিত হইয়া ‘মল্লবেশে’ রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীনীলাচলচন্দ্র যেমন নিজ গোষ্ঠী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রথোপরি ইন্দ্রনীল মনি সদৃশ শোভা পাইতেছেন — শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রও রথাগ্রে নিজ ভক্তবৃন্দ বেষ্টিত হইয়া হেমকান্তির লাবণ্য বিকাশ করিয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন গৌরকান্তিতে নীলাচলচন্দ্র কখনও কষিত কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিতেছেন। আবার, শ্যামকান্তিতে নবদ্বীপচন্দ্রও কখন শ্যামবর্ণ ধারণ করিতেছেন। কেবল পরম সুকৃতিবান ভক্তবৃন্দই এই অপরূপ ভাবসাদৃশ্য দর্শন লাভ করিতেছেন। অচল জগন্নাথ রথে আরোহণ করিয়াছেন, সচল জগন্নাথ রথাগ্রে দাঁড়াইয়া ভক্তবৃন্দের সঙ্গে রথারূঢ় বিগ্রহে নিজ বিগ্রহ দেখিতেছেন।

* বৌদ্ধ তিব্বতীদের উপাসনার হৃদয়ের মধ্যে বজ্র ধারণার (শূত্র মানে বজ্র) এক নাম মনিমা। ওং মণি পদ্ম হং এই ষড়ক্ষর মনিমা মন্ত্রটি তাঁরা হাতে চক্র ঘুরিয়ে জপ করেন। মনিমা উপাসনার বাহ্য সাধনা এটি। অন্তর

রথের রজ্জু বিস্তৃত হইল। রথযাত্রা উপলক্ষে সমাগত জনতা, (বিভিন্ন দেশের বিচিত্র বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও নারী) পরম উল্লাসে রথরজ্জু ধরিলেন। সু-মধুর ভঙ্গীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথ চলিতে লাগিল। প্রেমানন্দে সর্বলোক জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ‘জয় জগন্নাথ’ ‘জয় জগন্নাথ’ রবে গগন মণ্ডল পূর্ণ হইল। শ্বেতবর্ণ বালুকাময় সমুদ্র পথের দুই পার্শ্বে সুরম্য সুরম্য উপবন। দুই দিকের শোভা দর্শন করিতে করিতে পরমানন্দে নীলাচলচন্দ্র রথারোহণে চলিয়াছেন। অগণিত বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া রথের সুদীর্ঘ রজ্জু ধারণ করিয়া চলিয়াছে। রথ কখনও মন্দ মন্দ চলিতেছে আবার, কখনও বা স্থিরগতি হইতেছে। ‘সচল জগন্নাথ’ গৌরহরি নিজ ভক্তবৃন্দকে স্বহস্তে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিয়া শক্তিশালা করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী ও শ্রীবাস পণ্ডিত কীর্তনীয়া দলের প্রধান হইলেন। কীর্তনের জন্য প্রথমে চারিটি সম্প্রদায় গঠিত হইল। এই চারি সম্প্রদায়ে চব্বিশ জন গায়ক রহিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ছয় জন করিয়া গায়ক ও দুই জন মৃদঙ্গ মাদক।

প্রথম সম্প্রদায়ে স্বরূপ দামোদর প্রধান হইলেন। তাঁহার পাঁচজন দোহার, দামোদর পণ্ডিত, রাঘব পণ্ডিত, গোবিন্দ দত্ত, গোবিন্দানন্দ ও নারায়ণ। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন গৌর-আনা গৌনাই শ্রীল অষ্টমত আচার্য্য।

উপাসনা ধ্যান। উড়িষ্যায় মনিমা শব্দের খুব প্রীতির ও সর্কেশ্বরত্ব অর্থের সঙ্গে এবং শ্রীজগন্নাথের সর্কেশ্বরত্ব জ্ঞাপনের সঙ্গে বৌদ্ধ মনিমা শব্দের এত সাদৃশ্য থাকার মধ্যে ঐতিহাসিক অসঙ্গতিসমূহের সীমা নাই। নিরঞ্জন শব্দের অপর নাম ‘মণিমন্’।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁহার দোহার, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, ছোট হরিদাস, শুভানন্দ, শ্রীমান ও শ্রীবাস পণ্ডিতের অপর একভ্রাতা। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন, অভিন্ন-চৈতন্য-তনু অবধূত নিতাইচাঁদ।

তৃতীয় সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন মুকুন্দ দত্ত। তাঁহার দোহার বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শ্রীকান্ত, বল্লভ সেন এবং গোপীনাথ আচার্য্য। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন 'ভুবন পাবন' নামময় জীবন 'ঠাকুর হরিদাস'।

চতুর্থ সম্প্রদায়ে প্রধান হইলেন গোবিন্দ ঘোষ। তাঁহার দোহার তাঁহারই ছুই ভাই বাসুদেব ও মাধব, এক হরিদাস, বিষ্ণুদাস এবং অন্য এক রাঘব। এই সম্প্রদায়ে নৃত্য করিবেন বক্রেশ্বর পণ্ডিত। তাঁহার মহিমা—

'বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দো দিব্য শরীর।

অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির।'

ইহা ভিন্ন আরও তিনটি সম্প্রদায় গঠিত হইল—

(১) কুলীনগ্রামের সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন 'বসু রামানন্দ'

(২) শান্তিপুর সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন 'অচ্যুতানন্দ'

(৩) শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন 'নরহরি সরকার'

ইহাদের দলে বহু বহু লোক। প্রধান তিন জনে নৃত্য করেন।
এইরূপ সাতটি সম্প্রদায় হইল।

পূর্বের চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রে থাকিবেন। পরের তিনটি সম্প্রদায়ের মধ্যে রথের দুই পাশে দুইদল ও পশ্চাতে একদল।

গৌরহরির আদেশে সঙ্কীর্ণন আরম্ভ হইল। চৌদ্দমাদল বাজিয়া উঠিল। জগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ এ যাবৎ যে সব বাজ-ভাণ্ড বাজাইতে ছিলেন রাজা প্রতাপরুদ্রের আদেশে সে সব স্থগিত হইল।

‘সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল ।
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥’

গৌরহরির অননুসন্ধানে অপরূপ ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইল । তিনি সাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই একই সময়ে আবির্ভূত হইয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিলেন । জন মন-লোভা আজানুলম্বিত-বাহু যুগল উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্বক তাঁহার “জয় জগন্নাথ” “জয় জগন্নাথ” রব এবং সোল্লাস উচ্চ হরিধ্বনি ভক্তমণ্ডলীতে শক্তি সঞ্চাব ও উৎসাহ সৃজন করিতে লাগিলেন ।

‘সাত ঠাঁই বুলে প্রভু বলি হরি হরি ।
জয় জয় জগন্নাথ কহে বাহু তুলি ॥’

সকলেই দেখিতেছেন সংকীৰ্ত্তন পিতা গৌরহরি তাঁহাদিগ্ধে সংকীৰ্ত্তনের পূর্বোভাগে । সকলের আনন্দের অবধি নাই । অত্যন্ত উল্লাসের সহিত কীৰ্ত্তনে মত্ত হইয়া পরস্পরে বলাবলি করিতেছেন—

‘সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়ে ।
অন্য ঠাঁঞি নাহি যায় আমার মায়ায় ॥’

শ্রীকৃষ্ণ বাস বজনীতে অপ্রাকৃত ব্রজধামে ‘ব্রজরামা’ অর্থাৎ নিজ হলাদিনী শক্তিদেব সহিত বিলাস কালে অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন । রাইকানুর ভাব মিলিত বিগ্রহ গৌরহরি এই মায়াব জগতে (ঐতিহাসিক সত্য) কলিজীবের নয়ন গোচর হইয়া অসাধনে, আচণ্ডালে যে প্রেমদান লীলা প্রকট করিয়াছেন ইহা কারুণ্যের অবধি ।

(ষোড়শ বর্ষ কাল ব্যাপী অবস্থান করিয়া রঘুনাথ এই বাৎসরিক উৎসবের দ্রষ্টা ও স্বরূপের আনুগত্যে অন্তরঙ্গ সাথী)

রথের সম্মুখে নৃত্য করিতে করিতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্য্যন্ত ‘জগন্নাথ’
ও গৌরহরির গমন প্রসঙ্গে—ত্রিকাল সত্য লীলা দৃষ্টা শ্রীপাদ
রামদাস বাবাজী মহাশয়ের কীর্ত্তন * বর্ণিত হইতেছে—

রথের সম্মুখে—

	আবেশে বলে গোরারায়
স্বরূপ রামরায়ের করে ধরি,	আবেশে বলে গোরারায়
	বলে দেখ দেখ প্রাণ সখি !
	হেলে ছলে অস্ছে
রথোপরি বংশীধারী	হেলে ছলে আসছে
(যেন) নব-অনুরাগের হিল্লোলে	হেলে ছলে আসছে
* আজ নব রসের হিল্লোলে	হেলে ছলে আসছে
গোপীর মনোরথ পুরাবে ব'লে	হেলে ছলে আসছে

আসছে রথে চড়ে হেলে ছলে ।
গোপীর মনোরথ পুরাবে বলে ॥

আসিছে ব্রজের মনোমথ

পুরাইতে গোপীর মনোরথ ।
আসিছে ব্রজের মনোমথ ॥

* ভাগ্যবান ষাঁহার। এ কীর্ত্তন শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই অনুভব আছে যে লীলা ত্রিকাল সত্য । এবং চিহ্নিত দাসদের ষাঁহারা কীর্ত্তন হইলে তাহা সকলেরই অনুভবে ধরা পড়ে ।

(তখন) আবেশে রামরায় ব'লে
 ভাবনিধি গোরার মরম জেনে আবেশে রামরায় ব'লে
 (আবেশে) রামরায় করে গানে
 ভাবনিধি গোরার মরম জেনে রামরায় কবে গানে

(আমাদের) “শ্রীবাধারমণ রমনী মনোমোহন,
 শ্রীবৃন্দাবন বনদেবা।”

ঐ আসুছে প্রাণের রাধারমণ
 শ্রীবৃন্দাবিন বিহারী ঐ আসুছে প্রাণের রাধারমণ
 ঐ রসময় বংশীধারী ঐ আসুছে প্রাণের রাধারমণ

“শ্রীবৃন্দাবন বনদেবা”

“অভিনব রাস রসিকবর নাগর,
 নাগরীকৃতগণ সেবা !!”

আমাদের প্রাণ রাধারমণ
 বৃন্দাবিন-বিহারী বনমালী
 বরজ-যুবতী-কুলে দিতে কালি
 ঐ হেলে ছলে আসুছে
 ঐ রথে চড়ে আসুছে

নিতুই নিতুই নব নব
 নিতুই নিতুই নব নব
 নব নব বিভ্রমশালী
 নব নব বিভ্রমশালী
 নব নব বিভ্রমশালী
 নব নব বিভ্রমশালী
 নব নব বিভ্রমশালী

“ব্রজ নাগরীকৃতগণ সেবা”

ব্রজ নাগরী -কৃত

নিশি দিশি সেব্যমান

নিশি দিশি সেব্যমান

(ব্রজ) “নাগরীগণকৃত সেবা ॥”

“ব্রজপতি-দম্পতি,

হৃদয় আনন্দন”

মা যশোদার নীলমনি

বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের বশে,

দণ্ডে দশবার খায় নবনী

দণ্ডে দশবার খায় নবনী

ঐ এল তোমার নীলমনি

আবেশে রামরায় বলে

এস গো মা যশোদে

এস লয়ে ক্ষীর ননী

এস লয়ে ক্ষীর ননী

এস লয়ে ক্ষীর ননী।

ঐ এল তোমার নীলমনি :

তোমার নীলমনি এল ব্রজে,

এস গো মা যশোদে

এস গো মা যশোদে

(ত্বর করি) এস মা যশোদে

তোমার নীলমনিকে ননী দিতে

এস মা যশোদে

ত্বর করি এস মা যশোদে ।

নীলমনিকে ননী দিতে ॥

“ব্রজপতি দম্পতি

হৃদয় আনন্দন,

নন্দন নব-ঘন-শ্যাম ॥”

মা যশোদার নীলমনি

শ্যাম নব-জলদ

নন্দ হৃদি আনন্দন

নন্দ হৃদি আনন্দন

ভাগ্যবশে শ্যামজলদ,

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

ভাসাবে ডুবাবে বলে

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

লীলামৃত বরিষণে, ভাসাবে ডুবাবে ব'লে

ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

নবজীবন দিবে বলে

শ্যামজলদ উদয় হ'ল

শ্যামজলদ উদয় হ'ল

বিরহে মৃতপ্রায় জনে, নবজীবন দিবে ব'লে

শ্যামজলদ উদয় হ'ল

লীলামৃত বরিষণে

নব জীবন দিবে ব্রজজনে

নব জীবন দিবে ব্রজজনে

নব জীবন দিবে ব্রজজনে ।

লীলামৃত বরিষণে ॥

“নন্দন নব ঘন-শ্যাম ।

নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাস্বর”

নন্দীশ্বর পুরবাসী

‘নন্দীশ্বর পুর,

ঐ আস্ছে ব্রজের কালশশী

ঐ আস্ছে ব্রজের কালশশী

পুরট পটাস্বর’

শ্যাম অঙ্গে পীতাস্বর

(যেন) থির বিজুরি-জড়িত নবঘনে

থির বিজুরি-জড়িত নবঘনে

“নন্দীশ্বর পুর পুরট পটাস্বর

রামানুজ গুণধাম ॥”

ঐ যে রথে চড়ে আস্ছে

বলরামের ছোট ভাই

বলরামের ছোট ভাই

কা— কা— কানাইয়া

(যাকে) আদর ক’রে সদাই ডাকে

আদর ক’রে সদাই ডাকে

কা—কা— কানাইয়া

আরে আরে মেরো ভেইয়া ॥

“রামানুজ গুণধাম ।

শ্রীদাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর ॥”

বিশুদ্ধ সখ্য প্রেমার বশে,

ঐ রথে চড়ে আস্ছে

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজী

বনফল মিঠ লাগলে

খেতে খেতে বেঁধে বাখে

খেতে খেতে বেঁধে রাখে

বলে' আর খাওয়া হ'ল না

এ যে বড় মিঠ লাগ্‌ল

আর খাওয়া হ'ল না

আধ থাক, ভাই কানাইকে দিব

আর খাওয়া হ'ল না

(ধড়ার) অঞ্চলে বেঁধে রাখে

কত যতন ক'রে ধড়ার

অঞ্চলে বেঁধে বাখে

বাম করে, গলা জড়িয়ে ধরে,

ছুটে এসে তুলে দেয়

চাঁদ মুখে তুলে দেয়

বলে ধব ধব খাও কানাই

বড় মিঠ ফল ভাই

খাবে আমার প্রাণ কানাই

মিঠ লেগেছে তাই খেতে পাবি নাই, বড় মিঠ ফল ভাই

খাবে আমার প্রাণ কানাই

শ্রীদামের উচ্ছিষ্ট ভোজা

ঐ বথে চ'ড়ে আস্‌ছে

আবেশে রামরায় বলে

কোথায় আছ শ্রীদাম সখা

ঐ এলো তোমার প্রাণসখা ।

কোথায় আছ শ্রীদাম সখা ॥

আবেশে রামরায় বলে

ঐ রথে চড়ে আসছে

“শ্রীদাম সুদাম—সুবল সখা সুন্দর”

সুবলের মরম সখা

শ্যাম ত্রিভঙ্গ বাঁকা

সুবলের মরম সখা

(আমাদের) রাই বিরহে প্রাণ রাখা।

সুবলের মরম সখা ॥

ব্রজ রাখালের পরাণ

কালিয় দমন শ্যাম,

ব্রজ রাখালের পরাণ

ঐ রথে চ’ড়ে আসছে

কালিয় দমন শ্যাম

ঐ রথে চ’ড়ে আসছে

কালিয় দমন শ্যাম।

ব্রজ রাখালের পরাণ ॥

‘শ্রীদাম সুদাম

সুবল সখা সুন্দর

চন্দ্রক চাকু অবতংস।”

ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

আবেশে রামরায় বলে

ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

দেখ, সখি চেয়ে দেখ্

ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

ঐ বিনোদ বায়ে বিনোদ বরিহা *

ঐ বিনোদ বিনোদ বিনোদ দোলে

* ‘বরিহা’ । মানে ময়ূর পুচ্ছ ।

ঐ চূড়ার দোলন দেখে মদন,
মুরছি পড়ে ভূমিতলে
মুরছি পড়ে ভূমিতলে

ঐ মকর কুণ্ডল দোলে
ঐ মকর কুণ্ডল দোলে
যুগল কর্ণে

কুণ্ডল দোলে গো
কুণ্ডল দোলে গো
মকরাকৃতি

মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে
ঐ মকরাকৃতি কুণ্ডল
মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে
মনোমীন গিলিবে ব'লে
মুখ ব্যাদন ক'রে দোলে
মনোমীন গিলিবে ব'লে

বরজ ললনার
মনোমীন গিলিবে বলে

“(শিখি) চন্দ্রক চারু অবতংস ।
গোবর্দ্ধন ধর ধরনী সুধাকর”

ধরিতে গোপীর বিরহ গিরি
আসছে ব্রজের গিরিধারী
“গোবর্দ্ধন ধর ধরনী সুধাকর”
আসছে ব্রজের গিরিধারী

বরজ সুধাকর
ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
লীলামৃত রসপুর, বরজ সুধাকর
ব্রজাকাশে উদয় হ'ল
ব্রজাকাশে উদয় হ'ল

ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে
বংশীবট হেলনে

বেলু বাজায় গো
বেলু বাজায় গো

বেলু বাজায় গো ।
চৌদ্দভুবন আকর্ষিত ॥

মুনিজন্যর ধ্যান টলে

যোগী যোগ ভুলে গো
যোগী যোগ ভুলে গো

(হয়) সচল অচল, অচল সচল

পবনের গতি রোধ হয়

পবন স্থির হয়

গিরিরাজ চলে গো
গিবিবাজ চলে গো

(হয়) সচল অচল, অচল সচল

তরল কঠিন, কঠিন তরল

সচল অচল, অচল সচল

(হয়) তরল কঠিন, কঠিন তরল

পাষণ গলিয়া যায়

যমুনার জল ঘন হয়
যমুনার জল ঘন হয়

মুরলীর গানে

(হয়) তরলতা পুলকিত
তরলতা পুলকিত

নব নব ফল ফুলে

মুরলীর গানে

(হয়) পুষ্পিত ফলিত

পুষ্পিত ফলিত

(হয়) শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত

শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত

মোহন মুরলী রোলে

উত্তাল তরঙ্গ ছলে

যমুনা উজান চলে

যমুনা উজান চলে

নেচে নেচে উজান চলে

যমুনার জলে হেলে ছলে

মকর মীন নাচে গো

মকর মীন নাচে গো

যমুনার জলে হেলে ছলে ।

মোহন মুরলী রোলে ॥

ধায় কাননে ব্রজ কামিনী

মকর মীন নাচে গো

ত্যজি নিজ কুলে গো

ত্যজি নিজ কুলে গো

প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ ব'লে ।

ধায় কাননে ব্রজ কামিনী ॥

“মুখরিত মোহন বংশ ॥

কালিয়া দমন

গমনজিত কুঞ্জর

কুঞ্জরচিত রতি রঙ্গ ॥”

সাক্ষাৎ মন্থথ-মন্থথ

চড়ি গোপীর মনোরথে

গোপীর মনোরথ পূরাইতে

নাগর রসিয়া

রাসরসিকবর

ঐ হেলে ছলে আস্ছে

অপ্রাকৃত নবীন মদন

অপ্রাকৃত নবীন মদন

মন্থথের মন-মথে

মন্থথের মন-মথে

আবেশে রামরায় বলে

ঐ আস্ছে ব্রজের মন্থথ

ঐ আস্ছে ব্রজের মন্থথ

ঐ রথে চড়ে আস্ছে

অপ্রাকৃত নবীন মদন

কেলিরস বিনোদিয়া

কেলিরস বিনোদিয়া

কেলিরস তৎপর

কেলিরস তৎপর

কেলিরস ভূপতি

কেলিরস ভূপতি

শৃঙ্গাররসময় মুরতী

কেলিরস ভূপতি ॥

আবেশে রামরায় বলে

ঐ রথে চড়ে আস্ছে

শ্রীগৌরান্ধ গুণমণি,

শুনি রামরায়ের বাণী

শুনি রামরায়ের বাণী

ভাবনিধি গৌরান্ধ আমার

কিশোরী আবেশে ভোরা

কিশোরী আবেশে ভোরা

(আ মরি) নীলাচলে জগন্নাথ রায়

গুণ্ডিচা মন্দিরে চলি যায়

অপরূপ রথের সাজনী

তাহে চড়ে যায় যতুমণি

দেখিয়া আমার গৌরহরি

এই রথের আগে দাঁড়াইয়া

কিশোরী ভাবে ভোরা গোরা

এই রথের আগে দাঁড়াইয়া

“দেখিয়া আমার গৌরহরি

নিজগণ লইয়া এক করি

মাল্য চন্দন গলে দিয়া

জগন্নাথ নিকটে যাইয়া”

সাজ্জল সবে নবোল্লাসে

দেখিয়া গৌরের কিশোরী আবেশে

সাজ্জল সবে নবোল্লাসে

“মাল্য চন্দন গলে দিয়া ।

জগন্নাথ নিকটে যাইয়া ॥”

যেন সহচরী মাঝে রাইকিশোরী
যেন সহচরী মাঝে ভানুভঙ্গরী

পরিকর ঘেরা গৌরহরি
পরিকর ঘেরা গৌরহরি
পরিকর ঘেরা গৌরহরি

“মালা চন্দন গলে দিয়া ।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া ॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় ।

কীর্তন করয়ে গোরারায় ॥”

শ্রীজগন্নাথের রথ ঘেরি

হ'ল পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলী
হ'ল পৃথক্ পৃথক্ মণ্ডলী
সবাই আনন্দে নাচে গায়

রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় ।
সবাই আনন্দে নাচে গায় ॥

“রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায় ।”
সবারই মাঝে গৌর নাচে

“রথে বেড়ি সাত সম্প্রদায়
কীর্তন করয়ে গৌরায় ॥”

(এই) জগন্নাথের রথ ঘিরে
“আজানু লক্ষিত বাহু তুলি ।
ঘন ঘন হরি বলি ॥”

শ্রীগোরাঙ্গের প্রতি অঙ্গে

প্রকট হইল ভাবাবলী

প্রকট হইল ভাবাবলী

এই জগন্নাথের রথের আগে

নাচে গোরাঙ্গ কিশোরী

শ্রীজগন্নাথের বদন হেরি

নাচে গোরাঙ্গ কিশোরী

নাচে গোরাঙ্গ কিশোরী

“ঘন ঘন হরি হরি ধ্বনি ।

আন আর কিছুই না শুনি ॥”

গগন ভেদি উঠিল রোল

“হরি হরি হরি বোল ।

গগন ভেদি উঠিল রোল ॥”

“নিতাই অদ্বৈত হরিদাস ।

নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥”

হেমদণ্ড বাহু পসারিয়ে

নিতাই নাচে কাছে কাছে

নিতাই নাচে কাছে কাছে

প্রাণ গৌর চ'লে পড়ে পাছে ।

(তাই) নিতাই নাচে কাছে কাছে ॥

(আজ) সীতানাথ হরি বলে

গৌরহরির বদন হেরে ।
সীতানাথ 'হরি' বলে ॥

“নিতাই অদ্বৈত হরিদাস ।
নাচে বক্রেশ্বর শ্রীনিবাস ॥”

দেখি গোরার ভাবোল্লাস

সবাবই মুখে মুছ হাস

সবারই মুখে মুছ হাস

“মুকুন্দ স্বরূপ বামবায় ।”

অনিমিখে প্রাণগোরাব

বদন পানে চেয়ে আছে

বদন পানে চেয়ে আছে

ভাব জেনে গান ক'বে ব'লে

বদন পানে চেয়ে আছে

ভাবনিধি প্রাণগোবাজ্জিব,

ভাব জেনে গান ক'বে ব'লে

বদন পানে চেয়ে আছে

বদন পানে চেয়ে আছে

“মুকুন্দ স্বরূপ রামবায় ।

মন বুঝি উচ্চৈঃস্ববে গায় ॥”

ভাবনিধির মরম জেনে,

ভাব অশুকুল গান ক'বে

ভাব অশুকুল গান ক'বে

চেয়ে রসেব বদন পানে.

ভাবনিধির মরম জেনে

ভাব অশুকুল ক'রে গানে

সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়
 ভাব অনুকূল রস গায় সবে নিযুক্ত নিজ সেবায়
 “মুকুন্দ স্বরূপ রামরায় ।
 মন বুঝি উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥

(গায়) গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ ।
 যার গানে অধিক সন্তোষ ॥

বসু রামানন্দ নরহরি ।
 গদাধর পণ্ডিত আদি করি ॥”

তারা আশ্বাদিছে নব মাধুরী
 দেখে, কিশোর হ'য়েছে কিশোরী—
 জগন্নাথের বদন হেরি, কিশোর হ'য়েছে কিশোরী
 তারা আশ্বাদিছে নব মাধুরী

“বসু রামানন্দ নরহরি ।”

আশ্বাদিছে নরহরি
 কিশোরীর প্রেম-মাধুরী আশ্বাদিছে নরহরি
 (বলে.) কি মাধুরী মরি মরি !
 বলিহারি যাই কিশোরী, কি মাধুরী মরি মরি
 নাগরে কৈলি নাগরী— বলিহারি যাই কিশোরী
 বলিহারি যাই কিশোরী

“বসু রামানন্দ নরহরি ।
 গদাধর পণ্ডিত আদি করি ॥”

কাছে থেকে বদন চেয়ে

আস্বাদিছে গদাধর

আস্বাদিছে গদাধর

বঁধু আমার ববণ ধরি

কি শোভা হ'য়েছে মরি মরি

কি শোভা হ'য়েছে মরি মরি

গদাধর পণ্ডিত আদি করি ॥

দ্বিজ হরিদাস বিষ্ণুদাস ।

যা সবার গানেতে উল্লাস ॥

এই মত কীর্তন নর্তনে ।

কতদূর করিলা গমনে ॥

গৌর নাচে হেলে ছলে

পরাণ বঁধু পাইনু বলে ।

গৌর নাচে হেলে ছলে ॥

“আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল

আগে নাচাইয়ে নিজ জনে

“আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ।

সাত সম্প্রদায় সব একত্র করিল ॥

উদগুনৃত্যে প্রভু ছাড়িয়া হুঙ্কার ।

চক্র ভ্রমি ভ্রমে যেন আলাত আকার ॥”

হুকার গর্জন করি

আবেশে নাচে গোরা রায়

আবেশে নাচে গোরা রায়

আলাত-চক্রের প্রায় ।

আবেশে নাচে গোরা রায় ॥

“নৃত্যে যঁহা যঁহা পড়ে প্রভুর পদতল ।
সসাগরা শৈলমহী করে টলমল ॥”

শ্রীগৌরাজ পদভরে

ধরনী টলমল করে

ধরনী টলমল করে

(ধরনী) টলমল হয় প্রেমার ভরে ।

প্রাণ গৌরাজ হৃদে ধরে ॥

(ধরনী) টলমল হয় প্রেমার ভরে

“ধরনী প্রেমার ভরে টলমল হয় ।

যঁহা পদ পড়ে ধরু পঙ্কজ হিয়ায় ॥”

ধরনী হৃদয় কমল বিছায়ে দেয়
গৌর-পদকমল ধরবে বলে, ধরনী হৃদয় কমল বিছায়ে দেয়

(“ধরনী) হৃদয় কমল বিছায়ে দেয় ।

গৌর-পদ-কমল ধরবে বলে ॥”

“নৃত্যে যঁহা যঁহা পড়ে প্রভুর পদতল ।

সসাগরা শৈ- মহী করে টলমল ॥

স্তম্ভ শ্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবন্য !
নানাভাব বিকার তাহে গর্ভ হর্ষ দৈন্য ॥”

জগন্নাথের বদন চেয়ে

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ
স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

নানা ভাবাবলী
জগন্নাথের বদন চেয়ে

গৌর অঙ্গে হইল বিকাশ
গৌর অঙ্গে হইল বিকাশ
গৌর অঙ্গে হইল বিকাশ

যেমন নাচে তেমনি গায়

অপরূপ রথ আগে—

“নাচে গোরা রায় সবে মেলি গায়
কত শত মহাভাগে ॥

ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস
আবেশে কিছু না জানে ।

জগন্নাথ মুখ হেরি মহাসুখ
নাচে গর গর মনে ॥”

“রথে জগন্নাথ হেরি বলে, পাইলু বংশীবদনে
বলে, পাইলু বংশীবদনে
নাচে গর গর মনে ॥”

‘খোল করতাল

কীর্তন রসাল

ঘন ঘন হরিবোল ।

জয় জয় ধ্বনি,

সুর নর মুনি.

গগনে উঠিল রোল ॥

নীলাচলবাসী,

আর নানা দেশী

লোকের উথলে হিয়া ।”

আজ সবার আনন্দিত মন
দেখি গোরার প্রেম সংকীর্তন আজ সবার আনন্দিত মন

(তারা) প্রেম পাথারে সবাই সঁাতারে
ভাবনিধি গৌরাজ হেরে প্রেম পাথারে সবাই সঁাতারে

“নীলাচলবাসী,

আর নানাদেশী,

সবার উথলে হিয়া ।

প্রেমের পাথারে

সবাই সঁাতারে

দুখী যত্ অভাগিয়া ॥”

সবাই গেল প্রেমে মাতিয়া

দুখী যত্ অভাগিয়া

গৌর লীলা না দেখিয়া

দুখী যত্ অভাগিয়া

দুখী যত্ অভাগিয়া

রথযাত্রায় এই নীলাচলে.

আনন্দের পাথার ব'য়ে যায় রে

আনন্দের পাথার বয়ে যায় রে

“চৌদিকে মহাস্তম্ব মেলি করয়ে কীর্তন কেলি
সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে”

ভাবনিধির ভাব জেনে

“সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।”

ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে
ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে
ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে
ভাবনিধির ভাবের অনুকূলে

প্রেমস্বরে গান করে সকলে,
গান করে গৌরগণ সকলে,

“সাত সম্প্রদায় গায় গীত রে।”

“বাজে চতুর্দশ খোল, গগনে উঠিল বোল
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত রে ॥”

কীর্তন নটন দেখে

জগন্নাথ আনন্দে বিভোর
জগন্নাথ আনন্দে বিভোর

দেখি শচীসুত ভাবভূষিত

আজ জগন্নাথ আনন্দিত
আজ জগন্নাথ আনন্দিত

(দেখি) গৌর কিশোরী ভাবে অলঙ্কৃত,

আজ জগন্নাথ আনন্দিত

দেখি জগন্নাথ আনন্দিত রে ॥”

“উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র”

আজ প্রভু নিতাই চাঁদের

আনন্দ আর ধরে না
আনন্দ আর ধরে না

আজ প্রভু সীতানাথের
ভাবনিধির ভাববিকার হেরে

আনন্দ আর ধরে না
আনন্দ আর ধরে না

“উনমত নিত্যানন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
পণ্ডিত শ্রীবাস ভক্তভূপ রে ।

এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌর হরি ’
হরি হরি বোল ব’লে ভুবন মঙ্গল গৌর নাচে
ভুবন মঙ্গল গৌর নাচে

“এ সবারে সঙ্গে করি মাঝে নাচে গৌরহরি,
ভকত মণ্ডলী চারিপাশ রে ॥

হরি হরি বোল বলে পদ-ভরে মহী টলে”

ভাগ্যবতী ধরনীর
ভাবনিধি হৃদে ধ’রে

আনন্দ আর ধ’রে না রে
আনন্দ আর ধ’রে না রে
আনন্দ আর ধরে না রে

নয়নে বহয়ে অশ্রুধার রে

“প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ’
তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার রে ॥

ভাবাবেশে গোরারায়, নাচিতে নাচিতে যায়,
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে ॥”

আর রথ চলে না রে

হ'ল জগন্নাথ অচল, রথও অচল আর রথ চলে না রে

হেরি ভাবে ভোরা শচীসুত

হ'ল জগন্নাথ বিমোহিত

হ'ল জগন্নাথ বিমোহিত

অনুভব কর ভাই রে-

কেন জগন্নাথ বিমোহিত ?

কেন জগন্নাথ বিমোহিত ?

মিলেছে অনুকূল ঠাই
শ্রীগুরু চরণ হৃদে ধ'রে

অনুভব কর ভাই রে

অনুভব কর ভাই বে

অনুভব কর ভাই রে

“রাধা-ভাবে দেখে গৌরা ‘জগন্নাথে বংশীধারী’ ।
গৌরাজে জগন্নাথ হেরে ‘যুগল মাধুরী’ ॥”

আপনার মাধুরী

অনুভব কর ভাই রে

অনুভব নাই নন্দ-নন্দনের

অনুভব নাই নন্দ-নন্দনের

(দর্পণে) দেখি নিজ প্রতিবিম্ব

আপন মাধুরীতে আপনি মুগ্ধ

তাহে রাধা সঙ্গে অধিক মাধুরী

সে তো কখনও দেখে নাই তাহে রাধা সঙ্গে অধিক মাধুরী

আজ সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ
আপনার গৌরাজ স্বরূপে আজ সেই মাধুরী দেখে মুগ্ধ

“(তাই) ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে ।”

কেমন ক’রে চলবে বল

আপনিই হ’ল অচল

গৌর স্বরূপে যুগল মাধুরী হেরে.
মাধুর্যামৃত পারাবারে,—

জগন্নাথ ডুবে গেল

জগন্নাথ ডুবে গেল

জগন্নাথ ডুবে গেল

কেমন ক’রে চলবে বল ?

(হল) রথ অচল, রথী অচল,

কেমন ক’রে চলবে বল ?

ভাবনিধি গৌরাজ হেরে.

রথ রথী হ’ল অচল

রথ রথী হ’ল অচল

গৌরাজ স্বরূপে

আজ জগন্নাথে করিল লুক্ক

আজ জগন্নাথে করিল লুক্ক

আজ জগন্নাথ আত্মহারা

দেখি ভাবোল্লাসে ভোরা গোরা

আজ জগন্নাথ আত্মহারা

আজ জগন্নাথ বিমোহিত

দেখি রাই-কান্ন একীভূত

জগন্নাথ বিমোহিত ॥

আজ তাই মুক্ত জগন্নাথ
আজ তাই মুক্ত জগন্নাথ
দেখি নিজ স্বরূপ রাখানাথ

“আজ ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ রে
“আনন্দ-বিস্ময়-মন দেখি প্রেম-সংকীৰ্ত্তন”
নীলাচলনাথ জগন্নাথ রে

আনন্দ-বিস্ময়-মন দেখি প্রেম-সংকীৰ্ত্তন
নিজ পরিকরগণ সাথে রে ।

দূরে গেল দুঃখ শোক প্রেমায়ে ভাসিল লোক

সবাই আনন্দে বিহ্বল
দেখি ‘রথে’ অচল ‘পথে’ সচল সবাই আনন্দে বিহ্বল

আনন্দের পাথার ব’য়ে যায় বে
শ্রীরথযাত্রায় এই নীলাচলে আনন্দের পাথার ব’য়ে যায় রে

আজ নীলাচলবাসী আত্মহারা
দেখি ‘সচল’ ‘অচল’ চিতচোরা

—আজ নীলাচলবাসী আত্মহারা

“দূরে গেল দুঃখ শোক, প্রেমায়ে ভাসিল লোক,
স্থাবর জঙ্গম পশু পাখী রে ॥”

সবাই হইল সুখী
‘সচল’ ‘অচল’ মূৰ্ত্তি দেখি সবাই হইল সুখী

এই রথযাত্রায় নীলাচলে
এই জগন্নাথের রথের আগে

মধুর গৌরাজ্জ লীলা
মধুর গৌরাজ্জ লীলা
মধুর গৌরাজ্জ লীলা

নাচে শচীনন্দন
এই জগন্নাথের রথের আগে

নাচে শচীনন্দন
নাচে শচীনন্দন
নাচে শচীনন্দন

গৌর নাচে রাখাভাবে ।
এই জগন্নাথের রথের আগে ॥

নাচে শচীনন্দন

আ'মরি নাচে শচীনন্দন
দেখে রূপ সনাতন

মহারাস বিলাসের পরিণতি
মূরতিমস্ত প্রেমে বৈচিত্র্য
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
মিলনে দুই রসের খেলা
মিলনে, মিলনা অমিলনা রসের খেলা

দেখে রূপ সনাতন
দেখে রূপ সনাতন
দেখে রূপ সনাতন
দেখে রূপ সনাতন
দেখে রূপ সনাতন
দেখে রূপ সনাতন

(আমরি) দেখে রূপ সনাতন
শ্রীরাধা-প্রেমের কত বল, তাই ' দেখে রূপ সনাতন
শ্রীরাধা প্রেমের কত বল
নাগরে নাগরী কৈল শ্রীরাধা প্রেমের কত বল

(মুক্) রূপ সনাতন চিত
দেখে মূরতিমস্ত প্রেমবৈচিত্র্য (মুক্) রূপ সনাতন চিত

দেখে রূপ সনাতন

“গান করে স্বরূপ দামোদর ।”

ভাবনিধির ভাব জেনে

‘অনুকূল রস’ ক’রে গানে

ভাবনিধির ভাব জেনে

“গান করে স্বরূপ দামোদর ।”

গায় রায় রামানন্দ,

মুকুন্দ মাধবানন্দ,

বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥

প্রভুর দক্ষিণ পাশে

নাচে নরহরি দাসে

বামে নাচে প্রিয় গদাধর ।

নাচিতে নাচিতে প্রভু,

আওলাইয়া পড়ে কভু”

পরান নাথ পাইলু ব’লে

কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ নাচে, পরান নাথ পাইলু ব’লে

“বলে এই সে পরান নাথ পাইলু ।

যা লাগি মদন-দহনে দহি মৈলু ॥”

এই সে আমার পরান বঁধু

আমি যার লাগি বুঝে মরি,

এই সে আমার পরান বঁধু

“নাচিতে নাচিতে প্রভু,

আওলাইয়া পড়ে কভু,

আবেশে ধরয়ে দৌহার করে ।

ত্রীনিত্যানন্দ মুখ হেরি,

বলে পঁছ হরি হরি

না জানি, কি অভাবে করে ‘হায়’

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥

সঁওরি শ্রীবৃন্দাবন,

প্রাণ করে উচাটন,”

আজ সেই ভাবে ভোরা গোরা যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে
যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

রথে জগন্নাথ দেখি, যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে
প্রভাস মিলনে, যেন পেয়েছে নব বৃন্দাবনে

পেয়েও আশ মিটিছে না

“(বলে) সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম হে ।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন হে ॥”

বলে বঁধু তোমায় পেলাম বটে
পেয়েও আশা মিটিল না
বঁধু তোমায় পেলাম বটে
পেয়েও আশা মিটিল না

ব্রজের জীবন ব্রজাকাশে
যদি কৃপা করে করাও উদয়
যদি কৃপা করে করাও উদয়

তবে সাধ পূর্ণ হয়
কৃপা করে করাও উদয়

“সঁওরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,
আবেশে ধরয়ে রাখের করে ॥

বলে, 'ওগো প্রাণ সহচরি
 তোর করে ধরে মিনতি করি
 ব্রজে ল'য়ে চল বংশীধারী
 তোর করে ধরে মিনতি করি'
 ল'য়ে চল বংশীধারী

হোক আনন্দ ব্রজপুরী

ল'য়ে চল বংশীধারী

প্রাণ গৌরাজ আমার

কিশোরী ভাবেতে ভোরা
 কিশোরী ভাবেতে ভোরা

নিজগণ সঙ্গে ল'য়ে

ভাবোল্লাসে মত্ত হ'য়ে
 ভাবোল্লাসে মত্ত হয়ে
 নাচিতে নাচিতে যায়
 নাচিতে নাচিতে যায় ।

ভাবোল্লাসে গোরা রায়

উপনীত গুণ্ডিচার দ্বারে

জগন্নাথের শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ার দরজা পর্যন্ত নাতি
 দীর্ঘ পথ, এই ভাবে অপরূপ গমন নৃত্য ও কীৰ্ত্তন রঙ্গে রথাক্রম জগন্নাথ
 ও পথে মল্লবেশে মধুর নৃত্য কীৰ্ত্তনে উন্মাদ সগোষ্ঠী গৌরহরি উপনীত
 হইলেন ।

'অল্প ভাগ্যে শ্রীচৈতন্য গোষ্ঠী নাহি পাই ।
 কেবল ভক্তির বস চৈতন্য গোসাঞী ।'

—চৈতন্য ভাগবত

গুণ্ডিচা বাড়ীর দরজায় :-

(গৌরহরি ও জগন্নাথ)

	প্রেমস্বরে বলে গৌরা
গুণ্ডিচার দ্বারে জগন্নাথ পেয়ে	প্রেমস্বরে বলে গৌরা
জগন্নাথের বদন চেয়ে	প্রেমস্বরে বলে গৌরা
ব্রজে কৃষ্ণ পেলাম মেনে	প্রেমস্বরে বলে গৌরা

	কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে
জগন্নাথের বদন চেয়ে	কিশোরী আবেশে গৌরাঙ্গ বলে

বহুদিন পর বঁধুয়া এলে	দেখা না হইত পরাণ গেলে
	দেখা না হইত পরাণ গেলে
	বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম্
ঐ অলকা আবৃত বদন	বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম্

ঐ মুরলী রঞ্জিত বদন	বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম্
--------------------	----------------------------

ঐ হাসিয়া বাঁশিয়া বদন	বেঁচে আছি তাই দেখতে পেলাম্
------------------------	----------------------------

	প্রাণ আছে তাই দেখতে পেলাম্
তোমার অদর্শন বিরহেতে	প্রাণ আছে তাই দেখতে পেলাম্

“দেখা না হইত পরাণ গেলে ।
 দুখিনীর দিন দুখেতে গেল ।”

তোমার কোন দোষ নাই বঁধু
সকলই আমার কবমের দোষ, তোমার কোন দোষ নাই বঁধু

“ছুথিনীর দিন ছুখেতে গেল ।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ?”

পরান বঁধু তুমি ভাল তো ছিলে ?
আমাব যা ছিল তাহ'ল কপালে

পরান বঁধু তুমি ভাল তো ছিলে ?

“সে সব দুঃখ কিছু না গনি ।
তোমারই কুশলে কুশল মানি ॥”

(বঁধু) তোমার সুখেই আমাব সুখ
আপন দুখে মানি না; দুখ (বঁধু) তোমার সুখেই আমাব সুখ

“তোমারই কুশলে কুশল মানি ।
এত যে সহিল অবল। ব'লি ॥”

আমার ভাবনিধি গৌরাজ্জ বলে
(আমার) গৌরাজ্জ-কিশোরী বলে
এই জগন্নাথের বদন চেয়ে (আমার) গৌরাজ্জ-কিশোরী বলে

এই গুণ্ডিচার দ্বাবে, জগন্নাথের বদন চেয়ে
কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ বলে
ভাসি ছ'টি নয়ন জলে কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ বলে

“এত যে সহিল অবলা ব'লে ।
ফাটিয়া যাইত পাষণ হ'লে ॥”

ফেটে যেত হ'লে শৈল—

অবলা ব'লে এতই সহিল
অবলা ব'লে এতই সহিল

“ফাটিয়া যাইত পাষণ হ'লে”

(এখন) “গগনে উদয় করুক চন্দ”

আর তো আমি ভয় করি না
আমার গকুলচাঁদ পেয়েছি ঘরে, আর তো আমি ভয় করি না

গগন চাঁদ তুমি উদয় হও রে
যত কলা থাকে বিকাশ ক'রে গগন চাঁদ তুমি উদয় হও রে

“গগনে উদয় করুক চন্দ ।

মলয় পবন বহুক মন্দ ॥”

মলয় পবন মন্দ বও রে
আমার মদনমোহন এল ঘরে, মলয় পবন মন্দ বও রে

“মলয় পবন বহুক মন্দ ।

কোকিলা আসিয়া করুক গান ।

ভ্রমরা ধরুক পঞ্চম তান ॥”

কোকিলের কুল স্ববে

আর তো আমি ভয় করি না
আব তো আমি ভয় করি না

পরান বঁধু ছিল না ঘবে

বড ছুংখ দিয়েছে মোবে
বড ছুংখ দিয়েছে মোরে
আব তো আমি ভয় করি না
(আর) ভয় করি না কুল স্ববে

মদনমোহন এল ঘরে (আর) ভয় করি না কুল স্ববে

“বাসুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ।
ছুংখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥”

ব্রজের জীবন ব্রজে এল

সকল ছুংখ দূরে গেল
সকল ছুংখ দূরে গেল

রামরায়ের করে ধ'রে

কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ বলে
কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ বলে

“কি কহব রে সখি ! আনন্দ ওর ।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥”

গৌরাজ্জ কিশোরী বলে,

কি কব আনন্দ ওর
কি কব আনন্দ ওব

“চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ।
পাপ সুধাকর যত ছুংখ দেল ॥”

—গগনে উদয় হ'য়ে

“পাপ সূধাকর যত দুঃখ দেল ।
পিয়া মুখ হেরইতে তত সূখ ভেল ।”

আমার সকল দুঃখ দূরে গেল
পরাণ বঁধুর চাঁদ বদন হেরে, আমার সকল দুঃখ দূরে গেল

পিয়া-মুখ হেরইতে তত সূখ ভেল ॥

আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাই ।
তবু হাম্ পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥

শীতের ওড়নী পিয়া গীরিষের বা ।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥”

গৌরাঙ্গ কিশোরী বলে,
স্বরূপ রামরায়ের গলা ধরি বলে,
মরম কথা তোমারে কই,

শুন শুন মরম সই
শুন শুন মরম সই
শুন শুন মরম সই
শুন শুন মরম সই

“শীতের ওড়নী পিয়া গীরিষের বা ।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ॥”

আমার বলিতে ব্রজমাঝে,
আমার শ্যাম বঁধু বিনে,
আর আমার কেবা আছে
আর আমায় কেবা আছে
আর আমার কেবা আছে

“বরিষার ছত্র পিয়া দরিষার না ।
ভনয়ে বিছাপতি শুন বর নারি ।
সুজনক ছুঃখ দিন ছুই চারি ॥”

গৌরাজ্জ কিশোরী বলে
বলে, ছুখেব নিশি পোহাইল
পোহাইল ছুখের নিশি
হিয়ায ধ'রে কালশশী পোহাইল ছুখেব নিশি

কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ বলে
স্বরূপ বামরাযেব কবে ধরি,

কিশোরী আবেশে গৌরাজ্জ বলে

‘ও ললিতে । ও বিশাথে ।’
তোদের কনজোড়ে মিনতি কবি, ও ললিতে । ও বিশাথে ।

যেন কেও কিছু বলিস্ না গো
‘বঁধু বিদেশে গিয়া ‘ছিল’ ব’লে যেন কেও কিছু বলিস্ না গো

এ দেখ, আগেই মুখ হ’য়েছে মলিন,
যেন কেও কিছু বলিস্ না গো
আগেই মুখ মলিন হয়েছে

কেও কিছু বলবি বলে আগেই মুখ মলিন হয়েছে
যেন বেউ কিছু বলিস্ না গো

বঁধুর কোন দোষ নাই গো
সকলই আমার কপালের দোষ, বঁধুর কোন দোষ নাই গো

ও ললিতে ! ও বিশাখে !
সবে কর মঙ্গল আচরণ
'ব্রজ-মঙ্গল' ব্রজে এল
সবে কর মঙ্গল আচরণ

নিজ নিজ যুথ সঙ্গে করি,
নিকুঞ্জের পথে পথে,
দাঁড়াও সবে সারি সারি
দাঁড়াও সবে সারি সারি
দাঁড়াও সবে সারি সারি

আইলা নিকুঞ্জ বিহারী দাঁড়াও সবে সারি সারি

মনোমন্দিরে শ্রীগুরু আনুগত্যে লীলা চিত্তনে শ্রীরামদাস-

এই গুণ্ডিচার দ্বারে, কিশোরী ভাবাবেশে ভোরা গোরা
কিশোরী ভাবাবেশে ভোরা গোরা

রথারূঢ় জগন্নাথ হেরে, শ্রীরাধাভাবে ভোরা গোরা
শ্রীরাধাভাবে ভোরা গোরা

এই সেই রথযাত্রা, এই তো সেই জগন্নাথ
এই তো সেই জগন্নাথ

এই সেই গুণ্ডিচার দ্বার, এই সেই জগন্নাথ
এই সেই জগন্নাথ

কোথায় আমার প্রাণ গেরা ?
কিশোরী ভাবেতে ভোরা কোথায় আমার প্রাণ গেরা ?

কিশোরী ভাবেতে ভোরা, কোথায় আমার প্রাণ গেরা ?

কোথায় আমার প্রাণগেরা আজ একবার দেখা দাও
কোথায় আমার প্রাণগেরা আজ একবার দেখা দাও

এই গুণ্ডিচার দ্বারে একবার দেখা দাও ।
বড় আশা ক'বে এসেছি মোরা আজ একবার দেখা দাও
হা গেরা । প্রাণ গেরা । আজ একবার দেখা দাও

কোথায় স্বরূপ রামরায় । একবার দেখাও হে
বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা একবার দেখাও হে
একবার দেখাও হে

শ্রীগৌড় মণ্ডল হ'তে, বড় আশা ক'বে এসেছি মোরা
কোথায় অ'ছ প্রভু রূপ সনাতন । একবার দেখাও হে
একবার দেখাও হে

কোথায় দাঁড়াইয়ে ভোগ করিছ ?
মধুর গৌরান্ধ বিহার কোথায় দাঁড়াইয়ে ভোগ করিছ ?
প্রেম-বৈচিত্র্য লীলা কোথায় দাঁড়াইয়ে ভোগ করিছ ?

(আমাদের একবার দেখাও হে
কোথায় আছ আমার প্রভু নিতাই !

(আমাদের) একবার দেখাও হে
(তোমাদের) প্রাণ গৌর ল'য়ে কোথায় আছ
(আমাদের) একবার দেখাও হে

কোথায় আছ সীতানাথ !
কোথায় আছ ঠাকুর নরহরি !

একবার দেখাও হে
একবার দেখাও হে
একবার দেখাও হে

ত্রিকাল সত্য লীলায়
প্রাণ গৌর দেখতে নীলাচলে
প্রভু নিতাই অদ্বৈত সঙ্গ

সবাই তো এসেছ
সবাই তো এসেছ
সবাই তো এসেছ
সবাই তো এসেছ

গৌর ল'য়ে কোথায় বিহরিছ ?
আমাদের একবার দেখা দাও
বড় আশা ক'রে এসেছি মোরা, আমাদের একবার দেখা দাও

কোথায় আছ আমার পাগ্‌লা প্রভু ?
গৌর ল'য়ে কোথা বিহরিছ ?
কোথায় আছ আমার পাগ্‌লা প্রভু ?

কোথায় আছ প্রাণের রাধারমণ ?
নিতাই-গৌর প্রেমের পাগল,
কোথায় আছ প্রাণের রাধারমণ ?

কোথা বা বিহরিছ ?
 তোমার পরাণ নিতাই গৌর ল'য়ে কোথা বা বিহরিছ ?
 আমরা কত না খুঁজলাম
 এই নীলাচলে এসে অবধি আমরা কত না খুঁজলাম

আমরা কত না খুঁজেছি
 'কাশী-মিশ্রালয়ে' গিয়ে আমবা কত না খুঁজেছি
 'ভক্ত সম্মিলন দিনে' আমবা কত না খুঁজেছি

আমবা কত না ডেকেছি
 একবার দেখা দাও ব'লে, আমবা কত না ডেকেছি

দেখা পাই নাই কেঁদে ফিবেছি

আবার আশায় বুক বেঁধেছি
 নিশ্চয়ই দেখতে পাব ব'লে, আবার আশায় বুক বেঁধেছি

আশায় বুক বেঁধে গেছি
 (শ্রীরাঘবের) ঝালি সমর্পনের দিন আশায় বুক বেঁধে গেছি

আঃ নিশ্চয়ই দেখতে পাব
 দেখতে পাব প্রাণ শচীছলালে
 বাঘবের ঝালি সমর্পনকালে দেখতে পাব প্রাণ শচীছলালে

কৈ দেখতে তো পেলাম ন
 কেঁদে কেঁদে কত ডাকলাম কৈ দেখতে তো পেলাম ন'

একবারদেখা দাও ব'লে

কেঁদে কেঁদে কত ডাক্লাম

দেখিতে তো পেলাম না

গণসনে প্রাণ গৌরাঙ্গের,

কেঁদে কেঁদে ফিরে এলাম,

কারও দেখা পেলাম না

কারও দেখা পেলাম না

কারও দেখা পেলাম না

'গুণ্ডিচা মার্জন কালে'—

আবার প্রাণে আশা জাগ্লে

কাল নিশ্চয় দেখতে পাব

কাল নিশ্চয় দেখতে পাব

এই আশায় বুক বেঁধে

এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

গুণ্ডিচা মার্জন সস্তার সঙ্গে ক'রে,

—এলাম আমরা ভাই ভাই বলে

সহস্র সহস্র নরনারা!

'করে সম্মার্জনী' 'কাঁকে কুম্ভ'

দেখলাম সবেই উনমত

দেখলাম সবেই উনমত

দেখলাম সবেই উনমত

সকলেই আনন্দে মাতা

আমি মনে মনে ভাবিলাম

এরা গৌর দেখেছে

আমি কেবল নিরানন্দ

কারও দেখা পেলাম না

যারে দেখতে নীলাচলে এলাম, তার দেখা তো পেলাম না।

শুণ্টিচা মার্জন শেষ হ'ল
 প্রাণ গৌর দেখতে পেলাম না
 কেঁদে কেঁদে ফিরে গেলাম
 প্রাণ গৌর দেখতে পেলাম না

আবার আশা বুকে জাগল
 আবার আশা বুকে জাগল
 আজ নিশি পরভাতে,

আজ নিশ্চয় দেখতে পাব
 আজ নিশ্চয় দেখতে পাব
 এই জগন্নাথের রথের আগে
 আজ নিশ্চয় দেখতে পাব
 চিতচোরা প্রাণগোরা
 আজ নিশ্চয় দেখতে পাব
 কিশোরী ভাবিত মতি
 চিতচোরা প্রাণগোরা
 আজ নিশ্চয় দেখতে পাব

“(হায়রে) নালাচলে যব মঝু নাথ
 দেখিব আপনে জগন্নাথ
 রামরায় স্বরূপ লইয়া
 নিজভাব কহে উখাড়িয়া

হায়রে মোর কি হইব হেন দিনে
 সে লীলা কি দেখিব নয়নে ॥”

(হায়) আমি কি দেখতে পাব
 (হায়রে) “মোর কি এমন দশা হব
 সে কথা শ্রবণে শুনিব ॥”

হায় আমি কি শুন্তে পাব
 হায় আমি কি শুন্তে পাব
 সে হৃৎকর্ণরসায়ণ কথা

এই আশায় বুক বেঁধে
এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে
পাগলা প্রভু ! তোমায লদে ধরে,
এলাম আমরা ভাই ভাই মিলে

আজ একবার দেখা দাও
যদি নিজ গুণে এনেছ টেনে
আজ একবার দেখা দাও
নিতাই গৌর প্রেমের পাগল
আজ একবার দেখা দাও

দলদিন তো দেখি নাই
একবার দেখা দাও
এই জগন্নাথের রথের আগে
একবার দেখা দাও
প্রাণ নিতাই গৌর ল'য়ে
একবার দেখা দাও
কীভন নটন রঙ্গে
একবার দেখা দাও

পাগলা প্রভু দেখা দাও
নিতাই গৌরাজ ল'য়ে পাগলা প্রভু । দেখা দাও

— প্রাণে প্রাণে স্মরণ করাও
ভাবোন্মাসে মিলন বঙ্গ,
প্রাণে প্রাণে স্মরণ করাও

প্রাণে প্রাণে স্মরণ করাও
জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে, ভাবোন্মাসে মিলন-বঙ্গ
প্রাণে প্রাণে স্মরণ করাও

জগন্নাথ নন্দনন্দন সনে গৌরকিশোরীর মিলন বঙ্গ

—প্রাণে প্রাণে ভোগ করাও
 প্রাণে প্রাণে গাই মোরা
 ভাই ভাই ভাই মিলে, প্রাণে প্রাণে গাই মোরা

“গৌরঙ্গ রাধা জগন্নাথ শ্রীনন্দনন্দন ।
 গুণ্ডিচা নিকুঞ্জবনে, দৌহাকার হ'ল মিলন ॥”

গৌরকিশোরী মিলিল রঙ্গ
 জগন্নাথ নন্দনন্দন সঙ্গে ।
 গৌরকিশোরী মিলিল রঙ্গ ॥

“গুণ্ডিচা নিকুঞ্জবনে, দৌহাকার হ'ল মিলন ॥”

গৌরহরি বোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ॥

নবম অঙ্ক

নিতাই প্রসঙ্গে :

(কোন এক বারের ঘটনা)

জগৎজীবন গৌরশুন্দর এবং তাঁহার ভাবমণ্ডলের অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে গোড়দেশেই প্রচার কাষে (অবিচারে আচণ্ডালে অকাতরে শ্রীহরি উন্মুখ চিত্তবৃত্তি করিবার জন্য প্রেমদান লীলায়) পঠানোর সময় রঙ্গিয়া রঙ্গিয়া গৌরহরি আদেশ করিয়াছিলেন—

‘প্রতি বসে তুমি নীলাচলে আসবে না । কারণ, নদীয়া নীলাচল গমনাগমনে বহু সময় লাগবে, ফলে, প্রচার কার্যে ক্ষতি হবে ।’

কিন্তু স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাবে, নিতাইটাদ গৌরহরিকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না । প্রকাশ্য ভাষায় এই ‘মানা’ কিন্তু ‘বুকে উৎকণ্ঠা বাড়ান’ । নিগূঢ় গৌর-লীলার অনুভবী মহাজন তাই লিখিয়াছেন—

“নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায় ।”

আবার মহাজনের এই বাক্যটিকে ‘সম্পূর্ণ’ ও ‘প্রস্ফুটিত’ করিয়াছেন শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়—

গৌর যার হৃদে আছে	সে এক পা চলিতে নারে
গৌর ইচ্ছা না হইলে	সে এক পা চলিতে নারে
প্রাণ ধ’রে সদাই টানে	তাইতে প্রভু মানা করে
	তাইতে প্রভু মানা করে

“নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য ইচ্ছায় ।”

নিতাইচাঁদের গমন ভঙ্গিটিও ‘ত্রিকাল সত্য লীলার অনুভবি দ্রষ্টা’ শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের কীর্তনের অঙ্করে ধরা আছে। যথা—

“চলিল গৌর প্রেমের পাগল
মুখে ‘গৌর’ ‘গৌর’ নয়নে জল, চলিল গৌর প্রেমের পাগল
প্রাণ গৌর দেখব বলে চলিল গৌর প্রেমের পাগল”

— — —

এইরূপে আসিতে আসিতে পূর্বোধ্যমের অদূরে ‘কমলপুর’ গ্রাম, যেখানে হইতে জগন্নাথ মন্দিরের ধরাজা দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে আসিয়া অবর্ণনীয় প্রেমোৎকণ্ঠায় ‘হা প্রাণ শচীনন্দন’ বলিয়া নিতাইচাঁদ মুচ্ছিত হইলেন।

‘কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।

পড়িলেন নিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইয়া ॥’

কিছুক্ষণ পরে, নিরবধি নয়নে প্রেমের ধারা এবং প্রেমস্ববে, ‘দে ত মন্দির দেখা যায়,’ ‘গৌর তুমি কোথায় আছ’ ? এই কথা বলিতে বলিতে ‘নিতাই’ আবণ্ড কিছুদূর অগ্রসর হইয়া এক পুষ্পরঞ্জন উদ্যানে গোপনে রহিলেন।

এখানে প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করি যে, অতিগূঢ় নিতাইচাঁদের সমগ্র লীলায় দেখা যায়—

১। ‘নিজ সেব্য নিতাই ধনে—গৌর রাখিতে চান গোপনে’

২। নিতাই গৌরের যখন যখন মিলন হয় তখন অন্য কেহ সেখানে থাকে না।

পূর্বাপর সকল মহাজনরাই বলিয়াছেন—নিতাই চৈতন্য অভিন্ন ।
লীলা বা বিহার জন্ম তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন । এবং তাঁহাদের ছুইজন্য
মর্ষ তাঁহারা ছাড়া অন্যে জানিতে পারে না । তাই নিতাইচাঁদ
নীলাচলে আসিয়া গোপনে থাকিলে কি হয়, শ্রীতির টানে গৌরহরি
তাহা বুঝিতে পারিলেন । স্বরূপ আদি সঙ্গী ও সেবকবর্গকে গন্তীরায়
রাখিয়া তিনি একেশ্বর চলিলেন । যে পুষ্পোদ্যানে ধ্যানানন্দে
নিতাই আছেন সেই স্থানে গৌরহরি শুভ বিজয় করিলেন । তিনি
দেখিলেন চাঁদ নিতাই ধ্যানস্থ ! অশেষ বিশেষে নিজেকে ভোগ
করাই গৌর স্বরূপের স্বভাব । ‘নিজ পরিক্রমায় কি মাধুরী’ এই
অশ্রুতপূর্ব ভোগলালসা গৌরহরির চিত্তকে চঞ্চল করিল । তিনি—

“শ্লোক বন্দে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণিয়া”

এ ধ্যানানন্দে অবস্থিত নিতাইচাঁদকে পরিক্রমা করিতে
লাগিলেন ।

গৌরহরি পরম করুণাময় স্বভাবে নিত্যানন্দ মহিমা বর্ণনা
করিয়াছেন । তাহাতে জীব জগতকে সাবধান করা হইয়াছে যে—

লীলার স্বাভাবিক গতিতে ‘লীলা’ সঙ্কোচ ও প্রসারতা লাভ
করে । ভবিষ্যতে ‘লীলার’ আবরণমুখী গতিতে নিত্যানন্দ শক্তিতে
আবরণের বহির্প্রকাশ নানান্ ভাবে দেখা যাবে ।

নিতাই নিজ হৃদয়ে গৌরকে সর্বদাই ধারণ করিয়া আছেন ।
ধ্যানানন্দ অবস্থাতেও গৌর তাঁহার বক্ষে আছেন । সুতরাং
গৌরহরি (বিশেষ ভোগের লালসায়) সগন তাঁহাকে পরিক্রমা
করিতেছেন, তিনি তাহা অনুভব করিয়া প্রথমে পরম সম্মুখে “হরি”
“হরি” বলিয়া হৃদয় দিয়া উঠিলেন । পরে--

গৌরহরির ‘ইচ্ছা’ ও ‘ক্রিয়া’ শক্তি নিতাই তাঁহাকে অধিক
উল্লাস দিবার জন্ম--

‘দুই জনে প্রদক্ষিণ করেম দৌহারে ।
তুহে দণ্ডবৎ হই পড়েন দুহারে ॥’

দুইজনেই ভাবতরঙ্গে টলটল । গৌরাজ হৃদয়ে নিতাই আব
নিতাই হৃদয়ে গৌর । কে কা’র উপাস্ত ? কিছুক্ষণ পরে লীলার
সঞ্চারি শক্তি স্বভাবে দুইজনই প্রেম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন । এ
আলিঙ্গন রাই-কানুর ভাব বিগ্রহের একীভূত স্বরূপের ‘মহাভাব’
ও ‘প্রেমরসের’ মিলন । আবার কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়ের গলা
জড়াইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । পরক্ষণেই পরমানন্দ
গডাগডি যাইতেছেন । মহামন্তু দিগ্ভের গর্জনকে তুচ্ছ করিয়া
উভয়েই গর্জন করিতেছেন । পর মুহূর্তেই নিজ নিজ মতিমা
জানাইবার জন্য দুইজনেই দুইজনকে জোড়হস্তে নমস্কার করি-
ছেন । কোন শাস্ত্রে বর্ণনা নাই এইকপ অশ্রু, কম্প, হাস্য, মৃচ্ছা,
পুলক, বিবর্ণ উভয়ের শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ পাইতে লাগিল । অতঃপর
গৌবহনি জোড় হস্তে নিত্যানন্দেব স্তুতি করিলেন । এই সব স্তুতির
কিছু অংশ তাহার একান্ত জন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । বার জু
মহাশয়ের অংগর সমন্বিত কৌতূহন সামান্য নীচে কিছু বিদ্রুত হইয়াছে.
স্বথা—

নিত্যানন্দ স্তুতি চলে
তাঁর অতি গুঢ় নিত্যানন্দ

জগতে জানায় বে
জগতে জানায় বে
জগতে জানায় বে

শ্রীগুরু চরণ হৃদে ধরে’
অপরূপ রহস্য কথা

প্রাণে প্রাণে ধর ভাই
প্রাণে প্রাণে ধর ভাই
প্রাণে প্রাণে ধর ভাই

শ্রীমুখে বলেছেন গৌরহরি

“নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্তু ।”

ইচ্ছিতেতে গৌরহরি

আপন কথা বলেছেন

আপন কথা বলেছেন

আমার নামের রূপ মানি
তোমার রূপ আমার রূপ মানি, আমার নামের রূপ মানি ।

“শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত ॥

যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গ অলঙ্কার ।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিয়োগ অবতার ॥”

ভক্তিয়োগ অবতীর্ণ
তোমার পরশে নিজে করে করিতে ধন্য ভক্তিয়োগ অবতীর্ণ

“স্বর্ণ-মুক্তা-রূপা-কঁসা-রুদ্রাঙ্কাদি রূপে ।
নববিধা-ভক্তি ধরি আছে নিজসুখে ॥”

ভক্তি বলতে যার নাম তোমার শ্রীঅঙ্গে মূর্ত্তিমান
তোমার শ্রীঅঙ্গে মূর্ত্তিমান

অলঙ্কার রূপ ধ'বে তোমার অঙ্গ সেবা করে
তোমার অঙ্গ সেবা করে

ভক্তিয়োগ অবতার
তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার ভক্তিয়োগ অবতার

‘নীচ জাতি পতিত অধম যত জন ।

‘তোমা’ হৈতে সভার হইল বিমোচন ॥’

নিতাই তোমার অবতার

উদ্ধারিতে পতিত সবার নিতাই তোমার অবতার

ওহে নিতাই গুণমণি

পতিতের বন্ধু তুমি

পতিতের বন্ধু তুমি

ওহে নিতাই তুমি বিনে

পতিত হুর্গতি দেখে

এমন কার প্রাণ কাঁদে ?

এমন কার প্রাণ কাঁদে ?

এমন কার প্রাণ কাঁদে ?

আমার প্রতিজ্ঞা

তোমা হ’তে রক্ষা হল

তোমা হ’তে রক্ষা হল

“যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে ।

তাহা বাঞ্ছে সুর-সিদ্ধ-মুনি-যোগেশ্বরে ॥

‘স্বতন্ত্র’ করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কহে ।

হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়ে ॥”

কৃষ্ণ পরতত্ত্ব সীমা

ব্রজের সেই কালসোনা

তোমার হাতে বেচা কেনা

তোমার হাতে বেচা কেনা

তোমার হাতে বেচা কেনা

“তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার ?
মূর্ত্তিমন্তু তুমি কৃষ্ণরস অবতার ॥”

অতিগূঢ় নিতাই ধনে

জানাইছেন নিজ গুণে
জানাইছেন নিজ গুণে

যদি গৌর না জানায় নিজ গুণে, কেমনে বা জানবে আনে ?
কেমনে বা জানবে আনে ?

গৌরহরি নিজ নিতাই ধনে
নিত্য নন্দ স্তুতি ছলে
আজ জানাইছেন নিজ গুণে
আজ জানাইছেন নিজ গুণে
আজ জানাইছেন নিজ গুণে

কৃষ্ণরস মূর্ত্তিমন্তু.
তুমি বট ‘নিত্যানন্দ’
তুমি বট নিত্যানন্দ

কৃষ্ণরস যারে বলে
ওতে নিতাই তোমা-রূপে
বিহরিছে মূর্ত্তি ধ’রে
বিহরিছে মূর্ত্তি ধ’রে
বিহরিছে মূর্ত্তি ধ’রে

এ যে অতি গোপনকারী লীলা
আপন স্বরূপের রহস্য কথা
আবরণ দিয়ে বলছেন
আবরণ দিয়ে বলছেন
আবরণ দিয়ে বলছেন

ওহে ও নিতাই আমার,
তুমি ‘অমার’ রসের অবতার
তুমি আমার রসের অবতার

“ ‘বাহু নাহি জান’ তুমি সঙ্কীৰ্ত্তন সুখে
অহনিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিবন্তুব ।
.তামার বিগ্রহ কৃষ্ণ বিলাসের ঘর ॥”

আপনার মহিমা

আপনি ত বলবেন না
আপনি ত বলবেন না

নিতাই .তামার স্বরূপ খানি

ইঙ্গিতেতে বলছেন প্রভু
আমার ক্রীড়ান বসতি ভূমি
আমার ক্রীড়ান বসতি ভূমি

ভাগ্যবান কলিজীবে
নিতাই মহিমা বর্ণন ছ’লে

আজ জানাইছেন নিজ গুণে
আজ জানাইছেন নিজ গুণে
আজ জানাইছেন নিজ গুণে

আমার গৃঢ় বিলাসের ঘর,

প্রাণ নিত্যানন্দ কলেবর
প্রাণ নিত্যানন্দ কলেবর

‘অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে ।
সত্য সত্য প্রভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তারে ॥”

ইঙ্গিতে বলেন .: বহুবি
সেই’ত প্রীতি কবে আমাবে
নিত ই .তামারে যে প্রীতি কবে, সেই’ত প্রীতি কবে আমাবে

আমি বাঁধা তারি প্রেম-ডোরে
তোমারে যে শ্রীতি করে আমি বাঁধা তারি প্রেম-ডোরে

আমার হাতে সে পড়েছে
যে তোমারে শ্রীতি করেছে আমার হাতে সে পড়েছে
আহু প্রশংসা শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নিতাইচাঁদ
দলিতেছেন—

‘আমি একান্ত ভাবে ‘তোমার’। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে
একমাত্র তোমার সুখই আমার কামা। তুমি আমাকে প্রদক্ষিণ কর,
কিন্মা নমস্কার কর কিন্মা মার কিন্মা রাখ বলার কিছু নাই। তুমি
‘প্রভু’, আমি ‘দাস’। তোমার নিজ কোতুকে যেমন নাচাও তেমনি
নাচি।’

ইতার পর উভয়ে

“বসিলেন নিভতে পুষ্পের বনে গিয়া”

কিছুক্ষণ পরমানন্দে অতিবাহিত হইলে পর নিতাইচাঁদের নিকট
হইতে বিদায় লইয়া গৌরহরি নিজ বাসায় প্রত্যাবর্তন করিলেন
এবং চাঁদ নিতাই জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া টোটা গোপীনাথে
“মনপূর্বক পণ্ডিত গদাধরের বাসায় গমন করিলেন।

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দের প্রসঙ্গে (১)

“প্রতি বর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারি মাস ।
তাহা সবা লৈয়া প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥”

কিছু আভাস :

গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও এবং স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন, প্রতিষ্ঠাৰ মধ্যে মন ডুবিয়া থাকিলেও যে ভগবৎ স্মরণ মননে চিত্তকে ফিলাইতে পারি যায়—এ পন্থা, আদর্শ স্থাপন গৌবহবির প্রবক্তিত পথে এক অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব দান । এই ভাবে শ্রীহরি ভক্তনের পবন চরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ দ্বারা । নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ গৌবহবির সুখের জন্মই সংসাৰা । তাহারা মনে প্রাণে জানেন যে তাহারা গৌবহবির ‘দাম’ । তাহাদের সংসারের সকলই গৌবহবির আশ্রিত । তাহাদের সেবাই তাহাদের ‘ভজন’ ।

গৃহস্থ ভক্তের কথা শুনে সবারই

পদ্য পত্রে থাকে জল তব লাগে নাহি ।’

তৎকালে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলের পথ সুদূর । পদ য এত সেই পথ অতিক্রম ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না বলিয়াই মনে হইত প্রতিটি প্রদেশের বাজতন্ত্র তখন ভিন্ন ভিন্ন । হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের পথ দিয়াই গতাযাত । সুতরাং সেই গতাযাতও ছিল একটি দুকহ ব্যাপার । আজ তাহা আমবা কল্পনাও করিতে পারিব না । সেই অবস্থায় কতখানি শ্রীতির টান থাকিলে, এইকপ দুকহ কাটা শন হইতে পারে, সে কার্যও বিংশতি বর্ষব্যাপী একটানা ।

কিন্তু প্রতি বর্ষেই গৌবভক্তবৃন্দ সোল্লাসে (এই) যাতাযাত

করিতেন। আবার, তাঁহারা (নদীয়াবাসী গৌরভক্তবৃন্দ) কোন কোন বৎসরে স্ত্রী পুত্রের সহিতও আসিতেন।

সেই 'দিব্য' শ্রীতির সংবাদটি অনুভব করা ভিন্ন অনুমান করাই যায় না।

‘বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।’

—চৈঃ চঃ মধ্য ১ম

এই গৌড়দেশবাসী ভক্তবৃন্দের গতায়াতের দীর্ঘ দিন ছাড়া চারি মাস কাল নীলাচলেই গৌরহরির সঙ্গে তাঁহারা যাপন করিতেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের প্রতি দিনের কায্য—

(১) নরেন্দ্র সরোবর কিম্বা ইন্দ্রদ্যুয়ে জলকেলি; (ইতিপূর্বে প্রাণ্ডামাঙ্কন দিনের রত্নের একটি রত্নরূপে সে লীলারঙ্গ বর্ণনা হইয়াছে।)

(২) এই চারি মাস কাল একশত বিংশতি জনে ভাগ করিয়া গইতেন। ইহাতেও অনেকে ফাঁকি পড়িলেন দেখিয়া পরামশ করিয়া এক এক দিনে দুই তিন জনে গৌরহরিকে নিমন্ত্রণ করিবার অধিকার হইতেন।

“আর ভক্তগণ চাতুর্মাশ্য যত দিন।

এক এক দিন করি পড়িল বণ্টন ॥

একজন নিমন্ত্রণ কবে দুই তিন মেলি।

এই মত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কেলি ॥”

এই যে প্রভুর নিত্য নিমন্ত্রণ কেলি,—ইহা এক একটি বৃহৎ মহামহোৎসব। যিনি গৌরহরিকে নিমন্ত্রণ করেন তাঁহার (নীলাচল ও নদীয়ার) ভক্তবৃন্দও সেই সঙ্গে নিমন্ত্রিত হন। যে ভক্তের

বাড়ীতেই উৎসব হউক না কেন, গোবিন্দ, 'বঘুনাথ', রামাই আদি গৌৰগোষ্ঠীর সেবকবৃন্দ সেই সব নিমন্ত্রণকাবীদের সৰ্ব্ববিধ সেব সহায়তা করেন। কেহ জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন আনয়ন কবিয়া মহোৎসব করেন, কেহ বা গৃহে সমস্ত দ্রব্য পাক করিয়া মহোৎসব করেন।

“একেক দিন একেক ভক্ত গৃহে মহোৎসব ,
প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন কবে ভক্ত সব ॥”

‘কেহ ঘবভাত করে, কেহ প্রসাদান্ন
এই মত বৈষ্ণবগণ কবে নিমন্ত্রণ ॥’

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ

(৩) (প্রায় প্রত্যহই) গৌরহবি চারি সম্প্রদায় লইয়া মধুর নৃত্য কীর্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ কবিতেন। তিনি মধ্যস্থলে এবং তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে কীর্তন সম্প্রদায়। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অক্ষু, কম্প, পুলক, প্রস্বেদ প্রভৃতি অক্ষুত, অজ্ঞাত প্রেমের বিকান দর্শনে ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে আত্মহারা হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে হুঙ্কার গর্জন কবিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন। তাঁহার কোমল কমল নয়নদ্বয় দিয়া পিচকারীর ধাবাব মত প্রেমাশ্রু ধারা নির্গত হইত ; তাহাতে চতুর্দিকের ভক্তবৃন্দ সিঞ্চিত হইয়া যেন স্নানের বারিতে সিঁক্ত হইতেন।

অপূর্ব! অদ্ভুত! অথচ ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।

কখন কখনও শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে রহিয়া নৃত্য কীর্তন কবিতেন।

যথা—

‘বেড়া নৃত্য করি প্রভু করি কথোক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি করেন কীর্তন ॥

উচ্চৈশ্বরে চারিদিকে চারি সম্প্রদায় ।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌর রায় ॥’

—চরিতামৃত

অনেকক্ষণ এইভাবে নিজে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া তিনি এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়াইতেন । পরে চারিজন মহাত্মকে চারি সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতে আদেশ দিতেন । সাধারণতঃ অষ্টমতপ্রভু প্রথম সম্প্রদায়ে নৃত্য করিতেন । নিতাইচাঁদ দ্বিতীয় সম্প্রদায়ে, তৃতীয় সম্প্রদায়ে বক্রেশ্বর এবং চতুর্থ সম্প্রদায়ে শ্রীবাস পণ্ডিত । এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যস্থলে ভুবন-মোহন-মুক্তিতে তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতেন । কখন কখন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইত । যথা—

“চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন ।
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ॥”

অ ব'র নৃত্য করিতে করিতে যিনি গৌরহরির সম্মুখে আসেন তিনি তাঁহাকে সপ্রেম গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করেন । প্রত্যহ এইভাবে মহাসংকীর্তন বা প্রেমদান লীলা প্রকটিত হয় । যথা—

“মহানৃত্য মহাপ্রেম মহাসংকীর্তন ।
দোখ প্রেমানেন্দে ভাসে নালাচল জন ॥”

—চরিতামৃত

গোড়ায় ভক্তবৃন্দ প্রসঙ্গে (২)

(নৈমিত্তিক উৎসব)

(ক)

‘কৃষ্ণ জন্মযাত্রাতে প্রভু গোপাবেশ কৈল ।
দধি ভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল ॥’

—চরিতামৃত মধ্য ১ম

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমীর মধ্য রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি—
প্রখ্যাত ‘জন্মাষ্টমী’। পুরীধামে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ ধুমধাম
হয়। জন্মাষ্টমীর পরের দিন ‘নন্দোৎসব’। পরবর্ত্তী সময়ে
শারদীয়া দুর্গাপূজা যেমন একটি সর্ব ভারতীয় উৎসবে পরিণত
হইয়াছে—নন্দোৎসবও সেইরূপ একটি সর্ব ভারতীয় প্রখ্যাত
(বৈষ্ণবীয়) উৎসব।

‘নন্দোৎসবের দিন’ গৌরহরি সু-মনোহর গোপবেশ ধারণ
করিতেন। তাঁহার নদীয়া ও নীলাচলের ভক্তবৃন্দেরও গোপবেশ।
দাস রঘুনাথও ইহাদের মধ্যে ষোড়শ বর্ষব্যাপী ছিলেন।

“গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব”

গৌরহরি অপূর্ব গোপবেশধারী এবং তাঁহার সমস্ত ভক্তবৃন্দের
স্কন্ধে দধি ঢুঙ্কের ভার, হস্তে বগী এবং মস্তকে মনোরম পাগড়ী।
সকলেরই বদনে মধুর ‘হরি’ ‘হরি’ ধ্বনি। এই সুমধুর ভঙ্গীতে
সকলে—

“মহোৎসবের স্থানে আঁইলা বলি হরি হরি ॥”

—চরিতামৃত

মহোৎসবের স্থানটি যে কোথায়, তাহা গ্রন্থে অনুল্লিখিত।
অনুমান করা যায় যে, কানাই খুটিয়া কিন্না জগন্নাথ মাইতি ইহাদের
কাহারও বাড়ীতে হইত। উড়িষ্যা দেশবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের
সেবক কানাই খুটিয়া। ইনি নন্দ রাজার বেশে সজ্জিত। জগন্নাথ
মাইতি অপর এক ভক্ত মা যশোদার বেশে সজ্জিত। মহারাজ
প্রতাপরুদ্র, রাজগুরু কাশীমিশ্র, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তুলসী পাত্র
(জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা), অদ্বৈত আচার্য্য, নিতাইচাঁদ, শ্রীবাস
পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ অপরূপ গোপবেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবো-
চিত আবেশে আবিষ্ট। সকলেই প্রেমে উন্মত্ত। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-

লীলা কীর্তন হইতেছে। পবিত্র দধি ও হরিদ্রার জলে সকলে পুনঃ পুনঃ স্নাত হইতেছেন। রঙ্গিয়া গৌরহরি গোপবেশে বিচিত্র বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্য করিতেছেন। অদ্বৈতপ্রভু তাঁহার সম্মুখেই অদ্ভুত ভঙ্গীতে কটিদেশ ছুলাইয়া নৃত্য করিতেছেন। আর গৌরহরির শ্রীবদনের শোভা দেখিতেছেন। একবার উভয়ের চারি চক্ষুর মিলন হইল। অদ্বৈতপ্রভু হাসিয়া গৌরহরিকে বলিলেন—

“রাগ করিও না। ‘গোপ’ সাজে তোমাকে অতি মনোরম দেখাইতেছে। যদি তুমি গোয়ালার মত লগুড় ফিরাইতে পার তবে বুঝিব তুমি প্রকৃতই গোয়ালার ছেলে।” যথা—

‘অদ্বৈত কহে সত্য কহি, না করিহ কোপ ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥’

—চরিতামৃত

সচল জগন্নাথ গৌরহরির মনের অভিলাষ জানিয়াই ষেন অদ্বৈত-প্রভু এই কথা বলিয়াছেন। কারণ, তাঁহার বাক্য শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে তুলিয়া লইয়া পাকা লাঠিয়ালের মত অপূর্ব কৌশলের সহিত তাহা ঘুরাইতে লাগিলেন। দেখাদেখি নিতাই সোনাও আর একখানি লগুড় লইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। এই কৌতুক রঙ্গ কি মধুর তাহা দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়া রাখিয়াছেন। যথা—

‘তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ।
বার বার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা ॥

‘শিরের উপরে’ ‘পৃষ্ঠে’ ‘সম্মুখে’ ‘ছই পাশে’ ।
‘পাদ মধ্যে’ ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ॥’

‘আলাত চক্রে’র শ্যায়’ লগুড় ফিরায় ।
দেখি সব লোক চিত্তে চমৎকার পায় ॥’

—চরিতামৃত

সকলে পরম আশ্চর্য্য হইয়া শ্রীগৌরাজের এই মধুর লীলারঙ্গ দেখিতেছেন । সমাগত ভক্তবৃন্দ এবং নীলাচলবাসী দর্শকবৃন্দ সকলেই “অদ্বৈত আচার্য্যের জয়” এই বলিয়া উচ্চ জয়ধ্বনিতে পরিবেশটি আরও অধিক মাধুর্য্যময় করিলেন । এ জয়গান যথোচিত । কারণ, তাঁহারই করুণায় (সকলের) এই লীলা দর্শন সৌভাগ্য ঘটিল । রাই-কানুর ভাব বিগ্রহের মিলিত স্বরূপ ‘গৌরহরি’ । অনঙ্গ বলরামের ভাব এবং গৌরের অভিন্ন তনু হইতেছেন ‘শ্রীনিত্যানন্দ’ । তাই, মিতবাক্ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

“কে বুঝিবে তাঁহা দৌহার গোপ ভাব গুঢ়”

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এই ‘নন্দোৎসবে’ প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয়ে অপৰ্য্যাপ্ত উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ, ভোজ্য, বস্ত্র প্রভৃতি ‘অনর্গল’ বিতরণ করেন । ইহা ছাড়া গৌরহরির শ্রীমস্তকে একখানি স্বর্ণখচিত বিচিত্র বহুমূল্য পট্টবস্ত্র বাঁধিয়া দেন । আবার, উৎসবে যোগদানকারী ভক্তবৃন্দের মস্তকেও মনোরম ও মূল্যবান বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া নিজে কৃতকৃতার্থ হন । কানাই খুটিয়া এবং জগন্নাথ মাইতি উভয়েই সম্পন্ন ব্যক্তি । তাঁহারা নন্দ মহারাজ ও ব্রজেশ্বরীর পূর্ণ আবেশ পাইয়াছেন । অদ্ভুত প্রেমাবেশ ও স্বাভাবিক বাৎসল্য ভাবে তাঁহাদের গৃহে যাহা কিছু ছিল এই মধুর উৎসব উপলক্ষে সকলই দীন ছুঃখীদের দান করিলেন । ‘গোপবেশ বেণু কর গৌরসুন্দর’ মনোরম বেশ ও অপরূপ আবেশে পিতা মাতা-র (প্রতীক) জ্ঞানে পরম সম্রমের সহিত তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রণত হইলেন ।

“পিতা মাতা জ্ঞানে দৌহার নমস্কার কৈল”

কানাই খুটিয়া ও শিখি মাইতি প্রেমানন্দে আত্মহারা, বাহুজ্ঞান-শূন্য,—তঁাহারা প্রণতঃ গৌরহরিকে অপত্যাঞ্জানে শিরশ্চুম্বন ও কোল দিলেন ।

রাজা প্রতাপরুদ্র দত্ত বহুমূল্য পটুবস্ত্র শ্রীমন্তকে বাঁধা অবস্থায় গস্তীরার গুণুনিধি গৌরহরি প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে রাজ পথের মধ্য দিয়া বাসায় আসিলেন । তিনি যে সন্ন্যাসী, কোপীন ও কন্যা যে তঁাহার সম্বল—বহুমূল্য পটুবস্ত্র যে তঁাহার স্পর্শ করিতেও নাই,—বিষয়ীর দত্ত বস্ত্র তঁাহার যে গ্রহণ করিতে নাই—ইহা প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুর মনে একবার ধারণাও হইল না । লোকচক্ষে ইহা যে সন্ন্যাসীর অগ্রাহ্য তাহাও বুঝিতে পারিলেন না ।

নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দ গৌরহরির “শ্রীকৃষ্ণ” আবেশ ও তদনুকূল বিচিত্র বিচিত্র মধুর লীলাবলী বহুবার নবদ্বীপ-লীলায় দর্শন করিয়াছেন । কিন্তু সে সব লীলায় এত মাধুর্য্য বিকাশ পায় নাই ।

নৌলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ-বিরহিনী গৌরাঙ্গের কিশোরীর আবেশে বিচিত্র বিচিত্র লীলা নিত্যই দর্শন করেন । কিন্তু, আজ সেই রাই-কানুর আশ্ মিটান স্বরূপ গৌরহরির “কৃষ্ণ” আবেশ ও মন-প্রাণ-মাতান মধুর লীলা দর্শনে তঁাহারা অবর্ণনীয় অপার আনন্দ লাভ করিলেন ।

শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের ‘নন্দোৎসব কীর্ত্তন’ যে সব ভাগ্যবান পাঠক ও ভাগ্যবতী পাঠিকা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছেন তঁাহাদের সকলের বুকে গাঁথা আছে যে,—ঐ কীর্ত্তনে নন্দোৎসব দিনের ‘ব্রজলীলা’ এবং ‘ব্রজ-লীলার আশ্ মিটান গৌরলীলা’—এই উভয় লীলাই এক অপরূপ ভি়ানে প্রকট হইত । বাণীর ভাঙারে ভাষা নাই যাহা দ্বারা সে ‘মাধুর্য্যের’ কোন দিক্ দর্শন করা যায় ।

(খ)

‘বিজয়া দশমী’

প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশেষতঃ প্রত্যেক বাঙ্গালীর “বিজয়া দশমী” তিথি সারা বৎসরের কামনার ধন । তাঁহাদের রুচি ও আশয় হইতে গৌরহরির অনুভব সু-গূঢ় ও সু-মধুর । কেবলমাত্র গৌর-রসের-রসিক বৈষ্ণববৃন্দ আজও নিজ নিজ গুরু, গৌরানন্দ ও গৌরগণের সুখের অনুভবে দুর্গাপূজা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দ লাভ করেন ।

এ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর ‘কওয়া কথা’ আবৃত্তি করিয়া আমরা উপসংহার টানিব । যথা—

“বিজয়া দশমী লক্ষ্মী বিজয়ের দিনে ;
বানর সৈন্য হৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ।

হনুমান আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা ;
লক্ষ্মী-গড়ে চড়ি যেন ফেলায় ভাঙ্গিয়া ।”

‘কাঁহা রে রাবণা ?’—প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ;
‘জগন্মাতা হরে পাপী ! মারিমু সবংশে’ ।

এই কয় ছত্র বলার পর তিনি দাস গোস্বামীর অনুভব বর্ণন করিতেছেন—

“গোসাত্তির আবেশ দেখি লোক চমৎকার ;
সর্বলোক ‘জয় জয়’ করে বার বার ॥”

নোট :— গোড়দেশবাসী অভূতপূর্ব ভক্তি-রস-রসিক (প্রায় সকলেই গৃহী) ভক্তবৃন্দ সাধারণতঃ রথযাত্রা হইতে বিজয়া দশমী পর্য্যন্ত নীলাচলে গৌরহরিকে সঙ্গ সুখ দানে উল্লসিত করিয়া নিজেরা

সুখী হইতেন। তাঁহাদের এই অবস্থান কালে যে সব নৈমিত্তিক উৎসব এই গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই তাহাদের মধ্যে প্রখ্যাত কয়টি নীচে উদ্ধৃত হইতেছে—

(১) শ্রীগুরু পূর্ণিমা (শ্রীগুরুপূজা ও আদিগুরু ব্যাসদেবের আরাধনা উৎসব) আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন এই সু-রসাল উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইত।

(২) ঝুলন পূর্ণিমা (ব্রজবিহারী কৃষ্ণ ও নদীয়া-বিহারী গৌর-হরির ঝুলনলীলা মহোৎসব রক্ষ) শ্রাবণ শুক্লা প্রতিপদ হইতে শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই লীলা অনুষ্ঠান হইত।

(৩) ঠাকুর হরিদাস নির্য্যান—ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যানের পর প্রতি বৎসর ভাদ্র শুক্লা চতুর্দশীর দিন এই স্মরণ মহামহোৎসবটি পরম আবেশে অনুষ্ঠিত হইত।

‘ঈশ্বরের জন্মতিথি যে হেন পবিত্র।

বৈষ্ণবেরও সেই মত তিথির চরিত্র ॥’

পুনরুল্লেখ বাহুল্য যে, ‘আমাদের রঘুনাথ’ এই সব লীলার শুধু দ্রষ্টা ও সক্রিয় পার্শ্বদই নন, তাঁরই অনুভব সমূহ কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে অক্ষররূপে মূর্তি ধরিয়াছে।

— — — — —

দশম তরঙ্গ

‘শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর’

(শকাব্দ ১৪৪৩।৪৪ হইতে ১৪৫৫ পর্য্যন্ত)

এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় প্রসঙ্গাবলী—

(১) ঐতিহাসিক ঘটনা—

(১) প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা শ্রীরূপ ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজ নিজ (বিরহ ব্যথা উপশমের উপায় স্বরূপ) স্তবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) এ সম্বন্ধে দাস গোস্বামীর অনুভব ও মনোবৃত্তি কুবিরাজ গোস্বামীর ‘অক্ষরে’ ধরা আছে, যথা—

* “প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গস্তীর।

বুঝিতে না পারে কেহ যত্বপি হয় ধীর*।

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?

সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥”

(৪) ‘প্রথম চিত্র’, ‘দ্বিতীয় চিত্র’, এইরূপ দশম চিত্র পর্য্যন্ত দশটি অনুপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) এই পরিচ্ছেদে বর্ণনীয় প্রসঙ্গাবলী পাঠের কাঠিন্য অপানোদন জন্য সর্ব প্রথমে একটি ‘উদ্ঘাটন (১, ২, ৩, ৪, ৫) দেওয়া হইতেছে।

* ধীর—ধীর, শান্ত, অচঞ্চল, স্বস্থ বাসনামূলক কামাদি নাই বলিয়া যাহার চিন্তে চঞ্চলতা নাই। একমাত্র ভগবৎ চরণে ষাঠার চিন্তা নিবিশ্লেষিত।

উদঘাটন

(১)

অষ্ট সাপ্তিক ভাব :

স্তম্ভ : হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে 'স্তম্ভ' উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদিশূন্যতা, নিশ্চলতা, শূন্যতা দি জন্মে। কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়।

শ্বেদ : হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি বশতঃ শরীরে কম্পন জন্ম রস ধাতুর বিকার নির্ঝরকে 'শ্বেদ' বলে।

রোমাঞ্চ : আশ্চর্য্য বস্তুর দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি বশতঃ রোমাঞ্চ হয়। ইহাতে রোম সকলের উদগম ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্নতা দি হয়।

স্বরভঙ্গ : বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে। গদগদ বাক্য হয়।

কম্প : ক্রোধ, বিত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে যে চাঞ্চল্য হয় তাহাকে কম্প বলে।

বৈবর্ণ : বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি বশতঃ বর্ণ বিকারের নাম বৈবর্ণ।

অশ্রু : হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদি জন্ম চক্ষু হইতে জল বাহির হয়। তাহার নাম অশ্রু। হর্ষ জনিত অশ্রু শীতল। ক্রোধ জনিত অশ্রু উষ্ণ। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চক্ষুর ক্ষোভ, রক্তিমতা ও সন্মার্জনা দি থাকে। নাসিকার স্রাব ইহার অঙ্গ বিশেষ।

প্রলয় : সুখ ও দুঃখ বশতঃ চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতন আদি হইয়া থাকে।

এই সব বিকার (স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয়) প্রাকৃত ঘটনা অবলম্বনেও সাধারণ জীবের দেহেও ঘটে। বিশুদ্ধ ভক্তিরসবিদগণ বলেন—‘উহা প্রাকৃতই’।

তবে সাত্ত্বিক ‘প্রাকৃত’ ভাব হইতেও অপ্রাকৃত সাত্ত্বিক ভাবের অনুভূতি হয়। অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলা অবলম্বনে যখন ঐ সব বিকার দেখা যায় তখনই তাহাকে ‘সাত্ত্বিক ভাব’ বলা হয়।

আধার ভেদে এইসব বিকারের তারতম্য আছে। তাহাদের পর পর ধাপ্‌গুলির নামোল্লেখ মাত্র করা যায়—

শুদ্ধ ভক্তে— ঐ সব বিকার প্রথম স্তরের সাত্ত্বিক ভাব।

নিত্য সিদ্ধগণে—	শুদ্ধ ভক্ত হইতে নিৰ্ম্মল
ব্রজ রামাগণে—	তাহা হইতেও নিৰ্ম্মল
শ্রীরাধাগণে—	তাহা হইতেও নিৰ্ম্মল
শ্রীরাধায়—	সু-নিৰ্ম্মল

আর, রাই-কানুর মিলিত ভাব বিগ্রহ গৌরসুন্দরে ‘পরম সু-নিৰ্ম্মল’।

এই ‘তথ্য’ বা অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের তারতম্যতা বা ক্রমোন্নত অবস্থা স্মরণ রাখিতে হইবে।

পরবর্তী সংবাদ—

দীপ্ত : তিনটি, চারিটি কিম্বা পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাব যদি এক কালে অধিকরূপে ব্যক্ত হয় এবং তাহা যখন স্মরণ করা যায় না তখন তাহাকে দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।

উদ্দীপ্ত : পাঁচটি কিম্বা সকল সাত্ত্বিক ভাব এককালে ব্যক্ত হইয়া

পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় তখন তাহাকে 'উদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক ভাব বলা হয় ।

সুদীপ্ত : উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব যখন সর্বোত্তম আধার শ্রীরাধাতে প্রকাশ পায় এবং তখন যে অনির্বচনীয় পরম উৎকর্ষের প্রকাশ হয় তাহাই সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ।

রাধা-কৃষ্ণের ভাব মিলিত বিগ্রহ গৌরহরির স্বরূপে রাধা ভাবের চরম অবস্থাটি আরও মহনীয় । সুতরাং গৌর-স্বরূপের সুদীপ্ত ভাব মাদনাখ্য মহা ভাববতী শ্রীরাধা অঙ্গে প্রকটিত সুদীপ্ত ভাব হইতে অবশ্যই অধিক অনির্বচনীয় ।

(১)

গঙ্গারীর গুণনিধি গৌরহরির 'সদাই'

'দিব্যোন্মাদে,'—'ভ্রমময় চেষ্টা' ও 'প্রলাপময় বাক্য'—
এ সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।
তিনি কি ভাবে এ সংবাদ পাইয়াছেন ?

তাহা যে দাস গোস্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শনের পর তাহারই প্রমুখাৎ শ্রুতি বা স্বানুভূতি রূপদান তাহাও কবিরাজ বলিয়াছেন—

'চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।'

দিব্যোন্মাদ :—মহাভাব দুই প্রকার 'রূঢ়' ও 'অধিরূঢ়' ।

'অধিরূঢ় মহাভাব' আবার দুই প্রকার—'মোদন' ও 'মাদন' ।

‘মোদন’ হ্লাদিনী শক্তির পরমাবৃত্তি ; ইহা শ্রীরাধার ‘যুথ’ ভিন্ন অন্যত্র প্রকটিত হয় না। ‘পরিশ্লেষ দশায়’ এই মোদনকে ‘মোহন’ বলে। ‘মোহনে’ বিরহ বিবশতা বশতঃ সমস্ত সাত্ত্বিকভাব সুদীপ্ত হয়। এই ‘মোহন’ যখন কোন এক অনির্বচনীয় বৃত্তি বিশেষ প্রাপ্ত হয়, তখন ‘ভ্রম সদৃশী’ বৈচিত্রী দশা লাভ করে। তখন ইহাকে ‘দিব্যোন্মাদ’ বলে।

‘উদ্ঘর্গা’ (প্রেম বৈবশ্যের কার্যিক বিকাশ) ও ‘চিত্রজল্প’ (বাচনিক বিকাশ)—ভেদে ‘দিব্যোন্মাদ’ দশ প্রকার (প্রজল্প, পরিজল্প ইত্যাদি)।

রাই-কানুর ভাবমূর্ত্তি গৌরহরির দিব্যোন্মাদ দশাটি ব্রজলীলায় প্রকটিত মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ দশা হইতেও অনির্বচনীয় মাধুর্য্যময়।

দিব্যোন্মাদটি প্রাকৃত দেহে অর্থাৎ চিত্ত-বিকারজনিত এবং শোক মোহাদি ঔপসগিক বিকারের সাদৃশ্য হইলেও তাহা ব্যাধি। কিন্তু, অপ্রাকৃত উন্মাদ দৈহিক মানসিক ব্যাধি নয়।

প্রাকৃত উন্মাদ, গুণ বিকারের লক্ষণ। সুতরাং প্রাকৃত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির কোন বিষয়ে চিত্তবৃত্তি নিবেশের ক্ষমতা থাকে না। ‘দিব্যোন্মাদ’, প্রেমের অনির্বচনীয় গাঢ়তার ফল। প্রাকৃত উন্মাদের কারণ অনুসন্ধানের শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু, দিব্যোন্মাদে অনুসন্ধানী শক্তি নষ্ট হয় না—একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। যে যে বিষয়ে এই অনুসন্ধান শক্তির প্রয়োগ থাকে না সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে ‘দিব্যোন্মাদগ্রস্ত স্বরূপের আচরণ ভ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। বাস্তবিক ইহা ‘ভ্রম’ নয়।

দিব্যোন্মাদে, যে যে বিষয়ে চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ থাকে না (চিত্তবৃত্তির বাস্তবিক বিবশতা না জন্মিলেও) সেই সেই বিষয় সম্বন্ধীয়

আচরণ যেন চিত্তবৃত্তির বিবশতার ফল বলিয়াই মনে হয়। এই বৈবশ্যকে 'প্রেম বৈবশ্য' বলা হয়। এই মানসিক প্রেম বৈবশ্যের অভিব্যক্তি সাধারণত দুই প্রকার—

'কায়িকী' ও 'বাচনিকী'।

কায়িক বিকাশের নাম 'উদঘূর্ণা' এবং বাচনিক বিকাশের নাম 'চিত্রজল্প'।

(ভাবের বৈচিত্র্য ভেদে—চিত্রজল্প, প্রজল্প, পরিজল্প প্রভৃতি দশ ভাগে বিভক্ত।)

উদঘূর্ণার দৃষ্টান্ত :

কৃষ্ণ মথুরায়। নিকুঞ্জ অভিসারের কথা রাধার স্মরণ হইল। ঐ স্মরণে চিত্তবৃত্তি এমন গাঢ়ভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে, কৃষ্ণ ব্রজে নাই এ অনুসন্ধান লোপ পাইল (প্রেম বৈবশ্য)। তিনি নিকুঞ্জে অভিসার করিলেন। নিকুঞ্জে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পুষ্পশয্যা, বনমালা, তাম্বুলাদি নিকুঞ্জ বিলাসের সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিলেন। প্রেম বৈবশ্যতা বশতঃ এই প্রকার কায়িকী চেষ্টার নাম উদঘূর্ণা (ইহা কেবল শ্রীমতী ও গৌরমুন্দরেই বিকশিত)।

চিত্রজল্পের দৃষ্টান্ত :

হরিদাসবর্ষ্য উদ্ধব ব্রজরামাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূত বিষয়ে শ্রীরাধার চিত্তবৃত্তি এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইল যে তাঁহার শ্রীচরণ সান্নিধ্যে একটি ভ্রমর গুঞ্জন করিতে দেখিয়া তিনি সেই ভ্রমরকেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত দূত মনে করিলেন। বাক্-শক্তিহীন বিচারবুদ্ধিহীন একটি ভ্রমর যে দৌত্য কার্যের যোগ্য হইতে পারে না এ অনুসন্ধান-শক্তি লোপ পাইল। ভ্রমরকে

শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করিয়া শ্রীরাধা মনের আবেশে অনেক বৈচিত্রী-পূর্ণ বাক্য বলিলেন ।

—মেঘদূত কাব্যে মেঘের উদ্দেশের মত ।

(এ দৃশ্য দূর হইতে দর্শন করিয়া উদ্ধব বিস্মিত, স্তম্ভিত, মুগ্ধ ।)

প্রেম বৈচিত্র্য :

‘প্রিয়স্য সন্নির্কর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ ।

যা বিশ্লেষণধিয়ান্তি স্তাৎ প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥’

অনুবাদঃ প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের অনির্বচনীয় উৎকর্ষ স্বভাব বশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে যে পীড়া তাহাকে ‘প্রেম-বৈচিত্র্য’ বলে ।

ব্রজলীলার এই ভাব (প্রেম বৈচিত্র্যটি) শ্রীগোরাঙ্গ দেহেই প্রকাশ পাইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যেন ‘প্রেম বৈচিত্র্যটিই’ মূর্তি ধারণ করিয়াছে । যথা—

“গোরাঙ্গ-স্বরূপ,—মূর্তিমন্তু প্রেমবৈচিত্র্য”

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

গৌরহরির লীলা পরিকর ‘শ্রীখণ্ড গৌরব’ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের বিরচিত পদে—

“গস্তীরা ভিতরে গোরা রায় ।

জাগিয়া রজনী পোহায় ।

খেনে খেনে করয়ে বিলাপ ।

খেনে খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ ॥

খেনে ভিতে মুখ গির ঘষে ।

কোন নাহি রছ পছ পাশে ॥

থেনে কান্দে তুলি দুই হাত ।

কোথায় আমার প্রাণনাথ ॥

নরহরি কহে মোর গোর।

রাই-প্রেমে হইয়াছে ভোরা ॥”

—পদ কং ১৬৪৩

সুতরাং গৌর-স্বরূপের ‘ভ্রমময় চেষ্টা’ ও ‘প্রলাপময় বাণী’ সমূহের অনির্বচনীয় মাধুর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে ব্রজলীলা বর্ণনার অবসরে স্বরূপতঃ স্পৃষ্ট নাই। এবং এ সত্য সংবাদটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও অনুমোদন করিয়াছেন। যথা—

“লোকে নাহি দেখি এছে শাস্ত্রে* নাহি শুনি ।

হেন ভাব ব্যক্ত করে গ্যামী চুড়ামণি ॥”

—চরিতামৃত মধ্য ১৪শ

(৩)

ব্রজলীলার ‘বিষয়’ ও ‘আশ্রয়’ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা । এই উভয়ের এক অনির্বচনীয় একীভূত ভাবের স্বরূপ প্রকাশ “গৌরহরি” ।

‘ব্রজলীলার আশ্ মিতান লীলা’ যে গৌর-লীলা তাহার ‘বিষয়’
—স্বয়ং গৌরসুন্দর ।

এ লীলার সাত্ত্বিকভাব এবং দিব্যোন্মাদাদি ব্রজলীলায় প্রকটিত ভাবাদি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা মাধুর্য্যের অবধি । একমাত্র শ্রীগুরু

*শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব কৃত নিখিল ভক্তি গ্রন্থ পাঠের পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ “শাস্ত্রে নাই শুনি”—প্রকাশ করিয়াছেন ।

করুণায় সাঙ্গিক চিত্তের অনুভববেদ্য । আর, ভাষার যতদূর অবধি
তাহার সাহায্যেই কবিরাজ গোস্বামী প্রকাশ করিয়াছেন ! যথা—

“প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর ।
বুঝিতে না পারে কেহ যতপি হয় ‘ধীর’ ॥

বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে ?
সে-ই বুঝে বর্ণে,—চৈতন্য শক্তি দেন যারে ॥”

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

(৪)

সু-সংবাদ ৩—

পরম করুণ অযাচিত কৃপাকারী গৌরহরির লীলাবলীর এক
অনির্বচনীয় শক্তি যে প্রথমে না বুঝুক কোন ক্ষতি নাই । শুনিতে
শুনিতে লীলার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, রসের রীতি জানিতে
পারিবে এবং চিরঅনর্পিত প্রেমধনে ধনী হইবে । এ এক অপ্রাকৃত
অদ্ভুত দান ! যথা—

“যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত ।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই হৈবে বড় হিত ।”

—চরিতামৃত মধ্য ২য়

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের সমাপ্তির অবসরে শ্রীল কৃষ্ণদাস
কবিরাজ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে,

যেমন অতি ক্ষুদ্র রাঙ্গা টুনি পাখী সমুদ্রের একবিন্দু জল পান করিলে তাহার পিপাসা সম্পূর্ণ নিবারণিত হয় তিনিও তদ্রূপ অপরূপ গৌরাঙ্গ-লীলার এক কণা হয়ত স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন। এ লীলা সম্বন্ধে তাঁহার সুদূর অনুভূতি ও অভিমত তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

‘প্রভুর গন্তীর লীলা না পারি বর্ণিতে।

বুদ্ধি প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

‘কৃষ্ণলীলা’ ও ‘গৌরলীলা’ এই উভয় লীলার নিত্য সিদ্ধ পরিকর কবিরাজ গোস্বামী ‘গন্তীর লীলা’ (বা ‘শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর’)-র সাক্ষী, সাথী ও সেবক শ্রীল দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে শ্রবণ ও তাঁহার বিরহ দশার বিলাপ ও শ্রীঅঙ্গের বিকারাবলী দর্শনের অনুভবে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন পাখীর পাঠের ন্যায় তাঁহার অনুগমনে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ভরসা :--

(১) “ভক্তিদাতা গোরগুণ কে বর্ণিতে পারে ?

আপনি করয়ে দান, করয়ে সবারে ॥”

—ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ

(২) (গুরু) “কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য ;

ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ।”

—চরিতামৃত মধ্য ১৫শ

প্রথম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

একদা সখীবৃন্দ সহ শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও নিজ সখাবৃন্দসহ বৃন্দাবনের অপর অংশে অবস্থান করিতেছিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে দূর হইতে ‘কৃষ্ণ’ ও ‘রাধা’ পরস্পরকে দর্শন করিয়া পরস্পরের রূপ ও মনোহর হাব ভাবপ্রকাশ রূপলীলা মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। মিলিত হইবার জন্য উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। শ্রীরাধা ধৈর্য্যহারা হইয়া নিজ সখী শশীমুখী যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকট একখানি প্রেমপত্রী পাঠাইলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দূর দরশনে প্রেম চেষ্টাদি উল্লেখ করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও পূর্ব হইতেই ব্যাকুল। শ্রীরাধার হস্ত লিখিত প্রেমপত্রী পাঠ করিয়া তাঁহার ব্যাকুলতা অত্যন্ত বদ্ধিত হইল। পরম কৌতুকী কৃষ্ণ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া ঔদাসীণ্য প্রকাশ করিলেন। তিনি শশীমুখীকে বলিলেন—

‘তোমার সখীকে বলিবে পতিব্রতা-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করাই সু-নারীর গৌরব।’

এখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরাধা বিলাপ করিতেছেন। গম্ভীরার ভিতরে গৌরহরি এই ত্রিকাল-সত্য লীলাটির প্রকট দেখিলেন। ‘চিত্রজল্প দশায়’ বলিতেছেন—

প্রেমের প্রথম বিকাশ অঙ্কুরিত হইবামাত্র ভগ্ন হইলে যে অবর্ণনীয় দুঃখ জন্মে তাহার অনুভব শ্রীকৃষ্ণের নাই।

নবজাত প্রেমভঙ্গের দুঃখ শ্রীকৃষ্ণ জানিতে পারে না। তাহার কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ‘শঠ’ (শঠ সম্মুখে প্রিয় কার্য্য করে, অসাক্ষাতে অতিশয় অপ্রিয় কার্য্য করে এবং গোপনে অপরাধ করে)। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শঠ ; আমাকে মৃত্যুতুল্য যাতনা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ নিজ রূপ মাধুরী ও সু-মধুর হাবভাবে আমাকে মুগ্ধ

ও প্রলুব্ধ করিয়া এখন প্রত্যাখ্যান করেন কেন? বাহ্য ব্যবহারে তিনি 'নাগররাজ' কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি 'শঠ-শিরোমণি।' মধুর দর্শন, মধুর বাক্য, মধুর ভঙ্গী, মধুর ব্যবহার দ্বারা তিনি পরনারীকে প্রলুব্ধ করিয়া পরে নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান দ্বারা প্রাণে বধ করেন।

সখি! তুমি হয়ত বলিবে “কৃষ্ণ শঠ, পরনারী বধে নিপুণ, তাহা যদি জান তবে কেন সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলে? ইহার হেতু কি তাহা জানিনা। যে আশায় উহা করিলাম, নিজ অদৃষ্ট দোষে বিপরীত হুঃসহ হুঃখ পাইলাম। এ হুঃখে প্রাণ যায়। বিধি যে কপালে এমন হুঃখ লিখিয়াছেন তাহা ত পূর্বে বুঝিতে পারি নাই।

প্রেমের স্বভাব ধর্ম (আঁধল প্রেম কি রীতি) ভালমন্দ বিচার বোধ নষ্ট করে। প্রেমের গতি সর্বদা কুটিল। বিবিধ বৈচিত্রী বিধানই প্রেমের রীতি। সর্বদা সোজা পথে না চলিয়া প্রায়শই বক্র পথ তার অনুকূল। যখন প্রথম বিকাশ হয় তখন তো সকলদিকেই অনুকূল দৃষ্টি আসিয়াছিল। আমার অদৃষ্ট বশতঃ হঠাৎ তাহার গতি পরিবর্তিত হইয়া সোজা পথ কোথায় গেল কুটিলপথে তা হুঃখের দিকে অগ্রসর হইল। ‘শ্রীকৃষ্ণ শঠ, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর’ ইহা জানিয়াও এখন আর আমি তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ রজ্জু দ্বারা হাতে গলায় বাঁধা পড়িয়াছি। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলামাধুর্য আমাকে বিবশ করিয়াছে। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অশেষ হুঃখ দিতেছেন, জানিয়াও তাঁহাকে ত্যাগ করিবার স্বপ্নও দেখি না।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও লীলা মাধুর্যে আবিষ্ট। আবার কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া হুঃসহ হুঃখে পতিত। পরের প্রতি অত্যাচার করার সুন্দর কৌশলী তনুহীন মদন,—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটি বান্ সর্বদা আমার উপর নিষ্ক্ষেপ করিয়া আমাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া হুঃখ দিতেছে।

হে প্রাণ সখি! শাস্ত্রে কথিত আছে, একের হুঃখ অপরে বুঝে

না—ইহা সু-সত্য। তুমি যে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সখী, আমার দুঃখে তোমার দুঃখ, আমার সুখে তুমি সুখী, সর্বদা আমার নিকটে আছ,—তুমিও আমার মনের দুঃখ বুঝিতে পারিতেছ না। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার যে দুঃসহ দুঃখ তাহা যদি অনুভব করিতে তবে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিতে না। এ দুঃখে ধৈর্য্য ধারণ করা যায় না।

সখি ! হয়ত তুমি বলিবে কৃষ্ণ দয়ার সাগর, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই তিনি অঙ্গীকার করিবেন। এ আশা ব্যর্থ। জীবের জীবন চঞ্চল, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। যতদিনে তিনি কৃপা করিবেন ততদিন আমি বাঁচিলে ত ?

সখি ! এখন হয়ত তুমি বলিবে, “মানুষের আয়ু শত বৎসর। ইহার মধ্যে কি কৃষ্ণ, কৃপা করিবেন না ? এত অস্থিরতা কেন ?” আমার প্রতি স্নেহে (তোমার) এ প্রবোধ বাক্য। বিচার পূর্বক নয়। শোন ! আমি হয়ত একশত বৎসর বাঁচিতে পারি। ঐ শত বর্ষ মধ্যে কোনও সময়ে কৃষ্ণ হয়তো কৃপাও করিতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণকে সুখী করিবার মত দেহবল থাকিবে কি তখন ? বলহীনের লভ্য নন তিনি।

‘নিষ্ঠুর’ ও ‘শঠ’ কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ বলি শোন !

স্বীয় জ্যোতির আকর্ষণে অগ্নির যেমন অবোধ পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করে আর তাতে আকৃষ্ট হইয়া শেষে অগ্নির তেজেই পতঙ্গকে পুড়িয়া মরিতে হয়, অগ্নির তাহাতে কি দুঃখ ? তদ্রূপ কৃষ্ণের নিজ নাম-রূপ গুণ-লীলা (দ্বারা) অবোধ আভীর বাল্য আমাদের মনকে সম্পূর্ণ রূপে হরণ করিয়া তাঁহার প্রতি প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট করে। পরে প্রত্যাখ্যান করিয়া অপার দুঃখ দেয়।

(ভাবান্তর —)

সহসা ঔৎসুকী সঞ্চারীর উদয়ে শচীভুলাল গৌরহরি বলিতে লাগিলেন—

হা সখি ! কৃষ্ণ আমায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ হইল না । আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইল ।

আমার নয়ন ব্যর্থ । শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র হইতে ‘কণা কণা অমৃত’ ধ্বনি রূপে নিঃসৃত হইয়া বংশীর ছিদ্রপথে চতুর্দিকে প্রবাহিত হয় । শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র বংশীগানরূপ অমৃতের বাসস্থান । জগতে যত কিছু সৌন্দর্য্য আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের লাবণ্য বা সৌন্দর্য্যচ্ছটার সামান্যতম আভাস মাত্র । শ্রীকৃষ্ণ বদন ভিন্ন অন্যত্র স্বয়ংসিদ্ধ কোন সৌন্দর্য্য নাই । লাবণ্যামৃতের জন্মস্থান শ্রীকৃষ্ণবদন ।

সুন্দর বস্তু দর্শনই নয়নের সার্থকতা । সমগ্র সৌন্দর্য্যের আধার ও অমৃতের আকর স্বরূপ হইল ‘শ্রীকৃষ্ণবদনচন্দ্র’ । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদন দর্শনই নয়নের পূর্ণতম সার্থকতা । যে নয়ন তাহা দর্শন করে না, সে নয়ন থাকা না থাকা সমান ।

সখি ! কেবল যে আমার নয়নই ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু, আমার হৃদৈবের কত শক্তি তাহা একবার দেখ ! তাহার প্রভাবে আমার ছ’ একটি ইন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়—আমার দেহ, মন, চিত্ত—আমার সমস্ত জীবন এখন ব্যর্থ ।

সখি ! এখন কর্ণেন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা শোন :

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের হৃদকর্ণ রসায়ন সুললিত সংলাপ যেন অপ্রাকৃত অমৃতের নদী । নদীতে সর্বদা জলধারা প্রবাহিত হয় । নদীতে সর্বদাই পর্য্যাপ্ত জল থাকে । সেই জলের স্পর্শে সকলের দেহ শীতল হয় । সেই জল পানে সকলের তৃষ্ণা দূর হয় । শ্রীকৃষ্ণের বচনামৃতেও সর্বদা অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে । সর্ব অবস্থাতেই ইহা অমৃত হইতেও স্বাচ্ছন্দ্য । সে বচনামৃত শ্রবণ মাত্রেই মন প্রাণ সু-শীতল হয় । ‘শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়’ সেবার বাসনা ব্যতীত অন্য সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয় । শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ও সু-ললিত কণ্ঠ-

স্বরের শ্রবণই কর্ণের সার্থকতা। ছিদ্রই কানা; কড়ির ব্যর্থতার হেতু। যে কর্ণের ছিদ্রে শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাণী প্রবেশ করে না, সে কর্ণের ছিদ্রও ব্যর্থতা সম্পাদক।

সখি ! এখন নাসিকার ব্যর্থতার কথা শোন :

সুগন্ধ গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। জগতে কস্তুরী ও নীলপদ্মের গন্ধের সুখ্যাতি আছে। কস্তুরীও নীলপদ্মের মিলনে যে অপূর্ব সুগন্ধ হয় তাহার গর্ব ও মানকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভ খর্ব করে। সুতরাং সুগন্ধি দ্রব্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ সৌরভই শ্রেষ্ঠ। ঐ শ্রীঅঙ্গের গন্ধ গ্রহণই নাসিকার সার্থকতা। যে নাসিকা এই অতুলনীয় অঙ্গগন্ধ গ্রহণে অসমর্থ বা বঞ্চিত সে নাসিকা নাসিকা নহে। ভঙ্গা* মাত্র।

সখি ! এখন জিহ্বার ব্যর্থতার কথা শোন :

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত (অধর সংলগ্ন অমৃত, চকিবত তাম্বুলাদি, এবং ভুক্তাবশেষ) ও তাঁহার প্রেম-বশ্যতাди গুণ, ও তাঁহার মন উচাটন লীলাবলীর তুল্য স্বাদ আর কোন কিছু নাই, হইতেও পারে

* ভঙ্গা—কামারের জঁতা। (কর্মকারগণ যে যন্ত্র দ্বারা সাত্তাস করিয়া লোহা পোড়াইবার জন্ত আগুন ধরায়)

নাসাকে 'ভঙ্গা' বলার তাৎপর্য—নাসায় যেমন দুইটি ছিদ্র আছে, ভঙ্গায়ও তেমন দুইটি ছিদ্র থাকে। নাসার ছিদ্র দিয়া বাতাস যাতায়াত করে, ভঙ্গার ছিদ্র দিয়াও বাতাস যাতায়াত করে। ভঙ্গার ছিদ্রদ্বয় কোনও সুগন্ধ গ্রহণ করিতে পারে না। কেবল ভঙ্গ মিশ্রিত তপ্ত বায়ুই গ্রহণ করে, আর আগুনে পুড়িয়া মরে। যে নাসা শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ-সৌরভ গ্রহণ করিতে পারে না বা পায় না সে কেবল প্রাকৃত বিষয়ের ত্রিতাপ দন্ধ পূতি গন্ধ গ্রহণ করে। ফলে ত্রিতাপ জ্বালায় জলিয়া জলিয়া পুড়িয়া মরে।

না। যে জিহ্বার ভাগ্যে ঐ আশ্বাদন ঘটে না তাহা নিরর্থক। সে জিহ্বা ভেক* জিহ্বা।

সখি ! এক্ষণে ত্বগিন্দ্রিয়ের ব্যর্থতার কথা বলিতেছি শোন :

লোহাকে সোনা করার কাহিনী প্রাকৃত স্পর্শমণিতে ঘটে। কিন্তু অপ্রাকৃত স্পর্শ মণি শ্রীকৃষ্ণের করতল, আর পদতল, তার স্পর্শে প্রাকৃত চিত্তবস্তুও অপ্রাকৃত হইয়া যায়, জড়বস্তু চিন্ময় হইয়া যায়, ত্রিতাপ জ্বালায় তাপিত চিত্তও সু-শীতল হয়। যে দেহ শ্রীকৃষ্ণের কর-কমল ও চরণ-কমলের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত তাহা সর্বদা ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে এবং কাম ক্রোধাদির পদাঘাতই খায়।

অতঃপর 'রাই-কানুর-আশ-মিটান-স্বরূপ', গস্তীরার গুণুনিধি শ্রীগৌরসুন্দর (যেন) শ্রীরাধার প্রতি সমবেদনায় অধীরা মদনিকা সখীর মধুর বচন শ্রবণ করিতেছেন—

“সখি রাধে ! তুমি এত উতলা হইতেছ কেন ? কেতকী কুসুমের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরী তাহার নিকটে যায় কিন্তু কখন দেখে সেখানে মধু নাই, তখন কি ভ্রমরী কেতকীকে ত্যাগ করে না ? তুমি শঠ কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলে এখন বুঝিতেছ তাহাতে প্রণয় (মধু) নাই। প্রণয় প্রেম থাকিলে (এই) প্রেম-পাত্রীর অমর্যাদা করিতে পারিত না। এ অবস্থায় কৃষ্ণকে ত্যাগ কর না ?

সখির প্রীতিতে ও সু-যুক্তি পূর্ণ বাক্য শ্রবণে শ্রীরাধা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক বলিলেন—

*ভেক জিহ্বার সহিত তুলনা করার তাৎপর্য্য—জিহ্বা দ্বারা জীব রস আশ্বাদন করে ও শব্দ উচ্চারণ করে। ভেক কর্দ্দমে থাকে, কর্দ্দমাদিই আশ্বাদন করে। আর বর্ষা কালে তীব্র শব্দ করিয়া সর্পকে আশ্বান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধায় বঞ্চিত, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করেনা, তাহা কেবল 'প্রাকৃত-বিষয়-রস' আশ্বাদন করিয়া দেহকে 'বিষয় বিনে' জর্জরিত করে আর প্রাকৃত বিষয় কথা আলাপ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় জলিয়া পুড়িয়া মরে।

‘তবে ত্যাগই করিলাম ।’

স্ব-মুখোক্তি ‘কৃষ্ণত্যাগ’ বাক্য শ্রবণ মাত্রেই সচল জগন্নাথ গৌরহরি মহাভীত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—

‘শোন্ সখি ! (হঠাৎ) যখন বেণু-বাদন-পর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম তখন এক শত্রু ‘আনন্দ’ (অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন জনিত চিত্তের উন্মাদজনক হর্ষ) অপর শত্রু ‘মদন’ (অপ্রাকৃত কন্দর্প) আমার চেতনা হরণ করিয়াছিল । আমি সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শন করিতে পারি নাই । সে দর্শন যেন স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া মনে হইতেছে ।

প্রাণ সখি ! কোন সৌভাগ্যে যদি কখনও আবার আমার চিত্ত-চোরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাই, তবে, তখন, শ্রীকৃষ্ণ-বদন-সুধামাপুরী ভোগের বাধক ঐ ‘মদন’ ও ‘আনন্দ’কে বিতাড়িত করিয়া মনের সাধে প্রাণবঁধুর বদনসুধা পান করিব । সেই সময়ের প্রতিটি দণ্ড, প্রতিটি ক্ষণ, এমনকি প্রাতটি পলও সে অপরূপ মাধুরী ভোগে সু অলঙ্কৃত করিব ।

গম্ভীরার গুণনিধি গৌরহরির এই অপ্রাকৃত পরম অদ্ভুত দশা রামরায় ও স্বরূপ তাঁহারই সম্মুখে বসিয়া যেন চুমুকে চুমুকে পান করিতেছেন । গোবিন্দ, শঙ্কর, ‘রঘুনাথ’ আদি সেবকবৃন্দ অবশেষে অভ্যাস বশত দৈনন্দিন সেবা কার্য্য করিতেছেন । তাঁহারা কর্ণে গৌরহরির ‘প্রলাপ’ শ্রবণ করিতেছেন । তাঁহাদের চিত্ত সদাই ঐ গৌরগুণমণির ভাবময় চিস্তায় ভরপুর এবং নিজ নিজ সেবা অবসরে চক্ষুদ্বারা ‘শাস্ত্র’ অগোচর ভাব ভূষণে ভূষিত সে চাঁদবদন দর্শন করিতেছেন ।

লীলা বৈচিত্র্যে গৌরহরির কিঞ্চিৎ বাহ্যপ্রকাশ পাইলে তিনি (এতক্ষণ পরে) রামরায় ও স্বরূপের নিজ সম্মুখে উপস্থিতি অনুভব করিয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

আমার কি চেতনা লোপ পাইয়াছিল ?

আমি 'স্বরূপে' দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাখ্যানে শ্রীরাধা মদনিকা সখীর নিকট বিলাপ করিতেছিলেন। তোমরাও কি সে প্রাণ বিদারক প্রলাপোক্তি শুনিয়াছ ?

পরমুহূর্তেই কৃষ্ণ-বিরহিনী গৌর-কিশোরী অপরূপ ভাবান্তরে বলিতেছেন—

‘স্বরূপ ! রামরায় ! তোমরা আমার প্রাণের বান্ধব। তোমাদের বলি শোন, আমি কৃষ্ণ-প্রেমধনে বঞ্চিত। আমি সু-দরিদ্র। আমার দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বৃথা হইয়া পড়িল।’

পরম আক্ষেপের সহিত আবার বলিতেছেন—

ওহে স্বরূপ ! ও রামরায় ! শোন ! শুনিয়া বিচার করিয়া দেখ। হাঁ কি না সার কথা বল। এই বলিয়া (যথাপূর্ব) নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলেন—

‘শুদ্ধ কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্যময় যে ‘প্রেম’ তাহা জাম্বুনদজাত সহজ বিশুদ্ধ স্বর্ণের মত। সে প্রেম মনুষ্যালোকে হয় না। যদি কোন সৌভাগ্যে কাহারও চিত্তে অকৈতব কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয় তাহা হইলে সেই প্রেমই স্বীয় অচিন্ত্য আকর্ষণী শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন ঘটায় এবং ঐ মিলন কখনো খণ্ডিত হয় না ইহাই ঐ প্রেমের সহজ স্বভাব। যদি কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সে প্রেমের বিয়োগ ঘটে তবে সে (ভক্ত) আর বাঁচিতে পারে ?

প্রাণের বন্ধু স্বরূপ ! প্রাণের বন্ধু রামরায় ! লাজ্-লজ্জার মাথা খাইয়া বলিতেছি—অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম ভেে বহু দূরের কথা, কপট প্রেমও আমার নাই।

এতক্ষণ (গৌর-লীলার) ‘চিত্রজলে’ বাংলা ভাষায় প্রলাপ করিতে ছিলেন। অতঃপর শ্লোকবন্ধে সংস্কৃতে বলিলেন—

“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।
বংশীবিলাস্থাননলোকনং বিনা
বিভস্মি যৎ প্রাণ পতঙ্গকান্ বৃথা ॥”

—মহাপ্রভুপাদোক্তঃ

ভাবার্থ : শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময় প্রেমের কথা তো বহুদূরে, নিজের সুখের বাসনায়ুক্ত কপট প্রেমের অস্তিত্বও শ্রীকৃষ্ণচরণে আমার নাই। তেমন কপট প্রেমের সম্পর্ক যে নাই তাহা তোমাদের পরিষ্কার বলিতেছি শোন—‘তোমরা জান যে প্রেমের বিষয় ‘বংশী-বিলাসী-চাঁদবদন, তাহা আমার ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই। তথাপি এখনও যে নিজ দেহের লালন-পালন মার্জন-ভূষণ দেখিতেছ এ সব বৃথা, পরমার্থ কিছুই নাই।

আমার আহার, বিহার, শ্বাস, প্রশ্বাসাদি, সমস্তই বৃথা। এ সমস্ত কেবল ‘আপু্যকাম’ প্রীতিরই পুষ্টি সাধন করিতেছি। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ-শূন্য আমার এই প্রাণ ধারণে ধিক্।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ আমি প্রাণ ধারণ করিয়া আছি এবং নিজের দেহে প্রীতি দেখাইতেছি। সুতরাং আমার অকৈতব প্রেম দূরের কথা, কপট প্রেমও নাই।

(যাহাতে বিন্দুমাত্রও আত্ম-সুখ কিম্বা বিময়-বাসনারূপ মলিনতা নাই, যাহা তৃণ কর্দমাদি শূন্য গঙ্গাজল (সু-স্বাদু গঙ্গাজল) সদৃশ সু-নির্মল সেই শুদ্ধ প্রেম অমৃতের গায় আশ্বাদন চমৎকারিতা আছে। ইহা সিন্ধু তুল্য অপরিমেয়।

পরিষ্কার শুরু বস্ত্রে অতি ক্ষুদ্র কালির চিহ্নটিও যেমন ধরা পড়ে,

এই সু-নির্মল কৃষ্ণ-প্রেমের সহিত স্ব-সুখ-বাসনার আভাষ পর্য্যন্ত থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে ।

এই 'শুদ্ধ-প্রেম'* নৃ-লোকে হয় না । ইহা স্বরূপত বিড়ু । ইহার এক বিন্দুতে সমগ্র সসীম জগৎ ডুবিয়া যাইবে—এ আর বিচিত্র কি ? এই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের সুখ অবর্ণনীয় । ইহা মুক্-আস্বাদনবৎ । এ সুখে পাগল হইয়া যদি কেহ জগতে প্রকাশ করে তাহা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে না ।)

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত ।

—চরিতামৃত মধ্য ২য়

* এই প্রেমের বাহ্য প্রকাশ তীব্র-যজ্ঞগা. নূতন সর্প শাবকের বিষের যে অহংকার তাহাকেও নির্বাসিত করে । অভ্যস্তরে—আনন্দের পাথার ।

শীতল ইক্ষু অপেক্ষা তপ্ত ইক্ষুর স্বাদ অধিক । স্বাদাধিক্যের লোভে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও লোকে তপ্ত ইক্ষুই চর্ষণ করে । সু-নির্মল কৃষ্ণপ্রেম তদ্রূপ বাহিরে বিষবৎ অসহ জ্বালা ভিতরে অনীর্কচনীয় মধুর ও পরম উপাদেয় ।

'রাই-কাহুর-আশ-মিটান স্বরূপ' গৌরহরির 'প্রেম বৈচিত্র্য দশায়' তাঁহার শ্রীবদনে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সব অনীর্কচনীয় ভাবাবলী প্রকাশ পাইত, সে সব (শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্রীঅঙ্গে) স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার অহুতবের আধারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কিছুটা আমাদের বোধগম্য হয়, এই আশায় উপরোক্ত উপমা দুইটি পয়ারে বর্ণনা করিয়াছেন ।

দ্বিতীয় চিত্র

“শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর” (কবিরাজ)

(রাই-কানুর আশ্-মিটান মূর্তি গৌরহরির—সদাই দিব্যোন্মাদে
ভ্রমময় চেষ্টা ও প্রলাপময় বাণী ।)

একদা তিনি অভ্যাস বশতঃ জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছেন । সঙ্গে
গোবিন্দ ‘রঘুনাথ’ আদি সেবকবৃন্দ ।

(গৌরহরি সর্বদাই জগন্নাথদেবের সম্মুখ হইতে বেশ খানিকটা
ব্যবধানে অবস্থিত গড়ুর স্তম্ভের সন্নিকট হইতেই জগন্নাথ দর্শন
করিতেন । ঐ গড়ুর স্তম্ভের পার্শ্বে একটি গর্ত ছিল ।)

সিংহাসনে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেব দর্শন মাত্র দিব্য
স্বপ্নতির আলোকেই তিনি কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতেছেন । শ্রীমুখে
বলিতেছেন—

“কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমি কৃষ্ণের দর্শন পাইলাম । আমার জীবন
সার্থক হইল । আমার দেহ, মন ও চক্ষু জুড়াইল ।”

এই দিন গৌরসুন্দর যে কি বিচিত্র বিরহ দশায় জগন্নাথ দর্শন
করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অত্যাপি পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে
সুরক্ষিত । তাঁহার চরণ পরশে পাষণও গলিয়া গিয়াছে । সেই
গলিত পাষণে গৌরহরির শ্রীচরণের যে ‘ছাপ’ পড়ে সেই ছাপ সহ
শ্রীপ্রস্তরটি এখনও শ্রীমন্দির অত্যন্তরে উত্তর দরজার নিকট দর্শন করা
যায় । ঐ পাষণ গলান লীলা বিভূতিটি শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়ের
কৌতুবে স্ফূর্ত হইয়াছে—

গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে

একদিন আমার গৌরহরি
করিছেন জগন্নাথ দর্শন
করিছেন জগন্নাথ দর্শন
রাধিকা ভাবিত মতি

ভাবনিধি গৌরাজ্ঞ আমার
শ্রীজগন্নাথের বদন চেয়ে

রাধিকা ভাবিত মতি
রাধিকা ভাবিত মতি

“বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার”

জগন্নাথের বদন চেয়ে

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

স্বর্ণবর্ণ হ'ল বিবর্ণ

জগন্নাথ বলতে নারে

জ জ জ জ গ গ করে

জ জ জ জ গ গ করে

“বৈবর্ণ স্তব্ধতা আর, গদ গদ বাক্যোচ্চার

কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম্ম ।

এই সপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, আর দুই অনুভাব

হাস্য নৃত্য সব প্রেম ধর্ম্ম ॥”

সাত্ত্বিক বিকার যত

গৌর অঙ্গে হ'ল বেকত

গৌর অঙ্গে হ'ল বেকত

নানা ভাবাবলি ভূষণেতে

গৌর অঙ্গে বিভূষিত

গৌর অঙ্গে বিভূষিত

অ বিরল নয়ন ধারার

বিরাম নাই, বিরাম নাই

বিরাম নাই, বিরাম নাই

(যেন) শ্রাবণ মেঘের ধারা

বিরাম নাই, বিরাম নাই

(যেন) পিচকারী জল যন্ত্রধারা

শ্রীগৌরাজ্ঞের নয়ন ধারা

(যেন) পিচকারী জল যন্ত্রধারা

এক এক ধারায় শত শত ধারা (যেন) পিচকারী জল যন্ত্রধারা

অবিরল নয়ন ধারায়

মুখ কমল ভাসাইয়ে

হৃদি কমল ভাসাইয়ে

চরণ কমল পাখালিয়ে

গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বদেশের

শ্রীগৌরাজের নয়ন ধারায়

সেই গৌরের পদ পরশে,

প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা

ভাসিল সে মুখ কমল

ভাসিল সে মুখ কমল

পড়িল হৃদি কমলে

পড়িল হৃদি কমলে

পড়িল চরণ কমলে

নিম্ন খাল পূর্ণ হোলো

নিম্ন খাল পূর্ণ হোলো

নিম্ন খাল পূর্ণ হোলো

পাষণ গলিয়া গেল
পাষণ গলিয়া গেল

পাষণ গলান গোরা

পাষণ গলান গোরা

মহা সাবধান কবিরাজ গোস্বামী 'পাষণ গলান গোরার' পূর্ণ চিত্র
দেননি । তিনি বলিয়াছেন—

“গরুড় স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে

সে-খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

গৌরহরি বাহু-জ্ঞান-রহিত অথচ প্রতি ইন্দ্রিয় স্বভাবে নিজ নিজ
কার্য্য করিতেছে মাত্র । এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার সেবকবৃন্দ তাঁহাকে
গম্ভীরায় লইয়া আসিলেন । সেখানেও তাঁহার সেই স্ফূরণ অব্যাহত ।
গম্ভীরায় ফিরিয়া আসার কিছুক্ষণ পরে বাহুবোধ যেন জাগ্রত

হইতেছে। অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভীষ্টের প্রাপ্তিজনিত চিন্তার বিভ্রম। ফলে, কখনও পূর্বরাগ, কখনও ক্রাগ্রতেই স্বপ্ন সন্তোগজনিত আচরণটি নখের সাহায্যে মাটি খুঁটিতে ও মাটিতে মানাবিধ ঝাঁক দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই অবস্থান্তর। উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছেন—

“হাহা কাঁহা বৃন্দাবন ! কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন !

কাঁহা সেই বংশীবদন !

কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম ! কাঁহা সেই বেণু গান !

কাঁহা সেই যমুনা পুলিন !

কাঁহা রাস বিলাস ! কাঁহা নৃত্যগীত হাম !

কাঁহা প্রভু মদনমোহন !”

ভাবের প্রাবল্যে মনের উদ্বেগে ক্ষণকাল কাটাইতে পারিতেছেন না। নানাবিধ সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের প্রাবল্যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সহসা তিনি কর্ণামৃতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সু-স্বরে আবৃত্তি করিলেন—

“অমূল্যধন্যানি দিনান্তুরাণি,

হরে ত্বদালোকনমন্তুরেণ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্দো,

হা হন্ত ! হা হন্ত ! কণং নয়ামি ॥”*

—কর্ণামৃত শ্লোক সংখ্যা ৪১

পর মুহূর্ত্তেই চাপলাখ্য সঞ্চারী ভাবে বলিতেছেন—

প্রাণ বঁধু ! তোমার কৈশোর ও আমার চপলতা ত্রিভুবনে অদ্ভুত। এ দুইটি একমাত্র তুমি অথবা আমিই বুঝিতে পারি।

* তোমার দর্শন অভাবে অধন্ব এই ক্ষণ-লব-মুহূর্ত্তাদি কাল আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব ?

অপরে কেহ পারে না। তোমার বংশীবিলাস সম্পন্ন মনোহর মুখ-
কমল নয়ন ভরিয়া দর্শনের নিমিত্ত আমি চঞ্চল। কোথায় গেলে,
কি করিলে তোমাকে পাই বঁধু তুমিই আমাকে বলিয়া দাও।

এই সময় গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে যে সব নয়নের অভিরাম ভাবাবলী
প্রকাশ পাইত শ্রীরঘুনাথ সে সমূহ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।
কবিরাজ গোস্বামী সে দর্শন অনুভবটি অক্ষরে মূর্তি দিয়াছেন।
যথা—

‘নানা ভাবের প্রাবল্য হইল ‘সন্ধি’ ‘শাবল্য’
ভাবে ভাবে হৈল ‘মহা রণ’।

‘ঔৎসুক্য’ ‘চাপল্য’ ‘দৈন্য’ ‘রোষামর্ষ’ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সভার কারণ ॥”

—চৈঃ চঃ মধ্য ১য়

সংক্ষেপ :

‘নানা ভাবের প্রাবল্য’—নানাবিধ সঞ্চারী ভাব প্রবল হইয়া
উঠিল।

‘সন্ধি’—এক কারণ বা বহু কারণ জনিত দুই বা বহু ভাব একত্র
মিশ্রিত।

‘শাবল্য’—ভাব সমূহের পরস্পর সম্যকরূপে মর্দন।

(ভাবকে শাবলতুল্য বলা হয়। সন্ধিতে শাবলের ঘা দিয়াছে
যেন।)

‘ভাব শাবল্য’—বহু ভাব একত্র প্রবলবেগে উদিত হইয়া প্রত্যেক
ভাবই অপরগুলিকে পরাজিত করিয়া প্রাধান্য লাভের চেষ্টা।

‘মহারণ’—ভাব শাবল্যের মহাযুদ্ধ ।

‘ঐশুক্য’—অভিষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির উৎকণ্ঠা বশতঃ কাল
বিলম্ব অসহ

‘চাপল্য’—রাগ এবং ঘেঘাদি জনিত গান্ধীর্ঘ্যহীনতা ।

‘দৈন্য’—দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধাদি বশতঃ নিজেকে নিকৃষ্ট জ্ঞান ।

‘রোষ’—অপরাধ ও কটুক্তি প্রভৃতি জনিত উগ্রতা বা ক্রোধ ।

‘অমর্ষ’—তিরস্কার ও অপরাধাদি জনিত অসহিষ্ণুতা ।

‘সৈন্য’—সৈন্যগণ যেমন প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে, নানাবিধ
ভাবও সেইরূপ গৌরহরির চিত্তে উদ্ভিত হইয়া পরম্পরকে প্রতিপক্ষের
মত মর্দন করিতে লাগিল ।

উপরোক্ত পয়ারের বর্ণনা আর একটু সরল হইয়া আমাদের
কিছুটা অনুভবগম্য হয়, এই আশায় তিনি (কবিরাজ গোস্বামী)
দৃষ্টান্তে জাগতিক বলিয়াছেন—

‘মত্ত গজ ভাবগণ প্রভুর দেহ ইক্ষু বন
গজ-যুদ্ধে বনের দলন ।’

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

যাঁহারা কখন ইক্ষুবনে হস্তীর প্রবেশ দেখিয়াছেন তাঁহারা গৌর-
হরির শ্রীঅঙ্গের অবস্থা কিছুটা অনুভব করিলেও করিতে পারিবেন ।

ইক্ষুবন মধ্যে উন্মত্ত হস্তীগণের প্রবেশের সঙ্গে যদি সংগ্রাম
আরম্ভ হয় তবে ইক্ষুবন যে কিরূপভাবে বিদলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়
তাহা কোনরূপ বর্ণনা দ্বারা বোঝান যায় না ।

এইরূপ অনির্বচনীয় শরীর ও মনের অবস্থা মধ্যে অবসাদ এবং তাহা হইতে উখিত ভাবাবেশে তিনি কর্ণামৃতের আর একটি শ্লোক রত্ন আবৃত্তি করিলেন । যথা—

“হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈক বন্ধো !
 হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈক সিন্ধো !
 হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !
 হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোম্মে ?”

এই শ্লোকরত্নটি যে আবেশে গৌরহরির শ্রীমুখে উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অনুভব করিয়া দাস গোস্বামী—কবিরাজ গোস্বামী দ্বারে প্রকাশ করিয়াছেন । যথা—

‘উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্ফূরণ,
 ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান ;
 সৌলুষ্ঠ বচন-রীতি মান-পর্ব-ব্যাজ স্তুতি
 কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ।’

—চৈঃ চঃ মধ্য ১য়

সংক্ষেপ •

উন্মাদের লক্ষণ : দিব্যোন্মাদে নিজেকে অপর, অপরকে নিজ বলিয়া মনে হয় । আবার যাহা আছে তাহা নাই বলিয়া মনে হয়. ইত্যাদি ।

কৃষ্ণ-স্ফূরণে : শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত এই জ্ঞান ।

ভ

নানাবিধ ভাবের আবেশে :—

মান : প্রেমের পর উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হইলে তাহাকে স্নেহ বলে। ‘স্নেহ’ উৎকর্ষলাভ করিয়া যখন নূতন নূতন মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং নিজেকে প্রচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যে বাম্য ভাবাদি ধারণ করে, তখন তাহার নাম ‘মান’।

প্রণয় : মানের উৎকর্ষে প্রিয়জনের সহিত নিজের ভেদ নাই, এই কারণ—সম্ভ্রমশূন্যতা বশতঃ স্বীয় প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির সহিত কান্তের প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি ও পরিচ্ছদাদির ‘অভেদ’ এই উৎকর্ষ দশার নাম ‘প্রণয়’।

‘সোলুঠ বচন : পরিহাসযুক্ত বাক্য ভঙ্গী।

‘হে দেব ! হে দয়িত !.....’ শ্লোকরত্নটির পয়ার ছন্দে কবিরাজ গোস্বামী অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা অপূর্ব ! তাহারই ছায়া অবলম্বনে গড়ে বিবৃত হইতেছে—

গৌরহরি দিব্য স্ফূর্ত দশায় দর্শন ও প্রলাপ করিতেছেন—
কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা কুঞ্জ মধ্যে মুচ্ছিত প্রায় হইয়া আছেন। হঠাৎ নূপুরের শব্দ শুনিতেছেন বলিয়া মনে হইল। উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে সখিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“সখি ! কুঞ্জ মধ্যে নূপুরের শব্দ !” কিন্তু কৃষ্ণকে ত দেখিতেছি না। হুঁ ! বুঝিলাম, অন্ত্র ক্রীড়া সঞ্চার হইয়াছে।

(সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর) তিনি দেখিতেছেন কৃষ্ণ সাক্ষাতে দণ্ডায়মান। বক্রোক্তি বলিতেছেন—

‘হে দেব (যিনি সর্বদাই ক্রীড়া করেন) ! তোমার আশক্তি অন্ত্র, সেখানেই তুমি ক্রীড়া কর। এখানে আগমন কেন ? তোমার কোন প্রয়োজন নাই। যাও, জগতে তোমার জন্ম যাহারা তোমার অপেক্ষা করিতেছে তাহাদের সহিত ক্রীড়া কর।’

‘তিরস্কার শুনিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেল’—ইহা মনে ভাবিয়া, ব্যাকুল চিত্তে বলিতেছেন—

“হে দয়িত ! তাৎপর্য্য তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তুমি কেন আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ ? দয়া করে এস, দর্শন দাও, আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর ।”

পরক্ষণেই দেখিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন । দীনতার সহিত বলিতেছেন, অপরাধ ক্ষমা কর । বলিয়া সকাতরে অনুনয় বিনয় করিতেছেন । তখন তিনি পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তি সহকারে বলিতে লাগিলেন—

‘প্রাণ বঁধু ! কি দোষ ? সকলের চিত্ত সন্তুষ্ট করা তোমারই ত কর্তব্য । তুমি কেবল কি আমার ? তা উচিত নয় ! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও ? তুমি হইলে ভুবনের বন্ধু । তুমি তাহাদের মনস্তুষ্টি করিবে না ? নিশ্চয়ই করিবে ! অন্যথায় অন্যায় হইবে । তুমি তাহাদের মনোজয়ে গিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইতেছ কেন । বেশ করিয়াছ । আবার যাও । তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান কর । এখানে দাঁড়াইয়া কেন ? তারা যে আশার পথ চেয়ে আছে ! যাও ! যাও ! শীঘ্র যাও ।

‘হায় হায় কটুক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন ।’ ‘আর বুঝি আসিবেন না’ মনে করিয়া আবার ব্যাকুল হইলেন । এখন মনে ভাবিলেন রূপ গুণ ও লীলা মাধুরীতে শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে হরণ করিয়াছে । আর মান কেন ? যাহাতে শীঘ্র তাহার দর্শন পাই সেই উপায় করি । তাই অত্যন্ত দৈন্য ভাবে বলিতে লাগিলেন, “তুমি করুণার সিন্ধু । তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত কোমল । আমি তোমার চরণে অপরাধিনী । নিজ কারুণ্যে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দর্শন দিয়া প্রাণে বাঁচাও । তোমার প্রতি আমার কোন রোষ নাই । বাঁচাও ।”

পর মুহূর্তেই শ্রীরাধা মনে করিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, ‘বৃথা মান করিয়া আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ? প্রসন্ন হও। / কথা বল।

শ্রীরাধার ঔদাসীণ্যের উদয় হইল। তিনি বলিতেছেন—

“হে নাথ! একি কথা? তুমি ব্রজের জীবন। ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য তোমাকে সর্বদা নানা কাজে ব্যাপ্ত থাকিতে হয়। সুতরাং আমার নিকট আসিতে তোমার সময় হয়ে ওঠে না। আমি কেন মান করিব? আমি কথা বলি নাই বলিয়া তুমি মনে করিতেছ ‘মান’? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক। তোমার সহিত কথা বলিব না? তবে কি জ্ঞান? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাই তোমাকে সন্তাষণ করিতে পারি নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

“আমি তাঁহাকে কত তিরস্কার করিলাম তাই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন।”

আবার পর মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ সমাগত এই অনুভবে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। বাহু স্ফূর্তি হইল ‘শ্রীকৃষ্ণ নাই’ দেখিলেন। অত্যন্ত খেদের সহিত বলিতে লাগিলেন—“হে নয়নের আনন্দদায়ক, হে আমার রমণ, হায় হায়, আবার কখন আমি তোমার দর্শন পাইব।”

আমাদের রঘুনাথ এই প্রলাপের সময় গৌরহরির কিরূপ অবস্থা দর্শন করিয়াছিলেন তাহা কবিরাজের অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

“স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।

হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি ইতি উতি চায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত ॥”

মুর্ছায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া হৃৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অপূর্ব বৈচিত্রী সমূহ যাহা দেখিলেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন—

ক্রন্দন জনিত বাষ্পাকুল নেত্রে ঠিক চিনিতে না পারিয়া প্রথমে মনে করিলেন,—এই কি তিনি? আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন “না” মধুর জ্যোতিরামি বোধহয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

আর একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

না, না, এ ছ্যতিরামি নয়। তাহা এত চমৎকার হইতে পারে না। বোধ হয় স্বয়ং মাধুর্যই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

আরও একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

না, ইঁহার দর্শনে মনে ও নয়নে অনির্বচনীয় তৃপ্তি পাইতেছি। কেবল মাধুর্যের এত তৃপ্তি হয় না। আমার মন ও নয়নের আনন্দ বিধান জন্ম নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ‘অমৃত’ আসিয়াছেন।

আরও ভালরূপে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন ‘হস্ত পদ দেখিতেছি’। নিশ্চয়ই ইনি অমৃত নন। অমৃতের হস্ত পদ হয় না। তবে ইনি কে?

সম্যকরূপে অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়-বল্লভ, তাঁহার নয়নানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন।

দাস গোস্বামীর প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব বর্ণনার অন্তে শ্রীল কবিরাজ নিজ অনুভব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

‘কহিবীর কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
এছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।’

—চরিতামৃত

তৃতীয় চিত্র

(“শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর”)

একদা রাত্রিতে দিব্যান্মাদের চরম দশায় ব্যাকুল গৌরহরি গস্তীরা ভিতরে শয়ন করিয়া আছেন। এমন সময় চিত্ত মধ্যে রাস লীলার উদয় হইল। সে স্মৃতি ক্রমেই তাঁহার নয়ন সমক্ষে প্রতীয়মান হইল। ‘শ্যামের’ মনোরম ভাব, পীতাম্বরধারী বনমালা সুশোভিত ‘মদনমোহন’ স্বরূপটি প্রতিভাত হইল।

তাহার পর কৃষ্ণকান্তাবন্দ মণ্ডলাকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ঐ মণ্ডলীর মধ্যস্থলে শ্রীরাধা-সহ কৃষ্ণও নর্তন তৎপর।

‘বৃন্দাবনে রাসলীলা-সহ কৃষ্ণ পাইয়াছি’—এই আবেশে তিনি সমস্ত রাত্রি প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। প্রাতরুথানের সময় উত্তীর্ণ দেখিয়া, গোবিন্দ তাহার অন্তর্মগ্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বাহ্য বোধ করাইলেন। ইহাতে তাঁহার স্মরণ (দিব্য স্মৃতি) কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইল। তিনি বিষণ্ণ হইলেন। অবশেষে মত দেহের অভ্যাসে নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া জগন্নাথ দর্শনের জন্য শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। গোবিন্দ ও ‘রঘুনাথ’ তাঁহার অনুগমন করিলেন; তাঁহারা বুঝিলেন স্মরণ প্রমত্ত গৌরহরির চিত্তে গত রাত্রির স্মরণ আবেশ এখনো তিরোহিত হয় নাই। তখনও রাসলীলার স্মরণ আবেশে তিনি টলিতে টলিতে চলিয়াছেন। সে দিব্য দর্শন এখনো অখণ্ড ভাবে চলিতেছে।

গৌরহরি জগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য তাঁহার নিদিষ্ট স্থান গরুড় স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন।

সে দিন জগন্নাথ দেবের কোন বিশেষ উৎসব ছিল। এই কারণে শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির চত্বর দর্শনার্থী দ্বারা পরিপূর্ণ। একটি পরম ভাগ্যবতী উড়িয়া রমণী জগন্নাথ হইতে বহুদূরে ছিল।

তাহার সম্মুখে ও চতুর্পার্শে বিপুল জন সমাগম দেখিয়া জগন্নাথের শ্রীবদন দর্শনের প্রবল উৎকণ্ঠায় সেই নারী এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিল। গরুড় স্তম্ভে উঠিল। পরম আকাঙ্ক্ষিত জগন্নাথদেবের শ্রীবদন দর্শনে রমণী বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেহে স্মৃতি-লোপ পাইয়াছে। সেই ব্যগ্রতা এত প্রবল হইয়াছে যে ঐ রমণীর একটি পা স্তম্ভে স্থান না পাইয়া নিকটে দণ্ডায়মান গৌরহরির স্কন্ধের উপর গুস্ত করিল। রমণী কি করিতেছে তাহা জানে না। ‘মন’ তাহার দেহকে যেন ত্যাগ করিয়াছে। কোথায় দাঁড়াইয়া কি উপায় করিয়াছে তাহাও জানে না। তাহার একটি পা যে সচল জগন্নাথের স্কন্ধের উপর রাখিয়াছে তাহা সে জানে না। উৎকণ্ঠা ব্যাকুল উন্মুখ মন তাহাকে এই গহিত কার্যের আরম্ভে বাধা দেয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দরও পূর্ব রাত্রির রাসলীলারই প্রকট দর্শনানন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। তাঁহারও বাহু বোধে কোন স্পর্শ জাগিল না। কোন অনুসন্ধান নাই। জানিতেই পারিলেন না যে তাঁহার স্কন্ধে কোন রমণীর পা অথবা কোন বস্তু অপিত হইয়াছে। সামান্যক্ষণ পরে ঐ ঘটনা গোবিন্দের দৃষ্টি গোচর হইল। গোবিন্দ শিহরিয়া উঠিল। মহা সন্ত্রস্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাতে রমণীরও বাহু স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। সে তখন উৎকট ব্যস্ততা ও হৃদয় বিদারক আত্মির সহিত গরুড় স্তম্ভ হইতে নীচে নামিয়া বুক ফাটা ক্রন্দন করিতে করিতে গৌরহরির শ্রীচরণ সমীপে পতিত হইয়া বলিতে লাগিল—‘প্রভু ক্ষমা কর। রক্ষা কর। আমি মহা অপরাধিনী।’

যখন গরুড় স্তম্ভের উপর হইতে স্ত্রীলোকটিকে নামিতে বলে, তখন গোবিন্দের বাক্য গৌরহরির কর্ণ গোচর হয়। তাঁহার আবেশে ছেদ পড়িল। কিন্তু তিনি সেই ঘটনাটির জন্য পরম স্নেহ সন্তোষে গোবিন্দকে মুহূর্ত্তে বলিলেন—

“আদিবৈশ্যা* ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জন ;
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ

পরে আবার সেই স্ত্রীলোকের আন্তি দর্শনে গৌরহরির উক্তি—

“এত আন্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা ।
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে ;
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে ।”

তাহার পর, ভক্তির পরম উৎকর্ষ স্বভাবে, দৈন্ত্যে বলিলেন—

“অহো ! ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায় ;
ইহার প্রসাদে এছে আন্তি আমার বা হয় ।”

(“ভক্তি” যে ‘দীন স্বভাব’ ও ‘অযোগ্যতা বুদ্ধি’ দেয়, তাহার দৃষ্টান্ত আরও আছে । যথা—হস্তিনাপুরে, নারদ ঋষির মুখে যুধিষ্ঠির প্রহ্লাদ চরিত্র-বর্ণন শুনিয়া সদৈন্ত্যে বলিয়াছেন আমার কি এমন ভাগ্য হ’বে যে প্রহ্লাদের ন্যায় আমি ভক্তি লাভ করিব ।)

কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে গৌরহরির দিব্য (স্ফুরণ) দর্শনে স্তম্ভতা আসিল । রাসস্থলি, রাসবিহারী, গোপীমণ্ডলী ইত্যাদি সব অন্তহিত হইল । এবং স্বতন্ত্র দিব্য স্ফুরণ ঘটিল । তিনি কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন । অথচ বাহিরের দৃষ্টিতে তিনি তখন পুরীধামে ও জগন্নাথদেবের মন্দিরে অবস্থিত । যথা—

“কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম ? কাঁহা বৃন্দাবন ?”

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

সু-মধুর রাসলীলা দর্শন অন্তহিত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কুরুক্ষেত্র এবং কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ বলরামের অন্তরূপ দেখিতে দেখিতে

* আদি বৈশ্য আদত চাষা । স্নেহেব গালি এটা অর্থাৎ খাঁটা বোকা ।

গৌরহরির চিত্ত অন্তভাবে ব্যাকুল হইল। ঐ আবেশেই অতি বিষণ্ণ মনে তিনি পুনরায় গস্তীরায় ফিরিলেন। চক্ষু হইতে প্রবলবেগে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। ক্রমেই সেই অশ্রুপাতে দৃষ্টি রোধ হইল। ‘হায় এক পাইলাম এক হারাইলাম’, ‘হায় এক পাইলাম এক হারাইলাম’ এই অবস্থাটিতে গৌরহরির মন ক্ষণে ক্ষণে আনন্দের ও বিষাদের নিকেতন হইল। যতক্ষণ দিব্য স্ফূরণে তিনি রাসস্বলী রাসবিহারী, রাসমণ্ডলী দর্শন করিতেছেন ততক্ষণ তিনি প্রেমে গর্গর্গ। আবার কিঞ্চিৎ বাহ্যাবেশ আসিলে তিনি কুরুক্ষেত্র সহ রাম-কৃষ্ণ দর্শন করিতেছেন। তখন তাঁহার চিত্ত বিষণ্ণ হইতেছে।

আমাদের রঘুনাথের এ লীলা দর্শনের অনুভব, কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

‘উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য ;

দেহের স্বভাবে করে স্নান ভোজন কৃত্য।’

--চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

এইরূপে দিবা অবসান হইল। রাত্রি আসিল। গৌরহরি মরম সখা স্বরূপ ও রামরায়ের দর্শন পাইলেন। নিজ মনের নিগূঢ় কথা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলেন। যথা—

‘প্রাপ্তপ্রনষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা.

যযৌ বিষাদোজ্জ্বিতদেহগেহঃ।

গৃহীতকাপালিকধর্ম্যকো মে,

বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥

(এবার) গৌরহরি সংস্কৃতে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকের যে বাংলা অনুবাদ ‘পয়ারে’ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। সেই পয়ারের আনুগত্যে থোমতি গড়ে নিবেদন করিতেছি—

স্বরূপ ও রামরায়ের কণ্ঠ ধরিয়া পূর্বরাত্রির ঘটনা ও সমস্ত দিনের বিবিধ ঘটনা বর্ণন করিতে করিতে গৌরসুন্দরের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। এখন তিনি (দিব্যোন্মাদে) অভূতপূর্ব বাচাল হইয়া বলিতে লাগিলেন—

“প্রাণের বান্ধব ! কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আমার মন এতই উতল হইয়াছে যে আমার মন, দেহ-গেহ-সুখ, লোকধর্ম্ম (লজ্জা শীলতাাদি) ও বেদধর্ম্ম (পারলৌকিক মঙ্গলজনক কর্ম্মাদি) উপেক্ষা করিয়া কাপালিকদের বেশ ধারণ করিয়াছে।

(কাপালিক সম্প্রদায়ের সাধকরা নৃকপালাস্ত্রির দ্বারা নিম্নিত কুণ্ডল কর্ণে, হস্তে অলাবু পাত্র, কন্থা ধারণ, ভস্মে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত এবং গুরুদত্ত ষাদশ গুণ সূত্রে বাঁধা ‘দণ্ড’ হস্তে এবং মস্তকে বস্ত্রখণ্ডের ঝুলনা থাকে। তাঁহারা একান্তে নিরঞ্জন আত্মার চিন্তা করিয়া থাকেন ও তাঁহাদিগের শিষ্যগণ গার্হস্থ্যশ্রম হইতে যাহা ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করে, তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন।)

আমার মন প্রথমে রাসবিহারী কৃষ্ণকে পাইয়াছিল, পরে হারাইয়াছে তাই সেই বিষাদে দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন।

কাপালিকগণ কর্ণে শুভ্র কুণ্ডল ধারণ করে, আমার মন-রূপ-যোগী শ্রীকৃষ্ণের সু-মধুর লীলাবলীর সর্ব্বদা ‘শ্রবণ’ কর্ণাভরণ করিয়াছে। ভিক্ষা গ্রহণ ও তৃষ্ণার জল পান জন্য কাপালিকদের হাতে অলাবু পাত্র থাকে। আমার মনরূপ মহাবাউলে কাঁধেও ঐরূপ একটি ঝুলি আছে, “কোথায় কৃষ্ণ পাইব ? কখন পাইব ?” এইরূপ আশাই মনরূপ বাউলের ঝুলি। আর কৃষ্ণমাধুরী আশ্বাদনের লালসাই তৃষ্ণা নিবারণের সেই পাত্র।

গায়ে দেওয়ার নিমিত্ত বাউলদের কাঁথা থাকে। আমার মনরূপ বাউলের (দশ দশার একদশা) ‘চিন্তা’ রূপ কাঁথা আছে। কাপালিক

গায়ে ভস্ম মাখে । তাহাতে তাহার শরীর মলিন হয় । আমার মন বাউলের কৃষ্ণবিরহে রজে গড়াগড়ি দিয়া শ্রীঅঙ্গ মলিন ।

মনরূপ বাউলকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে ? কোথায় যাইতেছ ? তাহা হইলে সে 'হা হা কৃষ্ণ' বলিয়াই উত্তর দেয় । প্রশ্নের সঙ্গে এই উত্তরের সম্পর্ক থাকে না । অর্থাৎ প্রলাপই তাহার উত্তর ।

কাপালিকদিগের হাতে যেমন 'দ্বাদশ' নামক দণ্ড থাকে, আমার মনরূপ বাউলের হাতেও তদ্রূপ 'উদ্বেগ' রূপ দণ্ড আছে । কাপালিকের মাথায় যেমন বুলুনি—আমার মনরূপ বাউলের শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির নিমিত্ত চঞ্চলতা বা 'লোভ'* রূপ বুলুনি আছে ।

কাপালিকদিগকে পরের ঘরে ফল মল্য অন্নাদি ভিক্ষা করিয়া দেহ রক্ষা করিতে হয় । ভিক্ষা না मिलিলে তাহাদিগকে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিতে হয়, একারণ, তাহাদিগের শরীর কুশ হয় । আমার মনরূপ বাউলের ভক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণ-নাম-গুণ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ এই ভিক্ষা প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত মিলে না । তাই শ্রীঅঙ্গের কুশতা ।

কাপালিকগণ লোকালয়ে বিচরণ কালে তর্জী (যথা শ্রুত অর্থে যাহা বুঝায় প্রকৃত অর্থ তাহা অপেক্ষা অন্য অর্থ বোধ বাক্য) আবৃত্তি করিয়া থাকেন । আমার মনরূপ বাউল বহুবিধ অর্থসম্বিত ব্রজ-লীলা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের শ্লোকাবলী আবৃত্তি করে ।

‘দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,

শিষ্য লঞা করিল গমন ;

মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,

সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ।’

—চরিতামৃত অঙ্ক ১০ম

* তৃষ্ণা, লোভ ও আশা—

কোথায় ইষ্টবস্তু পাইব, কখন পাইব, মনের এইরূপ ভাবকে 'আশা' বলে । ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ইচ্ছা তাহাকে 'তৃষ্ণা' বলে । আর ইষ্ট বিষয়ে, বা ইষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত যে মনের চঞ্চলতা তাহাকে 'লোভ' বলে ।

পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় সর্বদা মনের অধীন শিষ্যবৎ । সে কারণ
কাপালিকদিগের যেমন শিষ্য থাকে তদ্রূপ দশ ইন্দ্রিয় মনরূপ
বাউলের শিষ্য । কাপালিকগণ নিজেদের গৃহ ও গৃহস্থিত ধন সম্পত্তি
ত্যাগ করিয়া বনে যায় । আমাদের দেহই মনের গৃহ । আমার
মনরূপ বাউল এই শ্রীঅঙ্গ ত্যাগ করিয়া কাপালিক হইয়াছে ।

কাপালিকরা বনে যায় । আমার মনরূপ বাউল রাই-কানুর
বিন্যাসভূমি বৃন্দাবনে গিয়াছে । কিন্তু 'মহাবাউল' । (অর্থাৎ শাস্ত্র
বর্ণিত দিব্যোন্মাদের উন্মাদ দশারও চমৎকারী কোন এক অনির্বচনীয়
দশা প্রাপ্ত হইয়াছে ।) মনরূপ এই 'মহাবাউল' দশার আনুগত্যে বা
পরিচালনায় ইন্দ্রিয়গণও মহা উন্মাদবৎ আচরণ করিতেছে । যথা—

চক্ষু যে কোন বস্তুতেই নিষ্কিপ্ত হউক না কেন, সেই বস্তুর রূপ
দেখিতে পায় না, দেখে রাসবিহারীর লীলা, কেহ কোন কথা বলিলে
কর্ণ সে কথা শুনিতে পায় না, সে শোনে বংশীনাদ ও কৃষ্ণের নর্ম্মবচন ।
কোন জিনিষের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে নাসা সেই জিনিষের
গন্ধ বুঝিতে পারে না, সে শ্রীকৃষ্ণঅঙ্গ গন্ধই অনুভব করে । এইরূপ
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দশা । আমার মহা উন্মাদ মনরূপ বাউল বৃন্দাবন
গিয়াছে ।

'বৃন্দাবনে প্রজাগণ যত স্থাবর জঙ্গম

বৃক্ষলতা গৃহস্থ আশ্রমে ।

তার ঘরে ভিক্ষাটন ফলমূল পত্রাশন

এই বৃত্তি করে শিষ্য সনে ॥'

—চরিতামৃত অস্ত্য ১৪শ

আমার মনরূপ মহাবাউল তাহার শিষ্য ইন্দ্রিয়গণের সত্বিত
ভিক্ষাবৃত্তিতে স্থাবর জঙ্গম গুল্মলতাতির দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ
করিতেছে ।

কৃষ্ণ-অনুরাগিণী ব্রজরামাগণ চক্ষুদ্বারা অসমোদ্ধ মাধুর্যময় বংশী-বদন শ্যামরূপ, কর্ণদ্বারা রাসবিহারীর মধুর বচনামৃত, মুরলীনাদাদি ; নাসিকা দ্বারা কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্কের সৌরভ, জিহ্বা দ্বারা অধর-রস, চর্কিত তাম্বুল ও অধরামৃত, ত্বক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা নিজ নিজ গাত্র স্পর্শ এই সব অপ্ৰাকৃত অমৃত নিরন্তর আশ্বাদন করেন। আমার মনরূপ বাউল চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক যে পাঁচটি শিষ্য আছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণ কান্তাদের ভুক্তাবশেষ ভিক্ষা করিয়া আনে। মনরূপ বাউল তাহাতেই জীবন ধারণ করে।

নির্জর্জন কুটিরে কাপালিকবৃন্দ যেমন শিষ্যসহ মহা যোগ অভ্যাসে রত থাকেন আমার মনরূপ বাউল শিষ্যগণ সহ শূন্য কুঞ্জমন্দিরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সঙ্গ পাইবার লোভে সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটায়। চক্ষু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শ্রীকৃষ্ণ রূপমাধুরী দর্শন নিমিত্ত। কর্ণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে সু-মধুর কণ্ঠস্বর পাইবার নিমিত্ত। নাসিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে শ্রীঅঙ্কগন্ধ পাইবার নিমিত্ত। জিহ্বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে অধরসুধা পানের জন্ম। ত্বক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কোটি চন্দ্র সূশীতল অঙ্গ স্পর্শ লাভের জন্ম—যদি বা কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হন এই আশা।

কৃষ্ণ বিরহে আমার মন দেহ শূন্য করিয়া কাপালিকদের গায় পলায়ন করিয়াছে।

এইরূপ নিজের অবস্থা বর্ণনাশ্বে গস্তীরাবিহারী গৌরহরি নীরব হইলেন।

বিরহ জ্বালা উপশমের একমাত্র ঔষধ বা উপায় ‘মিলন প্রসঙ্গ’। একারণ, স্বরূপ ও রামরায় পর্য্যায় ক্রমে কৃষ্ণলীলা গান ও কর্ণামৃত, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জগন্নাথ বল্লভ নাটক আদি গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় অর্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইলে পর রামরায় ও স্বরূপের মনে হইল যেন গৌরহরির কিছু বাহ্য-জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন তাহারা

গৌরহরিকে ভিতর প্রকোষ্ঠে শয়ন করাইলেন। রামরায় বিশ্রাম জন্ম নিজ গৃহে গমন করিলেন। গোবিন্দ এবং শ্রীরঘুনাথ সহ 'স্বরূপ' গম্ভীরার দরজার নিকট বাহিরে শয়ন করিলেন।

‘মহামন্ত্র’ নামে পূর্বরাগ হইতে সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান পর্য্যন্ত প্রতিটি অবস্থা মূর্তি ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন।) গৌরহরি (সমস্ত) রাত্রি জাগিয়া একাকী উচ্চৈঃস্বরে ‘নাম’ করিতে লাগিলেন।

ক্লান্তিতে স্বরূপ, রঘুনাথ এবং গোবিন্দ তিন জনেই কিছু সময়ের জন্ম নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের যখন নিদ্রাকর্ষণ ঘটে তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা গৌরহরির উচ্চনাম সংকীর্ণ শুনিয়াছেন। স্বরূপ চেতনা পাইয়া অনুভব করিলেন যে গৌরহরির উচ্চ নাম সংকীর্ণ বন্দ হইয়াছে। তিনি মনে করিলেন আমাদের ভাগ্যে হয়ত গৌরহরি একটু শয়ন করিয়াছেন। নিজের অনুমান সত্য কি না তাহা নিশ্চিত-রূপে নির্ধারণ করিবার জন্ম গৌরহরির শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া দেখিলেন বিছানায় বা শয়ন কক্ষ মধ্যে গৌরহরি নাই। আশ্চর্যের ঘটনা। বিরাট বাড়ী। তিনটি বড় বড় প্রাচীর লঙ্ঘন করিলে তবে বাহিরে যাওয়া যাইবে। সমস্ত দরজাই শৃঙ্খল-অর্গলে আবদ্ধ। তিনি উদ্বিগ্ন চিত্তে গোবিন্দ ও রঘুনাথকে জাগাইলেন। প্রদীপ জ্বালা হইল। প্রথমে উহার গম্ভীরার অভ্যন্তরে সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। তাহার পর ব্যাকুল প্রাণে রাস্তায় নামিলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরে একস্থানে গৌরহরির শ্রীবিগ্রহ ধূলায় লুপ্তিত। ঐরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহাদের বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন মন আরও কৌতূহলাক্রান্ত হইল। তাঁহার তৎকালীক অবস্থা দেখিয়া আরও ব্যাকুল হইলেন। দাস রঘুনাথ সে দৃশ্যের যে দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন তাহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের অঙ্করে আজও ধরা আছে। যথা—

‘প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয় ;
অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাহি বয় !’

(প্রভুর দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে। দেহ পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে। দেহে বুদ্ধি চেতনা নাই। নাশায় বুদ্ধি শ্বাসও বহিতেছে না।)

‘একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত ;
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম আছে মাত্র তাত !’

(কেবল যে দেহই পাঁচ ছয় হাত লম্বা হইয়াছে তাহা নহে ; প্রভুর দু’টি হাত এবং দু’টি চরণ তিন তিন হাত পরিমাণ লম্বা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে হাতের কনুই, বাহুমূল, গ্রীবা, কটি, প্রভৃতি সর্বস্থানে যে সকল অস্থি গ্রন্থি আছে সে সমস্ত শিথিল হইয়া গিয়াছে। প্রতিটি সন্ধি কেবল চর্ম দ্বারাই মাত্র অস্থির সহিত যোগ রহিয়াছে। কিন্তু দুইখানা অস্থির মধ্যে অনেকটা ফাঁক হইয়া গিয়াছে।) যথা—

“হস্ত-পদ-গ্রীবা-কটি-সন্ধি যত ;
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ।”

(প্রভুর হস্ত, পদ, গ্রীবা, কটি, প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে যত অস্থি গ্রন্থি আছে প্রত্যেকটিতেই অস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান শিথিল।)

“চর্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা ;
তুঃখিত হইলা সভে প্রভুকে দেখিয়া ।”

(অস্থি সন্ধির উপরে কেবল চর্মই লম্বা হইয়া দুইখানা অস্থির সংযোগ রাখিয়াছে। প্রতি গ্রন্থির চর্মও এক বিষত লম্বা হইয়াছিল।)

এ দৃশ্য দর্শনে স্বরূপ রঘুনাথ ও গোবিন্দ কিরূপ তুঃখ দশা প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনার ভাষা হয় না। (রাস রজনীতে বিজন বনে কৃষ্ণ পরিত্যক্ত শ্রীরাধায় এরূপ দশা প্রকট হয় নাই এবং তাহার দর্শনে চন্দ্রাবলী আদি নিখিল কৃষ্ণকান্তাদেরও এত দুঃখ হয় নাই।)

‘মুখে লাল ফেনা প্রভুর উত্তান নয়ন ;

দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ।’

(প্রভুর মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লাল নিঃসৃত হইয়া ফেনের আকার ধারণ করিয়াছে। চক্ষুর তারা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দর্শনে স্বরূপাদির প্রাণ মন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। প্রভুকে উঠাইতে যাইয়া নিজেরাই আকুল আর্তনাদ করিয়া ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িয়া প্রভুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

মহাধীর ও বিচক্ষণ স্বরূপ প্রভুর বাহু সম্পাদনের জন্য তাঁহার কর্ণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে মুহঁ মুহঁ ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিতে লাগিলেন। দীর্ঘ সময়ের পরে সেই কৃষ্ণ নাম গৌরহরির হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি মুখে ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’ বলিতে বলিতে চমকিত দৃষ্টি করিয়া উঠিলেন। যে ভাবের বিক্রমে অস্থি গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়াছিল, বাহুজ্ঞান হওয়াতে সে অবস্থার পরিবর্তন হইল। শ্রীঅঙ্গটি আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বাহু জ্ঞান লাভের পর নিজেকে ও স্বরূপ, রঘুনাথ ও গোবিন্দকে রাত্রি কালে সিংহদ্বারে ঐ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—
“আমরা এখন কোথায়? তোমরা এখানে কি করিতেছ?”

স্বরূপ বলিলেন, “উঠ! বাড়ী চল! সেখানে সমস্ত জানাইব।” এই বলিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ নিজেরা ধরিয়া বাসায় আনিলেন। পারে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা তাহাকে জানাইলেন। স্বরূপের মুখে নিজের অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন—

‘কি আশ্চর্য্য! কি হইয়াছে কি করিয়াছি আমার কিছুই মনে পড়িতেছে না। এই মাত্র মনে আছে যে, দেখিলাম শ্রীকৃষ্ণ আমার

সাক্ষাতে বিদ্যমান । তাহাও অতি অল্প সময় জন্ম (বিদ্যৎ চমকিতে যতটুকু সময় লাগে ।)

এইরূপ কথা বার্তা হইতেছে এমন সময় নিশান্তে জগন্নাথদেবকে জাগাইয়া আচমনান্তে যে শঙ্খ বাজান হয়, তাহা বাজিয়া উঠিল । স্নানাদি নিত্যকর্ম সমাধা করিয়া গৌরহরি সেবকদের সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন ।

এই লীলা বর্ণনার অন্তে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজ অনুভব অকপটে বলিয়াছেন । যথা—

এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ।

লোকে নাহি দেখে, এছে শাস্ত্রে নাহি শুনি ;
হেন ভাব ব্যক্ত করে গ্যাসীচূড়ামনি ।

শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ;
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ।

রঘুনাথদাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি ;
তার মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ।

— চরিতামৃত অন্ত্য ১৪শ

চতুর্থ চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

‘চটক পর্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে ;
ধাঞা চলে আৰ্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ।’

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

গষ্ঠীরার গুণুনিধি গৌরহরি প্রত্যহই সমুদ্র বারিতে স্নান করিতে যান । একদা সমুদ্র গমনের পথের অদূরে অবস্থিত চটক পর্বতের (বালুকা স্তূপ) প্রতি হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল । (নিরস্তর) দিব্য স্মৃর্ত অবস্থায় এই বালুকা পর্বতটিকে দেখিলেন ব্রজের ‘গোবর্দ্ধন পর্বত’ । এবং শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীতে মুঞ্চচিত্তা গোপীর আবেশে ‘গোবর্দ্ধনের’ সৌভাগ্য বর্ণনার একটি শ্লোকরত্ন উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি ছুটিয়া চটক পর্বত অভিমুখে চলিলেন ।

শ্লোকরত্নটি :—

হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ষ্যা,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহগাগেণয়ো স্তয়ো-র্ষৎ,
পানীয়সূযবসকন্দর কন্দমূলৈঃ ॥

—ভাঃ ১০।২।১।১৮

(অনুবাদ :—সখি ! এই অদ্রি (‘পর্বত’) গোবর্দ্ধন হরিদাস-বৃন্দের মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ । যেহেতু রাম ও কৃষ্ণের চরণ স্পর্শে হৃষ্ট হইয়া উত্তম জল ও কোমল তৃণ দ্বারা গোগণ ও গো-বৎসগণের সেবা করিতেছেন । আবার, উপবেশন ও ক্রীড়া নিমিত্ত গুহা, কন্দ, মূল, ফল, ফুল, রত্ন আদি দ্বারা সখা ও সখিবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ।)

গৌরহরি বায়ুর গায় দ্রুতবেগে ঐ চটক পর্বত অভিমুখে ছুটিলেন। ঐ অবস্থা দর্শনে গোবিন্দ ও রঘুনাথ ব্যাকুল হৃদয়ে, উচ্চ চীৎকার করিয়া ঘটনাটিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। গৌরহরির শ্রীঅঙ্গটিকে কোনরূপ আঘাত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গোবিন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তাঁহার সঙ্গ পাইতেছেন না। চারিদিক সোরগোল হইল—

“মহাপ্রভু ছুটিতে ছুটিতে কোথায় গেলেন ?”

ভক্তবৃন্দ যিনি যেখানে ছিলেন, গৌরহরি যে দিকে গিয়াছেন, সকলে সেই দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। ইহাদিগের মধ্যে আছেন— স্বরূপ, জগদানন্দ, গদাধর পণ্ডিত, রামাই, নন্দাই, শঙ্কর পণ্ডিত, পরমানন্দ পুরী, ভারতী গোসাঞি, কাশীশ্বর ও ‘রঘুনাথদাস’। খঞ্জ ভগবান আচার্য্য, তিনিও ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

প্রেমাবেশে গৌরহরি প্রথমে খুব দ্রুত ছুটিতেছিলেন কিছু দূর যাওয়ার পর অভূতপূর্ব স্তম্ভ ভাবের উদয় হওয়ায় তিনি আর চলিতে পারিলেন না। পরবর্তী অবস্থায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে যে অবস্থা হইল, সে লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দাস গোস্বামীর বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীর লিপিতে আজও সাক্ষী দিতেছে। যথা—

‘প্রতি লোমকূপে মাংস ব্রণের আকার ;
তার উপরে রোমোদগম কদম্ব প্রকার ।’

—চরিতামৃত অস্ত্য ১৪শ

অশেষ বিশেষে আশ্বাদনময় লীলায় ভাবনিধি গৌরহরির ‘পুলক’ উদগমে প্রতিটি রোমকূপের মাংস ফুলিয়া ফোঁড়ার মত হইয়াছে। তাহার উপরে রোমের শিহরণে রোমরাজি কণ্টকের আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে, প্রতিটি রোমকূপ কদম্ব পুষ্পের আকার ধারণ

করিয়াছে। রোমগুলিকে কদম্ব পুষ্পের কেশরের মত দেখাইতে-
ছিল। অদ্ভুত ! অপূর্ব !

আবার—

‘প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ;
কণ্ঠ ঘর্ষর, নাহি বর্ণের উচ্চার।’

অর্থাৎ, প্রতি রোমকূপ হইতে এত অধিক পরিমাণে এবং এত
বেগে ঘর্ষ বাহির হইতেছিল যে ঘর্ষের সহিত রক্তের ধারাও দেখা
যাইতেছিল। এবং কণ্ঠ হইতে অননুভূত ঘর্ষর শব্দ,—কোন অক্ষর
উচ্চারিত হইতেছিল না।

আবার—

‘ছুই নেত্র ভরি অক্ষ বহয়ে অপার ;
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা ধার।’

ছুইটি নয়নের ধারা দেখিয়া মনে হয় একটি গঙ্গার ধারা, অপরটি
যমুনার ধারা। উভয় নয়ন কমল ভাসাইয়া যেন সমুদ্ররূপ চরণ
কমলে মিলিত হইল।

আবার—

‘বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অক্ষ ;
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র তরঙ্গ।’

এমন বৈবর্ণ্য দশা যে, গৌরহরির সু-উজ্জ্বল স্বর্ণ কান্তি শঙ্খের
মত সাদা মনে হইল। সেই শ্রীঅক্ষে প্রবল কম্পন। এ কম্পনের
মাধুর্য্য উপমা দ্বারা আমাদের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।
যথা—

সমুদ্রের জল ডর ডর করিয়া মধুর ছন্দে অনবরত কাঁপে। গৌর-
সুন্দরের শ্রীঅক্ষও নয়নাভিরাম ছন্দে থর থর করিয়া অনবরত
কাঁপিতেছিল।

গোবিন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে আমাদের ‘রঘুনাথ’ উপরি বর্ণিত দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে অতঃপর দেখিলেন—

‘কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা
তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ।’

কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরহরি মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দও সেখানে পৌঁছিয়া জল পাত্রের জল গৌরহরির শ্রীমুখকমল, নয়ন ও মস্তকে এবং সর্ব অঙ্গে দিলেন । বহির্বাসের সাহায্যে শ্রীঅঙ্গে জলসিক্ত অঞ্চলের বীজন করিতে লাগিলেন ।

ইত্যবসরে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দও আসিয়া পঁছিয়াছেন । মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শনে তাঁহারা সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন ।

লোকে, কোন শাস্ত্রে কিম্বা ইতিপূর্বে গৌরহরির শ্রীঅঙ্গেও এতাদৃশ আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক ভাব তাঁহারা দেখেন নাই । দাস গোস্বামীর এই অনুভবও কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে ধরা আছে । যথা—

“প্রভুর অঙ্গে দেখ অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার ;
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈল চমৎকার ।”

আবাল্যাৎ গৌরহরির চরিত্রে দেখা যায় তাঁহাকে (অর্থাৎ রাইকানুর আশ্ মিতান স্বরূপকে) ‘সুস্থ’ করিবার মহৌষধি ‘হরিনাম’ অর্থাৎ চিন্ময় উপচারে সেবা ।

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহার কর্ণের নিকট ব্যাকুল প্রাণে, মধুর উচ্চৈঃস্বরে ‘নাম সঙ্কীৰ্ত্তন’ করিতে লাগিলেন । এবং তাঁহার মুচ্ছিত শ্রীঅঙ্গ হইতে রক্ত, সিক্ত বসন সহযোগে অপসারণ করিয়া অপর একটি বস্ত্রে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন এবং সু-শীতল জলদ্বারা সর্ব অঙ্গ পুনঃ পুনঃ

সম্মার্জন করিতে লাগিলেন। বহুক্ৰণ যাবৎ ‘মনের সেবা’ শ্রীনাম সঙ্কীৰ্ত্তন এবং ‘শ্রীঅঙ্কের সেবা’ সু-শীতল জলে অঙ্গ সম্মার্জন ফলে, অকস্মাৎ ‘হরিবোল’ বলিয়া গৌরসুন্দর উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ঐ আনন্দময় অবস্থা দর্শনে সমাগত সেবক ও পার্শ্বদবৃন্দ মহা আনন্দ ও উল্লাসে চতুর্দিক হইতে মঙ্গল সূচক ‘হরি’ ‘হরি’ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্ত ভাবনিধি শ্রীগৌরাজ্ঞ এতক্ৰণ যে লীলার দিব্য স্ফূর্ত রসে মগ্ন ছিলেন তাঁহার অন্তর্ধানে ছুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যে লীলা দেখিতে চান তাহা দেখিতে পাইতেছেন না। কিছু পরে একটু বাহু দশা আসিলে তিনি নিজ সেবক ও পার্শ্বদবৃন্দের উপস্থিতি অনুভব করিলেন। নিজ প্রাণ সখা স্বরূপকে চিনিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলেন—

“গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিল ?”

এ বাক্য—

ক্রোধ, দঃখ ও অভিমানের পরিচয় দেয়। পার্শ্বদবৃন্দ নির্বাক বিস্ময়ে তাঁহার চাঁদ বদন দর্শন করিতেছেন।

গলায় স্বর আক্ষেপে ভরা গৌরহরি নিজেই বলিতেছেন—

“লীলাপরায়ণ কৃষ্ণ পাইয়াও ছুর্ভাগ্যক্রমে সাধ মিটাইয়া তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না।

আরও বলিলেন—

স্বরূপ ! এই স্থান হইতে আজ আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, গোচারণের ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ আছেন কিনা তাহা সঠিক জানা। গোবর্দ্ধনে যাইয়া দেখিলাম তিনি একটি শিলার উপরে সুখে উপবেশন পূর্বক বেণু বাজাইতেছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া গিরি সানুদেশে ধেনুবৃন্দ বিচরণ করিতেছে।

এমন সময়ে তোমাদের কোলাহলে আমার সেই দিব্য ক্ষতি
অন্তর্হিত হইল।

অতপর ক্রোধে বলিলেন—

‘কেন বা আনিলে মোরে বৃথা ছুঃখ দিতে ?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলু দেখিতে।’

তাহার পর অভিমানে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে
অভিমানে কাঁদিতে দেখিয়া স্বরূপাদি সকলেও ক্রন্দন করিয়া
উঠিলেন। যথা—

“তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন”

এমন সময়ে পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী তথায় আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। এখন গৌরহরিরও পূর্ণ বাহু আবেশ ঘটিয়াছে।
তিনি সম্মুখে তাঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহারাও স্নেহা-
লিঙ্গন দানে তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। কৌতুকে গৌরহরি
প্রশ্ন করিলেন—

“দৌহে কেন আইলা এত দূরে ?”

তাঁহারাও পরিহাস বাক্যে জবাব দিলেন—

“তোমার নৃত্য দেখিবারে”

এ বাক্য শ্রবণে গৌরহরি লজ্জিত হইলেন।

অতঃপর সকলে মিলিয়া সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। সেদিন
মধ্যাহ্নে সকলে গৌরহরির আবাসেই প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন।

‘স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা,
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা।’

এই লীলা বর্ণনার অন্তে কবিরাজ গোস্বামী নিজ অনুভব
বলিয়াছেন। যথা—

“এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা ;
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ?

সংক্ষেপ করিয়া করি দিকদর্শন।”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ

—

পঞ্চম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

প্রতি দিনের মতই অতি প্রত্যুষে নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া গোবিন্দ আদি সেবকবৃন্দের সঙ্গে গম্ভীরার গুপ্তনিধি শ্রীগৌরসুন্দর যেমন জগন্নাথ দর্শনে যান তেমনি যাইতেছেন। তাহারই মধ্যে এক দিন এক অভাবনীয় ভাবের আবেশে গৌরহরি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একক জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন। সিংহদ্বারের ‘দলাই’ বা দ্বারপাল গৌরসুন্দরের দর্শন মাত্রেরই তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিল। গৌরসুন্দরের কোন বাহ্যানুসন্ধান নাই। তিনি পরম স্নেহভরে দ্বারপালের হাত ছুখানি ধরিয়া সকাতরে বলিলেন—

“সখি ! আমার প্রাণবল্লভ কোথায় ? আমাকে একবার দেখাইয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।”

‘রাই-কানুর আশ্-মিটান-স্বরূপ’ গৌরহরির মনের ভাব (যেন) তাঁহার মনোচোরা কৃষ্ণের সন্ধান দ্বারপাল বেশে সখিটি জানেন। ভাগ্যবান দ্বারবান কিন্তু গৌরহরিকে উত্তমরূপে জানে ও চেনে। তাই গৌরহরির কথা শুনিয়া দ্বারপাল নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিল। পরম সম্মুখে বলিল,—

“সখি ! তোমার ব্রজেন্দ্রনন্দন এই মন্দিরেই আছেন। আমার সাথে এস দর্শন করাইয়া দিতেছি।”

গৌরহরি তখনও দ্বারপালের হাত ধরিয়াই আছেন, তাঁহার মুখে নিরন্তর সেই একই কথা,—

“সখি ! আমার প্রাণনাথ কোথায় ? দেখাইয়া (আমার) প্রাণ রাখ।”

দ্বারপালের হাত ধরিয়াই তিনি জগমোহনে আসিলেন। গরুড় স্তম্ভের নিকট গৌরহরিকে দাঁড় করাইয়া দ্বারপাল গৌরহরির আবেশের পুষ্টির অনুকূল নিম্নস্বরে বলিল,—

“প্রভু ! ঐ দেখ তোমার প্রাণনাথ শ্রীপুরুষোত্তম । এইখানে দাঁড়াইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তোমার প্রাণনাথকে মনের সাথে দেখ ।”

গৌরহরির চঞ্চল দৃষ্টি সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেবের বদন কমলে অর্পিত হইল । অনির্বচনীয় দিব্য স্ফুরণে তিনি দেখিতেছেন—
‘মুরলী বদন শ্রীকৃষ্ণ’ ।

এমন সময় গোবিন্দ, রঘুনাথ আদি সেবকবৃন্দ তাঁহার সন্ধানে শ্রীমন্দিরে আসিয়াছেন । তাঁহারা তাঁহাদের পরাণনাথকে গরুড় স্তম্ভের নিকট দর্শন পাইয়া নিশ্চিত হইলেন । প্রয়োজন বোধে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের রক্ষা ও সেবার জন্য অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গৌরমুন্দরের শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব ভাবাবলী দর্শন করিতে লাগিলেন ।

এই লীলাটির ‘গৌরব’ ও ‘গম্ভীরতা’ আমাদের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব । কেবল এইটুকু প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে,—ষোড়শ বর্ষব্যাপী নীলাচলবাসী সচল জগন্নাথ গৌরহরির অন্তরঙ্গ সেবক দাস গোস্বামী গৌরহরির অদর্শনের পর যখন শ্রীকৃষ্ণ তটে অবস্থান করেন, সেই সময় তাঁহার গৌর-বিরহ-ব্যথা প্রশমনের জন্য স্বরচিত ‘শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু’ বা গৌর-মিলন-প্রসঙ্গ নিত্য স্মরণ ও কীর্তন করিতেন তাহাতে ৭ম শ্লোকে এই লীলাটি স্থান পাইয়াছে ।

ষষ্ঠ চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

এ স্থলে বর্ণনীয় লীলারত্নটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে অন্ত্য খণ্ডের ১৭শ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন ।

ঐ পরিচ্ছেদের বন্দনা শ্লোক,—

‘লিখ্যতে শ্রীল-গৌরশ্য অত্যদ্বুতমলৌকিকং ।

যৈ দৃষ্টং তনুখাৎ শ্রদ্ধা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং ॥’

অর্থ :—শ্রীল গৌরশ্য (শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের) অত্যদ্বুতং (‘শাস্ত্রে নাহি জানি’) অলৌকিকং (এবং অলৌকিক) দিব্যোন্মাদচেষ্টিতং (রাই-কানু একীভূত স্বরূপের দিব্যোন্মাদ চেষ্টা) যৈঃ (যাহাদিগ কর্তৃক) দৃষ্ট (দৃষ্ট হইয়াছে এবং এই অচিন্ত্য বিভুলীলা অন্তকে দর্শন করাইতে সমর্থ) তনুখাৎ (তাঁহাদের মুখে) শ্রদ্ধা (শুনিয়া) লিখ্যতে (লিখিত হইতেছে) ।

এক রাত্রির ঘটনা :

(প্রতি রাত্রিতে গঙ্গীরা গৃহের-নিধি গৌরহরির সহিত স্বরূপ ও রামরায় কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিতেন । এবং তাঁহাকে শয়ন করাইয়া বিশ্রামার্থে নিজেরা নিজ নিজ আবাসে যাইতেন । রামরায়ের নিজ ভবন জগন্নাথ বল্লভে এবং স্বরূপ থাকেন গঙ্গীরার সংলগ্ন একটি কুটিরে । রঘুনাথ তাঁহারই সহচর ।)

গন্তীরা* অভ্যন্তরে শয়ন করিয়া গৌরহরি উচ্চ নাম সংকীর্ণন করিতেছেন। গোবিন্দ গৌরহরির শয়ন কক্ষের বাহিরে শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ মধ্যেই গোবিন্দের নিদ্রাকর্ষণ ঘটিল।

এমন সময়ে, 'নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ' 'মুক্তিমান প্রেম বৈচিত্র্য' স্বরূপ 'গৌরহরি' হঠাৎ শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি। অপ্রাকৃত অলৌকিক আকর্ষক সেই বেণুধ্বনি। তিনি বেণুধ্বনির দিক নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হইলেন। (গৌরহরির শয়ন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তিনটি ফটক পার না হইলে রাস্তায় আসা যায় না। চতুর্দিকের সমস্ত প্রাচীরও উচ্চ উচ্চ। গৌরহরির সহজ পথ অবলম্বন করিয়া বাহিরে যাইবার (তখন) কোন উপায় ছিল না।) ভাবাবেশে সহজ পথে গমনের চেষ্টাও তাঁহার অনুসন্ধানে জাগিল না। তিনি এখন শাস্ত্র অগোচর 'মহাবাতুল'। তাই তিনি ছাদে উঠিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক সদর রাস্তায় নামিলেন।

(গন্তীরা মন্দির হইতে প্রায় এক 'ফার্লং' দূরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার। গন্তীরা হইতে সিংহদ্বার পর্য্যন্ত পথ কৃষ্ণ বেণুনাতে উন্মাদিনী গৌর-কিশোরী কি ভাবে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার দ্রষ্টা কেহ ছিল না। এ কারণ সে সু-মধুর গমন ভঙ্গীর বর্ণনা গ্রন্থে অনুল্লিখিত।)

সিংহদ্বারের দক্ষিণে যে স্থানে তেলেক্সা (অন্ধ্র) দেশীয় গাভীগণ দিবা রাত্র ঘুরিয়া বেড়ায়—

সেই স্থান পর্য্যন্ত গিয়াই (সম্ভবতঃ) গৌরহরির বাহ্য আবেশ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল। যাহা হউক—

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি

* ষাহারা কাশী মিশ্রের আবাস শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মঠটি পুরীধামে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা 'গন্তীরা' (গৃহ অভ্যন্তরে নির্জন প্রকোষ্ঠ, বাংলাদেশে যাহাকে 'চোরা' কুঠরী বলা হয়) দর্শন করিয়াছেন।

গৌরহরির উচ্চ সংকীর্ণন শুনিতে না পাইয়া শঙ্কিত হইলেন । সর্ব প্রথমে স্বরূপ গোস্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন । যথা—

‘স্বরূপে বোলাইল কপাট খুলিয়া,’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

অতঃপর ‘স্বরূপ’ আসিয়া দীপ জ্বালিলেন । তিনি গোবিন্দ, ‘রঘুনাথ’ শঙ্কর আদি সেবকবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া গন্তীরা মধ্যে সর্বত্র গৌরহরির অন্বেষণ করিলেন । সন্ধান না পাইয়া তাঁহারা পথে নামিলেন । চতুর্দিকে গভীর দৃষ্টি রাখিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সকলের চিত্ত তখন ব্যাকুলতায় ও উদ্বেগে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । তাঁহারা ধীরে ধীরে সিংহদ্বারের দক্ষিণ দরজায় আসিলেন । তাঁহাদের গতি স্তম্ভিত হইল .

দেখিলেন—অদূরে তেলেঙ্গা গাভীরূন্দের মধ্যস্থলে অলৌকিক দিব্যান্মাদ চেষ্ঠায় কূর্মাকৃতি ধারণ করিয়া গৌরহরি ধূলায় লুপ্তিত—পড়িয়া আছেন । কেবল অঙ্গ জ্যোতি দর্শনেই বুঝিলেন ঐ তাঁহাদের প্রাণের অধীশ্বর প্রভু । দিব্যস্বৃষ্টি ও অনির্বচনীয় আবেশে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাইতেছে না ।

গৌরহরির অন্তরঙ্গ সেবক ও এই লীলার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা “দাস গোস্বামী”র দর্শন ও অনুভব শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অঙ্করে ধরা আছে । যথা—

‘পেটের ভিতর হস্ত-পাদ কূর্মের আকার ;

মুখে ফেন, পুলকঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

অর্থাৎ—রাই-কাহুর ভাব মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের হস্ত, পদ সমস্তই (যেন) শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়াছে । দূর হইতে তাঁহারা

দেখিতেছেন যেন একটি স্বর্ণ-উজ্জ্বল 'কচ্ছপ' পড়িয়া আছে। তাঁহার শ্রীমুখে অপার্থিব ফেনা, দেহে নয়নের অভিরাম অপরূপ রোমাঞ্চ আর নয়নে—নদীর স্রোতের ন্যায় বারিধারা। আরও দেখিলেন—

‘অচেতন পড়িয়াছে যেন কুম্ভাণ্ড ফল ;
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ বিহ্বল।’

—চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ১৭শ

অর্থাৎ—সেই সোনার শ্রীঅঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত এবং বাহিরে চেতনার কোন বিকাশ নাই। প্রথম দর্শনে মনে, হইবে একটি স্বর্ণবর্ণ অপ্রাকৃত কুম্ভাণ্ড (কুমড়া)। ‘মহাবাউল’ গৌরহরির দিব্যান্মাদ দশায় বাহিরে স্তব্ধতা। অন্তরে, কোন এক অনির্বচনীয় আনন্দাধিক্য বশতঃ বিহ্বলতা। আর—

‘গাই সব চৌদিকে সুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ;
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।’

ঐ সব গাভীদেব কি সু-তুল্য সু-কৃতি !

‘অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য ;
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য়।’

—চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ১৭শ

সেই সব গাভীবৃন্দ সর্বদিক হইতে ঐ অপরূপ দর্শন, মনোমদ অঙ্গগন্ধ গৌরহরিকে বেষ্টন করিয়াছে। অপ্রাকৃত রাজ্যের চমৎকারী সে শ্রীঅঙ্গগন্ধ ‘গাভীবৃন্দ’ লাভ করিতেছে। কি করুণা! গাভীবৃন্দ মুহঁ মুহঁ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের এই পরম উজ্জ্বল দশার ভ্রাণ লইতেছে। তাহাদের এমন উন্মাদনা যে অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে গৌরহরির সন্নিহিত হইতে তাড়ান যাইতেছে না।

গৌরহরির শ্রীঅঙ্গের সুস্থতা বিধান জন্য স্বরূপাদি সেবকবৃন্দ—
'সেবক' স্বভাবে—

'অনেক করিল যত্ন না হইল চেতন ;

প্রভু উঠাইয়া ধরে আনিল ভক্তগণ ।'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

তাহার পর, গম্ভীরা প্রকোষ্ঠের প্রাঙ্গণে গৌরহরির শ্রীঅঙ্গ যথো-
চিত ভাবে স্থাপন ও লালন বা সু-শীতল বারি দ্বারা অভিষেক, অঙ্গ
সম্মার্জন, বীজন (বাতাস দেওয়া) আদি করিতে লাগিলেন । এবং
পরম বিচক্ষণ, ধীর ও অনুভবী স্বরূপের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া সকলে
উচ্চৈঃস্বরে 'নাম সঙ্কীৰ্ত্তন' করিতে লাগিলেন । এইরূপে বেশ কিছু
সময় গত হইলে পর গৌরহরির ঐ অলৌকিক ভাবের সম্ভরণ হইল ।
তিনি কিঞ্চিৎ বাহ্য দশা প্রাপ্ত হইলেন । তখন ধীরে ধীরে তাঁহার
শ্রীঅঙ্গের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল । এবং
ক্ষণকাল পরে, তিনি উঠিয়া বসিলেন । ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিলেন । তাহার পর স্বরূপকে বলিলেন—

(স্বরূপ !) 'তুমি আমা আনিলে কতি ?'

গৌরহরি যে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন ইহা জানিয়া স্বরূপ
মনে মনে আনন্দিত হইলেন । মুখে কিছুই বলিলেন না । স্বরূপের
জবাবের অপেক্ষা না করিয়া গৌরহরিই বলিতেছেন—

“স্বরূপ ! শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-মন-উচাটনকারী বেণুধ্বনি শুনিয়া আমি
বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম । গোষ্ঠে বেণুবাদনপর শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলাম ।
বেণুর সঙ্কেত পাইয়া শ্রীমতি অভিসার করিয়া কুঞ্জগৃহে আসিলেন ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতির (অপ্রাকৃত) আকর্ষণে কুঞ্জে আসিলেন । আমি
কৃষ্ণের অনুগমন করিলাম । 'গমনই নটন, বচনই গান' যে কৃষ্ণ

তাঁহার বেশ-ভূষার মধুর ধ্বনি আমার কর্ণকে যেন সম্পূর্ণ হরণ করিয়া লইল। তথায়, শ্রীরাধা ও তাঁহার সখিবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণ সহিত মনোরম হাস্য নর্মোক্তি ও পরিহাস বাক্যাদির মাধুর্য্য পাথারে যেন ভাসিতে-ছিলাম, এ হেন সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া বলাৎকারে আমায় এখানে আনিয়াছ।”

হায় ! হায় ! তোমরা এ কি করিলে ?—

‘শুনিতে না পাইলু সেই অমৃতসম বাণী !

শুনিতে না পাইলু ভূষণ মুরলির ধ্বনি !!’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭শ

শকাব্দ ১৪৩৪ হইতে ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী ‘সচল জগন্নাথ’ গৌরহরির বিচিত্র বিচিত্র লীলাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

‘লোকে নাহি দেখি ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।

হেন ভাব বাক্ত করে গ্যাসী চূড়ামণি।’*

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ

* শ্রীগুরু কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে জাগে যে কবিরাজ গোস্বামী এই পয়ার দ্বারে যেন আমাদের ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে,—

“শ্রীভগবানের যে কোন লীলাই হউক না কেন তাহা প্রথমে মর জগতে প্রকট হয়। এবং সেই সেই লীলা অস্তে, যথাকালে সেই লীলার গ্রন্থ ও লীলা অবলম্বনে শাস্ত্রাদি বিরচিত হয়। সুতরাং ‘রাই-কাহুর আশ্ মিটান’ স্বরূপ গৌরহরির লীলা অধুনা অপ্রকট হইল। এখনো সে লীলার গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই। সেই লীলার অন্ততম সাথী ও সাক্ষী দাস গোস্বামীর সেবক আমি মাত্র স্বচনা দিতেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যথাকালে শাস্ত্র প্রণীত হইবে।”

সপ্তম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

শরৎ ঋতুর শুক্লা তিথির জ্যেষ্ঠায় ঝলমল একটি রাত্রি—

‘মহারাস-বিলাসের-পরিণতি—বিলাস-বিবর্ত-মুরতি’ গৌরহরি নিজগণ সঙ্গে সমুদ্র তীরবর্তী একটি মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার অবস্থা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

“রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে।”

তাঁহার সঙ্গে আছেন স্বরূপ, রামরায়, গোবিন্দ, ‘রঘুনাথ’, শঙ্কর আদি সেবকবৃন্দ। গৌরহরি কৌতুক দেখিতে দেখিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। ভাব অনুকূলে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির এক একটি পদ স্মরণ করিয়া কখনও তিনি নিজেই গান করিতেছেন, কখনো স্বরূপ বা রামরায় গান করিতেছেন। এবং তিনি তখন তন্ময় ভাবে নৃত্য করিতেছেন। আবার কখনও কর্ণামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন, আবার কখন বা রামরায় উচ্চারণ করিতেছেন। সে সময়ের ‘অবস্থা’ প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দাস গোস্বামীর অনুভব, অক্ষরে ধরা আছে। যথা—

‘কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায় ;

ভূমে পড়ি কভু মুর্ছা, কভু গড়ি যায়।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

রাস পঞ্চাধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকগুলির কিছু তিনি নিজে আবৃত্তি করিলেন এবং বাকীগুলি রামরায় দ্বারা আবৃত্তি করাইলেন। কিন্তু, প্রতিটি শ্লোকের অর্থ তিনি নিজে করিতেছেন। ঐরূপ শ্লোকের অর্থ

বর্ণন সময়ে গৌরহরির কখন হর্ষ, কখন শোক । এ সব, ভাব বিকার
দাস গোস্বামী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কবিরাজ গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার
পূর্বক অনুভব করাইয়াছিলেন । এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার
সে অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন । যথা—

প্রথম অনুভব :

‘কৃষ্ণের নাচাই প্রেমা, ভক্তের নাচাই ;

আপনি নাচয়ে,—তিনে নাচে এক ঠাঁঞি ।’*

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

দ্বিতীয় অনুভব :

‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আশ্বাদন ;

সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ ॥’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

তৃতীয় অনুভব :

‘জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ;

আপনা শোধিতে তার ছোয় এক কণ ।’

যাহা হউক, স্বরূপাদি সঙ্গে গৌরহরি কৌতুকে উচ্চান ভ্রমণ
করিতে করিতে প্রসঙ্গত নিম্নলিখিত শ্লোক রত্নটি আবৃত্ত হইল—

* চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইলে ‘নৃত্য’ প্রকাশ পায় । আত্মারাম,
নির্দ্বিকার স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ এবং যাহার আনন্দের এক বিন্দুর কণা জগতকে
আনন্দে ডুবাইতে ও ভাসাইতে পারে তাঁহার চিত্তকেও আনন্দে উদ্বেলিত
করিতে সামর্থ্য বা শক্তি ধারণ করে ‘প্রেম’ । রাসাদিলীলায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য
প্রসিদ্ধ । (এই ‘প্রেম’ নৃ-লোকে হয় না । প্রেমের স্বরূপ অনির্বাচনীয়,
প্রাকৃত ভাষায় বর্ণনা হয় না । তবে হয় কিসে—কোন্ ভাষায় ? হয়, ভাব
বোধের ভক্তের পুলকিত অঙ্গে এবং অপাঙ্গের অক্ষু তরঙ্গে । সু-নির্মল নীরব
প্রেরণা ভাষাতেই প্রেমের কিঞ্চিৎ পরিচয় সম্ভব ।)

“তাভি যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ—
 যৃষ্টস্রজঃ স কুচকুক্ষুমরঞ্জিতায়াঃ ।
 গন্ধর্বপালিভিরনুক্রুত অংবিশদ্বাঃ
 শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতু ॥”

ভা—১০।৩.১৩১

এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—

(শারদীয়া মহারাসে রাস-ক্রীড়ায় যে শ্রম হইয়াছিল, জলকেলি দ্বারা সেই শ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে নিজ কান্তাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে অবতরণ করিয়াছিলেন ।)

সহসা অদূরে অতীব মনোরম দৃশ্য সমুদ্র, গৌরহরির নয়নে যমুনা বলিয়া প্রতিভাত হইল । সঙ্গে সঙ্গেই—

‘ঐ যমুনায়ে কৃষ্ণকান্তাদের সহিত রাসবিহারী জলকেলি করিতে ছেন’ ভাবিতে ভাবিতেই—

‘যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিল ।
 অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিল ॥’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

এবং সমুদ্রে পতন মাত্রই তাঁহার বাহুজ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল । তরঙ্গের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন তরঙ্গের স্রোতে ভাসিয়া যায়, গৌরহরির শ্রীঅঙ্গও তেমনি ভাসিয়া চলিতেছে । তাঁহার শ্রীঅঙ্গ কখন ভাসিতেছে কখন ডুবিতেছে ।

এ ঘটনাটি সহচরবৃন্দের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়াই দ্রুত ঘটিয়া গেল । কেহই প্রস্তুত ছিলেন না । অকস্মাৎ কি হইতে একি হইল ? স্বরূপাদি এত লীলাতনয় হইয়াছিলেন যে অকস্মাৎ শ্রীগৌরাজের অদর্শন তাঁহাদিগকে চমকিত ও বিভ্রান্ত করিল । এ দিকে গৌরহরির মহা আবিষ্ট শ্রীঅঙ্গ ভাসিতে ভাসিতে কোণার্কের দিকে চলিয়াছে । কখন

ডোবে কখন ভাসে। এ প্রসঙ্গে মহাগম্ভীর কবিরাজ গোস্বামী নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

‘কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট?’

এদিকে স্বরূপাদি সেবকবৃন্দ যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের জীবন সর্বস্ব তাঁহাদের মধ্যে নাই, অকস্মাৎ অদর্শন হইয়াছেন, তখন তাঁহারা প্রথমে সেই উদ্যান মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। সেখানে না পাইয়া তাঁহাদের মনে প্রশ্ন জাগিল :—

প্রভু কি জগন্নাথ দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে গেলেন? না কি মহা-উন্মাদ দশায় অন্য কোন উদ্যানে গিয়া মুচ্ছিত রহিলেন? না কি গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলেন? না কি নরেন্দ্র সরোবরে গেলেন? চটক পর্বতেই গেলেন না কি? না কি কোণার্কের দিকেই গেলেন? হঠাৎ কোথায় গেলেন?

নিজেদের মধ্যেই পৃথক পৃথক দল হইয়া সম্ভব অসম্ভব সর্বস্থানে খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি শেষ হইল। গৌর-হরির কোন সন্ধান মিলিল না।

তাঁহাদের মনে শঙ্কা জাগিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যেই অবস্থান করিতে করিতে তিনি কোথায় বা কতদূর যাইতে পারেন? তাঁহারা বন্ধু হৃদয়ের স্বভাবেই—

‘অন্তর্দ্বান কৈল প্রভু নিশ্চয়ই করিল।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

তখন সকলে সমকালে উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদারক ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে গৌরহরির কৃপায় ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক ‘গৌরগুণ’ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহারা সমুদ্র তীরে উপনীত হইলেন। এখন প্রভাত হইয়াছে। কয়েক মূর্ত্তিকে চিরাই

পর্বত অভিমুখে পাঠাইয়া গোবিন্দ ও রঘুনাথ সহ স্বরূপ সমুদ্রে তীরে তীরে গৌরগুণ কীর্তন করিতে করিতে পূর্বদিকে চলিলেন ।

কিছুক্ষণ পরে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ দেখিলেন অদূরে তাঁহাদের বিপরীত গতি হইতে জাল স্কন্ধে এক ধীবর আসিতেছে । তাহার পা দুটি টলিতেছে । সে কখন উন্মত্তের ন্যায় হাসিতেছে, কখন বা কাঁদিতেছে, কখন বা গান করিতেছে । মাঝে মাঝে ‘হরি হরি’ শব্দ উচ্চারণ করিতেছে । ঐ জালিয়ার আচরণ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন ! নিকটে আসিলে সেই জালিয়াকে স্বরূপ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘তোমার এইরূপ অবস্থা কেন ? পথে কোন লোককে দেখিয়াছ কি ?

ধীবর জ্বাবে বলিল—‘পথে কোন লোক দেখি নাই । এখন আমার এ অবস্থা কেন, তাহা শুনুন । আমি জাল বাহিতেছিলাম । হঠাৎ খুব ভারি বোধ হইল । অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত—

‘বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইল যতনে ;’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

যখন জালে আবদ্ধ বস্তু আমার দৃষ্টি গোচর হইল, তখন সবিস্ময়ে দেখিলাম—(বাহ্যেন্দ্রিয়) সম্পূর্ণ চেষ্টা রহিত এক মনুষ্য শরীর । তাহা দর্শন মাত্রই আমি বেশ ভয় পাইলাম । যাহা হউক, মাছ ধরার জালটিই আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায় সুতরাং জালটিকে খসাইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম । সেই সময় আমার হাত জালে উঠান ঐ শরীরে স্পর্শ হইল । কি আশ্চর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থা—

‘ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্র বহে জল,

গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল ।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

ইহা ব্রহ্মদৈত্য কি ভূতের খেলা নিশ্চিত বলা যাইতেছে না।
আরও অদ্ভুত কথা শুণু—

‘দর্শন মাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়’

এখন সে শরীরটি যেমন দেখিয়াছি তাহা তোমাদের জানাইতেছি,
শরীর খুব লম্বা পাঁচ হইতে সাত হাত পর্য্যন্ত হইতে পারে। এক
একটি ‘হাত’ এক একটি ‘পা’ তিন তিন হাতের কম নয়। শরীরের
বিভিন্ন স্থানের অস্থি সব আলাগা হইয়া গিয়াছে। বাহিরের চামড়াই
দেহটি ধরিয়া আছে। এবং ভয়ে—

‘তাহা দেখি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে।’

আরও শুণু—

‘মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন,
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু রহে অচেতন।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

এখনো সে ধীবরের বক্তব্য শেষ হয় নি। সে পুনরায়
বলিতেছে—‘আমাকে দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারেন যে আমায়
ভূতে ধরিয়াছে। এখন আমি যদি মারা যাই তাহ’লে আমার স্ত্রী
পুত্রের কি দশা হবে? ভাই সকল! সে ভূতের সব কথা বলা
যাচ্ছে না। এখন আমি ওঝার নিকট চলেছি। দেখি! যদি সে
এ ভূত ছাড়াতে পারে। আমি ধীবর। শুতরাং নির্জনে ও রাত্রি-
কালে মাছ ধরাই আমার বৃত্তি। আমার এতটা জীবন এই ভাবেই
কেটেছে। যদি কখন দরকার মনে করেছি ‘নৃসিংহ’ নাম স্মরণ
মাত্রই ভূত, প্রেত, আদি ভয় সব দূরে পালিয়েছে। এবার দেখছি
যে ‘নৃসিংহ’ নাম গ্রহণ করলে ভূতের প্রকোপ দ্বিগুণ বাড়ছে।
বলব কি, সে শরীর এমন বিকট যে দেখা মাত্রই ভয় আসে।

তোমাদের নিষেধ করি সেখানে যেও না । আমার নিষেধ না শুনে
যদি যাও, নিশ্চিত জেনে রাখ সে ভূত তোমাদের সকলকেই ধর্বে ।’
যথা—

‘সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত ;
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত ?

সেই ভূতের কথা ভাই ! কহন না যায় ;
ওঝা ঠাই যাইছি যদি সে ভূত ছাড়ায় ।

এক রাত্রে বুলি, মৎস মারিয়ে নির্জনে ;
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহ-স্মরণে ।

এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে ;
তাহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে ;

ওথা না যাইও আমি নিষেধি তোমারে ;
তঁাহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ।

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৮শ

স্বরূপ গোস্বামী জালিয়ার বিবরণে বুলিলেন—

জালিয়ার ভয়ের হেতুটি অপর কিছু নয়, তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ
গৌরহরি । আর বিলম্ব না করিয়া এই জালিয়াকে সঙ্গে লইয়া
প্রভুর নিকট যাইতে হইবে । তাই, তিনি সুমধুর কণ্ঠে জালিয়াকে
বলিলেন—

“আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে”

এই কথা বলিয়াই জালিয়ার বক্ষে ও হস্তে তাঁহার শ্রীহস্ত স্পর্শ করাইয়া
মন্ত্র উচ্চারণের মত শ্রীগৌরাজ নাম বলিতে বলিতে তাহার দেহ ও

মনের ভয় থামাইয়া দিলেন । পরম ভাগ্যবান সেই জালিয়ার মাথায় শ্রীহস্ত স্পর্শ করিলেন । তাহার পর তাহার সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দে তাহার পিঠে তিনটি চড় মারিয়া বলিলেন ‘যাও ! তোমার সব ভয় পলাইল । এখন স্থির হও ।’—তাহার ভয় দূর হইল ।

অতঃপর স্বরূপ গোস্বামী সেই ধীবরকে বলিলেন—

‘ভাই, ধীবর ! তুমি যাঁহাকে দেখিয়াছ তিনি তোমাদের ‘সচল জগন্নাথ গৌরহরি’ । তিনি কোন ভাবে বিভোর হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন । তাঁহার প্রেম বিকারের ফলে—

‘অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার ।’

গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে প্রেম বিকারের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা জালিয়া ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই । কিন্তু, ‘গৌরহরি-স্বরূপ’ সে বহুবার দেখিয়াছে । খুব ভাল ভাবে চেনে । এ কারণ, সে প্রত্যুত্তরে বলিল ‘গোসাঞি আমি তাঁহাকে বহুবার দেখিয়াছি । এ অতি বিকৃত আকার—কখনই আমাদের ‘সচল জগন্নাথ’ নহেন ।

স্বরূপ গোস্বামী বলিলেন—“ভাই, তুমি ত জান আমরা তাঁহার সঙ্গী । সুতরাং তাঁহার সকল অবস্থাই ভাল ভাবে জানি । তোমার বিবরণ শুনিয়া আমরা নিশ্চিত যে তিনিই তোমাদের ‘সচল জগন্নাথ’ ।

স্বরূপের কথা শুনিয়া ধীবর আনন্দিত হইল । সকলকে সঙ্গে লইয়া, যে স্থানে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্থাপন করিয়াছিল, সেই স্থানে লইয়া গেল ।

স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ দেখিলেন—

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের জলে অবস্থানের ফলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত শুভবর্ণ হইয়াছে ; অনির্বচনীয় ভাবের ফলে তিনি মুচ্ছিত প্রায়,

শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অস্বাভাবিক বোধ হইতেছে। এমন অবস্থা যে তাঁহার চেতনা সম্পাদন না করিয়া বাসায় লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। সেবক গোবিন্দ কোটি মাতৃ স্নেহে প্রথমে গৌরহরির শ্রীঅঙ্গের আর্দ্র কোপীন পরিবর্তন করিয়া শুষ্ক ডোর কোপিন পরাইলেন। তাহার পর শ্রীঅঙ্গের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা আদি সর্ব অঙ্গ হইতে অতি পরিপাটির সহিত বালুকণা অপসারণ করিয়া একটি বহির্বাস উপরে তাঁহাকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া হর্ষ বিষাদে প্রেম বিগলিত হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীৰ্তন করিতে লাগিলেন। বেশ কিছুক্ষণ নাম সঙ্কীৰ্তন হইলে পর, গৌরহরির কর্ণে 'নাম' প্রবেশ করিল। এবং—

‘হৃঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল’

দিব্য ভাবাবেশ কিছু শিথিল হইল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্বাভাবিক হইতে লাগিল। অর্দ্ধবাহু দশায় তিনি অবস্থা ও পরিবেশ বোধগমা করিবার চেষ্টায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে মহাসাবধান কুবিরাজ গোস্বামী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন গৌরহরির শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচল বাসে তাঁহার অবস্থা। যথা—

‘তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল ;

‘অস্তর্দশা’ ‘বাহুদশা’ ‘অর্দ্ধবাহু’ আর ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

(অস্তর্দশা :—বাহিরের বিষয়ের, কি নিজের দেহের, কোন অনুসন্ধান বা স্মৃতি থাকে না। এক দিব্য স্মরণ অবস্থা। রাই-কানুর আশ্-মিটান স্বরূপের লীলাগ্রন্থ এবং লীলা অবলম্বনে শাস্ত্র প্রণীত হয় নাই, এ কারণ ঐ অস্তর্দশার (এর) বেশী বর্ণনা নাই।

বাহুদশা :—সম্পূর্ণ বাহুজ্ঞান থাকে । শেষ দ্বাদশ বৎসরে এ অবস্থা খুবই ক্ষণস্থায়ী । এমন কি কোন দিন বাহুদশা থাকিতই না ।

অর্দ্ধবাহুদশা :—অন্তর্দশার ভাগই বেশী, বাহুদশার ভাগ অতি সামান্য, অর্দ্ধবাহুদশায় বাহিরের শব্দ কানে প্রবেশ করে মাত্র । কোন কোন সময়ে বাহিরের লোক দেখেও, কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারে না বা অতি কষ্টে চেনে । এই দশায় তাঁহার দিব্য স্ফূরণে যা যা দর্শন ঘটে সে সব বাক্যদ্বারা প্রকাশ পায় । তাঁহার ঐ কথাগুলিকে দিব্যোন্মাদে প্রলাপ বলা হয় । দিবা রাত্রির বেশীর ভাগ সময়ই এই অর্দ্ধবাহু দশায় কাটিত :

উপরে বর্ণিত অর্দ্ধবাহু দশায়, তিনি বলিতে লাগিলেন —

‘কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাও বৃন্দাবন,
দেখি জলকেলি করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।’

— চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

তাহার পর দেখিতেছেন—

রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি ;
যমুনায় মহারঙ্গে করে জল কেলি ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

অতঃপর সে স্থানে তাঁহার নিজের অবস্থান আদি বর্ণনা দিতেছেন—

‘তীরে রহি দেখি ‘আমি’ সখীগণ সঙ্গে ;
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

‘এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঞ্জে ।’

‘সে রঞ্জে’ বাক্যটি অবলম্বনে শারদীয়া মহারাসে রাসনৃত্যাদির অন্ত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণকান্তাদের যে ক্রল-বিহার ও বন্যভোজন বর্ণনা আছে—তাঁহার শ্রীমুখে বর্ণনা ও শ্রীঅঞ্জের বিকার ও ভাবলীলা দ্বারা সে ‘বিভূ লীলাটি’ সমুদ্র তীরে যেন প্রকট বোধ হইতে লাগিল ।

অন্ত্যে তাঁহার নিজের অবস্থা বর্ণন করিলেন—

‘রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

এমন সময়ে মহা কোলাহল করিয়া—তোমরা আমাকে এখানে আকর্ষণ করিলে । (দিব্য স্ফূরণে) যমুনা, বৃন্দাবন, কৃষ্ণ ও গোপীগণের দর্শন ও তাঁহাদের লীলা সুখে মগ্ন ছিলাম । তোমরা আমার সে সুখ ভঙ্গ করিলে ।

এই পর্য্যন্ত ‘প্রলাপে’ বলার পর তাঁহার বাহু দশা দেখা দিল । তিনি স্বরূপকে চিনিলেন । তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—

‘ইহা কেন তোমরা আমাকে লঞা আইলা ?’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

এতক্ষণ পরে, সময় ও সুযোগ বুঝিয়া স্বরূপ গৌরহরির শ্রীচরণে সজল নয়নে নিবেদন করিলেন—

“হে প্রাণনাথ ! আমাদের জীবন সর্বস্ব ! গত রাত্রিতে উদ্যান ভ্রমণ রঞ্জে তোমার সঙ্গে আমরা সুখে অবস্থান করিতেছিলাম । হঠাৎ যমুনা ভ্রমে (আমাদের অগোচরে) তুমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া বাহু চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলে । সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসিয়া এত দূর

আসিয়াছ। এই সুকৃতিবান ধীবরের জালে তুমি তীরে আসিয়াছ। তোমার স্পর্শে ঐ ধীবরের 'প্রেমদশা' নিজ চক্ষেই দেখ। রাস রজনীতে কৃষ্ণহারা ব্রজরামাদের দশা আমার জানা আছে। তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বনে—সমস্ত রাত্রি, তোমার অনুসন্ধান, তোমার নাম-রূপ-গুণ লীলা কীর্তন-সহ উচ্চ ক্রন্দনে আমাদের অতিবাহিত হইয়াছে। এই জালিয়ার মুখে তোমার সংবাদ পাইয়া, এখানে আসিয়া দেখি তুমি 'বাহিরে মুচ্ছিত'। ঐ অবস্থার মহৌষধি, উচ্চনাম সঙ্কীর্ণন করার ফলে তোমার অর্দ্ধবাহু দশা ফিরিল। সে দশার তুমি তোমার সমস্ত নিশার মধুময় ভোগের কথা প্রলাপে বর্ণন করিলে। সে সব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম।

অতঃপর স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের জীবন সর্বস্ব গৌরহরিকে স্মান করাইয়া আনন্দিত মনে বাসায় আনিলেন।

লেখা বাহুল্য এ লীলারও আশ্রয় 'রঘুনাথ' দ্রষ্টা ও স্বরূপ আনুগত্যে সেবক।



অষ্টম চিত্র

“শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর”

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—

‘কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
এছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ।’

—চৈঃ চঃ মধ্য ২য়

একটি ঘটনা—

পণ্ডিত জগদানন্দ নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের একটি তর্জী (প্রহেলিকা) গস্তীরার গুপ্তনিধি গৌরহরিকে বলিলেন । এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে গৌরহরি স্বরূপ রামরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণ কথায় নিমগ্ন হইলেন । অকস্মাৎ গৌরহরির শ্রীঅঙ্গে বিস্ময়কর বিরহ দশা উপস্থিত হইল । অর্দ্ধবাহু দশায় তাঁহার শ্রীমুখে প্রলাপ উদ্‌গত হইতে লাগিল । তিনি স্বরূপের কণ্ঠ নিজ সুকোমল বাহু দ্বারা বেষ্টন পূর্বক বলিতেছেন—

সখি ! নন্দবংশের মুখ উজ্জ্বলকারী শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? ময়ূর-পুচ্ছ ভূষিত কৃষ্ণ কোথায় ? মধুরতায় ও গান্তার্য্যে নূতন মেঘের ধ্বনিকে পরাজয়কারী মুরলীধর কোথায় ? ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর কান্তি যাঁহার, তিনি কোথায় ? রাস রস-তাণ্ডব নর্তক কোথায় ?

সে সখি ! আমার প্রাণ রক্ষার ঔষধি কোথায় ? হায় ! হায় ! আমার সুহৃৎসম, আমার গৌরবের সম্পত্তি তুল্য সে অমূল্যনিধি কোথায় ?

এমন প্রিয়তমের সহিত বিয়োগকারী নিষ্ঠুর বিধাতাকে ধিক্ !

গৌরহরি এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বিষাদে ‘হায়’ ‘হায়’

করিতে লাগিলেন। কেবল বলিতে লাগিলেন—‘হা হা কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় গেলে ?’

অন্যদিন রাত্রিতে এইরূপ দশা (অর্দ্ধবাহু) হয়। আজ দিবা-ভাগেই এ অবস্থা দেখিয়া স্বরূপ রামরায় চিন্তিত হইলেন। অভ্যাসের বশেই দিবসের নিত্যকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। এইভাবে প্রায় পূর্ণ দিবস ও অর্দ্ধ রাত্রির কাছাকাছি সময় পর্য্যন্ত অর্দ্ধবাহুে গৌরহরির বিলাপ দশা চলিয়াছে। সুতরাং স্বরূপ বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। এই বিরহ দশার বিরতি ও গৌরহরির কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কিরূপে ঘটে তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ সুধা-কণ্ঠে, ভাব বিভোর হইয়া সজল নয়নে সু-মধুর স্বরে গান ধরিলেন—

‘রাই ! তুমি যে আমার গতি ।

তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি

গোকুলে আমার স্থিতি ।

দিবা নিশি বসি গীত আলাপনে

মুরলী লইয়া করে ।

যমুনা সিনানে তোমার কারণে

বসি থাকি তার তীরে ।

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে

কদম্ব তলাতে থাকি ।

শুন গো কিশোরী চারি দিকে হেরি

যেমন চাতক পাখী ।

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী

সদাই ভাবনা মোর ।

করি অনুমান সদা করি জ্ঞান

তব প্রেমে হৈয়া ভোর ।’

স্বরূপের কণ্ঠে এই গানটি শুনিয়ে গম্ভীরাবিহারীর ‘মহাবাউল’
মন যেন কিছু স্থির হইল। তিনি পরম স্নেহভরে স্বরূপের গলা
জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“প্রাণ সখা স্বরূপ ! এ কথাগুলি কি কৃষ্ণের সরল প্রাণের কথা ?
কৃষ্ণ ত কপট চূড়ামণি, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করা যায় কি ?

দীঘল নয়নে চাহিয়া গৌরহরি নীরব রহিলেন।

এই ভাবের রাত্রির আরও কিছু সময় অতিবাহিত হইল।
‘স্বরূপ’ পরম স্নেহে গৌরহরিকে তাঁহার শয্যায় শয়ন করাইলেন।
তাঁহার কৃপাদেশ গ্রহণ পূর্বক (বিশ্রামের জন্য) রামরায় নিজ আবাসে
গমন করিলেন। সে রাত্রি সশিষ্য স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার
গুপ্তনিধির শয়ন প্রকোষ্ঠের বাহিরে বিশ্রাম গ্রহণ জন্য শয়ন
করিলেন।

সেদিন দিবাভাগ হইতেই গৌরহরির অনির্বাচনীয় উৎকট কৃষ্ণ-
বিরহ আবেশ। অর্দ্ধরাত্রির পর স্বরূপের সুধাকণ্ঠের গীত শ্রবণে
কিছু সময়ের জন্য তাঁহার ‘মহাবাউল’ মন স্থির হইয়াছিল। স্বরূপ
রামরায় বিদায় লইবার পর আবার সেই উৎকট দশা ফিরিয়া
আসিল। তাহা উত্তরোত্তর বাড়িতে বাড়িতে অচিন্ত্যনীয় একটি
দশা উপস্থিত হইল। সেই দশায় গৌরহরি আর ক্ষণমাত্র স্থির
রহিতে পারিলেন না। গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত
মহা বাতুলের চেষ্টা গ্রহণ করিলেন। অন্ধকারে দরজা খুঁজিয়া
পাইলেন না। দেওয়ালের বাধা দূর করিয়া বাহির হইবেন এই
আশায় সমস্ত রাত্রি দেওয়ালে নিজ নাক, মুখ, ঠোঁট, গাল, কপাল
ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কণ্ঠে অব্যক্ত গোঁ গোঁ শব্দ।

উষার আবির্ভাবের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল, এমন সময় স্বরূপের
নিদ্রা ভঙ্গ হইল। শয়ন অবস্থাতেই তিনি অদ্ভুত গর্জন গোঁ গোঁ

শব্দ শ্রবণ করিলেন। অতি ব্যস্ত ভাবে শয্যা ত্যাগ পূর্বক চিন্তিত মনে উঠিলেন। দীপ জ্বালিলেন। গোবিন্দ ও রঘুনাথকে জাগাইলেন। পরে তিনি ও গোবিন্দ দীপহস্তে গৌরহরির শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ‘হৃদয় বিদারক দৃশ্য’। দর্শন মাত্রই উভয়ে সমকালে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গৌরহরির নাক, কান, ঠোট, গাল, কপাল, সর্বস্থান ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। দেওয়াল ও মেঝেতে রক্তের দাগ।

বিষাদে ও স্নেহে তাঁহারা গম্ভীরা-বিহারীকে প্রথমে বিছানায় বসাইয়া সুস্থ করিলেন। আহত স্থানগুলি পরিষ্কার পূর্বক যথা-বিধি ব্যবস্থা করিলেন। গোবিন্দ ও রঘুনাথ পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বরূপও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের প্রাণকোটি প্রিয়-তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“প্রাণনাথ ! তুমি এ কি করিয়াছ ? কিরূপে তোমার চন্দ্রবদন একরূপ ক্ষত বিক্ষত হইল ?”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অপরূপ কণ্ঠে গৌরহরি স্থালিত বচনে ধীরে ধীরে বলিলেন---

“সখা স্বরূপ ! তোমরা বাহিরে যাইবার পরই কেমন অস্থির হইয়া পড়িলাম। প্রবল উদ্বেগে এই গৃহ মধ্যে থাকা অসম্ভব বোধ হইল। তাড়াতাড়ি বাহির হইতে চেষ্টা করিলাম। অন্ধকারে দ্বার ঠিক করিতে পারি নাই। ব্যাকুলতায় চারিদিকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করিলাম। দ্বার না পাওয়ায় উত্তরোত্তর ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাহির হইয়া আমার প্রাণকৃষ্ণকে খুঁজিতে পারিলাম না। লাভের মধ্যে এই সব নাকে মুখে ক্ষত।”

বলিতে বলিতে ‘হা কৃষ্ণ !’ বলিয়া তিনি পুনরায় নীরব হইলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ পরিচ্ছেদে এই লীলা প্রসঙ্গটি
বর্ণনা অন্তে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লীলাদ্রষ্টা দাস গোস্বামীর
অনুব্রুব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

‘উন্মাদ দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ;
যেই করে যেই বলে উন্মাদ লক্ষণ ।’

নবম চিত্র

(“শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর”)

স্থান : শ্রীধামপুরীতে অবস্থিত ‘জগন্নাথ বল্লভ’ নামক উদ্যান ।

কাল : বৈশাখ মাস । পূর্ণিমার রাত্রি ।

ইহাও এক ঐতিহাসিক সত্য :

সেদিন সন্ধ্যা সমাগমে ভাবনিধি গৌরহরি নিজ বাসা (গম্ভীরী) হইতে ‘জগন্নাথ বল্লভ’ উদ্যান অভিমুখে চলিলেন । তাঁহার অবস্থা দাস গোস্বামীর অনুভবে দেখা যাইতেছে --

‘.....রাত্রি-দিবসে ;

প্রেমসিক্তে মগ্ন রহি কভু ডুবে ভাসে ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ

স্বরূপ, রামরায়, গোবিন্দ, ‘রঘুনাথ’, শঙ্কর পণ্ডিত আদি পার্শ্বদ ও সেবকবৃন্দও সঙ্গে আছেন । অপরূপ গমন লীলা সঙ্গে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সেই রাত্রির উদ্যানের শোভা—

‘প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন ;

শুক-শারী-পিক-ভৃঙ্গ করে আলাপন ।

পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন ;

গুরু হঞা তরু লতায় শিখায় নাচন ।

পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ;

তরুলতা জ্যোৎস্নায় সব করে ঝলমল ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৯শ

সে স্মৃতির চিত্র অত্যাপি পুরীধামে (জগন্নাথ বল্লভ উদ্যান)
বর্তমান । তাহা দর্শন করিলে অনুমান করা শক্ত নয় যে ঐ সময়
সত্য সত্যই এই উদ্যানের অবস্থা ভাব চক্ষুর দৃষ্টিতে বৃন্দাবনের ন্যায়
মনোরম (প্রকৃতই) ছিল ।

সপার্বদ গৌরহরি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মনে করিলেন যে বসন্ত
প্রধান ষড় ঋতু আবির্ভূত হইয়াছে । সমস্ত বৃক্ষ ও লতা প্রস্ফুটিত
পুষ্প সমূহে মণ্ডিত হইয়া আছে । ফলবান বৃক্ষ সমূহ ফলভারে
অবনত । শুক. সারী, ময়ূর, কোকিলাদি পক্ষীগণ স্থানে স্থানে মধুর
কণ্ঠে শব্দ করিতেছে, কোথাও বা নৃত্য করিতেছে । ভ্রমরাবলি
মধুর গুঞ্জন করিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ।
দক্ষিণ দিক হইতে সুখ স্পর্শ বাতাস বহিতেছে । আকাশে পূর্ণচন্দ্রের
উদয়ে জ্যোৎস্না মণ্ডিত উদ্যান সর্ব বিষয়ে মনোমুগ্ধকর হইয়াছে ।

গৌরহরি উদ্যানের শোভা দর্শনে পুলকিত হইয়া মনের উল্লাসে
স্বরূপকে গান ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন ; স্বরূপ কালোচিত ধৃষ্ণ
ধরিলেন—

“ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে-
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল কুজিত-কুঞ্জ-কুর্টীরে ।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে নৃত্যতি যুবতি জনেন
সমং সগি বিরহিজনশ্চ দুস্তে ।” /

পদটি শুনিতে শুনিতে গস্তীরা বিহারী গৌরহরির বসন্ত রাস
নৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল । তিনি প্রতি বৃক্ষ ও প্রতি লতার নিকট
গমন করিয়া অপরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন । সে গমন ও নৃত্য-
ভঙ্গীর দৃশ্য দাস গোস্বামী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া—কবিরাজ গোস্বামী

দ্বারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বাংলা পয়ারটি দেওয়া গেল।
যথা-

‘রসের উল্লাস ভরে অপরূপ নৃত্য করে
ছনয়নে বহে প্রেম ধারা ।
অপরূপ সে মাধুরী স্মরণ করিয়া হরি
বারি বহে রাজ্ঞা দুই নেত্রে ॥

বসন্ত উৎসব কালে সেচন করয়ে জলে
যেন পিচকারী জলমন্ত্রে ।

সকম্প আনন্দাবেশে দশনে অধর দংশে’

তাহার পর সবিস্ময়ে ‘রঘুনাথ’ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—

‘হেন প্রেম আছিল কোথায় ?’

এ প্রশ্নের হেতু—

তিনি সচক্ষে দর্শন করিলেন—

‘একবার যারে হেরে তার আঁখি মন হরে
মোর মন সতত মাতায় ।’

গৌর-সুন্দরের অপরূপ নৃত্য ভঙ্গীতে লুক্ক হইয়া রাসবিহারী কৃষ্ণই
(যেন) অদূরে এক অশোক বৃক্ষ তলে হাসি মুখে, মধুর ত্রিভঙ্গিম-
ঠামে দণ্ডায়মান। হঠাৎ ঐ কৃষ্ণ মুক্তিটি গৌরহরির নয়নের সম্মুখ
হইল। তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণ অভিমুখে ছুটিলেন।
পরম কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ, গৌরহরিকে নিকটবর্তী দেখিয়া মধুর হাস্য
প্রদর্শন পূর্বক অন্তর্দ্বান করিলেন।

“এই এখনি কৃষ্ণের দেখা পাইলাম, হায় পুনরায় হারাইলাম”---
এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে গৌরহরি মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে
লুটাইয়া পড়িলেন।

অতঃপর অপরূপ ঘটনা :

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দান করিয়াছেন। কিন্তু, নিত্য নবায়মান তাঁহার
শ্রীঅঙ্গের গন্ধ গৌরহরিকে অধিক পাগল করিল। তিনি অর্ধবাহু
দশায় বিলাপে বলিতেছেন—

সখি ! আমার প্রাণ-কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের মনোহারিত্বের কথা আর
কি বলিব ! কিসের সঙ্গে তুলনাই বা দিব ! কস্তুরী ও নীলপদ্মের
মিলিত সুগন্ধে যে মধুর সুগন্ধের উৎপত্তি হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গগন্ধের
নিকট পরাজিত। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধের তুলনা জগতে নাই।

‘অনির্বচনীয় সৌরভ’ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উথিত হইয়া চতুর্দশ
ভুবনকে ভরপুর করিয়া থাকে।

সর্ব চিত্তাকর্ষক এই অঙ্গ সৌরভ নারীর নাসায় প্রবেশ করিলে
সে নারী আনন্দে নয়ন নিমীলিত করে।

সখি ! শ্রীকৃষ্ণের মনোরম অঙ্গগন্ধ জগৎকে মত্ত করিয়া ফেলে।
ইহা নারীর নাসায় প্রবেশ করিয়া সে চিত্তে স্থায়ী বাসা নেয়। আর
যেন নাসায় রজ্জু দিয়া সে নারীকে কৃষ্ণের নিকট লইয়া যায়।

সখি ! কমলকে কপূর দ্বারা লেপন করিলে ঐ কমলের যে
সৌগন্ধ হয় শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়ে, নাভিতে, শ্রীবদনে, শ্রীকর যুগলে ও
শ্রীচরণ যুগলে সেইরূপ অপূর্ব শীতলতা স্নিগ্ধতা ও অপূর্ব সুগন্ধ
আছে।

সু-শীতল ও সুগন্ধি চন্দনের সঙ্গে অণুরু, কুকুম, কস্তুরী ও
কপূরাদি মিশ্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গে লেপন করা হয়। ইহারা

প্রত্যেকেই ‘সুগন্ধ’। ইহাদের মিলনে যে সুগন্ধ হয় তাহা অপূর্ব। আবার, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের স্বাভাবিক সৌরভের সহিত এই সব সুগন্ধের মিলনে এক অনির্বচনীয় সৌগন্ধের উদ্ভব হয়। ঐ অনির্বচনীয় সৌগন্ধের শক্তির কথা বলি শোন—

“ডাকাইত” যেমন দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্বক গৃহস্বামীর সাক্ষাতেই গৃহের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়—গৃহস্বামী কেবল অসহায় দর্শক হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অনির্বচনীয় সৌগন্ধ, কুল-রমণীবৃন্দের নাসা-দ্বারে প্রবেশ করিয়া তাহাদের লজ্জা, ধর্ম, কুল, শীল, সংযম—এক কথায় সর্বস্ব ডাকাইতের ন্যায় লুণ্ঠন করিয়া লয়।

লজ্জা ধর্মাদির আশ্রয়ীভূত গৃহরূপ দেহটিও হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পণ করে। কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ গুরুজনের সাক্ষাতে তাহাদের কেশ বন্ধন, নীবীবন্ধন খসাইয়া দেয়—পাগলিনী করিয়া ছাড়ে।

‘শ্রীকৃষ্ণ’ অঙ্গগন্ধের অপ্রাকৃত মোহিনী, যথেষ্ট পরিমাণে আশ্বাদন করিয়াও নাসার আশা মিটে না। গন্ধ পাইলেও নাসিকার তৃষ্ণার শান্তি নাই; কিন্তু যদি না পায় তখন তো নাসার যেন তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া মরিয়া যাওয়ার ন্যায় অনির্বচনীয় কষ্ট।

সখি! কৃষ্ণ, নারী ধরার এক কৌশল করিয়াছে। তিনি একটি হাট বসাইয়াছেন। সেই হাটে বিনামূল্যে তাহার শ্রীঅঙ্গগন্ধ বিক্রয় হয়। এই গন্ধের প্রলোভনে জগতের সমস্ত রমণীকে তিনি আকর্ষণ করেন। ঐ হাটে গেলেই বিনামূল্যে “গন্ধ” পাওয়া যায়। রমণীবৃন্দ এইরূপে যখন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পায়, তখন সেই গন্ধের প্রভাবে তাহাদের চক্ষু, কর্ণাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়বাস্তুর ক্রিয়া সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায়। তাহারা উন্মাদ দশা প্রাপ্ত হয়। গৃহের কথা, আত্মীয় স্বজনদের কথা,

কুল ধর্ম্মাদির কথা কোন বিষয়েই আর তখন তাহাদের কোনরূপ অনুসন্ধান থাকে না।

রাত্রির প্রথম পাদে অশোক বৃক্ষতলে গৌরহরির কৃষ্ণ দর্শন ঘটে। সেই কৃষ্ণ দর্শনে, মহাপ্রভু সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে দৌড়াইয়া গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্বান করেন। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ সেই সময় হইতে সমস্ত রাত্রি তিনি সাক্ষাৎ অনুভব করিলেন। ঐ গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া সমস্ত রাত্রি তিনি দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। উন্নতের গায় উদ্ভানের প্রতিটি বৃক্ষলতার নিকট ছুটিয়া যান—মনে করেন সেখানে গেলেই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সেখানে গিয়াও কৃষ্ণ দর্শন পান না; কেবল কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করেন।

প্রাতঃকাল উপস্থিত দেখিয়া স্বরূপ রামরায় নানান উপায়ে গৌরহরির বাহু-স্বৃষ্টি করাইলেন। তাহার পর সমুদ্রে স্নান ও জগন্নাথ দর্শনের অস্তে বাসায় (গন্তীরায়) আনিলেন।

এই লীলাটির গান্ড্যর্থ্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া “দাস গোস্বামী” নিজ শ্লোকে এ লীলাটিকে আজীবন স্মরণ ও কীর্তন করিয়াছিলেন।

এই লীলা বর্ণনা অস্তে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর সতর্ক বাণী—

(১) ‘অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তার ;
তর্কের গোচর নহে চরিত্র ষাঁহার ।’

(২) অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা বিলাপ শুনিয়া ;
তর্ক না করিও শুন বিশ্বাস করিয়া ।’

‘বিভু’ কৃষ্ণ ও ‘বিভু’ গৌরসুন্দরের অলৌকিক লীলাতে কাহার বিশ্বাস হইবে ? সে পাত্রের পরিচয়ও কবিরাজ গোস্বামী দিয়াছেন।
যথা—

‘মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দৌহার দাসের দাস ;
যারে রূপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস ।’

তাহার পর, আমাদের প্রতি করুণায় তিনি রূপা উপদেশ
করিয়াছেন। যথা---

‘শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিলে পাবে মহাসুখ ;
যাণ্ডবে আখ্যাঙ্কিকাদি কুতর্কাদি ছুঃখ ।’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ

দশম চিত্র

(শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর)

গৌরহরির স্বরচিত 'শিক্ষাষ্টক' শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের অন্ত্য খণ্ডের বিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত। এই বর্ণনীয় বিষয়ের পটভূমিকা কবিরাজ গোস্বামী নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষেৰ্ষোদেগদৈন্যার্তিমিশ্রিতম্।

লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভিনিষেব্যতে ॥

সংস্কৃত টীকা :—

প্রেমেতি । গৌরচন্দ্রস্য লপিতং জল্পনাদিকং ভাগবতৈঃ সাধুভিঃ কর্তৃভূতৈঃ নিষেব্যতে শ্রয়তে ইত্যর্থ । কথন্তু তং লপিতং ? প্রেমোদ্ভাবিতং প্রেমোহপ্যদ্বৃতং হর্ষং আনন্দং সীমা—গুণেষু দোষারোপনং উদেগং ইতস্ততো ধাবনং দৈন্যং দীনতা আর্তং মনঃপীড়া এতৈ মিশ্রিতম্ ।

(শ্লোকমালা)

মহাভাবের চরম দশায় উপনীত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার একীভূত স্বরূপ শ্রীগৌরাজ । ঐ স্বরূপে (এখন) দিবারাত্র অখণ্ড কৃষ্ণ-বিরহ । ঐ বিরহ দশায় শ্রীধাম পুরীতে অবস্থিত গম্ভীর মন্দিরে তিনি জাগিয়া কাঁদিয়া রজনী অতিবাহিত করেন । সেই উৎকট বিরহের বিলাপ দশায়—হর্ষ, শোক, রোষ, দৈন্য, উদবেগ, আর্তি, উৎকর্ষা সন্তোষ হইতে একদা উদ্ভূত এই সু-ছল'ভ মণি সদৃশ "শিক্ষাষ্টক" ।

ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার ভাব পরিবর্তন হইতেছে । কখনও তিনি হর্ষ ভরে উৎফুল্ল, কখনও শোকে অধীর, কখনও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন—কখন বা প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ

হইতেছেন। এই শেষোক্ত ভাব ভরে কোন এক রাত্রিতে পরমানন্দ-ময় গৌরহরি স্বরূপ ও রামরায়কে হর্ষ ভরে বলিলেন—

“.....শুন স্বরূপ রামরায় ।
‘নাম সংকীৰ্ত্তন’ কলৌ পরম উপায় ॥”

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ

অর্থাৎ ভগবত প্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে, তাঁহাদের মধ্যে ‘হরিনাম সংকীৰ্ত্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ’।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকেও পুরীধামের সিদ্ধ বকুলতলে একদা গৌরহরি বলিয়াছিলেন—

‘ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা ভক্তি ।
‘কৃষ্ণ-প্রেম’ ‘কৃষ্ণ’ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীৰ্ত্তন ।
(যে হেতু, নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেম ধন ॥’

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ

(‘নামের’ অচিন্ত্য শক্তিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মায়াবদ্ধ আমাদের ন্যায় জীবের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার বিরচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের ১য় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ১৪৪-১৭৩ শ্লোকে ‘নাম সংকীৰ্ত্তনের’ সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন ।)

গৌরহরি আরও বলিলেন—

‘সংকীৰ্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ;
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ।’

কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীৰ্তন দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যিনি ‘সঙ্কীৰ্তন যজ্ঞে’ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন তিনি সু-বুদ্ধি ব্যক্তি। গৌরহরির মন প্রফুল্ল, হৃদয় শান্ত, প্রাণে আনন্দে ভরপুর। তিনি পুনরায় বলিলেন—

‘নাম সংকীৰ্তন হৈতে সৰ্বানর্থ নাশ।
সৰ্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস ॥’

এই বলিয়া তিনি স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ত্রুটি প্রকাশ করিলেন—

‘চেতো দৰ্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনিৰ্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্ ।’

আনন্দাসুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সৰ্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্তনং ॥’

যাহা (১) চিত্তরূপ দৰ্পণকে মার্জিত করে (২) সংসাররূপ মহা-দাবানলকে নিৰ্বাপিত করে (৩) জীবের মঙ্গলরূপ কৌমুদীকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে (৪) বিদ্যাবধুর জীবন সদৃশ (৫) আনন্দরূপ সমুদ্রকে উচ্ছলিত করে (৬) প্রতি পদেই পূর্ণামৃত আশ্বাদন দেয় (৭) মন-আদি ইন্দ্রিয় বর্গের তৃপ্তিজনক—সেই ‘শ্রীকৃষ্ণ-নাম-সঙ্কীৰ্তন’ সৰ্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন।

—ইহা অর্দ্ধবাহু দশায় গৌরহরির স্বগতোক্তির গীতি। কিন্তু, কলি কবলিত মায়া মুক্ত জীবকে ‘ভজন ক্রিয়াতে’ প্রলুব্ধ করিতে পরম সমর্থ এই শ্লোকের ত্রুটি।

ভরপুর প্রাণের আনন্দে ‘সংকীৰ্তন পিতা’ গৌরহরি ‘হরিনাম

সংকীর্ণনের' মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন । হঠাৎ তাঁহার মনে (প্রেমের স্বভাবে) উদয় হইল যে—

“নামে তাঁহার অনুরাগ নাই”

এবং

“নামের ফল হইতে তিনি বঞ্চিত হইতেছেন”

—সঙ্গে সঙ্গে তিনি দৈন্য ও বিষাদ দশা প্রাপ্ত হইলেন । এই অবস্থায় বিলাপ করিলেন—

‘নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি—

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি

হৃদৈবসীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥’

(হে ভগবান ! তুমি কৃপা করিয়া প্রত্যেক লোকের নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ইহ জগতে আপনার বহু নাম প্রচার করিয়াছ । তোমার অনন্ত নামের অনন্ত শক্তি । প্রত্যেক নামেই তুমি তোমার নিজের অনন্ত শক্তি নিহিত করিয়াছ । আবার তুমি জীবের প্রতি দয়া করিয়া তোমার অচিন্ত্য প্রভাব সম্পন্ন নাম স্মরণের ‘সময়’ ‘অসময়’ নির্ধারণ কর নাই । জীব শুদ্ধাশুদ্ধ সকল অবস্থায়, ‘কাল’ ‘অকাল’ সকল সময়েই তোমার আনন্দ-রস-মুক্তি ‘নাম’ গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইতে পারে । হে দয়াময় ! তোমার এতাদৃশ কৃপা সত্ত্বেও আমার এমনি ছুর্ভাগ্য যে, তোমার এই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভুবন-মঙ্গল নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না ।)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—

‘খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয় ॥’

‘অর্দ্ধবাহুদশায়’ গৌরহরির এই ‘বিলাপ’ আমাদিগকে যেন
‘অনর্থ-নিবৃত্তি’ দশায় যে অনুভব তাহা, জ্ঞাপন করিতেছেন—

অতঃপর বিষাদভাব কিছুটা পাতলা, হইলে সदैন্নে গৌরহরি
বলিতেছেন—

“ ‘যে রূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় ।
তাহার ‘লক্ষণ’ শুন স্বরূপ, রামরায় ॥’

এই বলিয়াই তিনি শ্লোকরত্নটির উদয় করিলেন । যথা—

‘তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥’*

এই শোক রত্নটির ব্যাখ্যা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

“উত্তম হৈয়া আপনাকে মানে তৃণাধম ;
তুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ।—
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয় ;
শুকাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ।

* এই শ্লোক রত্নটির মর্ম—

সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও যদি হয়, তথাপি সাধক নিজেকে সর্বা-
পেক্ষা হেয় মনে করিবেন । ঐ অবস্থা স্বভাবে পরিণত হইলে তবে “প্রেম-
প্রাপ্তি” ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রেরণায় আমাদের মনে হয় এ ‘অবস্থা’ বা
‘অধিকার’ লাভ করিয়া কলিজীব হরিনাম করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ।

(এ শ্লোকের তাৎপর্য এই শ্রীগ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন ।)

যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ;
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ ।

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ;
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ।

এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয় ;
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয় ।”

—চরিতামৃত অন্ত্য ২০শ

‘রাই কানুর আশ্ মিতান’ ‘গৌরহরি স্বরূপের’ প্রখ্যাত শিক্ষা
অষ্টকটি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা অস্ত্রে নিজের একটি অভিমত
দিয়াছেন—

‘প্রভুর গম্ভীরা লীলা না পারি বুঝিতে ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১০শ

— — — — —

একাদশ উরঙ্গ

(১)

রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন—

‘প্রভুর বিয়োগে স্বরূপের অন্তর্ধানে ।
মহা দুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন ॥’

—ভক্তিরত্নাকর

চারি ব্রহ্মের বিহারভূমি মধুর নীলাচল ধামে সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষ (শকাব্দ ১৪৪০ হইতে ১৪৫৫ পর্য্যন্ত) সময়ে, শ্রীল রঘুনাথ দাসের যে ভাবে গৌরহরি ও তাঁহার নদে, নীলাচল ও ব্রজের অগণিত ভক্ত-গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলন ঘটয়াছে এইরূপ আর একটি চরিত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ।

গৌরহরির অন্তর্ধানের দুঃসহ শোকে তাঁহার দ্বিতীয় দেহ স্বরূপ গোস্বামী সঙ্গে সঙ্গে দেহ রক্ষা করেন ।

প্রাণপ্রিয় ‘গৌরহরি’ ও ‘স্বরূপ’ এই দুই স্বরূপের লীলা সঙ্গোপনে ‘রঘুনাথ’ উৎকট বিরহে উন্মাদপ্রায় হইয়া গেলেন । অন্যদিকে গৌর-বিরহে গদাধর পণ্ডিতের মুহূঁ মুহূঁ মুর্ছা ও বিলাপ ; রাজা প্রতাপ রুদ্র. রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কাশীমিশ্র, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি নীলাচলের অগণিত ভক্তবৃন্দের ঘন ঘন মুর্ছা ও হৃদয় বিদারক দশা । সকলের মুখে ‘হা প্রাণনাথ এ কি করিলে’ ? এইরূপ বেদনা বিষাদ তমোময় পরিবেশে অবস্থান করা রঘুনাথের পক্ষে অসম্ভব হইল ; রঘুনাথ মনে মনে বিচার করিলেন—

“আর কেন ? সোনার গৌরাঙ্গ তাঁহার লাল। সঙ্কোপন করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় দেহ (আমার প্রভু ও পিতা) স্বরূপ গোসাঞি ও সেই সঙ্গে গেলেন ; এ নির্লজ্জ প্রাণ দেহে রহিল কেন ? আর জীবন ধারণের ফল কি ? এখন মরণই মঙ্গল । এখন মৃত্যুই পরম বন্ধু ।

‘হা স্বরূপের সর্বস্ব প্রাণ গৌরাঙ্গ’—বলিয়া এ দেহ ত্যাগ করিব ।”

কোথায় ও কিরূপে দেহ ত্যাগ করিবেন, সে বিবরণ—

‘বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ বন্দিয়া ;
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ।’

—চরিতামৃত আদি ১০ম

—এবং মহাছুঃখে তিনি বৃন্দাবন গমন করিলেন ।

ষোড়শ বর্ষ পূর্বে ‘সপ্তগ্রাম’ হইতে বন, কণ্ঠক, পর্বত, জল, পথে হিংস্র জন্তু আদি অতিক্রম করিয়া যখন নীলাচলে আসেন সে আগমন ‘পূর্বরাগ দশায়’—মিলন আশা-রূপ অবর্ণনীয় আনন্দ । সেবার যেমন অনাহারে অনিদ্রায় ছুটিয়া চলিয়াছিলেন তেমনি বৃন্দাবন পথে গমনের সময়ও অনাহারে অনিদ্রায় ছুটিয়া চলিয়াছেন । কিন্তু, এ গমন—অবর্ণনীয় ছুঃখের সহিত ।

‘পরিপূর্ণ মিলনের’ বিরহে ‘সর্বোত্তমা প্রাপ্তি’ তাহা ব্রজের পথে রঘুনাথের ঘটিয়াছে । তাই—

‘চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা :’

‘দেহ ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধন’

‘এ ছার দেহে কাজ কি আছে ?
গৌরাজ বৈমুখ দেহ এ ছার দেহে কাজ কি আছে ?

প্রাণ গৌর যদি বিরূপ হয়েছে এ ছার দেহে কাজ কি আছে ?

আর বেঁচে কাজ কি বল ?
প্রাণ গৌর যদি ছেড়ে গেল আর বেঁচে কাজ কি বল ?

আর আমি রাখব না
শ্রীগৌরাজ বৈমুখ প্রাণ আর আমি রাখব না’

—শ্রীপাদ বাবাজী মহাশয়

নীলাচল হইতে ব্রজভূমি এই সুদীর্ঘ পথ এইরূপ বিলাপ করিতে
করিতে ‘দাস গোস্বামী’ গোবর্দ্ধন পর্বত তটে পঁহুছিলেন ।

(২)

‘রঘুনাথের’ মনের ‘আশয়’ জানিয়া পরম করুণ গৌরহরি নিজ
প্রিয় শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে (তাঁহাদের অনুভূত মূর্তিতে) রঘুনাথের
মনোবৃত্তি জানাইলেন এবং কৃপাদেশ করিলেন—

“তোমরা দুই জনে অতি সত্বর গোবর্দ্ধন তটে গিয়া আমার
‘স্বরূপের রঘুনাথকে’ প্রাণে বাঁচাও ! অন্যথায় সে আমার বিরহে
প্রাণত্যাগ করিবে । আমার অনেক কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে ।
তাহাকে লইয়াই সে সব কাজ হইবে । তোমরা সত্বর গিয়া তাহার
প্রাণ রক্ষা কর ।”

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গৌরহরির আদেশ লাভ করিয়া গিরি গোবর্দ্ধনের পথে ছুটিলেন ।

গৌরহরি লীলা সঙ্কোপন করিয়াছেন এই মর্শ্বান্তিক সংবাদ বাতাসে ভর করিয়াই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । তাঁহারা সেই হইতেই অসহ্য ব্যথায় মুহমান হইয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ চরম কৃপাপ্রাপ্ত রঘুনাথের সঙ্গ পাইবেন, তাহার সঙ্গগুণে গৌর-অদর্শন-জ্বালা প্রশমিত হইবে, দুঃসহ দুঃখ মধ্যেও মনে কথঞ্চিৎ স্বস্তি লাভ হইবে ; এই লোভে (অদূরে) গৌরপ্রিয় রঘুনাথের দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিতে আসিতে পথে সেই 'গৌরাজ্ঞ বিরহী' শীর্ণ-মুক্তি রঘুনাথকে ছুই ভাই জড়াইয়া ধরিলেন । যথা—

‘ধরি রূপ সনাতন

রাখিল তাঁর জীবন

দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা ।’

তাঁহারা রঘুনাথকে বলিলেন—

“ভাই রঘুনাথ ! এ কি সঙ্কল্প করিয়াছ ? কাহার দেহ ত্যাগ করিবে ? এ কি তোমার দেহ ? এ দেহে তোমার কি অধিকার ? এ দেহ শ্রীগৌরাজ্ঞ অঙ্গীকার করিয়াছেন । গৌরের ক্রীত না এই দেহ ? শ্রীগৌরে উৎসর্গীত এই দেহ ।

তাহার পর তাঁহারা (স্বপ্নবৎ অনুভূত) যে গৌরহরির আদেশ পাইয়াছেন তাহা রঘুনাথকে জানাইলেন । শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মাধ্যমে গৌরহরির অভিমত জানিয়া রঘুনাথ—

“ছুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া

রাধাকুণ্ড তটে গিয়া

বাস করি নিয়ম করিলা ।”

(৩)

গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জমালা প্রসঙ্গে :

পূর্বেই জানা গিয়াছে যে শ্রীমৎ শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে একমূর্তি গোবর্দ্ধন শিলা ও একটি গুঞ্জমালা লইয়া গিয়াছিলেন : তিনি ঐ দিব্য শক্তিধর বস্তু দুইটি গম্ভীরাবিহারী গৌরহরিকে উপহার দেন । গৌরহরি তিন বৎসর কাল যাবৎ ঐ দুটিকে অপূর্ব ধন-জ্ঞানে কখনও মাথায়, কখনও নাসায়, কখনও চক্ষে, কখনও বক্ষে ধারণ করিয়া রাখাক্ষেপের সাক্ষাৎ সঙ্গ সুখ ভোগ করিতেন । গৌরহরির প্রেমাশ্রুতে ঐ শিলা ও মালা নিরন্তর পরিষিক্ত হইত । এইরূপ ভাবে তিন বৎসর কাল ব্যাপী গোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জমালাকে নিজ স্নেহ, শ্রীতি ও সঙ্গসুখ দান করার পর সেই অপরূপ বস্তুদ্বয় রঘুনাথকে শ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ দান করিয়াছিলেন ।

নীলাচলে ঐ শিলা ও মালা রঘুনাথ নিত্য সেবা করিতেন গৌরহরির অপ্রকটে উৎকট বিরহ ব্যথা প্রশমনের জন্ত শ্রীকৃষ্ণ তটে বাস কালে সর্বদা গৌরশ্রীতির নিদর্শন ঐ বস্তুদ্বয় নিজ নয়ন সম্মুখে রাখিতেন ।

‘প্রভুর হস্ত দত্তে এই গোবর্দ্ধন শিলা ।
এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা ॥’

শ্রীকৃষ্ণতটে শ্রীল দাস গোস্বামীর বিলাপ বর্ণনেও একথার সত্যতা ও সাক্ষী আছে । যথা—

মহা-সম্পদাবাদপি পতিতমুদ্ধত্য কৃপয়া ।
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং গৃশ্য মুদিতঃ ॥
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং ।
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস (গোস্বামী) বিরচিত অনুবাদ---

'আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল ।

স্বরূপের আশ্রয় দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥

বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে ।

এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে ॥'

আরে মোর সোনার গৌরাজ্জ প্রভু ।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুগিতে নারিব আর কভু ॥

দ্বাদশ উরঙ্গ

(১)

রূপ-সনাতন প্রসঙ্গে :

‘মহাপ্রভুর লীলা যত অন্তর বাহির !
দুই ভাই তার মুখে শুনে নিরন্তর ॥’

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের অপরূপ মূর্তি গৌরহরি ও তাঁহার প্রেম চেষ্টা শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাদের নীলাচল অবস্থান কালে স্বচক্ষে কিছু কিছু দর্শন করিয়াছিলেন। পরে, ব্রজ ও নীলাচলে পত্র প্রেরকদের হস্তে ও লোকমুখে যৎসামান্যই শুনিতে পাইতেন। এক্ষণে গৌর-হরির ষোড়শ বর্ষব্যাপী অন্তরঙ্গ সেবক দাস গোস্বামীকে পাইয়া তাঁহারা নীলাচল-বিহারী গৌরহরির ‘প্রকট কালের লীলাবলী কোটি গুণ উজ্জ্বল প্রকাশে’ ভোগ করিতে লাগিলেন। যথা—

বিরহ প্রশমনের একমাত্র ঔষধ ‘মিলন প্রসঙ্গ’। স্মৃতরাং, শয়নে স্বপনে জাগরণে দাস গোস্বামী গৌরহরির মিলন প্রসঙ্গই আলাপ করেন। তাঁহার ঐ স্বাভাবিক চেষ্টাতে রূপ-সনাতন আদি ব্রজের গৌর-পরিকর ভক্তবৃন্দ (যেন) সাক্ষাৎ ভাবে গৌরহরির প্রকট লীলা ভোগ করিতেন।

রঘুনাথ দাস সর্বদা শ্রীকৃষ্ণ তটেই পড়িয়া থাকিতেন। শ্রীরূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, শ্রীভীষ আদি মহাজনবৃন্দ নিজ নিজ ভজন ও গৌরহরির আদেশ পালন জন্য ‘ব্রজে’ অন্যত্র বাস করিলেও তাঁহারা সকলেই মনে মনে রঘুনাথের সঙ্গ-সুখ ভোগ

করিতেন। এবং যখন যখন ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ অবসর পাইতেন, তাঁহারা রঘুনাথের নিকট ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহারা রঘুনাথের দর্শনকে গৌর দর্শনের সমান সুখ মনে করিতেন। তাঁহারা যে শ্রীকৃষ্ণ তটে গমন করিতেন এবং সেই স্থানে মাঝে মাঝে অবস্থান করিতেন তাহার সাক্ষ্য স্বরূপ আজও শ্রীকৃষ্ণ তটে ঐ সমস্ত গোস্বামীদের “আসন” (ভজন ও বিশ্রাম স্থান) সংরক্ষিত হইয়াছে। (চিত্র সাহায্যে দেখান হইল)।

প্রাচীন ও প্রামাণিক বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে শোনা যায় যে—

শ্রীল রঘুনাথ দাস ব্রজে (শ্রীকৃষ্ণে) বাসের পর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, প্রবোধানন্দ সরস্বতী আদি যে সব গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণ তটে ইষ্টগোষ্ঠীর সময় আলোচিত হওয়ার পরই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে—

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব আদির অনুভবই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আশ্বাদন ;
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ।’

—চরিতামৃত অন্ত্য ১৮শ

‘ভক্তি রত্নাকর’ শ্রীগ্রন্থে পাওয়া যায়—

‘সনাতন রূপ রঘুনাথ এক তিনে ।
রঘুনাথ চেষ্টা দিগ্‌বিদিক্‌ ভুবনে ॥’

‘ব্রজলীলা’ ও ‘ব্রজের আশ্‌-মিটান গৌরলীলার’ যে সর্বোত্তম অধিকারী রঘুনাথ দাস, সে সম্বন্ধে (ইঙ্গিত)—

(১) বৈষ্ণবতোষণী টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

‘রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টৌ
গোপালভট্টৌ রঘুনাথ দাসঃ ।
স্মাতামুভো যত্র সুহৃৎ সহায়ৌ—
কো নাম সোহর্থো নভবেৎ সুসিদ্ধঃ ॥’

(২) লঘুতোষণী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন—

‘যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা ।
কৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোন্মিনিবহে ঘৃণন্ সদা দিব্যতি ।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভর মতীতৈবানয়োভ্রাজতো ।
স্তন্যস্তত্ব পদং মত ত্রিভুবনে নাশ্চর্য্যমার্ঘ্যোস্তমৈঃ ॥’

(৩) শ্রীজীব অন্যত্র বলিয়াছেন—

‘রঘুনাভিধৈয়স্য তয়োমিত্রত্বমীয়ষঃ ।
স্তবমালা দানমুক্তাচরিতঃ কৃতিষদিতন ॥’

(৪) শ্রীগোপাল চম্পু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

‘শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য সনাতনরূপকং
গোপাল রঘুনাথস্ত ব্রজবল্লভ পাহিমাম্ ।’

তিনি স্বয়ং ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন—

“হে শ্রীরঘুনাথদাস নামধামতয়া ইতি প্রসিদ্ধ—
পরমভক্তিপরাবিদ্ধ ।”

হরিভক্তি বিলাসের প্রারম্ভ শ্লোকের টীকায়—

(৫) শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

রঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলভাস্করং পরমভাগবতঃ
ইত্যাদি

(১)

রূপ সনাতনের অদর্শনে :

গৌরহরির বিয়োগে রঘুনাথ অন্ন ত্যাগ করিয়া সামান্য বন্য ফল, তক্র ও দধি মাত্র আহার করিতেন। পরে, আর একটি নিদারুণ বিরহ ব্যথার শেল আসিয়া তাঁহার বিদীর্ণ হৃদয়কে ছারখার করিয়াছে।

“সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।”

আর নিরন্তর বিলাপ—

(বলে) এ জীবনে কাজ কি বল ?

সনাতন যদি ছেড়ে গেল (বলে) এ জীবনে কাজ কি বল ?

কেন ম'রি নাহি যাই

অন্ন-জল বিষ খাই—

কেন ম'রি নাহি যাই

আবার, কিছুদিন পর, একটি পঞ্জর খসিয়া যাওয়ার মতই—

শ্রীরূপের অদর্শনে,—

শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গ

যেন জন্মে জন্মে পাই হে

যেন জন্মে জন্মে পাই হে

প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌরসঙ্গ

শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গ

শ্রীরূপ সনাতন সঙ্গ

আমার প্রভু স্বরূপ সনে

যেন জন্মে জন্মে পাই হে

যেন জন্মে জন্মে পাই হে

যেন গৌর বলে মরতে পারি
এই কৃপা কর 'গৌরগণ' 'গৌর-লীলাস্থলী'—।

যেন গৌর বলে মরতে পারি

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী)

ত্রয়োদশ উরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণ সংস্কারে :

(১)

শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস :

শ্রীরাধাকৃষ্ণের উৎপত্তির বিষয় একটি বিচিত্র ইতিহাস মিশ্রিত আখ্যান আছে। কিছু পুরাণের কথার সহিত সংশ্লিষ্ট। যথা—

দ্বাপর যুগ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে। একদা কংস রাজার প্রেরিত 'অরিষ্টাসুর' নামক অসুর বৃষ রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ব্রজ-রাজকুমার রাক্ষসী মায়ার ছলনা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। এই লীলায় ছলনাময় রৌদ্ররস ও অদ্ভুত রসের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়াছিল।

অরিষ্টাসুর বধের অল্প কিছুক্ষণ পরেই রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমতী অরিষ্টাসুরের নিধন সংবাদ শুনিয়া মুছ বক্র ও ঘণা বজ্রক হাস্য ও দৃষ্টির সহিত বলিলেন—

“তোমার ঘণা নাই, কর্তব্যাকর্তব্য বোধ নাই। অরিষ্টাসুর অসুর হইলেও সে একটি বৃষের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল ত? তুমি গো হত্যা করিয়া বীভৎস কাণ্ড কারয়াছে। ছিঃ! আমাকে ছুঁইও না। তুমি অপবিত্র হইয়াছ। যদি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া আসিতে পার তবে তোমার দোষ ঘুচিবে।”

রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক হাসির সহিত বলিলেন—

“তীর্থের অব্বেষণে যাইয়া সময় নষ্ট করি কেন ? এই খানেই সকল তীর্থ আনিয়া তোমাদের সমক্ষেই স্নান করিতেছি । দেখ ।”—

এই বলিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও মোহকারী শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে পদাঘাত করিলেন । বিশ্বস্তরের পদাঘাতে সরোবর প্রমাণ বিরাট গর্ভ সৃষ্টি হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তীর্থের পবিত্র সলিল মহা-উল্লাসে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান পূর্ণ করিল । তীর্থগণ আপন আপন পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন । পরম প্রিয়ার বাসনা পূরণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে নিজে সেই সরোবরে স্নান করিলেন । এই কুণ্ডের নাম—‘শ্যামকুণ্ড’

অতঃপর রস কোন্দলে তিনি শ্রীমতীকে বলিলেন, “সখী ! আমার ক্ষমতা দেখিলে ত ? তোমাদের এমন ক্ষমতা আছে কি ? যাক্, এখন সকলে আমার এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্র হও ।”

শ্রীমতী গস্তীরভাব ধারণ করিয়া বলিলেন—

‘সখা ! উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ । গর্গাচার্যের মুখে শুনিয়াছি—’

“উদ্ধত্য পঞ্চমুৎ পিণ্ডান্ স্নায়াৎ পরং জলাশয়ে”

সুতরাং আমরা প্রত্যেকে পাঁচটা করিয়া টিলা নিক্ষেপ করিয়া পরে আমরা সরোবরে স্নান করিব । তুমি দাঁড়াইয়া দেখ ।’

‘রাসেশ্বরী’ এই বলিয়া নিজের সখীবৃন্দসহ মৃত্তিকা উত্তোলন করিতে লাগিলেন । তাহাতে অচিরেই আর একটি কুণ্ডের উৎপত্তি হইল । সেই কুণ্ডেও সমস্ত তীর্থ সমাগত হইয়া ‘হ্লাদিনার সার’ শ্রীমতীর স্তব স্তুতি করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন । এই কুণ্ডের নাম—‘রাধাকুণ্ড’ ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও এই কুণ্ডতে বাস করিতেন । তিনি বর্ণনা দিয়াছেন—

‘কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধামাধুরিমা ।
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥’

অত্য়াপিও সেই কুণ্ডদ্বয় বর্তমান । মথুরা হইতে চৌদ্দ মাইল
দূরে গোবর্দ্ধন গ্রাম । এবং গোবর্দ্ধন হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে
‘শ্রীরাধাকুণ্ড’ ও ‘শ্রীশ্যামকুণ্ড’ অবস্থিত ।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা অবসানে উক্ত ‘অপ্রাকৃত’ কুণ্ডদ্বয় আবরিত হইয়া
যায় । পুনরায় গৌরলীলার সময় যখন গৌরহরি শ্রীবৃন্দাবনে*
আগমন করেন, তখন তিনি দেখিলেন—

‘দুই ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়’

তিনি ঐ ধান্য ক্ষেত্রের অল্প জলেই স্রষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন ।
বলভদ্র ও তাঁহার সেবক এবং মথুরাবাসী সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ ‘গৌর-
হরির’ এই স্নান লীলা দর্শনে বিস্মিত হইলেন । তাঁহারা প্রথমে
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । স্নানান্তে গৌরহরি স্তব পাঠ
করিলেন—

‘গোবর্দ্ধন গিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নায়াৎ হরেঃ প্রিয়ঃ ।’

নরো ভক্ত্যে ভবেৎ বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষনং !’

(শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের প্রকট তিথি কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর দিবস
রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে । সেই সময় প্রচণ্ড শীতের সমাগম থাকে

* ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভু শীত ঋতুতে শ্রীবৃন্দাবনে
আইসেন । শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৭

এই গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীনবদ্বীপদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীশ্রীগোড়েশ্বর
বৈষ্ণব সন্ন্যাসিনী, রাধাকুণ্ডের মোহান্ত ছিলেন ।

এবং মধ্য রাত্রি ; কিন্তু অত্য়াপি স্নানার্থে প্রতিবৎসর ঐ সময় অসংখ্য লোকের সমাগম হয় ।)

‘যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তুশুকুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।

সর্বগোপীষু সৈবেকো বিষ্ণোরতন্ত্য বল্লভা ॥’ (পাদ্মে)

ইহার পর সেই স্থানের মৃত্তিকা লইয়া তিনি (গৌরহরি) নিজের শ্রীঅঙ্গে তিলক ধারণ করিলেন ।

তখন বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহার সঙ্গীরা বুঝিলেন যে এই স্থানই ‘রাধাকুণ্ড’ ।

(২)

মহন্ত শ্রীনবদ্বীপদাস মহাশয় প্রণীত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস শ্রীগ্রন্থ হইতে জানা যায়—

(১) গৌরহরি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের শীত ঋতুতে শ্রীবৃন্দাবনে আইসেন ।

(২) ১৪৫৫ শকে অথবা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দাস গোস্বামী ব্রজে আগমন কবেন ।

(৩) দাস গোস্বামী ব্রজে আসার পরও ১২।১৩ বৎসর পর্যন্ত বর্তমান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড চাষের জমি ছিল । কারণ, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ মূল্যে ঐ জমি খরিদ হইয়াছে । এবং ঐ ঘটনার প্রায় সাত বৎসর পরে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামকুণ্ডের জমি খরিদ হয় ।

(৪) ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকুণ্ড খনন হয় ও ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামকুণ্ড খনন হয় ।

সুতরাং, ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কোন সময়ে একদা দাস গোস্বামীর মনে উদয় হইল—

‘কুণ্ডল জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল’

— চরিতামৃত

‘রঘুনাথ’ নিজের বাসনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার আপন মনে প্রশ্ন জাগিল, এ কি? আমার মনে এ কথার উদয় হইল কেন? কুণ্ডল জলে পূর্ণ করাতে অর্থের সম্পর্ককে টানিয়া আনা। নিষ্কিঞ্চন ভিখারীর এ বাসনা কেন?

ভক্তির স্বভাব দীনতায় তিনি নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করিলেন। পরে বিবিধ প্রকারে নিজ মনকে বুঝাইয়া অতি সাবধানে নিৰ্জনে রহিলেন।

ঐ দিনই বদরিকাশ্রমে উপনীত জনৈক ধনী ব্যক্তি ‘বদরিনাথ ধামে’ অবস্থিত শ্রীনারায়ণের পাদমূলে বহু অর্থ রাখিয়া প্রণাম করিলেন। পরম ভাগ্যবান সেই ধনী ব্যক্তি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—

দিবাভাগে যে ‘অচল’ মূর্তি দর্শন করিয়াছেন সেই শ্রীমন্ নারায়ণ বলিতেছেন—

‘তোমার দেওয়া মুদ্রা আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ মুদ্রা গুলিতে আমার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। এগুলি লইয়া তুমি মথুরার সন্নিকটে “অরিষ্ট” গ্রামে যাও। সেখানে এক দিব্য মূর্তি বৈষ্ণব দেখিতে পাইবে। তাঁহার নাম ‘রঘুনাথ দাস’। তাঁহাকে বলিও, বদরিকাশ্রমের অধীশ্বরের আজ্ঞায় আপনার জন্ম এই টাকা আনিয়াছি।

‘রঘুনাথ’ এই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবেন। তখন তাঁহাকে বলিও, তোমার অভীষ্ট দেবের প্রেরণাতেই তোমার মনে শ্রীকুণ্ডলের সংস্কারের বাসনা উদয় হইয়াছে। এবং তাঁহারই কৃপাদেশে আমি এই অর্থ তোমার দ্বারা রঘুনাথকে পাঠাইতেছি। তিনি অর্থ গ্রহণে (আর) ইতস্ততঃ বা কুণ্ঠা যেন না করেন।

প্রভাতে, পরম সুকৃতিবান সেই ধনী মহাজন কৃত কৃতার্থ বোধে, বদরিকাশ্রমের অধীশ্বরের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত অস্ত্রে মথুরার পথে অগ্রসর হইলেন এবং যথাকালে সেখানে উপনীত হইলেন। আবার, মথুরা হইতে দ্রুত 'অরিষ্ট' গ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। করুণা প্রেরিত মহাজন যথা সময়ে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাসের শ্রীচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে (পূর্ব বর্ণিত) বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। সেই ভাগ্যবান ধনী মহাজন দাস গোস্বামীর কৃপা লাভ করিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীকৃষ্ণদেবের পঙ্কোদ্ধার কার্য্য আরম্ভ হইল। অচিরেই শ্রীকৃষ্ণদেব সু-নির্ম্মল স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ হইল।

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ সংস্কারের কিছুদিন পরের একটি ঘটনা—

ঠাকুর হরিদাসের আদর্শে রঘুনাথদাস 'অনিকেতবাসী'। একদা শ্রীপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণে শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামীর ভক্তন কুটিরে শুভাগমন করিলেন। মানস পাবন-ঘাটে* স্নান করিতে যাইয়া দেখেন একটি ব্যাঘ্র ঐ ঘাটে জলপান করিতেছে। আর অদূরে শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস বাহুবেশ শূন্য অবস্থায় বসিয়া আছেন। ব্যাঘ্র জলপান করিয়া তাঁহারই পাশ দিয়া চলিয়া গেল। যথা—

* 'শ্যামকৃষ্ণ' তীরে একটি ঘাট।

‘রঘুনাথ গোস্বামী’

‘রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া ।
ব্যাত্র বনে গেল তাঁর নিকট হইয়া ॥’

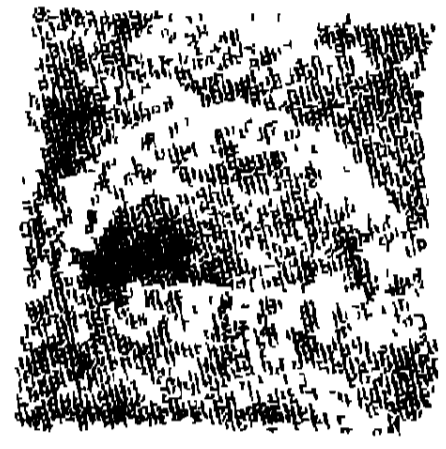
—ভক্তিরত্নাকর

কিছুক্ষণ পরে ‘রঘুনাথের’ বাহ্যাবেশ হইলে চাহিয়া দেখিলেন—
সম্মুখে শ্রীপাদ সনাতন । অতি সন্ত্রমে তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবৎ
প্রণতঃ হইলেন । তিনিও পরম স্নেহে রঘুনাথকে স্বীয় বক্ষে ধারণ
করিলেন । বিদায় সময়ে শ্রীসনাতন গোস্বামী ‘রঘুনাথকে’ বলিলেন—
“প্রাণের ভাই রঘু ! তুমি আমার একটি অনুরোধ বক্ষা কর ।
অতঃপর দিবারাত্র বৃক্ষতলে রহিও না । গোপালের (গোপালভট্ট
গোস্বামীর) কুটিরের নিকটে তোমার জন্মে একটি কুটির বন্দোবস্ত
করিয়া দিতেছি । তুমি এখন হইতে সেই কুটিরে থাকিও ।

‘শ্রীকৃষ্ণ তটে’ এই স্থানটি এখনো সুরক্ষিত এবং ‘দাস গোস্বামীর
ভজন কুটি’ নামে খ্যাত ।

এই স্থানটির চিত্র সংযোজিত হইল ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥
 नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो ।
 नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो नमो ।



श्री कृष्णदास दास 'दास गोश्यामी' 'उद्धार कर्ता'

চতুর্দশ উরঙ্গ

(১)

শ্রীকৃষ্ণ তটে :

‘রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন ।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন ॥’

—চরিতামৃত

পরম বিচিত্র চরিত্র গৌরস্বরূপ । তাঁহার লীলাবলীর স্মরণ,
মনন ও প্রলাপ বর্ণনই দাস গোস্বামীর—

‘মানসে রাধাকৃষ্ণ সেবন’

নীলাচলে ‘রঘুনাথ’ যেরূপ স্বরূপের ‘পুত্র’ ও ‘ভৃত্য’ তেমনি—

শ্রীকৃষ্ণতটে কৃষ্ণদাস কবিরাজও দাস গোস্বামীর ‘পুত্র’ ও ‘ভৃত্য’ ।

এই কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, দাস
গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণতটে যে সুদীর্ঘ কাল বাস করেন সে সময়ের—

(ক) প্রতিটি দিন ও রাত্রি, ‘তিনি’ রাধাকৃষ্ণের একীভূত স্বরূপ
গৌরহরির মানসে সেবা করিয়াছেন । ‘সেবা’ অর্থে সুখ দেওয়া ।
(গৌরহরি সুখ পায় কিসে ?—ব্রজলীলার সঙ্গ ও প্রসঙ্গে ।)

এবং—

(খ) ‘প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিন্তন’

এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অভিষ্টদেব সোনার গৌরাজ মহাপ্রভুর
অঙ্গ যে কয়টি স্বরচিত ‘বন্দনা’ রাখিয়া গিয়াছেন এবং এখনো মহা-

‘তার পর দিবস শ্রীজীব শ্রীনিবাসে ।
পাঠাইলা শ্রীকুণ্ডেতে গোস্বামী পাশে ॥’

দাস গোস্বামী বাৎসল্যে ও পরম স্নেহে শ্রীনিবাসকে কৃপার অবধি করিলেন । শ্রীকুণ্ড ও গোবর্দ্ধনে তিন দিন রাখিলেন । গোবর্দ্ধন-বাসী রাঘব পণ্ডিত এবং শ্রীকুণ্ডবাসী নিজ সেবক কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকেও কৃপা আশীর্বাদ করিতে বলিলেন ।

‘তিন দিন রহি রাখাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে ।
সবা’ অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে ।’

—ভক্তিরত্নাকর ৪র্থ তরঙ্গ

এবং বৃন্দাবনে আসিয়া সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীনিবাস বিদ্যারম্ভ করেন । তাঁহার পাঠের আচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী ।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে “নরোত্তম” ব্রজে আসেন । তাঁহার দীক্ষা দেন লোকনাথ গোস্বামী । তিনিও শ্রীজীবের নিকট বিদ্যারম্ভ করেন । কালে, শ্রীনিবাস “শ্রীআচার্য্য” পদবী প্রাপ্ত হন । এবং ‘নরোত্তম’ “শ্রীমহাশয়” পদবী লাভ করেন ।

দ্বিতীয় মিলন :

শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদিগকে ব্রজের সর্বত্র দর্শনে পাঠান । ঐ কার্য্যে তাঁহাদের সাথী হন গোবর্দ্ধন পর্বত সন্নিকটে পুছরী গ্রামের নিবাসী প্রখ্যাত রাঘব পণ্ডিত । (এখনো ‘রাঘবের গোঁফা’ পুছরীতে সুরক্ষিত আছে ।)

বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে একদিন তাঁহারা শ্রীকুণ্ডে

আসিলেন। রাঘব পণ্ডিত উভয়কে দাস গোস্বামীর শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের পরিচয় আদি সব বিবরণ নিবেদন করিলেন। দাস গোস্বামী হর্ষ চিত্তে সমস্ত শ্রবণ করিলেন।

‘শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে।

ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামী চরণে ॥’

—ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ

উৎকট বিরহে—দাস গোস্বামীর দেহ অস্থি-চর্ম-সার এবং অতিশয় দুর্বল। তথাপিও তিনি তাঁহার দুর্বল ও শিথিল বাহুদ্বয় শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে আলিঙ্গন জন্ম প্রসার করিলেন। তাঁহাদের আলিঙ্গন করিলেন। পরে শ্রীনিবাসকে খুব ধীরে ধীরে যে সমস্ত কথা বলেন তাহা অপরে শুনিতে পান নি। (তখন) এত দুর্বল দাস গোস্বামীর শরীর! কৃষ্ণদাস কবিরাজ, দাস গোস্বামী ও ব্রজবাসীর চেষ্টায় ও আগ্রহে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণে স্নান করিলেন, কুণ্ডবাসী অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং সেখানেই মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। দাস গোস্বামী ও শ্রীকুণ্ডবাসী সকলের সহিত যথাযোগ্য বিদায় সন্তোষের অন্তে তাঁহারা তাঁহাদের ‘ব্রজমণ্ডল’ পরিক্রমার পথে চলিলেন।

তৃতীয় মিলন :

প্রথমে শ্রীনিবাস, তাহার পর শ্রীনরোত্তম ব্রজে আগমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে শ্যামানন্দও অস্থিকা কালনা হইতে ব্রজে আসেন। এখন তিন জনেই সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। সুতরাং শ্রীজীব আদি ব্রজের বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব লিখিত গ্রন্থ-

রাজী, 'পঠন' 'পাঠন' জন্ম, শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে গৌড়ে ও উৎকলে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। যাত্রার দিন স্থির হইল। যথা—

'অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী প্রশস্ত।
সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ত্রস্ত ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ

গৌড়মণ্ডলে যাত্রার পূর্বে দাস গোস্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য শ্রীজীব, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইলেন। সে সময়ের দাস গোস্বামীর বর্ণনা ভক্তিরত্নাকর ৬ষ্ঠ তরঙ্গ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

'শ্রীদাস গোস্বামীর কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর দক্ষে হিয়া বিরহ ব্যথায় ॥'

কি বিরহ এবং কা'র কা'র বিরহ তাহাও পরবর্তী পয়ারে বলা আছে। যথা—

'কোথা 'শ্রীস্বরূপ', রূপ সনাতন বলি।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥'

এবং উৎকট বিরহের ফলে.—

'অতিক্ষীণ শরীর দুর্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥'

পরবর্তী পয়ারে বলা হইয়াছে—

'যত্বেপিহ শুক দেহ, বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥'

তাঁহার নির্বন্ধ ক্রিয়া সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামীর পয়ারে জানা আছে । এবং এই তরঙ্গের প্রারম্ভে উল্লিখিত আছে । যথা—

‘রাত্রি দিনে রাধা-কৃষ্ণের মানস সেবন ।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র চিস্তন ॥’

ভক্তি রত্নাকরে অতিরিক্ত আলোকপাত দেখা যাইতেছে ।
যথা—

‘দিবা নিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহণে ।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু নয়নে ॥’

এবং ভক্তিরত্নাকর শ্রীগ্রন্থ রচয়িতা ‘নরহরি দাস’ নিজ অনুভব ও অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন । যথা—

‘দাস গোস্বামীর চেষ্টা বুদ্ধিতে কে পারে ?
সদা মগ্ন রাধা-কৃষ্ণ চৈতন্য বিহারে ।’

শ্রীনিবাস আচার্য্য যে সময় নরোত্তম শ্যামানন্দ সহ শ্রীকৃষ্ণে পঁছ-
ছিলেন সে সময় দাস গোস্বামী নির্জনে বসিয়া গ্রন্থ অনুশীলন করিতে-
ছিলেন । শ্রীনিবাস আদি দাস গোস্বামীর দূর দর্শনে নিজদিগকে
ধন্য মনে করিলেন । নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতঃ
হইলে তিনি অতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ
করিলেন এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শ্রীনিবাসের মুখের দিকে তাকাইলেন ।
অর্থাৎ ব্যাপার কি ? আজ তোমরা তিনজনে একত্রে এসেছ !

শ্রীনিবাস—

গৌড়দেশ গমনের বিস্তারিত প্রস্তুতি ও বিবরণ শ্রীদাস গোস্বামীর
শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন । তাহা শ্রবণে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত
হইলেন । তাহার পর—

‘সর্বমতে সাবধান করি শ্রীনিবাসে ।

আলিঙ্গন করি ছুই নেত্র জলে ভাসে ॥’

—ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তরঙ্গ

বিদায়ের পূর্বক্ষণে আর একবার শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ দাস গোস্বামীর চরণ বন্দনা করিলেন । বিদায় কালীন বিচ্ছেদ ব্যথা অবর্ণনীয় । দাস গোস্বামীর ইঞ্জিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি শ্রীকৃষ্ণ-বাগী কয়েক মূর্ত্তি শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দর সহিত বৃন্দাবন পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন । এবং গ্রন্থসহ মথুরা ত্যাগের চাক্ষুষ বিবরণ সহ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে ফিরিয়া দাস গোস্বামীর শ্রীচরণে নিবেদন করেন ।

মা জাহ্নবা প্রসঙ্গে :

মা জাহ্নবা যখন ব্রজে যান তখন দাস গোস্বামীর তনু অতিশয় ক্ষীণ তনু । চলিতে বল নাই, আহার নাই, নয়নে নিদ্রা নাই । নিরন্তর ‘গৌর’ ও ‘গৌরগণদের’ বিরহের উৎকট যন্ত্রণা ভোগ হয় । মঃ-জাহ্নবার বৃন্দাবনে শুভ বিজয় সংবাদ কর্ণগোচর হইলে পর দাস গোস্বামী মাতা গোস্বামীকে অভ্যর্থনার জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজকে বৃন্দাবনে পাঠান । কবিরাজ গোস্বামীর প্রমুখ্যাৎ মা জাহ্নবাকে নিজ দশা জ্ঞাপন করাই ছিল শ্রীরঘুনাথের উদ্দেশ্য । এবং তাঁহার একান্ত প্রার্থনাও ছিল যে—মা জাহ্নবা দেবী যেন কৃপাপূর্বক এখানে আসিয়া তাঁহার সম্মানকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন ।

এ সংবাদ শ্রবণে—

‘শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী যে হইল অন্তরে ।

তাহা বিবরিয়া কে কহিতে শক্তি ধরে ?’

—ভক্তিরত্নাকর, একাদশ তরঙ্গ

মা জাহ্নবার ঐ বিহ্বল অবস্থা দর্শনে শ্রীল গোপাল ভট্ট আদি সকলেই সজে সজে বলিলেন—

আগামী কল্যই-‘শ্রীকুণ্ডে’ যাওয়া হইবে ।

পরদিন প্রাতঃকালে মা জাহ্নবা শ্রীকুণ্ডতীরে উপস্থিত হইলেন । মাতা পুত্রের দর্শনের জন্য এবং পুত্রও মাতার দর্শনের জন্য ব্যাকুল । ঐ হেন মনের অবস্থায় যেখানে দাস গোস্বামী বলিয়াছিলেন— মা জাহ্নবা তথায় বিজয় করিলেন । দাস গোস্বামী তাঁহাকে দণ্ডবৎ ও যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন । ঠাকুরাণী পরম স্নেহে ও সজল নয়নে বলিলেন—

“তোমাকে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠিত মন”

(প্রেমবিলাস)

কিছুক্ষণ মাতা পুত্রে মর্ম্বকথার আলাপনান্তে, স্বভাব দৈন্যে দাস গোস্বামী বলিলেন—

‘মা আমাকে চিরদিন নিজভৃত্য বলিয়া মনে রাখিবেন ।’

পরে কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিলেন—

‘আমি নিতান্ত অভাজন । বিষয়ীর ঘরে আমার জন্ম । আমি ভজন-সাধনহীন । আমার এমন কি গুণ আছে যে শ্রীগৌরসুন্দর আমায় কৃপা করিবেন ? আমি একদিনও তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিতে পারিলাম না ।

মা জাহ্নবা (নীরবে) বিশেষ চিহ্নিত ‘গৌরাঙ্গ-দাস’ দাস গোস্বামীর শির চুম্বন করিলেন । আনন্দাশ্রুতে তাঁহার শ্রীমস্তক সিক্ত করিতে লাগিলেন ।

বেশ কিছু সময় দাস গোস্বামীর সজে সুখে যাপন করিয়া তিনি শ্রীকুণ্ডকে প্রণাম করিলেন : তাহার পর পরম বাৎসল্যের ভাবে জননী পুত্রকে রাখিয়া দূরে যাইবার সময় যে ভাবে রোদন করেন,

মা জাহ্নবা রঘুনাথের হাত ধরিয়৷ তেমনি করিয়৷ কাঁদিতে লাগিলেন ।
রঘুনাথও অবুঝ শিশুর গ্যায় মায়েৰ বিদায় কালে কাঁদিয়া ব্যাকুল ।

‘এই মত সেই স্থানে বিদায় হইয়া ।

নিজে কান্দি যান রঘুনাথে কাঁদাইয়া ॥’

(প্রেমবিলাস)

(৪)

‘কবিরাজ যাঁর শিষ্য রহিলেন কাছে ।’

(প্রেমবিলাস)

(গৌরহরির প্রকট বিহার কিম্বা তাহার নিত্য-সিদ্ধ-পরিকরণের
দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই । কিন্তু, তাহাদের অভিন্ন স্বরূপ
নাম-রূপ-গুণ-লীলা সম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থটি ‘বাণী-
বিগ্রহ’ হইয়া আজও বর্তমান ।)

গৌরহরির শ্রীচরণ তলে স্বরূপ, স্বরূপের শ্রীচরণ তলে কবিরাজ
গোস্বামী এক অপার্থিব মধুর দৃশ্য ।

এ যেন রাই-কানুর ভাববিগ্রহের আশ্-মিটান-লীলাকারী গৌর-
হরি ‘কল্পবৃক্ষ’, সে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্বরূপ, পত্র পুষ্পরূপে দাস
গোস্বামী এবং সুপক্ক ফল শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের পয়ারে ধৃত
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

সনাতন গোস্বামীকে গৌরহরি বলিয়াছিলেন—

‘তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন ।’

আবার রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন—

“দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে”

তখন, গৌরহরি স্বপ্নযোগে শ্রীরূপ ও সনাতনকে জানাইলেন—

“রঘুনাথ আমার বিরহে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছে । তোমরা দুইজনে সত্বর গিরি গোবর্দ্ধন তটে যাও এবং আমার রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও ।

আমার রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও

তাহার দ্বারে আমার অনেক কাজ হবে,

আমার রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও

খৃষ্টাব্দ ১৫১৮ হইতে খৃষ্টাব্দ ১৫৩৩ পর্য্যন্ত অথও ষোড়শ বর্ষব্যাপী গৌরহরির সেবক দাস গোস্বামী । শেষ দ্বাদশ বৎসরের অন্তরঙ্গ সেবাতেও তিনি স্বরূপের আনুগত্যে নিত্য সহচর ছিলেন ।

প্রাকৃত-রাজ্যে দেখা যায় চন্দন বৃক্ষের তলায় যে সব অন্যান্য বৃক্ষ অবস্থান করে, সেই সব বৃক্ষও চন্দনের গন্ধই দান করে ।

যাঁহার সর্বজ্ঞতা হইতে সকলের সর্বজ্ঞতা সেই গৌরহরি জানিতেন যে, যে দুইটির ভাব উপাদানে এই দেহ গঠিত, সেই দুই উপাদানের অশেষ বিশেষ মহিমা প্রকাশ ও প্রচার না করিলে জগৎ ইহার (গৌর স্বরূপের) ‘প্রকাশ’ কেন ?

—তাহা জানিতে পারিবে না ও পরিপূর্ণরূপে গ্রহণও করিতে পারিবে না । এই কারণে, ঐ দুই উপাদান (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধে যাহাদের সর্বপ্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সেবা সম্বন্ধ আছে সেই

ছই স্বরূপ (শ্রীরূপ ও সনাতন) কে আদেশ দিলেন *—“তোমার ব্রজলালা প্রকাশ কর ।”

‘গৌরলীলা’ বা চির-অনর্পিত-অর্পণ লীলার সাথী ও সাক্ষী কে ? ঐ রূপ যোগ্য স্বরূপ হইতেই ত লীলা প্রকাশিত হওয়া চাই ? আবার লীলা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে তাহা প্রকাশ শোভন হয় না ।

এই ‘মুখ্য’ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্মই দাস গোস্বামীর স্বরূপ বৈভবটির প্রয়োজন । এবং এই আশয়েই গৌরহরি রূপ-সনাতনকে বলিয়াছেন—

‘রঘুনাথকে প্রাণে বাঁচাও তাহার দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে’

আচার্য্য পরম্পরায় শ্রুত হয়—

ব্রজলীলার সর্বোত্তমা প্রাপ্তি বা বিরহের অবধি ‘ভ্রমর গীত’

এবং

ব্রজলীলার আশ্-মিটান-লীলা যে ‘গৌরলীলা’, তাহার বিরহের অবধি—

‘শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর’

গৌরময়-প্রাণ. উৎকট গৌর-বিরহী, স্বচ্ছদর্পণ দাস গোস্বামী সুদীর্ঘ কাল শ্রীকুণ্ডতে বাস করিয়া কবিরাজ গোস্বামীর হৃদয়ে গৌরহরির নালাচল লীলা বিশেষ ভাবে সঞ্চার করেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ‘অক্ষররূপে’ সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে ।

যাঁহারা শ্রীকুণ্ড দর্শন করিয়াছেন (আশাকরি তাঁহারা অবশ্যই দর্শন করিয়াছেন ।)

* ব্রজলীলার গ্রন্থ, লীলাস্বলী ও শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন বা গৌর-সেবা করিয়াছেন ।

১। দাস গোস্বামীর ভজন স্থান

২। কবিরাজ গোস্বামীর ভজন স্থান

আচার্য্য ও পরম প্রিয় (সেবক) শিষ্যের সহিত যতটুকু ব্যবধান
থাকা দরকার এ কুটির দু'টি আজও সে সাক্ষ্য বহন করিতেছে ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সম্পূর্ণ হইয়াছে ১৫৩৭ শকে জ্যৈষ্ঠ পঞ্চমী
রবিবার । বিশুদ্ধ জ্যোতিষ গণনায় এই ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত
হইয়াছে ।

অর্থাৎ গৌরহরি ; তাঁহার প্রকট বিহারের সমস্ত পরিকর বা
লীলার সাথী ও ভ্রষ্টাদের অন্তর্দ্বানের পর 'সম্পূর্ণ লীলাটি' শ্রীচৈতন্য
চরিতামৃত' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাইয়াছে ।



श्रीलक्ष्मीदेवकी कलाकृत "उज्ज्वल कलाकृत"

পঞ্চদশ তরঙ্গ

গৌর-বিরহ প্রশমনের ঔষধি :

অনুভবশীল মহাজনবৃন্দের মুখে শোনা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বাসের সময় দাস গোস্বামী তাঁহার দুর্জয় গৌর বিরহের প্রশমনের ঔষধিরূপে তাহার স্বরচিত স্তব (শ্রীশ্রীগৌরান্ধ স্তব কল্পতরু) এবং অষ্টক (শ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্রম্) 'নিত্য' পাঠ করিয়া বিলাপ করিতেন । মূল সংস্কৃত ও বাংলা পয়ারে অনুবাদ সহ সে দুইটি যথাক্রমে নীচে উদ্ধৃত হইতেছে ।

শ্রীশ্রীগৌরান্ধ স্তব কল্পতরু :

গতিং দৃষ্টা যস্য প্রমদ-গজবর্ষ্যেহখিলজনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুংকার নিবহম্ ।
স্বকাস্ত্য্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্চীধু চ বচ-
স্তুরঞ্জৈর্গৌরান্ধো হৃদয়ং উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (১)

সকল জনের মন করিবারে আকর্ষণ

বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ ।

একবার যেই হেরে সে আঁখি ফিরাতে নারে

মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ ॥

হেরিয়ে গৌরান্ধ-গতি থুংকৃত-গজেন্দ্র-গতি

গজ সে সামান্য মদে মাতা ।

গৌরাজ বদন হেরে, সকলক চন্দ্রোপরে
ঘৃণা করে সকল জনতা ॥

গৌর-কান্তি ঝলমল তার আগে স্বর্ণাচল
অচল সে তারে কি গণিব ।

গৌরাজ মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী
পিলে মন করে পিব পিব ।

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ।

অলঙ্কৃত্যাত্মানং নব-বিবিধ-রত্নৈরিব বলদ —
বিবর্ণত্ব-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু-পুলকৈঃ ।
হসন্ স্বিছন্নৃত্যন্ শিতি-গিরিপতেনির্ভরমুদে-
পুরঃ শ্রীগৌরাজ্ঞে হৃদয় উদয়মাং মদয়তি ॥

ওহে মোর গৌরসুন্দর নটরাজ !
শ্রীল জগন্নাথ আগে বাড়াইয়া অশুরাগে,
নাচে পরি'ভাব-রত্ন সাজ ॥

বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
কম্প, অশ্রু, পুলক, সঘর্ম্ম ।

এই সপ্ত সাত্বিকভাব আর দুই অনুভাব
হাস্য, নৃত্য, সব প্রেম ধর্ম্ম ॥

নব রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে শোভে চমৎকার
 হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত ,
 সে রস যে নিরখিল সেই সে রসে মাতিল
 মোর মন করে উন্মাদিত ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু !
 হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
 ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ (২)

রসোল্লাসৈস্তিৰ্য্যগ্গতিভিরভিতো বারিভিরলং
 দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকান্নরুণ জলযন্ত্রহমিতয়োঃ
 মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুর মধরং কম্প-চলিতৈ-
 নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গে হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (৩)

রসের অবধি মোর গোরা ;
 রসের উল্লাস ভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
 ছ'নয়নে বহে প্রেমধারা ॥

অপরূপ সে মাধুরী স্মরণ করিয়া হরি,
 বারি বহে রাঙ্গা ছই নেত্রে ।
 বসন্ত উৎসব কালে সেচন করয়ে জলে
 যেন পিচকারী জলযন্ত্রে ॥

সকম্প আনন্দাবেশে দশনে অধর দংশে
 হেন প্রেম আছিল কোথায় ।

একবার যারে হেরে তার আঁখি মন হরে
মোর মন সতত মাতায় ॥

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ (৩)

ক্ৰচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতশ্চোকবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদধদধিক দৈর্ঘ্যং ভূজপদোঃ ।
লুঠন ভূমো কাক্বা বিকল-বিকলং গদগদবচা ॥
রুদন্ শ্রীগৌরাজা হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (৪)

একদিন কাশী মিশ্রালয়ে—

বসিয়াছেন মহাপ্রভু যা দেখি না শুনি কভু
হেন ভাব উদয় হৃদয়ে ॥

শ্রীনন্দনন্দন হরি বিরহ আবেশে ভরি,
অঙ্গ সন্ধি সব শ্লথ হৈল ।

ভূজ পদ দীর্ঘাকার গদগদ বচনোচ্চার
ভূমে লুঠে কাঁদে সবৈকল্য ॥

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ (৪)

অনুদঘাটা দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
 বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্কিক-সুরভি-মধ্যে নিপতিতঃ ।
 তনুত্বৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু-বিরহাদ্
 বিরাজন্ গৌরান্ধো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ (৫)

শয়ন মন্দিরে গোরারায় !
 কৃষ্ণের বিরহ ভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
 বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥

কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিত সদা,
 কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান ।
 এই মত আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,
 সে হেতু বাহিরে যেতে চান ॥

তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উদ্ধ,
 তাহা লঙ্ঘ্য আবেশের বলে ।
 তেলেঙ্গা গাই-এর মাঝে, দেখি গোরা রসরাজে,
 পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে ॥

ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কুর্ম প্রায়,
 অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে ।
 অবেশিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
 করে কূর্মাকৃতি শ্রীগৌরান্দ্রে ॥

আরে মোর সোনার গৌরান্দ্র প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,-
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণাৰ্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকূৰ্বন্ব বিকলধীঃ ।
দধন্দ্ৰিত্তৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষণে রুধিরং
ক্ষতোথং গৌরাজ্ঞো-হৃদয় উদয়ন্যাং-মদয়তি ॥ (৬)

একদিন সে আপন, প্রাণাৰ্বুদ সমান,
ব্রজ লাগি বিরহে বিভোর ।
করেন প্রলাপ অতি, তাপ বিকল মতি
অবিরত উন্মাদে উজোর ॥

বাহিরে যাইতে মন, যাইতে না পেয়ে পুন.
ভিতে ঘর্ষে বদন-সরোজ ।
অপরূপ প্রেমরাশি, গৌর রস-সুবিলাসী.
হেরি মোহে কোটি মনোজ ॥

হেন গৌর রসরাজ, স্বানুভাবে নটরাজ,
উদয় মোর হৃদয় মাঝার ।
জানি না সেহ কেমন, কেমন করয়ে মন,
উন্মাদে যে হয় সে বিভোর ॥

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু !
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতার আমার হিয়া,-
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৬ ॥

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণভুরিতমিহ তং লোকয় সখে !
 হমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্নুদ ইব ।
 দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদ্বক্তেন ধৃত-তদ্
 ভূজাস্তো গৌরাস্তো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

একদিন গকুলচাঁদে, দরশন মনসাধে,
 ঠাকুর মন্দিরে চলি যায় ।

দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক,
 ভাবোন্মাদে মত্ত গৌররায় ॥

তারে কহে ওহে শুন, তুমি সে বন্ধু আপন,
 বল কোথা মোর প্রাণ গোবিন্দ ।

প্রভুর সন্তাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি,
 কহে বুঝি ভাব অনুবন্ধ ॥

চলহ হুরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণ সখ,
 এত শুনি ধরে তার হাত ।

রাধিকা ভাবিত মতি, নিজে গোপী-প্রাণপতি,
 আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ ॥

আরে মোর সোনার গৌরাস্ত প্রভু !
 হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
 ভুলিতে নারিব আর কভু ॥

সমীপে নীলাদ্রেচ্চটকগিরিরাজস্য কলনা—
 দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
 ব্রজনস্মীতুক্ত্রু প্রমদ ইব ধাবন্নবধুতো
 গনৈঃ সৈগৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

নীলাচল নিকটেতে, দেখি চটক পর্বতে,
 ভাবে মত্ত গৌর রসরাজ ।

যাব সে আমি গকুলে, গৌর গুণমণি বলে.
 দেখি গোবর্দ্ধন গিরিরাজ ॥

উন্মাদ বাতুল হেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান,
 হেন কালে নিজগণে ধরে ।

হেন গৌর রসরাজ, উদয় হৃদয় মাঝ,
 বিহ্বল করয়ে সদা মোরে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
 ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলা-মহসি বর-তন্মগুপ-তলে
 স্বরূপেণ স্বেনাপর-নিজগণেনাপি মিলিতঃ ।
 স্বয়ং কুব্বন্নাম্মতি-মধুরগানং মুরভিদঃ
 সরজ্ঞো গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

দোল মহোৎসব কালে, বসি দোল মঞ্চতলে,
স্বরূপাদি নিজগণ সনে ।

আপনে গৌরাজ রায়, নিজ নাম গান গায়,
পরিপূর্ণ মাধুর্য তরঙ্গে ॥

সে অক্ষ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল,
আর কি ভুলিতে পারে কভু ।

হৃদয়ে উদয় ক'রে, সতত মাতায় মোরে,
প্রেমসিন্ধু স্বর্ণ-গৌর প্রভু ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্ষ্যে যত্নবরঃ ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরিধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধন্তে গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্যাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

গোবিন্দ নামক ভক্ত, তারে দয়া অনুরক্ত,
যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি ।

পুরীদেবে করে ভক্তি, যেন তাঁর অনুরক্তি,
যত্নবর সান্দীপনি প্রতি ॥

স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,
গিরিধারী যেমন সুবলে ।

সে প্রভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈর্য মানেনে,
সদাভাসে প্রেমামৃত জলে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাক্ষ প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদাবাদপি পতিতমুদ্ধত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং নৃশ্চ মুদিতঃ
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাক্ষো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি । ১১ ॥

আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল ।

স্বরূপের আশ্রয়ে দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥

বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে ।

এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাক্ষ প্রভু !

হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরান্দোদগত-বিবিধ-সম্ভাব-কুসুম
প্রভা-ভ্রাজ্জৎ-পদ্মাবলি-ললিত-শাখং সুরতরুন্ম ।
মুহূর্ষোহতিশ্রদ্ধৌষধিবর-বলৎপাঠসলিলৈ-
রলং সিঞ্চেন্দ বিন্দেৎ সরসগুরু-তল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

স্তব কল্পবৃক্ষ হয় ইহার আখ্যান ।
ইহা যেই পাঠ জলে সিঞ্চে ভাগ্যবান ॥

ত্রিসঙ্কায় করে যেই পাঠ অবিরত ।
শ্রীগৌরান্দেবের প্রেমে সেই হয় উনমত ॥

পঠনে শ্রবণে হয় বিঘ্ন বিনাশন ।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ॥

দাস গোস্বামিপদ হৃদে করি আশ ।
কল্পবৃক্ষ ভাষে নবদ্বীপচন্দ্র দাস ॥

শ্রীশচীনন্দনাষ্টক স্তোত্রম্

হরিদৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতনাত্মানমতুলং ।
 স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তমসখী বাপ্তুমভিতং ॥
 অহো গোড়ে জাতঃ প্রভুরপর গৌরৈকতনুভাক্ ।
 শচীস্বনুঃ কিং মে নয়নসরণিং যাস্মতি পুনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল মাঝ,
 ব্রজ নব যুবরাজ,
 রসরাজ মাধুর্য্য সাগর ।
 রাধা প্রিয়তম সখি,
 মাধুর্য্যে পরম সাক্ষী,
 নিরপেক্ষ প্রেমের আকার ॥

রাধিকার অনুরাগ,
 বাড়াইতে মহাভাগ,
 গোপনে করিয়া নটবেশ ।
 দর্পণে দেখেন রূপ,
 ত্রিজগতে অপরূপ,
 স্বমাধুর্য্য অশেষ বিশেষ ॥

নবঘন নীলাঞ্জন,
 প্রভৃতি উপমাগণ,
 কোথা গণি সেহ মূল্যতম ।
 সে গান্তীর্য্যে ডুবে যায়,
 সত্যসুখবোধ্যদ্বয়,
 শ্যামল সুন্দর নিরূপম ॥

উজ্জল কিরণ তায়,
 উছলে বিজুলি প্রায়,
 রাঙ্গা আঁখি রাধা-অনুরাগে ।
 নয়ন কাঁপিয়া পৈশে,
 হৃদয় চাপিয়া বৈসে,
 একপ বারেক যারে লাগে ॥

মন করে উদাসীন, জল বিহু যেন মীন,
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি সহে ।

সুধু রূপের এত ছটা, তাহাতে ভূষণ যটা,
পিতাম্বর বেণু শোভে তাহে ॥

শুক্ল সু-নির্মল জ্যোতি, রক্ত অনুরাগ রতি,
অস্তুরে অস্তুরে হিরন্ময় ।

স্নিগ্ধ মুগ্ধ চিদাকাশ, শ্যামল বিম্ব ভাস,
শবল বিচিত্র জ্যোতি তায় ॥

আশা মাত্রে পাপ নাশি, উপজায় পুণ্যরাশি,
চিত্ত শুদ্ধি ভক্তি মুক্তি দিয়ে ।

রাখিয়ে ছুঃখের পরে, প্রেম দিয়া মন হরে,
এ বচ্যায় কে পলাবে ধেয়ে ॥

সে রূপের নিরীক্ষণে, জগৎ জনার মনে,
বহুমানে ধাতার কৌশল ।

অহো ধাতা দয়াময়, জুড়াইতে তাপত্রয়,
রূপে বিশ্ব করিল শীতল ॥

নয়ন নিমেষ ছুঃখে, মীন চক্ষু বাঞ্ছে লোকে,
প্রতিক্ষণে নব নব শোভা ।

এ রূপের কিবা শক্তি, উপজায় প্রেমভক্তি,
নিরবধি জগ-মনলোভা ॥

এই মত আত্মা হেরি, বিচার করেন হরি,
স্বমাধুর্য্য করি অনুভব ।

রাধাভাবে যদি দেখি, রাধা সম হব সুখী,
যে সুখ 'বিষয়ে' অসম্ভব ॥

মিলিয়া রাধার সনে, রাধাভাব লৈয়া মনে,
রাধা ধ্যানে রসিক শেখর ।

শ্রীরাধার ঐকান্তিক, অনুরাগ স্বাভাবিক,
সেই ভাবে মন গর গর ॥

বিচারিতে বাড়ে রতি, ধরিয়া রাধার ছ্যতি,
কি আশ্চর্য্য গৌড় মণ্ডলে ।

আর এক নিজ মুক্তি, গৌরাজ্ঞ মধুরাকৃতি,
শচীগর্ভে জাত বিপ্রকুলে ॥

সকল রূপের ভূপ, গৌরাজ্ঞ চাঁদের রূপ,
হেরিবে এমনি হয় মনে ।

রসিক শেখর হরি, অঙ্গে মাথা রাই কিশোরী,
অনুরাগী আপন ভজনে ॥

সে রূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে ।

নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥

পুরীদেবশ্চাস্তুঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো ।
 মূর্গোবিন্দাচ্চ দ্বিশদ পরিচর্য্যচ্চিতপদঃ ॥
 স্বরূপশ্চ প্রাণাৰ্ব্বুদ কমল নীরাজিতমুখঃ ।
 শচীসূহুঃ কিং মে নয়ন সরনিং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥ ২ ॥

এরূপে গৌরাক্ষরূপে, অবতীর্ণ নবদ্বীপে,
 গৃহে থাকি চব্বিশ বৎসর ।
 লোক ত্রাণ প্রেমাবেশে, বৃন্দারণ্য অভিলাষে,
 সন্ন্যাস করিলা অতঃপর ॥

নবদ্বীপের ভক্তগণ, বিরহেতে অচেতন,
 জীবন চৈতন্য কৃপা বর্ষে ।
 মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে, স্থিতি জানি সবে চলে,
 প্রত্যক্ষ দর্শন রসতর্ষে ॥

ক্ষেত্রবাসী সর্বত্যাগী, ভক্তগণ সহযোগী,
 নানা 'রসে' ভজে রসরাজে ।

কেহো স্নেহ কেহো সখ্যে, কেহ দাস্ত্র কেহ মুখ্য,
 নিজ নিজ মনোমত কাজে ॥

পরম আনন্দ পুরী, শ্রীপরমানন্দ পুরী,
 পরম প্রণয় মধুরসে ।

চৈতন্যে করান স্নান, পুরীদেব ভগবান,
 অলৌকিক প্রণয় বিশেষে ॥

গোবিন্দ নামক ভক্ত, পাদ সেবা অনুরক্ত,
গুরু নিয়োজিত দয়া-দাস ।

গোবিন্দ সমান ভাগ্য, কে হইবে তার যোগ্য,
দেবতার যাহে অভিলাষ ॥

স্বরূপ দামোদর নাম, উজ্জ্বল প্রেমের ধাম,
রাধিকা সখীর সম ভাবে ।

চৈতন্যের মর্মজ্ঞানে, প্রাণকোটি নির্ম্মাচ্ছনে,
শ্রীমুখ মার্জনে সদা সেবে ॥

সে রূপ বারেক হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে ।

নয়নের পথে কভু. পুনঃ কি মিলিবে প্রভু,
শচীরনন্দন মোর মাথে ॥ ২ ॥

দধানং কৌপীনং তছুপরি বহিবস্ত্রমরুণং ।
প্রকাণ্ডো হেমাঙ্গি ছাতিভি রভিতঃ সেবিত তনুঃ ॥
মুদা গায়ন্তু চৈ নিজ মধুর নামাবলিমসৌ ।
শচীস্তু কিং মে নয়ন সরণিং যাস্ত্যতি পুনঃ ॥ ৩ ॥

সকল রূপের ভূপ, গৌরাজ্ঞ টাঁদের রূপ,
অরুণ কৌপীন বহিবাস ।

প্রকাণ্ড দীঘল তনু, কণক পর্বত জানু,
কান্তি ভরে চৌদিগ প্রকাশ ॥

প্রেমানন্দ রস ভরে, নাম-সংকীৰ্ত্তন করে,
 মধুর গন্তীর স্বর ধাম ।
 বলে ছঃখহারি কৃপা বর্ষ, চিত্তাকষি রসোৎকর্ষ,
 রতি দাতা 'হরে কৃষ্ণ রাম' ॥

সে রূপ বারেক হেরি, ধৈর্যজ ধরিতে নারি,
 আশা পুনঃ পুনঃ নিরাক্ষিতে ।
 নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
 শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥ ৩ ॥

অনাবেদ্যাং পূর্বৈরপি মুনিগণৈঃ ভক্তি-নিপুণৈঃ ।
 শ্রুতে গুঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস ফলাং ভক্তিলতিকাম্ ॥
 কৃপালুস্তাং গোড়ে প্রভুরতি কৃপাভিঃ প্রকটয়ন্ ।
 শচীশূনুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্মতি পুনঃ ॥ ৪ ॥

এ গৌড়মণ্ডলে প্রভু দয়ালু চৈতন্য ।
 অবতীর্ণ হইয়া ভুবন কৈল ধন্য ॥

প্রকটিল ভক্তি লতা পরম মঙ্গল ।
 সে লতায় ফলে প্রেমোজ্জ্বল রসফল ॥

চৈতন্য দর্শনে ব্রজভাবে কৃষ্ণ-রতি ।
 রাগমার্গে ঈশ্বরের ভজনে প্রবৃতি ॥

পূর্ব মুনিগণ সবে এ ভক্তি বাঞ্ছিল ।
 আজ্ঞা বিনা জানাইতে তাহারা নারিল ॥

কর্ম জ্ঞান বৈধী ভক্তি বৈধ-অনুরাগ ।
এই সব প্রকাশিল পূর্ব মহাভাগ ॥

গোপিকার মত নিরপেক্ষ অনুরাগে ।
ভজন যোগ্যতা স্ফূরে প্রভু কৃপা-যোগে ॥

তাদৃশ যোগ্যতা বিনে তাদৃশ প্রসাদ ।
'রাস' লভ্য নহে, যাতে লক্ষ্মী করে সাধ ॥

কাম রতি, ধৈর্য রতি স্বাভাবিক রতি ।
স্বভাব সামর্থ্য রতি গোকুল যুবতী ॥

সেই অধিকারী অন্তরঙ্গ শিরোমণি ।
আত্মতত্ত্ব রহস্য প্রকাশ পাত্র মানি ॥

শ্রুতিগণ এই তত্ত্ব রাখিল গোপনে ।
পরাভক্তি প্রশংসনে প্রাপ্ত গোপীগণে ॥

হেন ভক্তি প্রচারিল শচীর নন্দন ।
হেন কি হইবে পুন মিলিবে দর্শন ॥ ৪ ॥

নিজছে গোড়ীয়ান জগতি পরিগৃহ-প্রভুরিমান্ ।
হরেক্ষেত্রেব্যং গণন বিধিনা কীর্ত্তরত ভোঃ ॥
ইতি প্রায়াং শিক্ষাং জনকইব তেভ্যঃ পরিদির্শন্ ।
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন সরগিঃ ষাস্ততি পুনঃ ॥ ৫ ॥

গোড়বাসী জনে, নিজ জন জ্ঞানে,
বিশেষে করিয়া স্নেহ ।

প্রেমানন্দ ভরে, নেত্র বারি ঝরে,
 আনন্দ বৈবশ্য ভয়ে ।
 নিকটে না উঠে, গরুড় নিকটে,
 দর্শন লাগিয়া রহে ॥

আপনি অদ্বয়, ভজন বিষয়,
 আপনি ভকত ধীর ।
 হেন কি হইবে, পুন দেখা দিবে.
 চৈতন্য করুণাবীর ॥ ৬ ॥

মুদা দন্তৈর্দৃষ্টাভ্যতি বিজিত বন্ধুকমধুরং
 করং কৃৎসা বামং কটি নিহিত মন্যং প্রবিলসন্ ।
 সমুখাপ্য প্রেন্নাগণিত পুলকো নৃত্য কুতুকী ।
 শচীস্নুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্মতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

চৌদিকে ষেড়িয়া ভক্ত. সঙ্কীর্ণনে অনুরক্ত,
 মাঝে নাচে চৈতন্য চন্দ্রমা ।

কদম্ব কেশর জিনি, প্রব্যক্ত পুলক শ্রেণী,
 প্রভু প্রকাশেন প্রেম-সীমা ॥

আনন্দ উদ্রেক অতি, মাতিল ভক্তের প্রতি,
 বাঁধুলি অধর চাপে দস্তে ।

কটিতটে বাম কর, দক্ষ বাহু উর্দ্ধতর,
 সেই শোভা ধাইল দিগন্তে ॥

বারেক সে রূপ হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
 আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে ।
 নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
 শচীর নন্দন প্রাণনাথে ॥

সরিত্তীরারামে বিরহবিধুরো গকুলবিধো ।
 নদীমন্তাং কুব্জয়নজলধারা বিততিভিঃ ॥
 মুহুমূর্চ্ছাং গচ্ছন্ তকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্ ।
 শচীশুভুঃ কিং মে নয়ন সরণিং যাস্মতি পুনঃ ॥ ৮ ॥

সরিত্তীরে উপবন, মধ্যে শ্রীশচীনন্দন,
 উদ্দীপন কৃষ্ণের বিরহ ।
 নয়ন গলিত জলে, অপরূপ নদী চলে,
 মুহুমুহু অনুভবে মোহ ॥

সেই দশা যে দেখিল, তার কি না দশা হৈল,
 মৃতপ্রায় নাহিক সশ্বিং ।
 কার ভাবে গৌরহরি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
 ইহা বলি সকলে মোহিত ॥

বারেক সে রূপ হেরি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
 আশা পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষিতে ।
 নয়নের পথে কভু, পুন কি মিলিবে প্রভু,
 শচীর নন্দন মোর সাথে ॥

শচীসুনোরস্ঠাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ ।
 সদা দৈন্তোদ্রেকাদতি বিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ॥
 প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ ।
 পৃথুপ্রৈমাদ্ভোধৌ প্রথিত রসদে মজ্জয়তি তং ॥

শ্লোক পড়ি প্রেম যোগে, গৌরাঙ্গ দেখেন আগে,
 শ্রীদাস গোস্বামী মহামতি ।
 অষ্টকে অভিষ্ট দিলো, আপনে প্রতীত হৈলো,
 আশীর্বাদ করে লোক প্রতি ॥

শ্রীশচীনন্দনাষ্টক, সর্বাভীষ্ট সম্পাদক,
 দৈন্ত্য করি পড়ে যে স্মৃতি ।
 শ্রীচৈতন্য প্রভু তাঁরে, ডুবাবেন প্রেম সাগরে,
 সদয় হইয়া তাঁর প্রতি ॥

ইতি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী বিরচিত শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্

(৩)

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামীর স্বরচিত বাংলা পদ কীর্তন :-
 (শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা)

“চন্দ্রবদনী ধনী, মৃগ-নয়নী ।
 রূপে গুণে অনুপমা, রমণী-মণি ॥

মধুরিম-হাসিনী, কমল বিকাসিনী,
 মতিম হারিণী, কঙ্কুষ্টিনী ।

ধীর সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি,
তনু রুচি ধারিনী, পিক-বয়ানী ॥

উজর লম্বিত বেণী, মেরুপর যেন ফণী,
আভরণ বহু মণি গজগামিনী ।

বীণা পরিবাদিনী, চরণে নূপুর ধ্বনি,
রতিরসে পুলকিতা জগমোহিনী ॥

সিংহ জিনি গাজা ক্ষীণী, তাহে মণি কিঙ্কিনী,
কাঁপি উছলি তনুপদ অবনী ।

বৃষভানু-নন্দিনী, জগজন বন্দিনী,
দাস রঘুনাথ পত্ন মনোহারিণী ।

আরত্রিক বর্ণনা :

“হরত সকল সন্তাপ, জনমকো,
তড়প তড়প যম কাল কি ।
(মিঠু তপন তাপ কাল কি)
আরতি কিয়ে মদনগোপাল কি ॥ ৫ ॥

গো-ঘৃত রচিত, কপূর কি বাতি,
ছলকত কাঞ্চন থাল কি ।

ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ, কাঁঝরী বাজত,
বেণু বিশাল কি ॥

চন্দ্র কোটি জ্যোতি, ভানু কোটি রশ্মি,
মুখ শোভা নন্দলাল কি ।

ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোহে,
উরে বৈজয়ন্তী মাল কি ॥

সুন্দর লাল, কপোল ছবি মো,
 নিরখত মদনগোপাল কি ।
 সুর-নর মুনিগণ, করতহি আরতি,
 ভকত বৎসল প্রতিপাল কি ॥
 ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ বাঁঝরী,
 অঞ্জলি কুমুম গোপাল কি ।
 বন্দিছে রঘু,- নাথ দাস, পঁছ,
 মোহন গোকুল বাল কি ॥”

জয়দেবের মহিমা কীর্তন * ৩ :

পদ্মাবতী রতিকান্ত !
 রাধামাধব, প্রেমভকতি রস,
 উজ্জল মুরতি নিতান্ত ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ, গ্রন্থ সুধাময়,
 বিরচিত মনোহর ছন্দ ।
 রাধাগোবিন্দ, নিগূঢ় লীলা গুণ,
 পদ্মাবলী পদবৃন্দ ॥
 কেন্দু বিশ্ববর, ধাম মনোহর,
 অনুরাগ করয়ে বিলাস ।
 রসিক ভক্তগণ, সে সরবস ধন,
 অহর্নিশি রহু তছু পাশ ॥
 যুগল বিলাস গুণ, করু আশ্বাদন,
 অবিরত ভাবে বিভোর ।
 দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন,
 কিয়ে করব নব ওর ॥

* আমাদের মনে হয় শ্রীল জয়দেব রচিত শ্রীগীত-গোবিন্দের গান-কীর্তন শ্রবণে, নীলাচলে গঙ্গীরা কক্ষে যে মধুময় পরিবেশ ও আনন্দ লাভ হইত তাহারই স্মরণ ও কৃতজ্ঞতার এই ‘জয়দেব’ মহিমা কীর্তন করিয়াছেন ।

“বিরহে” গৌর সেবার উপকরণ :

শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণে অবস্থান কালে গৌরহরির সেবার উপকরণ হিসাবে যে সব স্বরচিত স্তব স্তবাবলী কীর্তন করিতেন তাহাদের তালিকা :—

(ক) শ্রীশ্রীস্তবাবলীস্থ-স্তবানাং সূচিকা

স্তবের নাম	শ্লোক সংখ্যা
১। শ্রীশ্রীচৈতন্যষ্টকম্	৯
২। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরু	১২
৩। শ্রীশ্রীমনঃ শিক্ষা	১২
৪। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিনঃ প্রার্থনা	৪
৫। শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্	১১
৬। শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস প্রার্থনাদশকম্	১১
৭। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্	৯
৮। শ্রীশ্রীব্রজবিলাস-স্তবঃ	১০৭
৯। শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ	১০৪
১০। শ্রীশ্রীপ্রেমপুরাভিধ-স্তোত্রম্	১১
১১। শ্রীশ্রীগ্রন্থকর্তৃঃ প্রার্থনা	৪

	স্তবের নাম	শ্লোক সংখ্যা
১২।	শ্রীশ্রীস্বনিয়মদশকম্	১১
১৩।	শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টোত্তরশত-নামস্তোত্রম্	৪৭
১৪।	শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্	৯
১৫।	শ্রীশ্রীপ্রেমান্তোজ-মরন্দাখা-স্তবরাজঃ	১৩
১৬।	স্বসঙ্কল্প-প্রকাশ-স্তোত্রম্	২১
১৭।	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল কুমুমকেলিঃ	৪৪
১৮।	শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃতম্	২১
১৯।	নবাষ্টকম্	৯
২০।	শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রম্	১৫
২১।	শ্রীশ্রীমদনগোপালস্তোত্রম্	১১
২২।	শ্রীশ্রীবিশাখানন্দদাভিধস্তোত্রম্	১৩৪
২৩।	শ্রীশ্রীমুকুন্দাষ্টকম্	৯
২৪।	উৎকর্থা দশকম্	১১
২৫।	শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্	৯
২৬।	অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকম্	৮
২৭।	শ্রীশ্রীদাননির্বর্তনকুণ্ডাষ্টকম্	৯
২৮।	শ্রীশ্রীপ্রার্থনাশ্রয় চতুর্দশকম্	১৪
২৯।	অভীষ্টসূচকম্	১৫

(খ) উপরোক্ত স্তবাবলী ছাড়া—

“শ্রীশ্রীদানকেলিচিন্তামণি” ও “শ্রীশ্রীমুক্তাচরিত” সর্বজনবিদিত
গ্রন্থ দুটিও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত।

নোট : শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিরচিত—স্তবাবলী, শ্রীশ্রীদান-
কেলিচিন্তামণি এবং শ্রীশ্রীমুক্তাচরিতের—

‘মূল’, পদচ্ছেদ’, ‘অন্বয়’ ; ‘প্রখ্যাত শ্রীল যত্নন্দন দাসের বাংলা
পয়ারে অনুবাদ’ এবং ফুটনোটে ‘সংস্কৃত টীকা’ সহ একটি স্বতন্ত্র
গ্রন্থ শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রেরণায় প্রকাশের ইচ্ছা রইল।

ষোড়শ উরঙ্গ

ভূমিকা

পণ্ডিতের তর্কযুক্তির আসরে যান্ নাই, ধার্মিকের বাদ প্রতি-
বাদের সভায় যান্ নাই, মঠ মন্দির স্থাপনে উদ্যোগী হন নাই, অথচ
“বহুদিনের লুপ্ত তীর্থস্থানগুলির পুনরুদ্ধার হয়েছে,” “বহু প্রাচীন
সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিপাটি সেবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে” “অসংখ্য
নরনারী বৈষ্ণবধর্মে গাঢ়ভাবে আনুগত্য লাভ ক'রেছে,” কিন্তু,
কোথায় মোহান্ত হন নাই, কোথাও কর্তৃত্ব নিয়ে বিষয়ী
বৈষ্ণবের পদ গ্রহণ করেন নাই।

কি অদ্ভুত সংকীর্ণনের মোহন আকর্ষণ তাঁর কণ্ঠে বেজেছে!

বাস্তালী ও বিশ্বের গর্ব, বাস্তালীর সাধনা, বাস্তালীর চেতনা,
বাস্তালী ও বিশ্ববাসীর প্রেরণার উৎস শ্রীল রামদাস।

এ হেন শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় যে ভাবে দাস গোস্বামীর
চরিত্র ‘অনুভব’ ও ‘অনুশীলন’ করেছেন, তাহা পরিবেশন
ক'রে আমরা এ গ্রন্থের উপসংহার টানব।

(“সূচক-কীর্তন তো স্মরণ করা,—

তোমাদের ব্যবহার রাজ্যে শোচক বা শোক-প্রকাশ।

ভক্তের বিরহই তো, সবচেয়ে দুঃখের, তাইতো ‘শোচক’।

ওই সব দিন স্মরণ ক'রে কীর্তন করলে তজ্জাতীয় শক্তিলাভ হয়।

যদি কেউ অন্য ব্রত নাও পারে, কিন্তু শোচক কীর্তন স্মরণ বা

পাঠ করা দরকার, তাতে ঢের পাওয়া যায়।”)

(বাবাজী মহাশয়)

শ্রীম্চক কীর্তনের গৌরচন্দ্র

প্রেমসিন্ধু গোরারায়
আ'মরি,—প্রেমসিন্ধু গোরারায়
শ্রীরাধাকৃষ্ণ,—প্রেমবিকারের বারিময়—প্রেমসিন্ধু গোরারায়

আ'মরি,—শত শত ধারা বয়
বহে শত শত ধার
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসার—
বহে শত শত ধার
(নিরন্তর),—যাহা হইতে দশদিগে—
বহে শত শত ধার

আ'মরি,—অক্ষয় পারাবার
নানাভাব রত্নালয় আ'মরি—অক্ষয় পারাবার—
(আ'মরি,—মহাভাব রত্নালয়—অক্ষয় পারাবার)

“প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়”,
আ'মরি,—হেলে ছলে খেলায় রে
ওরে ভাই রে আমার,—আমার নিতাই তরঙ্গ—হেলে ছলে খেলায় রে

ওরে ভাই রে আমার,—গৌর প্রেমসিন্ধু হিয়ায়, হেলে ছলে খেলায় রে

(আ'মরি,—কতই না গরব ক'রে—হেলে ছলে খেলায় রে)

“প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,”

ওকি আহা-মরি,—“করুণা-বাতাস চারি পাশে” ।

তা'তে—“প্রেম উথলিয়া পড়ে”

আ'মরি রে,—করুণা বাতাস-পরশে—প্রেম উথলিয়া পড়ে,

‘আ’মরি,—করুণা-বাতাস পরশে—

আমার,—নিতাই তরঙ্গসনে অদ্বৈত,—করুণা-বাতাস-পরশে

ওরে ভাই রে আমার, আমার,—

নিতাই তরঙ্গসনে—করুণা-বাতাস পরশে

“প্রেম উথলিয়া পড়ে”

আ'মরি—উথলিয়া ভাসায় রে

আমার,—শ্রীগৌরানন্দ-প্রেমসিন্ধু— উথলিয়া ভাসায় রে

আ'মরি,—প্রেমজলে ডুবায় রে

গৌর, প্রেমসিন্ধু উথলিয়া— প্রেমজলে ডুবায় রে

আ'মরি,—স্বাবর জঙ্গম গুল্ললতা— প্রেমজলে ডুবায় রে

আহা,—“প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাফাল ছাড়ে,”

ওকি আহা-মরি,—“তাপতৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥”

সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

গৌর, প্রেমসিন্ধু উদ্বলিত— সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

নিতাই-তরঙ্গ-যোগে উছলিত—

সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

করুণা,—বাতাস-পরশে উদ্বেলিত—

সেই, প্রেমজলে সিঞ্চিত করে

ওকি আহা-মরি,—“তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥”

ও ভাই দেখ দেখ,—“নিতাই চৈতন্য দয়াময় ।”

এমন,—হয় নাই আর হবার নয় রে

ওরে ভাই রে আমার এমন,—পরম করুণ প্রেমদাতা—

হয় নাই আর হবার নয় রে

‘এমন পরম করুণ প্রেমদাতা’

আমার,—নিতাই-গৌরাক্ষের মত—এমন, পরম করুণ প্রেমদাতা

হয় নাই আর হবার নয় রে

ও ভাই,—বড় অবতার রে

বড় অবতার রে

ওরে ভাই রে আমার,—প্রভু নিতাই প্রাণ গৌরাক্ষ—

বড় অবতার রে

আ’মরি,—“পতিতেরে বিলাওল প্রেমেরই ভাগুর রে ॥”

আ’মরি—যারে তারে যেচে দিল

চির,—অনপিত-প্রেমধন—

যারে তারে যেচে দিল

‘গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে’—

দন্তে তৃণ,—গলবাসে করযোড়ে গিয়ে,—আচণ্ডালের দ্বারে দ্বারে

—যারে তারে যেচে দিল

প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে,—সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা— প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে,—পুত্র, সখা, প্রাণ-পতি করা—

প্রেম দিল আচণ্ডালে

আপনাকে, বশ ক'রে অধীন করা— প্রেম দিল আচণ্ডালে

প্রেম দিল আচণ্ডালে

আয় আয়,—কে নিবি আমায় কিনিবি বলে—প্রেম দিল আচণ্ডালে

প্রেম দিল আচণ্ডালে

ও ভাই,—বড় অবতার রে

ও ভাই দেখ দেখ,—আমার,— “নিতাই চৈতন্য দয়াময় ।”

আহা,—“ভক্ত-হংস-চক্রবাকে, তারা, পিব পিব বলি ডাকে”

ভাইরে,—“পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥”

তা'তে, “ডুবি রূপ সনাতন”

ওরে ভাই রে আমার, গৌরপ্রেমসিন্ধু মাঝে—ডুবি রূপ সনাতন

তঁারা, সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

এই, দুর্বাসনা তরঙ্গময় সংসার— সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

কেমন ক'রে ডুবতে হয় তাই দেখাবার লাগি—

সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

কেমন ক'রে ডুবতে হয় তাই জানবার লাগি

—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

কেমন করে, ডুবতে হয় তাই জানাবার লাগি—

শ্রী, শিক্ষাগুরুরূপী তাঁরা কেমন করে,—

ডুবতে হয় তাই জানাবার লাগি

তাঁরা, সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

এই গৌরপ্রেমসিন্ধু মাঝে তাঁরা,—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

ওহে ও প্রাণ, গৌরাঙ্গ যা কর বলে—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

(প্রাণ, গৌর হে, যা কর বলে—সাঁতার ভুলে ডুবেছিল)

'প্রাণ, গৌর হে, যা' কর বলে—

আমি তোমার হ'লাম—প্রাণ,—গৌর হে যা' কর বলে

তাঁরা, সাঁতার ভুলে ডুবেছিল

নইলে, ডুবা ত' যায় না

সংসার সাঁতার না ভুলিলে—ডুবা ত' যায় না

দুর্ভাসনা তরঙ্গময় এই, সংসার সাঁতার না ভুলিলে—

ডুবা ত' যায় না

আমি আমার না ঘুচিলে—ডুবা ত' যায় না

এ সংসারে, আমি আমার না ঘুচিলে—ডুবা ত' যায় না

আমি তোমার না হইলে—ডুবা ত' যায় না

কায়মনোবাক্যে না বিকালে—

আমি তোমার হলাম বলে কায়মনোবাক্যে না বিকালে—

ডুবা ত' যায় না

“ডুবি রূপ সনাতন,

ভুলি নানা রত্নধন”

ওকি আহা মরি—“যতনে গাঁথিল তার মালা।”

আ’মরি ডুব্ দিয়ে রত্ন ভুলে
ওরে ভাই রে আমার, গৌরপ্রেমসিন্ধুমারে—

আ’মরি, ডুব্ দিয়ে রত্ন ভুলে

প্রাণ গৌর হে, যা কর ব’লে—

এবার আমি তোমার হলাম—প্রাণ গৌর হে, যা’ কর ব’লে

আ’মরি ডুব্ দিয়ে রত্ন ভুলে

ওকি আহা মরি, “যতনে গাঁথিল তার মালা”

আমরি—“ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি”

এ মালা—অন্য সূত্রে গাঁথা যায় না

“ভক্তি সূত্রে গ্রন্থি করি”

“লহ জীব কণ্ঠ ভরি”

আ’মরি—ভক্তিসূত্রে গ্রন্থি করি,

লহ জীব কণ্ঠ ভরি,

দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ॥ ভাই রে ॥

মালা—পর রে তর রে

এ যে পর তর মালা, মালা—পর রে তর রে

‘বিশুদ্ধ—ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা

গৌর, প্রেমসিকুতে ডুব দিয়ে তোলা—

বিশুদ্ধ, ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা

শ্রী, রূপ-সনাতন-ডুবাকুর তোলা—

বিশুদ্ধ, ভকতিসিদ্ধান্ত রত্নমালা

মালা, পর রে তর রে

কৃষ্ণে, সুদৃঢ় মতি হবে—মালা, পর রে তর রে

ভাই—“দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা ॥”

সিদ্ধান্ত করিতে কভু না কর অলস ।

সিদ্ধান্তে লাগয়ে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস ॥”

মালা—পর রে তর রে

“দূরে যাবে ত্রিতাপের জ্বালা” ভাই রে !!

“আহা—লীলারস সঙ্কীর্ণন”

শুধু ভাই রে আমার—গৌরপ্রেমসিকু মাঝে “লীলারস সঙ্কীর্ণন”

নিশিদিশি বিকসিত

শ্রীরাধাকৃষ্ণ, লীলারস সঙ্কীর্ণন পদ্য—নিশিদিশি বিকসিত

যার, মৃগাল খেয়ে জীবন ধরে

যত-ভক্ত-হংস-চক্রবাক, যার—মৃগাল খেয়ে জীবন ধরে

কেউ বা ডুব কেউ সঁতারে

আমার—নিতাই-তরঙ্গে-নেচে নেচে—

কেউ বা ডুব কেউ সঁতারে

কেউ বা ডুব কেউ সঁতারে

যে—সঁতারে সে ব্রজলীলা ভোগ করে
যে—ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়

এ ত' দুটি লীলা নয় রে
ব্রজলীলা আর নদীয়ালীলা—এ ত' দুটি লীলা নয় রে

আমার—শ্রীগৌরাজ লীলাসিন্ধু
তার উপরে ভাসে ব্রজলীলা
আর, ডুবিলে নদীয়ালীলা—তার, উপরে ভাসে ব্রজলীলা পায়

যে, ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়
করণা-বাতাস-পরশে—নিতাই-তবঙ্গে নেচে নেচে—যে,

—ডুবে যায় সে নদীয়ালীলা পায়

গৌরলীলায় সেই ডুবতে পারে
ঠাকুর-নরোত্তম বলেছেন—গৌরলীলায় সেই ডুবতে পারে
যে,—রাধামাধব অন্তরঙ্গ হবে—গৌরলীলায় সেই ডুবতে পারে

সে, পরিণতি ভোগ করে
মহারাস বিলাসে—সে, পরিণতি ভোগ করে

মূর্তিমন্তু—প্রেমবৈচিত্র্য লীলা হেরে

দেখে—নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ

দেখে—নিত্য মিলনে দুই রসের খেলা

আমার, নিগূঢ় গৌরাজলীলা--মিলনে, মিলি অমিলি রসের খেলা

আমরি—বিলাস-বিবর্ত-লীলা হেরে

হেরে, রাই কানু একাকৃতি

স্বর্ণপঞ্চালিকা ঢাকা নীলমণি - -রাই কানু একাকৃতি

মহাভাব রসরাজ—রাই কানু একাকৃতি

কিন্তু, বিপরীত ভাবে অবস্থিতি
ব্রজের, অপূর্ণসাধ পূরাইতে—কিন্তু, বিপরীত ভাবে অবস্থিতি

দেখে—রাই কানু, কানু রাই

নাগরী নাগর, নাগর নাগরী—রাই কানু, কানু রাই
(রমণী রমণ, রমণ রমণী—রাই কানু কানু রাই)

রাই কানু কানু রাই
যা' দেখে, রামরায় মূরছিত—রাই কানু, কানু রাই
যা' দেখে,—রামরায় মূরছিত
গোদাবরী তীরে যা দেখে—রামরায় মূরছিত
বিবর্ত বিলাস রঙ্গ দেখে—রামরায় মূরছিত
নানা, বিবর্তে বিলাস রঙ্গ দেখে—রামরায় মূরছিত

এ যে গন্তীরার গুপ্তনিধি
মহা, রাসবিলাসের পরিণতি—এ যে গন্তীরার গুপ্তনিধি
বিলাস বিবর্ত লীলা হেরে

আহা, “লীলারস সঙ্কীর্ণনে, বিকসিত পদ্মবন”

শুঁকি আহা মরি, “জগত ভরিল যার বাসে।”

আহা, “ফুটিল কমল বন, মাতিল ভ্রমরগণ”

তারি, দলে দলে ছুট্লে
 সঙ্কীৰ্তন কমলের গন্ধ পেয়ে— তারি, দলে দলে ছুট্লে
 “সঙ্কীৰ্তন কমলের গন্ধ পেয়ে”
 গৌর, প্রেমসিক্কুতে বিকসিত লীলারস—
 সঙ্কীৰ্তন কমলের গন্ধ পেয়ে
 তারি, দলে দলে ছুট্লে

ভকত ভ্রমর যত—তারি দলে দলে ছুট্লে
 ‘ভকত ভ্রমর যত’—

প্রেম মধু পানে লুবধচিত—ভকত ভ্রমর যত
 তারি দলে দলে ছুট্লে
 গৌর গুন্ গুন্ গুন্ রবে—তারি, দলে দলে ছুট্লে

‘গৌর গুন্ গুন্ গুন্ রবে—
 প্রেম মধু পিবে বলে—গৌর গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ রবে

প্রেমমধু পিবে বলে—
 গৌরলীলা, রস সঙ্কীৰ্তন কমলের—প্রেমমধু পিবে বলে
 তারি—দলে দলে ছুট্লে

ফুটিল কমল বন, মাতিল ভ্রমরগণ”

হায় রে, “পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে” ॥

আমরি—মনভ্রমর মাতল না রে
 গৌর প্রেমসিক্কুতে লীলারস পদ্য ফুট্লে বটে—

কিন্তু আমার, মন ভ্রমর মাতল না রে
গৌর প্রেমসিন্ধুতে, লীলারস সঙ্কীর্ণন কমল ফুটল বটে—

কিন্তু আমার, মন ভ্রমর মাতল না রে

মন ভ্রমর মাতল না রে
বিষয় কেতকীফুলে মজে রইল—কীর্তন কমলেতে মাতল না রে

‘বিষয় কেতকীফুলে মজে রইল’—

বাসনা, কণ্টকাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়েও—

বিষয় কেতকীফুলে মজে রইল
কীর্তন কমলেতে মাতল না রে

প্রেমমধু পিয়ে ধন্য হ’ত—কীর্তন কমলেতে মাতল না রে

হায় হায়—আমি এবার বঞ্চিত হলাম
এমন, প্রেমসিন্ধু অবতারে, হায় হায়—আমি এবার বঞ্চিত হলাম
আমি এবার বঞ্চিত হলাম
এমন, বিশ্বাস্তুর অবতারে—আমি প্রেমধনে বঞ্চিত হ’লাম

আমার, নামে রুচি হ’ল না রে—আমি প্রেমধনে বঞ্চিত হ’লাম

(জগত ভাসুল প্রেমের বন্যায়—আমি কেবল বঞ্চিত হলাম)

আমার—একবিন্দু পরশ হল না রে
আমি, অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম—

আমার একবিন্দু পরশ হল না রে

‘অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম—

ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত এই,—অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম

আমার—একবিন্দু পরশ হ’ল না রে

আমি রইলাম বাকী রে

(জগত ভাসূল প্রেমের বণ্ডায়, কেবল—আমি রইলাম বাকী রে)

এমন, প্রেমসিন্ধু অবতারে কেবল,—আমি রইলাম বাকী রে

প্রেম পেতে রইলাম বাকী

শ্রীগুরুবৈষ্ণবে দিয়ে ফাঁকি— প্রেম পেতে রইলাম বাকী

প্রেমধনে বঞ্চিত হ’লাম

আপন ছুঁদেব দোষে— প্রেমধনে বঞ্চিত হ’লাম

প্রেমধনে বঞ্চিত হলাম

এমন, গোরা পঁছ না ভজিলাম—প্রেমধনে বঞ্চিত হ’লাম

‘এমন, গোরাপঁছ না ভজিলাম’—

ভক্ত পদধূলি ভূষণ ক’রে এমন,—গোরা পঁছ না ভজিলাম

।গোরচন্দ্র সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক কীর্তন

“যবে রূপ সনাতন

ব্রজে গেলা দুইজন”

শ্রীগৌরান্দের আজ্ঞা পেয়ে

রূপ সনাতন গেল ব্রজে

রূপ সনাতন গেল ব্রজে

(তা) “শুনইতে রঘুনাথ দাস”

হিরণ্য গোবন্ধনের পুত্র

সেই ত রঘুনাথ দাস

সপ্তগ্রামের অধিপতি

সেই ত রঘুনাথ দাস

সেই ত রঘুনাথ দাস

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ
বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে (রঘুনাথের) স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ
(পরম্পর) লোকমুখে গৌর-কথা শুনে—

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক গৌর-অনুরাগ

শুধু কেবল তাই নয়

আরও গূঢ় কথা আছে ভাই

(রঘুনাথের) স্বাভাবিক অনুরাগ প্রকাশ পাবার—

আরও গূঢ় কথা আছে ভাই

ঠাকুর শ্রীহরিদাসের

বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন
বাল্যকালে পেয়েছেন দর্শন

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া হে
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া হে

দুইবার রঘুনাথ

বাধা পেয়ে হতাশ হ'য়ে
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধ'রে
প্রাণের কথা প্রাণে ধ'রে

কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে
কেঁদে কেঁদে এলেন ফিরে

ঘরে ব'সে রঘুনাথ
নিরঞ্জে নিজ-মনে
কত দিনে কৃপা হ'বে বলে

ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে
ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে
ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে
ব্যাকুল হয়ে সদাই কাঁদে

কিছুদিনে রঘুনাথ

সপার্বদে পাণিহাটিতে
মধুর লীলাচল হ'তে

পরম্পর শূন্যে পেলেন
পরম্পর শূন্যে পেলেন

আসিয়াছেন প্রভু নিতাই
আসিয়াছেন প্রভু নিতাই
আসিয়াছেন প্রভু নিতাই

গৌর-আজ্ঞায় নামপ্রেম বিলাতে আসিয়াছেন প্রভু নিতাই

রঘুনাথ এই বার্তা পেয়ে
চলিলেন নিতাই পাশে

অতি গোপনে ছদ্মবেশে
নিঃসঙ্গে দীনবেশে

চলিলেন নিতাই পাশে
চলিলেন নিতাই পাশে

হ'য়ে উপনীত পানিহাটিতে
দূর হ'তে দেখতে পেলেন

নিজগণ সনে নিতাইসুন্দর

আছেন সঙ্কীর্ণনে উনমত
আছেন সঙ্কীর্ণনে উনমত

অনুক্ষণ কীর্তন ক'রে

কীর্তনরঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে
কীর্তনরঙ্গে ক্লান্ত হ'য়ে

গঙ্গাতীরে বট-বৃক্ষ-মূলে

নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে
নিতাই বসিলেন পিণ্ডোপরে

সেই 'বৃক্ষ' সাক্ষ্যরূপে
গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে

অঢাপিও বিরাজিছে
অঢাপিও বিরাজিছে
অঢাপিও বিরাজিছে

দূর হ'তে রঘুনাথ

করিলেন দণ্ডবৎ
করিলেন দণ্ডবৎ

সেই কালে এক পরিকর
জানাইলেন নিতাইচাঁদে

দেখ দেখ দেখ প্রভু—

রঘুনাথ অদূরে

তোমায় দণ্ডবৎ করে

তোমায় দণ্ডবৎ করে

শ্রীরঘুনাথ দাস

চির-পরিচিত নিতাইটাদের

চির-পরিচিত নিতাইটাদের

‘রঘুনাথ’ নাম শুনে

স্বাভাবিক স্নেহের বশে

অমনি উঠিলেন নিতাই

অমনি উঠিলেন নিতাই

গেলেন রঘুনাথের কাছে

বাহু পসারি কৈলেন কোলে

বলিলেন শ্রীমুখেতে -

‘চোরা’ তোরে পেয়েছি কাছে

লুকায়ে থাক দূরে দূরে

আজ দণ্ড দিব তোরে

আজ দণ্ড দিব তোরে

আজ দণ্ড দিব তোরে

এই লীলা-রহস্য

কেন ‘চোরা’ সন্সোধন কৈলেন

অনুভব কর ভাইরে

অনুভব কর ভাইরে

অনুভব কর ভাইরে

‘গৌর’ আমার নিজস্ব ধন
নিতাইটাদের মনে এই অভিমান
নিতাইটাদের মনে এই অভিমান

নিতাইচাঁদ রঘুনাথে

সেই অভিমানে বলছেন
সেই অভিমানে বলছেন

আমার ধন আমায় না ব'লে

গিয়েছিলে ভোগ করিতে
গিয়েছিলে ভোগ করিতে

চোরা তোরে পেয়েছি কাছে

আজ 'দণ্ড' দিব তোরে
আজ 'দণ্ড' দিব তোরে

'মহোৎসবের' আঞ্জা দিয়ে

রঘুনাথে কৈলেন কৃপাদণ্ড
রঘুনাথে কৈলেন কৃপাদণ্ড

'দণ্ড মহোৎসব' ব'লে

আজও তার খ্যাতি আছে
আজও তার খ্যাতি আছে

চিড়া-দধি মহোৎসব

আজও তার খ্যাতি আছে

পড়ি নিতাই-পদ তলে

রঘুনাথ কাঁদে
রঘুনাথ কাঁদে

আমি কি তোমার গৌরঙ্গ পাব

কাতরে রঘুনাথ বলে
বল বল প্রভু নিতাই
বল বল প্রভু নিতাই

নিতাই তারে কৈলেন কৃপা

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক কীর্ত্তন

তার মাথে চরণ দিয়ে

করিলেন শক্তি সঞ্চার
করিলেন শক্তি সঞ্চার

‘পরে তারে তুলে নিয়ে
স্থির করিলেন বৃকে ধ’রে

অচিরে পুরিবে সাধ

(বলিলেন: স্থির হও রঘুনাথ
(বলিলেন) স্থির হও রঘুনাথ

নিতাইটাঁদের কৃপা পেয়ে রঘুনাথ ফিরে এলেন গৃহে

কবে গৌর-পদে ঠাঁই পাব

সদাই ব্যাকুলিত চিত
সদাই ব্যাকুলিত চিত

“ববে রূপ সনাতন

ব্রজে গেলা ছুইজন

(তা) শুনইতে রঘুনাথ দাস

ওনি রূপ সনাতন গেলা ব্রজপুরে

আর ত ঘরে রইতে নারে
আর ত ঘরে রইতে নারে

শ্রীকৃপসনাতনের আদর্শ পেয়ে

প্রাণ আজ উঠল কেঁদে
প্রাণ আজ উঠল কেঁদে

রঘুনাথ সঙ্কল্প কৈল
গৌর-পদে বিকাইব

আর ঘরে নাহি থাকিব
আর ঘরে নাহি থাকিব
আর ঘরে নাহি থাকিব

আমি থাকুব না আর এ সংসারে
শ্রীরূপ সনাতন গেল ব্রজপুরে—

আমি থাকুব না আর এ সংসারে

কে যেন তারে বল্ল প্রাণে
তাদের ব্রজে গমন-বার্তা সনে কে যেন তারে বল্ল প্রাণে
আইস রঘুনাথ আর কেনে কে যেন তারে বল্ল প্রাণে

কে যেন তারে ডাকল প্রাণে
আইস আমার রঘু বলে কে যেন তারে ডাকল প্রাণে
'ডাকার সনে' 'টান্নল প্রাণে' কে যেন তারে ডাকল প্রাণে

(তাই) “ইন্দ্র সম সুখ যার নিজ রাজ্য অধিকার
(সব) ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥”

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্যরাশি বাম পদে ঠেলিবে
বাম পদে ঠেলিবে

নব লক্ষের ঐশ্বর্য থু থু ক'রে ত্যাগ ক'রে
থু থু ক'রে ত্যাগ ক'রে

মলবৎ ত্যাগ ক'রে
বিষয়ে গৌর মিলে না ব'লে মলবৎ ত্যাগ ক'রে

(সব) “ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥”

অতুল ঐশ্বর্যরাশি - কিছুতেই বাঁধিতে পারল না
কিছুতেই বাঁধতে পারল না

আমার গৌর-প্রেমের বাউলেরে বল কে বাঁধিতে পারে
বল কে বাঁধিতে পারে

অতুল ঐশ্বর্য রাশি কিছুতেই বাঁধতে পারল না
কিছুতেই বাঁধতে পারল না

আমার গৌর-প্রেমের বাউলেরে বল কে বাঁধিতে পারে ?
বল কে বাঁধিতে পারে ?

গৌর-ভাবে-মাতা প্রাণ যার দেহ-স্মৃতি কাঁহা তার
দেহ-স্মৃতি কাঁহা তার

দেহ-স্মৃতি নাহি যার সংসার কূপ কাঁহা তার
সংসার কূপ কাঁহা তার

গৌর-কৃপা হয়েছে যারে তারে কি বাঁধিতে পারে
তারে কি বাঁধিতে পারে
ছার 'বিষয়-বন্ধনে' তারে কি বাঁধিতে পারে

সে কি বাঁধা থাকে এই ছার বন্ধনে
গৌর চেয়েছে যারে কৃপা-নয়নে—

সে কি বাঁধা থাকে এই ছার বন্ধনে

কি করবে তারে বিষয়-বন্ধনে
 মন মজেছে যার গৌর-গুণে কি করবে তারে বিষয়-বন্ধনে

বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
 রঘুনাথের পিতা, তারে বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে
 গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে রাখবার তরে বেঁধেছিলেন বিবাহ-বন্ধনে

কিন্তু কি করবে ছার সংসার বন্ধন
 গৌর-পদে যার মজেছে মন—

কিন্তু কি করবে ছার সংসার-বন্ধন

কে রাখিতে পারে ধ'রে
 যে বাঁধা পড়েছে গৌর-প্রেমডোরে কে রাখিতে পারে ধ'রে

ফিরেও ত চাইল না রে
 অতুল ঐশ্বর্য্য অঙ্গরী নারী ফিরেও ত চাইল না রে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
 সব ছেড়ে 'হা গৌর' ব'লে চলিল গৌর প্রেমের পাগল

চলিল গৌর প্রেমের পাগল
 সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে চলিল গৌর প্রেমের পাগল
 দীন হীন কাঙ্গালের বেশে

মুখের কথায় কি গৌর মিলে
 সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে মুখের কথায় কি গৌর মিলে

সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে
সব ছেড়ে ঝাঁপ না দিলে
প্রাণ গৌর হে যা কর ব'লে
মুখের কথায় কি গৌর মিলে

চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
পেয়ে নিতাই-কৃপা-বল

সবই নিত্যানন্দ-কৃপাবল
সবই নিত্যানন্দ-কৃপাবল
দাস রঘুনাথের বৈরাগ্য কেবল

প্রভু দেখাইলেন জগতেরে
প্রভু দেখাইলেন জগতেরে
দাস রঘুনাথের দ্বারে
প্রভু দেখাইলেন জগতেরে
আপনার প্রাপ্তির উপায়

আমার দিবার অধিকার নাই
আমার দিবার অধিকার নাই
আমি বিকায়েছি নিতাই ঠাই

তবে ত আমারে মিলে
তবে ত আমারে মিলে
নিতাইচাঁদের কৃপা হ'লে

(সব) “ছাড়িয়া চলিলা প্রভু পাশ ॥

উঠি রাত্রি-শেষ ভাগে
জানি বা প্রহরী জাগে

পথ ছাড়ি বিপথে চলিলা ।”

গৌর-সেবাকতি নিত্যানন্দ সেই ত পথে লয়ে যায় রে
সেই ত পথে লয়ে যায় রে

“মনোদ্বৈগে সদা ধায়”

কতক্ষণে দেখতে পাব ব'লে
সেই ‘হরিবোলা’ রসের বদন কতক্ষণে দেখতে পাব ব'লে

যায় রঘুনাথ ব্যাকুল প্রাণে
স্মড়রি নিতাই যুগল চরণে যায় রঘুনাথ ব্যাকুল প্রাণে

মনে মনে ভারে রে
রঘুনাথ পথে যেতে মনে মনে ভারে রে

কথা কি ফলবে
আমার ভাগ্যে নিতাইটাদের কথা কি ফলবে

প্রভু নিতাই বল্লেন সাধ পূর্বে
পানিহাটি গ্রামে দেখা দিয়ে প্রভু নিতাই বল্লেন সাধ পূর্বে

হায় আমি কি দেখা পাব
গৌরের রাতুল চরণ-যুগল হায় আমি কি দেখা পাব

একবার দেখা দিও হে
সোনার গৌরাক্ষ প্রভু একবার দেখা দিও হে
“মনোদ্বৈগে সদা ধায় ক্ষুধা-ভৃগু নাহি পায় রে”

যার হৃদে গৌর-বাস সদা কি করবে তারে ক্ষুধা তৃষ্ণা
যার হৃদে গৌর-বাস সদা কি করবে তারে ক্ষুধা তৃষ্ণা

“দিবানিশি কিছু না জানিলা ॥”

তার আবার কিসের দিবানিশি
যার হৃদে জাগে গৌরা শশী তার আবার কিসের দিবানিশি

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুরাগে দেহ স্মৃতি নাই রে
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুরাগে দেহ স্মৃতি নাই রে

আহার নাই, নিদ্রা নাই চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
‘হা গৌর !’ ব’লে কাঁদে কেবল চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
ছ’নয়নে ধারা অবিরল চলিল গৌর-প্রেমের পাগল
ছ’নয়নে ধারা অবিরল চলিল গৌর-প্রেমের পাগল

স্বাবর-জঙ্গম যারে দেখে করযোড়ে ভিক্ষা মাগে
স্বাবর-জঙ্গম যারে দেখে করযোড়ে ভিক্ষা মাগে

এই ভিক্ষা দাও সবাই

মধুর নীলাচলে গিয়ে যেন আমি দেখতে পাই
শচীতুলাল প্রাণ গৌরাঙ্গে যেন আমি দেখতে পাই
শচীতুলাল প্রাণ গৌরাঙ্গে যেন আমি দেখতে পাই

‘দিবা নিশি কিছু না জানিলা’

একদিন ভিষ্কাচ্ছিলে

গো বাথানে সন্ধ্যাকালে

হা চৈতন্য বলিয়া বসিলা ।

এক গোপ ঢুক দিলা

তাহা খাইয়া বিশ্রামিলা

সেই রাত্রি তাহাই বঞ্চিলা ॥

রঘুনাথ দাস গোসাঞির

কি বল্ব বৈরাগ্যের কথা

কি বল্ব বৈরাগ্যের কথা

‘যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে

ভূমি-শয়্যা নাহি জানে

সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায় ।’

‘অপরূপ গৌরঙ্গ লীলা’

‘রাজা’ রাজত্ব ছাড়ি

কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা

কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা

শ্রীগৌরঙ্গ-অনুরাগে

সে আজ শুতিয়াছে গো-বাথানে

সে আজ শুতিয়াছে গো-বাথানে

যে শোয় না কভু পালঙ্ক বিনে

—সে আজ শুতিয়াছে গো-বাথানে

এত অনুরাগ না হইলে

মুখের কথায় কি গৌর মিলে

মুখের কথায় কি গৌর মিলে

“সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায় !

যেই ঘোড়া দোলা বিনে, পদব্রজ নাহি জানে,
সে পথ হাঁটয়ে রাঙ্গা পায় ॥

যে না হইতে দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড়-রসে করিত ভোজন ।

এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি গমন ॥”

কেউ দিলে তবে খায় আহারের চেষ্টা নাই
আহারের চেষ্টা নাই

“বার দিনের পথ গিয়া, তিন সন্ধ্যা অন্ন খাইয়া,
উত্তরিলী নীলাচল পুরে ।

দেখিয়া শ্রীমন্দির, নয়নে গলয়ে নীর,
‘হা চৈতন্য’ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥

(এর পর, ‘নীলাচলে-গৌর-রঘুনাথ-মিলন’ অংশটুকু এই গ্রন্থের ৫৩-৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, এ কারণ তাহা এখানে বাদ দিয়া পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত হইতেছে ।)

কিছু পরে গৌরহরি
রঘুনাথে স্থির করি

সঁপে দিলেন স্বরূপের করে

(রীতিমত) ভজন-প্রণালী শিখাবার তরে—

সঁপে দিলেন স্বরূপের করে

সাধন-প্রণালী শিখায়ো ব’লে সঁপে দিলেন স্বরূপের করে

সেই দিন হ'তে রঘুনাথে

আদর করে ডাকতেন প্রভু
আদর করে ডাকতেন প্রভু

ও স্বরূপের 'রঘু' বলে

আদর করে ডাকতেন প্রভু

কি বলব রঘুনাথের কথা

“শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে,

রঘুনাথ দাস চিতে,

পরম বৈরাগ্য উপজিলা ।

দারা গৃহ সম্পদ,

নিজ রাজ্য অধিপদ,

মলপ্রায় সকলি তাজিলা ॥

পুরশচর্যা কৃষ্ণনামে

গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥”

রঘুনাথ দাস গোস্বামি
পাইতে গৌরাজ চরণ

‘কৃষ্ণনামে’ করেন পুরশচরণ

‘কৃষ্ণনামে’ করেন পুরশচরণ

‘কৃষ্ণনামে’ করেন পুরশচরণ

‘গৌর-গণের’ চরিতে

অনুভব কর ভাই রে

অনুভব কর ভাই রে

শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে

অনুভব কর ভাই রে

পাবার লাগি গৌরচরণ

তঁরা করেন কৃষ্ণ ভজন

তঁরা করেন কৃষ্ণ ভজন

শ্রীগৌরাজ সেবা আশয়

তাদের কৃষ্ণ ভজন মুখ্য নয়

তাদের কৃষ্ণ ভজন মুখ্য নয়

“পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণনামে, গলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
শ্রীগৌরাজের পদধূগ সেবে।”

শ্রীদাস রঘুনাথের

কি বল্ব ভজনের কথা

কি বল্ব ভজনের কথা

অপূর্ব বৈরাগ্যের কথা

স্মরণিলে প্রাণ কেঁদে উঠে

স্মরণিলে প্রাণ কেঁদে উঠে

নীলাচলে গিয়ে রঘুনাথ

জগন্নাথের সিংহ দ্বারে

অযাচক বৃত্তি ক’রে

অযাচক বৃত্তি ক’রে

“হা গৌর” বলে অঝোরে ঝুরে

অযাচক বৃত্তি ক’রে

কারে কিছু নাহি চায়

যেচে দিলে তবে খায়

যেচে দিলে তবে খায়

না দিলে উপবাস

যেচে দিলে তবে খায়

‘গৌর-কৃপা’ পাবার লাগি

সিংহ দ্বারে অযাচক বৃত্তি

সিংহ দ্বারে অযাচক বৃত্তি

এইরূপে কিছুদিন গেল

তারপর তাও ছাড়ি দিলেন

‘গৌর’ বলে কাঁদে সদাই--

ছত্রে ছত্রে মেগে খায়

ছত্রে ছত্রে মেগে খায়

তাও কিছু দিনে ছেড়ে দিলেন

বলতে বুক ফেটে যায়

তারপর অদ্ভুত বৈরাগ্য

তারপর অদ্ভুত বৈরাগ্য

তেলেঙ্গা গাইএর পরিত্যক্ত

গলা প্রসাদ বেছে খায়

গলা প্রসাদ বেছে খায়

যা গাভীতেও খেতে নারে

গলা প্রসাদ বেছে খায়

“হা’ গৌর” ব’লে ভাসে নয়ন ধারায়

গলা প্রসাদ বেছে খায়

প্রেমময় গৌরহরি

পরস্পর শুনতে পেলেন

পরস্পর শুনতে পেলেন

রঘুনাথের এই ব্যবহার

পরস্পর শুনতে পেলেন

তার কি প্রভু রহিতে পারে

প্রিয় রঘুনাথের দ্বারে

দেখাইলেন জগতেরে

দেখাইলেন জগতেরে

ত্যাগ বৈরাগ্য কা’রে বলে

দেখাইলেন জগতেরে

একদিন রঘুনাথ

আপন মনে প্রসাদ বাছছেন

(হা) গৌর গৌর ব’লে কাঁদছেন

—আপন মনে প্রসাদ বাছছেন

নয়ন জলে ভেসে যায়
এক এক রঞ্চ মুখে দেয়
এক এক রঞ্চ মুখে দেয়

রঘুনাথের রীতি
দূর হ'তে দেখলেন প্রভু
দূর হ'তে দেখলেন প্রভু

গোপনে এসে গৌরহরি

রঘুনাথের কর হতে
এক কণিকা প্রসাদ তুলে নিলেন
এক কণিকা প্রসাদ তুলে নিলেন

শ্রীমুখে প্রসাদ দিয়ে বললেন
ছিঃ ছিঃ একি রঘুনাথ
'একি তোমার উচিত কার্য'

আমাকে বঞ্চিত করে
এমন সুধা একা আশ্বাদ করছ
এমন সুধা একা আশ্বাদ করছ

হায় প্রভু কি করলে ব'লে
রঘুনাথ বঞ্চে কর হানিলেন
রঘুনাথ বঞ্চে কর হানিলেন

বাহু পসারি গৌরহরি

ভাসি দুটি নয়নজলে
রঘুনাথে করলেন কোলে
রঘুনাথে করলেন কোলে
এস 'প্রাণের রঘু' বলে
রঘুনাথে করলেন কোলে

কি মধুর লীলা রে

না হ'লে এমন লীলা

সাথে কি গলে শিলা

সাথে কি গলে শিলা

দাসেব গুণ কি প্রভুর গুণ
যেমন প্রভু তেমনি দাস

কার গুণ গাইব মে

কার গুণ গাইব যে

কাব গুণ গাইব বে

সে মধুর লীলা কৈ,

সে দাস কৈ সে প্রভু কই
সে দাস কৈ সে প্রভু কৈ,

“এই মনে অভিলাষ,

পুনঃ বসুনাথ দাস,

নয়ন গোচর কবে হবে ॥”

শ্রীবসুনাথ দাস

আদর্শ ‘গৌরাজ্জ’ দাস

আদর্শ ‘গৌরাজ্জ’ দাস

‘গৌরদাস’ ব'লে পরিচয় দিয়ে

নামে কলঙ্ক বটালাম

নামে কলঙ্ক বটালাম

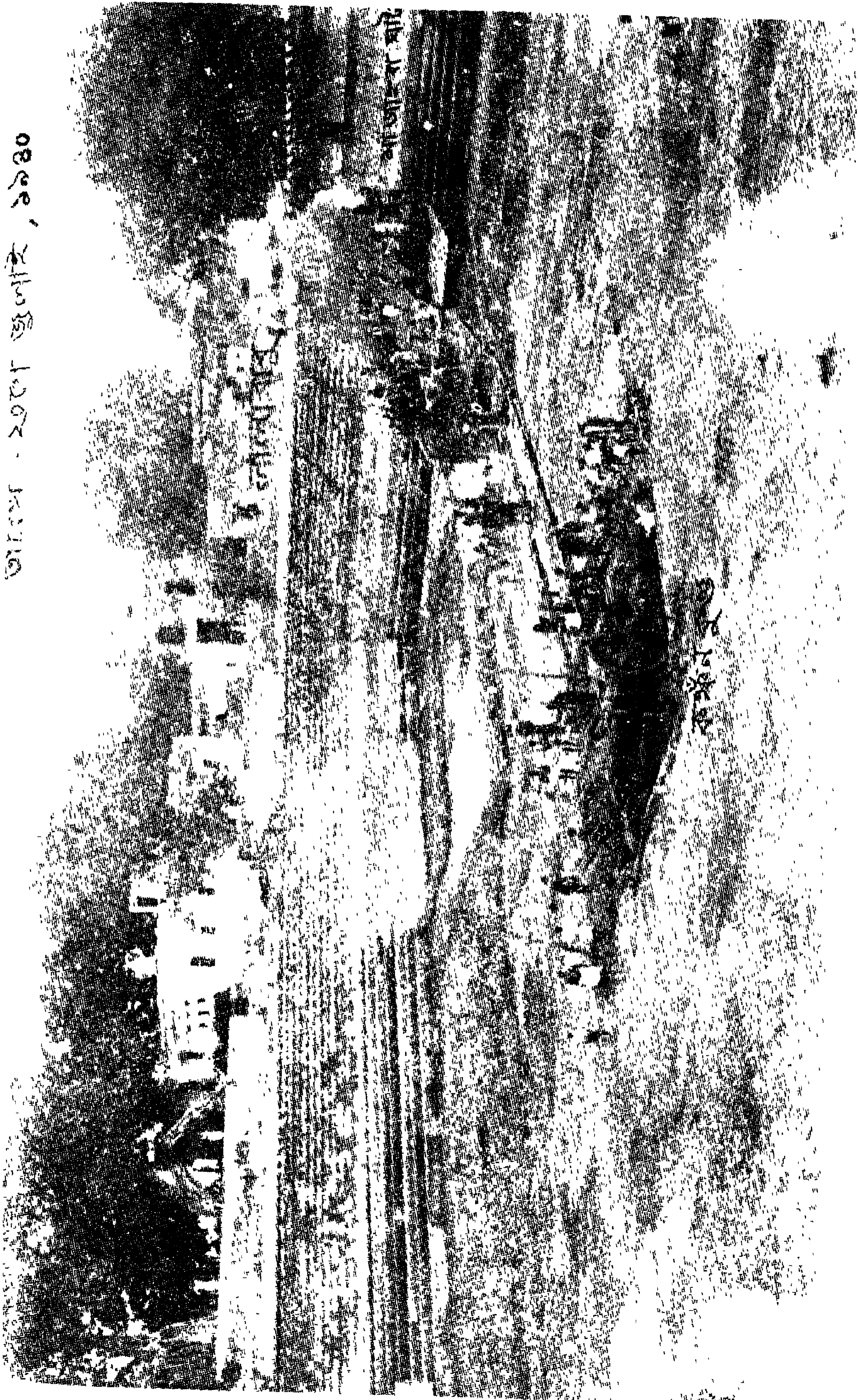
আমাদের পরিচয়ে

দাস-নাম কলঙ্কিত হল

দাস-নাম কলঙ্কিত হল

কি বল্ব রঘুনাথের কথা

আমেরিকা - ২০০৭ জুলাই, ১৯৪০



দাস গোস্বামী

১৯৪০

“গোরাক্ষ দয়াল হঞা, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জা-হারে ।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাহারে ॥”

নিজ বক্ষঃস্থিত গুঞ্জা-হার	রঘুনাথে সমর্পিলেন
	রঘুনাথে সমর্পিলেন
	নিজ বক্ষঃস্থিত গুঞ্জা-হার
'গোবর্দ্ধন শিলা' আর	নিজ বক্ষঃস্থিত গুঞ্জা-হার

রঘুনাথে সমর্পিলেন
শ্রীমুখে বল্লেন প্রভু—

এই নাও রঘুনাথ	(রঘু) এই তোমার যুগল-সেবা
গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জা-মালা	এই তোমার যুগল-সেবা
গুঞ্জা 'রাধা' গিরিধারী 'কৃষ্ণ'	এই তোমার যুগল-সেবা
	এই তোমার যুগল-সেবু

ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে	বাসের আজ্ঞা কৈলেন
শ্রীরাধাকুণ্ড তটে	বাসের আজ্ঞা কৈলেন
	বাসের আজ্ঞা কৈলেন

শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে	শ্রীরাধাকুণ্ড তটে
	শ্রীরাধাকুণ্ড তটে

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর
শুনলে পাষণ ফেটে যায়

কি বল্ব অতুরাগের কথা
কি বল্ব অতুরাগের কথা
কি বল্ব অতুরাগের কথা

“চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ে করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।”

প্রাণ গৌর-আঞা স্বদে ধ’রে
“বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ॥”

“দেহ ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে”

এ ছার দেহে কাজ কি আছে?
গৌরাজ-বৈমুখী দেহ এ ছার দেহে কাজ কি আছে?
প্রাণ গৌর যদি বিরূপ হয়েছে এ ছার দেহে কাজ কি আছে?

প্রাণ গৌর যদি ছেড়ে গেল আর বেঁচে কাজ কি বল
আর বেঁচে কাজ কি বল

শ্রীগৌরাজ-বৈমুখী প্রাণ

আর আমি রাখব না
আর আমি রাখব না

“দেহ ত্যাগ করি মনে

গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে”

প্রাণের প্রাণ গৌরহরি

রঘুনাথের আশয় জেনে
রঘুনাথের আশয় জেনে

প্রিয় শ্রীরূপ-সনাতনে
“রঘুনাথের মনোবৃত্তি”

জানাইলেন স্বপনে
জানাইলেন স্বপনে
জানাইলেন স্বপনে

আমার বিরহে কর্বে প্রাণপাত

সঙ্কল্প করেছে রঘুনাথ
সঙ্কল্প করেছে রঘুনাথ

‘রঘুনাথ’ বিরহে ত্যজিবে পরাণ

তোমরা গিয়ে রাখ প্রাণ
তোমরা গিয়ে রাখ প্রাণ

গিরি গোবর্দ্ধন-তটে
আমার রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে

ত্বরায় যাও দুই জনে
ত্বরায় যাও দুই জনে
ত্বরায় যাও দুই জনে

আমার রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে
তার দ্বারা আমার অনেক কাজ হবে—

আমার রঘুনাথে বাঁচাও প্রাণে

প্রাণগৌরের আজ্ঞা পেয়ে

শ্রীরূপ-সনাতন উঠি প্রভাতে
গিরি গোবর্দ্ধন-পানে
রাখতে রঘুনাথের প্রাণে

ত্বরায় গেলেন দুই জনে
ত্বরায় গেলেন দুই জনে
ত্বরায় গেলেন দুই জনে
ত্বরায় গেলেন দুই জনে

দূর হ’তে দেখতে পেয়ে

গৌর-শ্রিয় রঘুনাথে

দূর হ'তে দেখতে পেয়ে

ছুটে গিয়ে ধরলেন

“তুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥

ধরি রূপ সনাতন

রাখিল তার জীবন

দেহত্যাগ করিতে না দিলা ॥”

এ কি সঙ্কল্প করেছ রঘুনাথ ?

এ কি তোমার দেহ রঘুনাথ ? কা'র দেহ ত্যাগ করিবে ?
 এ কি তোমার দেহ রঘুনাথ ? কা'র দেহ ত্যাগ করিবে ?

এ দেহে তোমার কি অধিকার
 এ দেহে গৌর করেছে অধিকার—

এ দেহে তোমার কি অধিকার

এ যে গৌরের কেনা দেহ কা'র দেহ ত্যাগ করিবে
 এ যে গৌরের-উৎসর্গীকৃত দেহ কা'র দেহ ত্যাগ করিবে

“তুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া”

গৌর অভিমত জানিয়া
 “তুই গোসাঞির আজ্ঞা পাইয়া রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
 বাস করি নিয়ম করিলা ॥”

রঘুনাথ দাস গোসাঞি
রাধাকুণ্ড তীরে বসে

নিশি দিশি ডাকে রে
নিশি দিশি ডাকে রে
নিশি দিশি ডাকে রে

গোসাঞি নিয়ম ক'রে সদা ডাকে
হা হা গান্ধর্বিবকে

হা রাধে শ্রীরাধে
হা রাধে শ্রীরাধে
হা রাধে শ্রীরাধে

হা রাধে শ্রীরাধে

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি
তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি

ন জীবামি ছুরা বিনা

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি
তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি

রাধে তোমার আমি তোমার আমি
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—

রাধে তোমার আমি তোমার আমি
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—

রাধে তোমার আমি তোমার আমি

দেখা দাও প্রাণ কিশোরী
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি
তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি

গোসাঞী বলে অনুরাগ ভরে
এই কুণ্ডতীরে তোমার বঁধু-সাথে
দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে
দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে
দেখা দাও প্রেমময়ী রাধে

এই কুণ্ডলীতে প্রাণ বঁধু সনে দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণে
 দেখা দিয়ে রাখ মোর প্রাণে

কোথায় আছ প্রাণ-গৌর একবার দেখা দাও
 একবার দেখা দাও

রাধাকুণ্ড-তীরে দাস গোসাঞি নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে
 কোথা গো প্রেমময়ী রাধে নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে
 নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে

রঘুনাথের ভজন নিয়ম যেন পাষাণের রেখা
 যেন পাষাণের রেখা

“বাস করি নিয়ম করিলা”

শ্রীরঘুনাথ দাস গোসাঞির অপূর্ব ভজন-রীতি
 অপূর্ব ভজন-রীতি

“ছেঁড়া কঙ্কণ পরিধান”

মুখে কৃষ্ণ-গুণ গাঁথা ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা
 ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা

(পরিধানে) ছেঁড়া কাঁথা বহির্বাস নিশি দিশি হা হতাশ
 পরিচয় দেয় শ্রীচৈতন্যদাস নিশি দিশি হা হতাশ
 নিশি দিশি হা হতাশ

“ছেঁড়া কফল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার ।

তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্তন করি
রাধাপদ ভজন যঁহার ॥”

রাধাপদ ভজন করে কেবল গৌর মুখের তরে
কেবল গৌর মুখের তরে

“ছাপুপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায় ।

চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥”

শুধু মুখের কথায় কি গৌর মিলে
এমন করে তিলে তিলে না ভজিলে—
শুধু মুখের কথায় কি গৌর মিলে

“গৌরাজপদাঙ্ঘুজে রাখে মনোভূজরাজে”

প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
আপন প্রাণের ভোগের কথা—প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি
‘শ্রীচৈতন্যসুবকল্পবৃক্ষে’ প্রকাশিলেন দাস গোসাঞি

সুবকল্লবৃক্ষ বর্ণন ক'রে

কবিরাজের গলা ধ'রে কাঁদে
কবিরাজের গলা ধ'রে কাঁদে

রথের আগে নটন পর

গৌর হ'বে নাকি নয়ন-গোচর
গৌর হ'বে নাকি নয়ন-গোচর

রঘুনাথ দাস গোসাঞি

কাঁদে আর্তনাদ ক'রে

রাধাকুণ্ড-তীরে ব'সে

কাঁদে আর্তনাদ ক'রে

(কৃষ্ণদাস) কবিরাজের গলা ধ'রে

কাঁদে আর্তনাদ ক'রে

(প্রাণগৌরাজের) নীলাচল-বিহার বল্তে বল্তে

—কাঁদে আর্তনাদ ক'রে

(বলে) বল বল কবিরাজ

সোনার গৌরাজ প্রভু

আর কি আমি দেখতে পাব

গৌরের নীলাচল-বিহার

আর কি আমি দেখতে পাব

আর কি আমি দেখতে পাব

(বলে) এই দেখ কবিরাজ

গুঞ্জা-গিরিধারী দেখায়ে বলে

এই দেখ কবিরাজ

এই আমার প্রভুর গলার গুঞ্জামালা
এই শিলা প্রভুর বক্ষে ছিল

—এই আমার প্রভুর গলার গুঞ্জামালা

এই কথা বলতে বলতে
গুঞ্জা-গিরিধারী বুকে ধ'রে

বাহু পসারী জড়িয়ে ধরে
ভাবাবেশে বলে রে—

পেয়েছি তোমায় চিতচোরা
আর ছেড়ে দিব না
আর ছেড়ে দিব না

গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
গৌর-অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে
গুঞ্জা গিরিধারী বুকে ধ'রে

না হ'বে বা কেন রে
না হ'বে বা কেন রে
স যে প্রাণ-গৌরাজের বুকে ছিল

গৌর অঙ্গ-সঙ্গ ভোগ করে ।

আবার ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
'হা গৌর' 'প্রাণ গৌর' বলে আবার ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

(বলে) পাব কি গৌরাজ-ধনে
আমার প্রভু স্বরূপের সনে পাব কি গৌরাজ-ধনে

“স্বরূপের সদাই ধেরায় !”

(বলে) আর কি দেখা দিবে মোরে
 হা আমার প্রভু স্বরূপ আর কি দেখা দিবে মোরে
 প্রাণ গৌর লয়ে গন্তীরা-ঘরে আর কি দেখা দিবে মোরে

আর কি দেখতে পাব না
 তোমার গলাধরা প্রাণ-গোরা আর কি দেখতে পাব না
 তোমার কণ্ঠমালা শচীর-বাল্য আর কি দেখতে পাব না
 রাধা ভাবে ভোরা গোরা আর কি দেখতে পাব না

আর কি শুন্তে পাব না
 বিবর্ত-বিনাস-প্রসঙ্গ আর কি শুন্তে পাব না

ডাকবেন ও প্রাণ সহচরী
 তোমার গলা-ধরি গৌর-কিশোরী ডাকবেন ও প্রাণ সহচরী

হুরায় মিলাও বংশীধারী
 ও প্রাণ সহচরী হুরায় মিলাও বংশীধারী

আর কি তা শুনাবে না

আর কি দেখাবে না
 গন্তীরার গুণুলীলা আর কি দেখাবে না

ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
 রঘুনাথ দাস গোসাঞি ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মস্মাৎ ॥”

হা গৌরাজ মহাপ্রভু
হা স্বরূপ মোর প্রভু হা গৌরাজ মহাপ্রভু

“স্বরূপেরে সদাই ধৈর্যায়”

অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগ-প্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে ।

সেই আৰ্ত্তনাদ করি, কঁাদি বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে ॥”

যে ধনী হয় গৌর-প্রেমধনে

আপনারে অযোগ্য মানে তার এইত স্বভাব বনে
তার এইত স্বভাব বনে

ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
রঘুনাথ দাস গোস্বামিঞে ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে রে
ব্যাাকুল হ'য়ে কাঁদে রে

হা রাধার বল্লভ,

গান্ধবিকা-বান্ধব,

রাধিকা রমণ রাধানাথ ।

হে বৃন্দাবনেশ্বর

হা হা কৃষ্ণ দামোদর

কৃপা করি কর আত্মস্মাৎ ।

ব্যাকুল হয়ে বলে রে

“শ্রীকৃপ শ্রীসনাতন,

যবে হৈল অদর্শন,

অন্ধ হ’ল এ দুই নয়ন ।”

চলে গেল দুই নয়ন

‘শ্রীকৃপ’ ‘শ্রীসনাতন’

চলে গেল দুই নয়ন

যারা করাত গৌর দরশন

চলে গেল দুই নয়ন

দুই নয়ন তারা হ’লাম হারা

শ্রীকৃপ শ্রীসনাতন চলি গেলা

দুই নয়ন তারা হ’লাম হারা

গৌর-গোবিন্দ-লীলা-দরশনের

দুই নয়ন তারা হ’লাম হারা

আর কি বা দেখ্‌ব আঁখি মেলে

শ্রীকৃপ-সনাতন গেল চ’লে

আর কি বা দেখ্‌ব আঁখি মেলে

বৃথা কেন রাখ্‌ব নয়ন

যদি ছাড়ি গেলা কৃপ সনাতন

বৃথা কেন রাখ্‌ব নয়ন

“বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি

বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি

এ প্রাণে আর কাজ কি বল

প্রাণের প্রাণ গৌর ছেড়ে গেল

এ প্রাণে আর কাজ কি বল

যেন গৌর ব'লে মরতে পারি

এই কৃপা কর 'গৌরগণ' 'গৌর-লীলাস্থলী'—

যেন গৌর ব'লে মরতে পারি:

“সবারে করয়ে পরণাম ॥

রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে,

ছাড়িল সকল ভোগে,

শুখা রুখা অন্ন মাত্র সার ।

গৌরাক্ষের বিয়োগে,

অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,

ফল গব্য করিল আহার ॥

সনাতনের অদর্শনে

তাহা ছাড়ি সেই দিনে

কেবল করয়ে জল পান ।”

সনাতন যদি ছেড়ে গেল

(বলে) এ জীবনে কাজ কি বল

এ জীবনে কাজ কি বল

অন্ন জল বিষ খাই

কেন ম'রে নাহি যাই

কেন ম'রে নাহি যাই

রূপের বিচ্ছেদ যবে,

জল ছাড়ি দিল তবে,

রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥

শ্রীরূপের অদর্শনে,

না দেখি তাঁহার গণে,

বিরহে আকুল হৈঞা কঁাদে ।

কৃষ্ণ-কথা-আলাপনে,

না শুনিয়া শ্রবণে,

উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্জুনাদে ॥

ব্যাকুল হয়ে দাস গোসাঞি ডাকে
শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে প'ড়ে ব্যাকুল হয়ে দাস গোসাঞি ডাকে

“হা হা রাধা কৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন ।

‘হা চৈতন্য মহাপ্রভু’

হা চৈতন্য বলতে হারায় চৈতন্য

“হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥”

নয়নে দরদর-ধারে

কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে

আহার নাই নিদ্রা নাই

কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে

কুণ্ডতীরে রঘুনাথ কাঁদে

কোথা বা লুকালে

হা স্বরূপ রূপ সনাতন

হা প্রাণ শচীনন্দন

হা প্রাণ শচীনন্দন

আর কে শুনাবে গৌর কথা

রূপ সনাতন গেলে কোথা

রূপ সনাতন গেলে কোথা

গৌর-কথা কি শুনাবে না

আর কি সঙ্গ দিবে না

আর কি সঙ্গ দিবে না

“কঁাদে গোসাঞি রাত্রি দিনে

পুড়ি যায় তনু মনে”

গৌরান্দ বিরহানলে ।

“পুড়ি যায় তনু মনে

ক্ষণে অঙ্গ ধুলায় ধুসর ।

“চক্ষু অন্ধ অনাহার”

নিশি দিশি কেঁদে কেঁদে

চক্ষু অন্ধ অনাহার

আপনাকে দেহ ভার

বিরহে হইল জর জর ।”

বিরহেতে শীর্ণ তনু

উঠিবার শক্তি নাই

উঠিবার শক্তি নাই

ত্যাগ করেছেন আহার

কঙ্কাল হয়েছে সার

কঙ্কাল হয়েছে সার

বসিলে উঠিতে নারে

“রাধাকুণ্ড তটে পড়ি

সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি

মুখে বাক্য না হয় স্মরণ ॥”

আর বলিবার শক্তি নাই রে
“মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে”

ফুকারি বলতে নারে

“মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥

সেই রঘুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ ॥

এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে করহ পরসাদ ॥”

রঘুনাথ দাস গোসাঞি এই কৃপা কর মোরে
এই কৃপা কর মোরে

স্বরূপের প্রিয় রঘুনাথ এই কৃপা কর মোরে

তোমা হ’তে অধিক ছুঃখী মোরা বিতর বিরহ-কণা
বিতর বিরহ-কণা

যেন নিশিদিশি কাঁদতে পারি
“চৈতন্য-স্তব কল্পবৃক্ষ” গান করি,
—যেন নিশিদিশি কাঁদতে পারি

‘হা গৌর’ ‘গৌরগণ’ বলি, যেন নিশিদিশি কাঁদতে পারি

যেন গৌরগুণে সদা ঝুরি

তোমার চরণ হৃদে ধরি

যেন গৌর-গুণে সদা ঝুরি

যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ’য়ে

তোমার গৌর-বিরহ স্মরণ ক’রে

—যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হয়ে

‘কুণ্ডলীয়ে’ তোমার গুণ গেয়ে

—যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ’য়ে

শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে গিয়ে

যেন কেঁদে লুটাই ব্যাকুল হ’য়ে

যেন তোমার চরিত্র স্মরি মরি

শ্রীগুরু-গৌরঙ্গ হৃদে ধরি

—যেন তোমার চরিত্র স্মরি মরি

—————

(এই তরঙ্গ সন্নিবেশিত উপরের শোচক কীর্তন এবং পরপৃষ্ঠা হইতে সন্নিবেশিত ‘শোচকে আক্ষেপ কীর্তনটি’ নিত্যধাম গত শ্রীল দ্বিজপদ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীশ্রীনিতাই সুন্দর পত্রিকাতে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে ।)

ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ।

জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল

(হায় হায়) যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর রে
হেন প্রভু কোথা গেলা, আচার্য্য ঠাকুর রে ॥

(হায় হায়) কাঁহা গেলা স্বরূপ রূপ, কাঁহা সনাতন রে ।
কাঁহা গেলা রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন হে ॥

(হায় হায়) কাঁহা গেলা ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ :
এক্ কালে কোথা লুকালে, গোরা নটরাজ ॥

(হায়রে) কারও দেখা পেলাম না
কি বলব তুর্দেবের কথা (হায়রে) কারও দেখা পেলাম না

(আহা) “শ্রীগৌরাজের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর,
(হায়) নরহরি মুকুন্দ মুরারি ॥

(হায় হায়) সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেমকন্দ,
(হায়) দামোদর পরমানন্দপুরী ॥”

(হায় হায়) যে সব করিলা লীলা,”
(হায়রে) মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

(আমরি) শ্রীসুরধুনী আর সিদ্ধ কূলে

—(হায়রে) মধুর নদীয়া আর নীলাচলে

(হায় হায়) যে সব করিলা লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহা মুই না পাইবু দেখিতে ।”

(হায়) কিছুই দেখতে পেলাম না রে
‘প্রেমোন্মত্তকারী লীলা’ (হায়) কিছুই দেখতে পেলাম না রে

	প্রেমোন্মত্তকারী লীলা
স্বাবর জঙ্গম গুল্মলতা	প্রেমোন্মত্তকারী লীলা
বাড়িখণ্ড পথে ব্রজে আসিতে	প্রেমোন্মত্তকারী লীলা

কিছুই দেখতে পেলাম না রে
প্রাণ গৌরাজের) পাষণ-গলান-লীলা
—কিছুই দেখতে পেলাম না রে

	পাষণ-গলান লীলা
(আমার) চিতচোর প্রাণ গৌরাজের	পাষণ গলান লীলা

—অত্যাপি তার নিদর্শন আছে

(শ্রীনীলাচলে) জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে

—অত্যাপি তার নিদর্শন আছে

এখনও তার সাক্ষী দিছে

‘পাষণে শ্রীপদচিহ্ন’

সেই লীলার সাক্ষী দিছে

সেই লীলার সাক্ষী দিছে

কিছুই দেখতে পেলাম না

(প্রাণ গৌরাজের) পাষণ গলান লীলা

— কিছুই দেখতে পেলাম না

দেখা শুনা হ’ল না

কারে বল্ব ছুর্দৈবের কথা

দেখা শুনা হ’ল না

তখন জনম পেলাম না

দেখা শুনা হ’ল না

(ও সে) গমনে নটন বচনে গান দেখা শুনা হ’ল না

“হায় তাহা মুই না পাইলু দেখিতে ।”

“(হায় হায়) তখন না হৈল জন্ম, এবে ভেল ভববন্ধ.

সে না সেল রহি গেল চিতে ॥”

আর জুড়াইবার উপায় নাই

‘সে লীলা অদর্শন শেল’

নিশিদিশি জল্ছে হিয়ার

নিশিদিশি জল্ছে হিয়ার

‘পরান গৌরাজ্ঞাচাঁদের’

সেই লীলা অদর্শন শেলে

সেই লীলা অদর্শন শেলে

নিশি দিশি জল্ছে হিয়া

আর জুড়াইবার উপায় নাই ভাই
(একমাত্র) 'প্রাণ গৌর' কথা' বিনে আর

—আর জুড়াইবার উপায় নাই ভাই

	এনেছেন কৃপা করে
পরম করুণ শ্রীগুরুদেব	এনেছেন কৃপা করে
কেশে বাঁধি কৃপা ডোরে	এনেছেন কৃপা করে

এনেছেন কাছে ব্রজ ভূমিতে
(শ্রীগুরুদেব) অহৈতুকী কৃপার বশেতে
—এনেছেন কাছে ব্রজ ভূমিতে

এমন দিন আর পাবে না ভাই
এমন সুযোগ আর হয় নি ভাই

	বল বল ভাই গৌর বল
শ্রীমহাস্তগণের শরণাগতিতে	বল বল ভাই 'গৌর' বল

	শ্রীমহাস্তগণের শরণাগতিতে
'শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী'	শ্রীমহাস্তগণের শরণাগতিতে
	বল বল ভাই গৌর বল

'তাদের পদরজ' শিরে ধ'রে	বল বল ভাই গৌর বল
তাদের পদরজময় ভূমিতে লুটায়	বল বল ভাই গৌর বল

“(ও) বদনে বল জয় জয়, শচীর কুমার রে”

বল বল ভাই ‘গৌর’ বল
কবিরাজ গোস্বামীর চরণ তলে বসে বল বল ভাই ‘গৌর’ বল

কবিরাজ গোস্বামীর চরণ তলে
যিনি এনেছেন কৃপাবশে কবিরাজ গোস্বামীর চরণ তলে

বল বল ভাই গৌর বল
আর কিছু লাগে না ভাল বল বল ভাই গৌর বল

“বদনে বল জয় জয়, শচীর কুমার রে।”

জয় জয় দাও ভাই প্রাণ ভরি
আমার প্রেমাবতার গৌরহরির জয় জয় দাও ভাই প্রাণ ভরি

জয় জয় জয় গৌরহরি
বল জয় জয় জয় গৌরহরি

প্রেমাবতার গৌরহরি
জয় জয় জয় জয় প্রেমাবতার গৌরহরি

জয় জয় গৌরহরি
স্বাবর জঙ্গম প্রেমোন্মত্তকারী জয় জয় গৌরহরি

“গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার রে ॥”

কি বা জানি কি বা বলব
যা বলান্ তাই বলি বাণী

শ্রীগুরুদেব কৃপার খনি যা বলান তাই বলি বাণী
 “(প্রাণ) গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার রে ॥”

আমার চিতচোর গৌরাজ্জ মুরতি

‘মহারাসবিলাসের পরিণতি’ আমার চিতচোর গৌরাজ্জ মুরতি

চিতচোর গৌরাজ্জ আমার

মহাভাব প্রেমরস খনি

চিতচোর গৌরা গুণমণি
 চিতচোর গৌরা গুণমণি

মহাভাব প্রেমরস খনি

বল বল ভাই গৌর বল

রামরায়ের চিতচোর
 ‘মুরতিমন্তু প্রেম বৈচিত্র্য’
 ‘নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ’

বল বল ভাই গৌর বল
 বল বল ভাই গৌর বল
 বল বল ভাই গৌর বল

চিতচোর গৌরাজ্জ আমার

বল বল ভাই গৌর বল

“গৌর আমার নিগম নিগূঢ় অবতার রে ॥”

“শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য

গৌর গুণ ভাল জানে”

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

অনশনে গঙ্গাতীরে বসে

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

(আমার) প্রাণ কৃষ্ণ এস বলে

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

(আমার) প্রাণ গৌর এস ব'লে

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

প্রাণ গৌর এস ব'লে

ভাসি ছুটি নয়নজলে

প্রাণ গৌর এস ব'লে

যে কেঁদে কেঁদে এনেছে

“শ্রীদ্বৈত আচার্য্য গৌর গুণ ভাল জানে রে ।

প্রভু নিতাই অবধূত, যার গুণ গানে রে ॥”

(আমার) প্রভু নিতাই পাগল করা গোরা

আমার আমার আমার আমার

—আমার প্রভু নিতাই পাগল করা গোরা

প্রাণ ভরে বল ভাই তোরা

—আমার প্রভু নিতাই পাগল করা গোরা

“প্রভু নিতাই অবধূত, যার গুণ গানে রে ॥

(ভাইরে) য়াঁর গুণে ঝুরি ঝুরি”

য়াঁর গুণে ঝুরি ঝুরি

য়াঁর গুণে ঝুরি ঝুরি

য়াঁর গুণে ঝুরি ঝুরি

য়াঁর গুণে ঝুরি ঝুরি

“ରୂପ ସନାତନ ରେ”

“(ଭାହିରେ) ଧୀର ଶୁଣେ ଝୁରି ଝୁରି, ରୂପ ସନାତନ ରେ ।
 ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆଇଲା ବୁନ୍ଦାବନ ରେ ॥”

ଲୁପ୍ତ ବ୍ରଜ ପ୍ରକାଶ କୈଳା

‘ଗୌର ବ’ଲେ କୈନ୍ଦେ’ ‘ଅନୁଭବେ’

ଲୁପ୍ତ ବ୍ରଜ ପ୍ରକାଶ କୈଳା

ଗୌର ବଲେ କୈନ୍ଦେ ଅନୁଭବି

‘ଲୀଳାଭୂମି’ ଜ୍ଞାନି

ଗୌର ବଲେ କୈନ୍ଦେ ଅନୁଭବି

ଲୁପ୍ତ ବ୍ରଜ ପ୍ରକାଶ କୈଳା

“ସକଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଆଇଲା, ବୁନ୍ଦାବନ ରେ ।”

(ଭାହିରେ) ଧୀର ଶୁଣେ ଝୁରି ଝୁରି, ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ଦାମ ରେ ।
 ଧୀର ଶୁଣେ ଝୁରି ଝୁରି, ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ଦାମ ରେ
 ଧୀର ଶୁଣେ ଝୁରି ଝୁରି, ଶ୍ରୀରଘୁନାଥ ଦାମ ରେ
 “ଇନ୍ଦ୍ରସମ ରାଜା ଛାଡ଼ି, ଏହି ରାଧାକୁଣ୍ଡେ ବାସ ରେ ॥”

ନିଶିଦିଶି କାନ୍ଦେ ରେ

(ଆମାର) ରଘୁନାଥ ଦାମ ଗୌସାହି

ନିଶିଦିଶି କାନ୍ଦେ ରେ

ଏହି ରାଧାକୁଣ୍ଡତୀରେ ବସେ

ନିଶିଦିଶି କାନ୍ଦେ ରେ

(କୃଷ୍ଣଦାମ) କବିରାଜେର ଗଲା ଧରି

ନିଶିଦିଶି କାନ୍ଦେ ରେ

(କୃଷ୍ଣଦାମ) କବିରାଜେର ଗଲା ଧରି

ଏହି କୁଣ୍ଡତୀରେ ବସି

କୃଷ୍ଣଦାମ କବିରାଜେର ଗଲା ଧରି

ব্যাকুল হয়ে কাঁদে গোসাই
দাস গোসাঞি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন

বল বল কবিরাজ

আর কি আমি দেখতে পাব

বল বল কবিরাজ

আর কি আমি দেখতে পাব

‘সোনার গৌরাজ প্রভু’

আর কি আমি দেখতে পাব

এই এই দেখ কবিরাজ

দাস গোসাঞি ব্যাকুল হ’য়ে বলে

এই এই দেখ কবিরাজ

এই কুণ্ড তীরে বসে বলে

এই এই দেখ কবিরাজ

এইখানে বসে বলে,

দেখ দেখ কবিরাজ

কবিরাজের গলা ধরে বলে.

দেখ দেখ কবিরাজ

আমার প্রভুর গলায় ছিল

এই ‘গিরিধারী’ ‘গুঞ্জামালা’

আমার প্রভুর গলায় ছিল

ভাবাবেশে বলে রে

ব্যাকুল হয়ে বলতে বলতে আবার

ভাবাবেশে বলে রে

‘গুঞ্জামালা’ ‘গিরিধারী’ বুকে ধরে

ভাবাবেশে বলে রে

‘বিন্দুতে’ ‘সিন্ধু’ ভোগ করে

অঙ্গ সঙ্গ পেয়েছে

চিতচোরা প্রাণ গৌরাজের

অঙ্গ সঙ্গ পেয়েছে

	সেই অনুভবে বলে
‘গুঞ্জামালা’ ‘গিরিধারী’ বুকে ধ’রে	সেই অনুভবে বলে
‘বিন্দুতে’ ‘সিন্ধু’ ভোগ করে	সেই অনুভবে বলে
গুঞ্জামালা গিরিধারী বুকে ধরে	সেই অনুভবে বলে

	আর ছেড়ে দিব না
পেয়েছি তোমায় চিতচোর	আর ছেড়ে দিব না

	কোথা বা আছ হে
	দাস গোসাঞি কোথা তুমি
এইত তোমার বসতি ভূমি	দাস গোসাঞি কোথা তুমি

এই ত তোমার বসতি ভূমি

শ্রীগুরুমুখে শুনে বলি	এইত তোমার বসতি ভূমি
এখানে বসে, ব্যাকুল হয়ে কাঁদুছ তুমি	

	একবার কি দেখা দিবে
কোন অধিকার নাই, তবু বলি	একবার কি দেখা দিবে

কোন্ অধিকারে দেখা দিতে বল্ব
‘দুর্ভাসনার কিস্কর’ আমি কোন্ অধিকারে দেখা দিতে বল্ব

	অযাচিত কৃপাকারী
আমার পরাণ গৌরান্ধগণ	অযাচিত কৃপাকারী

শ্রীগুরুমুখে শুনেছি

অযাচিত কৃপাকারী

একবার কি দেখা দিবে

না না দেখা দিও না

‘হৃদৈবের কিঙ্কর’ আমি

না না দেখা দিও না

তোমার ভজনে বিঘ্ন হবে

না না দেখা দিও না

এই কৃপা কর হে

রঘুনাথ দাস গোস্বামি

এই কৃপা কর হে

যদি কৃপা করে এনেছ টেনে

এই কৃপা কর হে

বহু দিন পরে যদি,

কৃপা করে এনেছ টেনে

কৃপারজ্জু কেশে বেঁধে

যদি কৃপা করে এনেছ টেনে

গৌর গুণে ঝুতে পারি

শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি

গৌর গুণে ঝুতে পারি

যেন পাগল হ’য়ে বেড়াই সদা

যত দিন এই দেহ থাকে

যেন পাগল হ’য়ে বেড়াই সদা

শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায়

যত দিন এই দেহ থাকে

পাগল হয়ে বেড়াই সদা

ভাই ভাই ভাই মিলে

পাগল হয়ে বেড়াই সদা

‘গৌরাঙ্গ বিহার ভূমিতে’

পাগল হয়ে বেড়াই সদা

গৌরলীলা স্মরি ঝুরি ঝুরি

পাগল হয়ে বেড়াই সদা

এই কৃপা কর হে

রঘুনাথ দাস গোস্বামি

এই কৃপা কর হে

যেন কণ্ঠ হার হ'য়ে থাকে
 যেন কণ্ঠহার হ'য়ে থাকে
 শ্রীগুরুকৃপাদত্ত নামাবলী

'সাধ্য' 'সাধন' নির্ণয় করা,
 শ্রীগুরু কৃপাদত্ত নামাবলী
 যেন কণ্ঠহার হয়ে থাকে

ভাই ভাই বেড়াই সদা
 ভাই ভাই বেড়াই সদা
 ভাই ভাই বেড়াই সদা
 শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধ'রে
 নাম-মালা কণ্ঠহার ক'রে

প্রাণ ভ'রে গাইতে পারি
 প্রাণ ভ'রে গাইতে পারি
 শ্রীগুরুচরণ হৃদে ধরি

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম ।
 জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ॥

(নিতাই) গৌর হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল
 শ্রীগুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর হরিবোল ॥

(শ্রীপাদ রামদাস বাবাজী মহাশয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংক্রান্তি
 বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৪।।০ ঘটিকায়, শ্রীকুণ্ডতটে অবস্থিত দাস গোস্বামীর
 সমাধিতে এই কীর্তনটি করিয়াছিলেন ।)

সপ্তদশ তরঙ্গ

“প্রীতি উগহার”

বিবরণ

১। (চিত্রে) সঙ্কলয়িতার শ্রীগুরুদেব—

২। শ্রীগুরুদেব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য ঠাকুর দেবশর্মা, পঞ্চতীর্থ. মধ্যে প্রমোদরে “শ্রীশ্রীরাম
দাস কথামৃত এবং কোথাও বা শ্রীগুরুদেবের বাণীটিই কেবল
উদ্ধৃত হইয়াছে। --(পর পৃষ্ঠায় পৃথক সূচী)

৩। শ্রীগুরু অষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণ-মালা—

পৃষ্ঠা—৫৬২

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ন ঙরোরধিকম্	: ৫২১	শ্রীশ্রীরামদাস কথামৃত :	
এ বারের বিপরীত খেলা :	৫২১	সিদ্ধ প্রসঙ্গ	: ৫৩১
আমার ঠাই নাই	: ৫২২	সাধন প্রসঙ্গ	: ৫৩৩
আকর্ষণের ভিত্তি	: ৫২২	আনুগত্য	: ৫৩৬
‘ধর্ম’ ও ‘অধর্ম’	: ৫২২	সাধন সম্পদ	: ৫৪০
‘অপরাধ’	: ৫২২	স্বতন্ত্রার আরও রূপ	: ৫৪৭
শাস্তি	: ৫২২	বৈষ্ণব সমাজে দাস ভাব	: ৫৫০
আমি করি এ বড় জালা :	৫২৩	বৈষ্ণবের আদর্শ	: ৫৫২
করেছি ও করেছেন	: ৫২৩	উপায় কি ?	: ৫৫৩
জীবের স্বাধীনতা কোথায় ?	৫২৪	একটি ভক্তের প্রশ্ন	: ৫৫৪
স্বাধীনতা	: ৫২৫	সাধন ও স্বতন্ত্রতা	: ৫৫৬
ভক্তি পথের প্রাথমিক পাঠ্য		সংসারের স্রোতে সাঁতার :	৫৫৯
নির্বাচন	: ৫২৫		
বর্ণাশ্রম ধর্মে	: ৫২৫		
দৃষ্টি	: ৫২৬		
সাবধান বাণী	: ৫২৬		
সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়	: ৫২৬		
বৈষ্ণবের দৃষ্টি	: ৫২৭		
আসক্তি	: ৫২৮		
সাধু-সঙ্গ ও বিশ্বাস	: ৫২৯		

अशु सङ्कलनकार श्री प्रकटन



नाममय-जीवन श्रील रामदास दादाजी

ন গুরোরধিকম্

ওগো ! গুরু স্বরূপে যখন হাত ধরেছে, তখন চাওয়া পাওয়া সব হয়ে গেছে, তবে যদি বল তা'হলে এই সব নাম প্রসঙ্গ বিগ্রহ সেবা প্রভৃতির প্রয়োজন কি ? সে কোন হেতুতে নয়, কোন জন্তে নয়, সে কেবল তাঁর (শ্রীগুরু স্বরূপের) মুখ পানে চেয়ে, সে ভালবাসে তাই, নইলে আমাদের আর কি প্রয়োজন আছে ?

“এ বারের বিপরীত খেলা”

‘দাতার স্বভাব দান করা—

হেতু নাই যুক্তি নাই পাত্রাপাত্র বিচার নাই, প্রচ্ছন্ন স্বভাবে আসা প্রচ্ছন্নভাবেই সব কাজ সারা। ‘স্বরূপে’ ‘আবরণে’ ‘কাজে’ সবই প্রচ্ছন্ন, রূপে মিল করতে গেলে ঠকে যাবে। কাজে মিল করে নাও, ঘরে বসে ‘সব পাবে’।

যে গুলো ঘটে যাচ্ছে সে গুলো কি সোজা ?

কলির জীবের সর্বদাই ভুলে থাকা স্বভাব। খাওয়া পরা নিয়ে ব্যস্ত, তাদের কি এ রাজ্যে আসা সোজা !

তাই প্রচ্ছন্ন ভাবে আসা, ওই ওরই ভেতর দিয়ে ঢুকে সম্বন্ধ করিয়ে নিতে হবে—যেচে দিতে হবে, তবে কাজ হবে। এ বারের খেলা সব বিপরীত।

কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের বিধি নিষেধ, অধিকারী অনধিকারী কিছু দেখলে চলবে না, দেখতে গেলে পাবে না, দাতার করুণার ঠাই হবে না...

আমির ঠাই নাই

‘তারই জিনিষ, সেই আসে, দেয়ও মারফতে, ‘আমির’ ঠাই নাই

“আকর্ষনের ভিত্তি”

ওগো ! সে বাজিয়ে দেখে নেয়, টান্টা কোথায় ? নিজের ‘লাভ’ ‘পূজা’ ‘প্রতিষ্ঠায়’ না তাঁর ওপর ; ওমনি করেই তো নিজের জনকে খাঁটি সোনা করে রাখে, আর তাই দেখেই তো পরশমণির সন্ধানে সব যায়, আসল কথা কা’র মুখ চেয়ে আছ, টাকা পয়সার না তার মালিকের ? না তার ছাড়া কেউ দাতা আছে ?

সে সব নাটের গুরু । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য.....

‘ধর্ম্য’ ও ‘অধর্ম্য’

‘ওগো, আত্মানুশীলনই ধর্ম্য আর, পরানুশীলনই অধর্ম্য’

‘অপরাধ’

ও গো ! ‘অস্থানে’ বস্তুর আরোপই ‘অপরাধ,’
যে যা নয় তাকে তাই করাই অপরাধ ।

‘শান্তি’

‘আত্মদোষ’ ‘আত্ম,—অপরাধ’ চিন্তা ক’রলেই শান্তি আসে

আমি করি এ বড় জ্বালা

বাবাজী মহাশয় :

‘একটি গল্প আছে—

এক সময় এক দরিদ্র ভক্ত ব্রাহ্মণ, শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্যে আর একটি মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভিক্ষায় বে'র হ'লেন। কিছু দিন পর বেশ ধন-রত্ন সংগ্রহ হ'লো। তা'র এই সব সংগ্রহ দেখে এক ডাকাত তার পিছু নিলে, সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে সেই ভক্তটি সন্ধ্যা করতে বসেছেন, ডাকাতও লুকিয়ে থাকলো, সুযোগ হলেই সর্বস্ব নেবে। এদিকে ওখানে লক্ষ্মীনারায়ণ পাশা খেল'ছিলেন, হঠাৎ নারায়ণ হাত থামিয়ে উঠে পড়লেন, ঠাকুরাণী বল্লেন, ও কি ! উঠলে কেন ?

নারায়ণ বল্লেন, এক ভক্তের সর্বস্ব ডাকাতে কেড়ে নিচ্ছে, সে আমায় স্মরণ করেছে কাতর ভাবে। এই কথা বলেই একটু থেমেই আবার খেল'তে বসলেন, দেবী জিগ্যেস করলেন, কি হ'ল ? থেমে রইলে যে ?

নারায়ণ হেসে বল্লেন, ও হ'য়ে গেছে। ব্রাহ্মণ ভাবলে আমিই বা কেন শুধু শুধু ছাড়'বো, একটু দেখেই নিইনা !

ব্যাস, আর আমার কাজ নেই, যতক্ষণ আমার ওপর ভরসা করেছিল, তখন ছুট'ছিলাম, কিন্তু, যখন তার ‘অহংজ্ঞান’ এসে পড়লো আমার কাজও ফুরোলো।

‘ক'রেছি’ ও ‘ক'রেছেন’

বাবাজী মহাশয়:

দেখ ! আজ ছুটি বেশ কথা পেয়েছি—

‘করেছি’ ও ‘করেছেন’

জগত-শুদ্ধ লোক এত ‘করেছির’ দলে মিশে পুরুষকার অহংকারে
নষ্ট হয়ে যায়ই !

(এটা করেছি, ওটা করেছি বলে ঐ রসেই মেতে আছে)

আচ্ছা ! আমি করেছি বললে—

‘কর্তা’ ও ‘ভোক্তার’ অভিমান এল না ?

আর তাঁরই কৃপা অবলম্বনে সমস্ত কাজ সমাধান করে
অকপট সত্যানুভূতিতে যদি কেউ বলেন—

সমস্তই তিনি ক’রেছেন—

তা’হলে তিনি যে ‘সম্পিত’ ও ‘আশ্রিত’ এবং প্রভুর বিশুদ্ধ
সেবক এটা বুঝতে কি বাকী থাকে ?

এই ‘করেছি’ কথাটা জগতে কি দুর্দশাই কর’ছে !

জীবের স্বাধীনতা কোথায় ?

বাবাজী মহাশয়ঃ

হাঁ জীবের অবার কর্তৃত্ব আর স্বাধীনতা—

ঐ যে গো বলা হয়—

অন্ন গ্রাস গ্রহণেও ক্ষমতা নেই, রান্না, বান্না হয়েছে, আসন,
জল, থালা, অন্ন ব্যঞ্জন, সব সামনে ধ’রে দিল । গ্রাস তুল্বে
এবার । এমন সময় হয়তো বাড়ীতে বিপদ বাধলো কিম্বা যে পরি-
বেশন করছে তারই সঙ্গে সামান্য কারণে কিছু বেধে গেল, হাতের গ্রাস
হাতে রইলো, মারুলে লাথি ‘গেল সব উন্টে’ । রাগে লাল হয়ে উঠে
পড়লো ;

কি ?—পারুল না কেন ?

এইতো 'কর্তৃত্ব'

তা হ'লে বোঝো, যে সব সময়েই তাঁর বশ্যতা চাই।

স্বাধীনতা—

বাবাজী ম'শায়

'আমার' স্বাধীনতা রেখো না 'আমার' ঠাই রেখো না বিপদে প'ড়বে।

স্বাধীনতা কোথায়? যখন তাঁতে মতি থাকবে স্বা (স্বা মানে মুখ্য তিনি, গৌণ এই দেহ) ধীন হ'য়েও তাঁরই অধীন তবে 'স্বাধীন'।

ভক্তি পথে প্রাথমিক পাঠ্য নির্বাচন—

দ্ব্যখ, সবাই ভগবানের কথা শুনছে, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত।—আরে, এতে তো তাঁর কথা আছে, আগে এ সব শুনে কি করবে? তাতে তো তাঁর কথা আছে, তোমার কথা কৈ? তুমি কোথায় যাবে? কেমন করে যাবে?

সেটা কোথায় আছে জান? 'ভক্ত' কথায়। ভক্তের কথা শোনো, প্রাপ্তির পথ বলা আছে, তোমার অবস্থা বলা আছে, তাতেই সব জানতে পারবে। ভক্ত ছাড়া তোমার অবস্থার কথা আর কে বলবে? আগে থেকে তাঁর অবস্থা জেনে কি করবে?

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে

ওগো! বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেও সব হয়। আশ্রম ধর্ম্মে আতিথেয়তার

মহৎ কৃপা লাভ হয় ; কোন মহাপুরুষ দোরে এসে হয়তো ফিরে
 গেলেন, তাতেও করুণা লাভ হয় । তাঁরা বলেন—

‘আ হা ! এরা ভুলে আছে’
 ব্যস্ ‘কার্য্য সিদ্ধি’ ।

দৃষ্টি

‘দৃষ্টি এলে বিচারের ঠাঁই থাকে না । যত প্যাঁচ ঐ ‘দৃষ্টি’ নিরে ।
 বস্তু ঠিকই থাকে,—যেমান দৃষ্টি তেমান প্রাপ্তি । দৃষ্টি হয় ভাবে ।
 কৃপা ক’রে কেউ সে ভাব দিলে তবে দৃষ্টি ফেরে । তখন দেখে বিচার
 কোথায় ? সবই ‘নিত্যানন্দময়’ ।

সাবধান বাণী

সব তো ‘স্বার্থ মিশ্রিত’ পরমার্থ, ‘বিশুদ্ধ পরমার্থ’ কৈ ?
 সে হোলে অল্পেই কাজ হয় ।

সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়

দেখ ! ছেটেবেলার একটি কবিতা মনে পড়ে—

সাধনের থাকিলেও বিভিন্ন পদ্ধতি ।
 সকল সাধকের এক ঈশ্বরের মতি ॥

শ্রীকবিরাজও বলছেন না ?

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ।
 কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার ॥

আর তাইতো তার নাম 'বিশ্বন্তর' 'বিশ্বরূপ'। তোমার ভাল না লাগে তো কি করবে? কিন্তু, বাদ দেবে কেন?

'বিরাটের' 'বিশ্বরূপের' কোনোটি বাদ দিয়ে কি 'বিরাট' হয়? না 'বিশ্বরূপ' হয়? সব নিয়েই তবে তো! না কি বল? সবেতেই সর্ব শক্তি আছে না? ঐ যে বলেছেন—

'সর্ব শক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ'

তবে?—

বিচার ক'রে 'গ্রহণ' 'বর্জন' দৃষ্টি' তো দুর্দেবেই হয়।

বৈষ্ণবের দৃষ্টি

দেখ! কেদার দত্ত ম'শায় (ভক্তি বিনোদ) 'কল্যাণ কল্পতরু' লিখেছেন, তাতে বেশ বলেছেন—

ঐ যে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা আছে না

“কবে এ সংসার বামে ঠেলে যাব”

তাতে তিনি কি বলেছেন, জান?

তুমি সংসার ঠেলবে কি রকম? ও কথায় ভক্তি পথে আঘাত লাগে।

“আমায় অযোগ্য জেনে সংসারই ঠেলে ফেলবে”

বেশ কথাটি নয়! মীরার ভজনেও তো ওই কথা.....

আসক্তি

বাবাজী ম'শায়! যা'র যা'তে আসক্তি হয়, তাতে তা'র একটা চেহারার ছাপ পড়ে, চেহারা দেখলেই সেটা নজরে পড়ে। বস্তুর বিকার বস্তুতেই থাকে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : আচ্ছা, বাবা ! বস্তু যদি পরিষ্কার থাকে তবেই না, তার ওপর ছাপ পড়ে ; সেটা সরিয়ে নিলেই ছায়াও যায় । মলিন হ'লে ছায়া পড়ে না, পড়লেও স্থায়ী হয় না । আমরা যখন পরিষ্কার নই তখন আর আমাদের ছুঁর্ভাবনা কি ?

বাবাজী ম'শায় শুনে হাসলেন । বেশ সহজ সুরেই বললেন-নাগো না, স্বচ্ছ বস্তুতেই নয়, যা' দেখবে, যা শুনবে, যা করবে—সবেতেই ছায়া পড়ে ; স্বচ্ছ হ'লে লোকের নজরে পড়ে, আর মলিন হলে (আর) নজরে পড়েনা ; কিন্তু ছাপতো পড়েই !

তোমরা বল 'আদর্শ চরিত্র' । আদর্শ মানে আয়না । আয়নার সামনে দাঁড়ালে খুটিনাটি সব দাগ ধরা পড়ে । আয়নার কাছ থেকে সরে গেলে আর মনেই থাকে না ।

আর, ফটো তোলার আয়নায় সব ধরা থাকে, তাতেই সব আটকে যায় ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা : বিষয়ের ছাপ্ থাকে কিসে ?

বাবা ! কেন ? দেহে, মনে । ভাবনার ছাপ্ মনে আর আহার ব্যাবহার দেখা শোনার ছাপ্ দেহে । কিছুই যাবার নয় ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : এ ছাপ্ ধরে রাখে কে ?

বাবা : 'সংস্কার' ও 'আসক্তি'

অনাদি কালের বাসনা ; লোভ এলেই সংযোগ ।

এ রাজ্যে 'ও রাজ্যে ছুই সমান :—

এ রাজ্যে 'মালিন্য' আর 'বন্ধন'

ও রাজ্যে 'মাজ্জন' আর 'মজ্জন'

কবিরাজের কথা তো তাই—

‘চিত্ত দর্পণ মার্জ্জন করে’

ওদের সব আচরণ দেখ্ছ না কেমন? যেখানে ‘উদ্দীপনা’ সেখানেই আলিঙ্গন; যে খানে ‘মালিন্য’ সেইখানেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ হোলো আচরণের কথা।

‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা’ : বাবা! আপনি যে বলেন দেহেও ছাপ্ থাকে, সেটা কি রকম?

বাবা : দেহের ছাপ্ আহারে। অশুদ্ধ আহার দেহে গিয়ে গোটা-টাই বদলে গেল। সে রক্ত যত কাল দেহে থাকে, তত দিন দেহের বিকার। সে বিকার কি এক দিনে যায়?

সে রক্তের দোষ পাল্টাতে দেবী হয়। এক এক রসে এক এক বিকার—

‘মলিন শরীরে না! হয় কৃষ্ণের ভজন’

‘প্রসাদ’ ‘চরণামৃত’ খেতে খেতে ও ধাত্ যায়। তা’ ছাড়াও, থেকে যায় মাতৃ পিতৃ স্মৃতি।

সাধু-সঙ্গ ও বিশ্বাস

পটভূমিকা :

[একটি বড় প্রোসেশন যাচ্ছে—বাবা নিবিষ্টের মত দেখছেন আর বৃহস্পতি হাসছেন। তাদের কোলাহল আর পথচারীর ভীড়, সেখানটায়

বেশ জমে উঠেছে।

হঠাৎ বাবা বললেন—‘এরা কিসের আকর্ষণে শোভাযাত্রা করছে? ‘পরের উপকার’ না ‘প্রতিষ্ঠা’?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা : ‘ছইই’

বাবা : মূলে কি? (পরে) হেসে বললেন—

‘দেহাত্মাভিমান’—সকল বন্ধনের একমাত্র কারণ।
যেখানে ‘দেহাত্মাভিমান’ নেই, সেইখানেই ‘সাধু-সঙ্গ’।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা : বুঝবো কি করে?

বাবা : ‘বিশ্বাস মহাশয়ের’ সাক্ষাৎ হলেই বোঝা যাবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা : কথায় বিশ্বাস না বিশ্বাস বলে কোন বস্তু আছে?

বাবা : বিশ্বাস একটা অবস্থা!

প্রসঙ্গান্তরে—

‘বিশ্বাস মহাশয়ের দেখা মিললে কিছুই আটকায় না। আমাদের কেবল ওঁর সঙ্গে আলাপ হোলো না।’

ওগো সবই আছে সবই থাকবে—‘হরিনাম’ ‘মুক্তি’ ‘প্রসাদ’।
কিন্তু অবিশ্বাসেই সব ফাঁক।

শ্রীশ্রীরামদাস কথামৃত

১৯৫৫ সাল জ্যৈষ্ঠ মাস পোস্তার রাজবাড়ী
কলিকাতা । সকাল ৭টা

সিদ্ধ প্রসঙ্গ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : সিদ্ধপুরুষরাও সাধারণ লোকের মত লোভ কামনা
ও ক্রোধের বশ হ'য়েছেন শুনেছি, এটা কি রকম ?

বাবাজী ম'শায় : তোমাদের কবিরাজিতে সিদ্ধ মকরধ্বজের
কথা আছে । কিন্তু তাই ব'লে কি তা দিয়ে প্রলেপ দাও
না পাচন কর ? যিনি যে কর্মে সিদ্ধ তাতেই তাঁর কাজ, আর
যিনি যে 'ভাবে' সিদ্ধ সেই 'ভাবেই' তাঁর প্রাপ্তি । অনন্ত ভাব
অনন্ত কর্ম ।

তোমরা মনে কর সিদ্ধ-পুরুষ মানে 'সব ভাবে 'সব
কাজেই' তিনি সিদ্ধ, তা হয় না । জীব যে তিনি । কেউ
পথ চলায় সিদ্ধ কেউ লেখা পড়ায় সিদ্ধ, কেউ বা মোট বওয়ার
সিদ্ধ । তাঁর কাছে অন্যটি খুঁজতে গেলেই বিড়ম্বনায় প'ড়বে ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! অনেক সিদ্ধ-পুরুষ অধর্মের কাজ করেন
এও তো শুনেছি !

বাবাজী ম'শায় : ভগবৎ সম্পর্ক শূন্য কাজে আর ভাবে সিদ্ধ হ'লে
ধার্মিক হবেনই তিনি, এমন মনে কর কেন ? শ্মশানে ব'সে
অনেকে ভূতপ্রেত সিদ্ধ হন, তাঁদের কাছে ধর্মের কি পাবে ?

সকল ধর্মের মূল শ্রীভগবান। তাঁর ভাবে তাঁর কাজে যিনি সিদ্ধ হবেন, তাঁর কাছে যেও তা'হলে আর ওসব বলা আসবে না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বাবা! লোকে বলে এটি হোল সিদ্ধ-পুরুষের কথা, তা কথা তো কথাই, তাতে আবার সিদ্ধ-পুরুষের কি আছে?

বাবাজী ম'শায় : তোমরা যখন পড়াশুনা কর, তখন একটা আলোর দরকার হয়, তা সে সূর্যের আলোই হোক আর না হয় তেলের আলো, কিন্তু আলো চাই। অন্ধকারে কি দেখতে পাও? সাধুদের পড়াশুনাতেও আলো লাগে, সে আলো তাঁর আলো। যাতে তাঁর আলো পড়েনা তাকে তাঁরা বলে অন্ধকার, তখন কোনও কথা তাঁরা প'ড়তেও পারেন না আর কাউকে সে কথা ব'লতেও পারেন না। সেই জন্মেই সাধারণের কথা আর সিদ্ধপুরুষের কথায় তফাৎ থাকে। তাঁদের আচরণও আলাদা, অন্তরে যখন তাঁদের প্রেরণা আসে, তখন তাঁরা শ্রীভগবানের পেছনে থেকে কাজ করে যান। তাঁদের চলাফেরা কথা কওয়া দেখা শোনা সবতেই তাঁর আলো না এলে তাঁরা অন্ধের মত বোবা-কালার মত থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বাবা! সিদ্ধ-পুরুষেরা অনেক সময় নিজেকে গোপন করে রাখেন, চিন্তা কেমন ক'রে?

বাবাজী ম'শায় : চাখো কৃপণ ধনী দেখেছ? এই এত টুকুছোট কাপড় পরেন, জলছড়া দিয়ে রান্না করিয়ে খান, লোকের কাছে দীন দরিদ্রের মত থাকেন, কথায় কথায় নিজেকে সামান্য মানুষ ব'লে পরিচয় দেন, কিন্তু লোকে তাঁকে ধ'রে ফেলে; লোকে জানতে পারে ইনি মস্ত ধনী। তাঁর শরীরে মনে এমন একটা লাবণ্য বের হয় যাতে লোকে সহজেই জানতে পারে ইনি ধনী। তা হোলে বোঝে, প্রাকৃত সম্পদ পেয়েও যদি তাকে

গোপন ক'ৰতে না পাৰে তাহ'লে অপ্ৰাকৃত পৰমার্থ সম্পদ
পেলে কেউ গোপন ক'ৰতে পাৰে কি ? তাঁৰ সব সময় 'ধৈৰ্য্য'
'বিনয়' 'মিত্ৰতা', 'কৰুণা' এগুলি আপনি আপনি প্ৰকাশ হ'য়ে
পড়ে। ও গুলি যে তাঁৰ জিনিষ, কুপা ক'ৰে তিনি তাঁকে
দিয়েছেন। গোপন কৰা যাবে না তো।

শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! এমন সব কথা শুনেছি যে মনে হয়, যেন
সাধু মহাপুৰুষৰা কথাৰ ঠিক রাখতে পাৰেন না। কাউকে
বল্লেন অনুক সময় তোমাৰ ওখানে যাব, কিন্তু ঠিক সময়ে
যতে পাৰলেন না, কিম্বা গেলেনই না, তাতে কি মনে কৰা
চলে সাধুৰা বেভুল হন ?

বাবাজী ম'শাই : (হাসিতে হাসিতে) ও কথা ব'ল্লে তাঁৰ ওপৰ দোষ
দৃষ্টি কৰা হয়, অমন ভাবতে নাই। সাধুদেৰ জীবন শ্ৰীভগ-
বানে অপিত। কাউকে কথা দেবার আগে ওঁৰা ওপৰ থেকে
প্ৰেৰণা পেয়েই তবে কথা দেন, তা হ'লে বেভুল হবেন কেন ?
তিনিই তো তাঁকে নিয়ে যাবেন, তাঁৰ ছটি ঐশ্বৰ্য্যেৰ মধ্যে
একটি ঐশ্বৰ্য্য হোলো "সমগ্ৰ বীৰ্যশক্তি"। তা হোলোই বোঝো
বীৰ্যবান না হ'লে মেধাবী হয় না। এৰাজ্যেৰ (সাধন
ৰাজ্যেৰ) গোড়ার ভিৎ হোলো ব্ৰহ্মচৰ্য। ওটি তাঁৰ ঐশ্বৰ্য্য ;
যিনি সে ঐশ্বৰ্যে ধনী তিনি বেভুল হবেন কেন ?

সাধন প্ৰসঙ্গ

শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! সাধন ভজন কৰবার সময় रिपुগুলিৰ তাড়না
কি বাড়ে ? শুনেছি সে তাড়নায় অনেকে ভ্ৰষ্ট হ'য়ে যান।

বাবাজীম'শায় : ছটি রিপূর কোনটি কম কোনটি বেশী নয় সব কটিই সমান । ওদের উৎপাতে ভিৎ আর ইমারত (দেহ মন কৰ্ম ইত্যাদি) সবই ঝাঁঝরা হয় । ওবে গোড়ারটিতে ভিৎ ঘায়, তাই অত সাবধান হওয়ার কথা । বাকীগুলিতে দেওয়াল কাঠাম সব নষ্ট হয় ।

মনে কর তুমি যে বাড়ীতে আছ সে বাড়ীতে যদি তোমার আপন জন কি গুরুজন বন্ধু বান্ধব কি চাকর বাকর কেউ আসেন তুমি কি ক'রবে ? সে যেমন লোক তার জন্তে তোমার ঘরটিতে তেমনি থাকার ব্যবস্থা করবে তো ? কারও জন্তে সাদা সিদে, কারও জন্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ! তারপর তিনি এসে কি তোমার ঘরে উপদ্রব ক'রবেন ? যদি করেন, তা হ'লে কি ভাববে ? নিশ্চয় ইনি তিনি নন অন্য কেউ এসেছেন ! তেমনি তোমার এই দেহ মনের ভেতরে যিনি আসবেন তাঁর থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা আগে কর ।

তিনি কল্যাণময়, সব সময় কল্যাণ ক'রছেন, 'নাম' করলে কি তিনি এসে উপদ্রব ক'রবেন ? কখনই নয় । 'নাম' 'নামী' যে অভিন্ন, তাঁকে এ ঘরে রাখতে হ'লে, তেমনি পরিষ্কার, পবিত্র রাখ, তবেতো ।

'প্রসাদ' 'চরণামৃত খাও, 'সাধুসঙ্গে সৎ প্রসঙ্গে থাক' নাম কর । কিসের তোমার রিপূর তাড়না ? তবুও যদি তাড়না দেখ তবে জানবে তাঁকে আননি, তাঁর বদলে অভিমান গৌরব, প্রতিষ্ঠা, লাভ, পূজা এঁরা এসেছেন, ওঁদের স্বভাব ওঁর ক'রছেন । শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হও, অকপটে তাঁকে জানাও সব ঠিক হ'য়ে যাবে । যদি বল রিপুগুলির স্বভাবই হোলো তারা সহিতে পারে না উপদ্রব করে, কিন্তু তার

আগমনে “শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পলাবে সব” .
শরণাগতবৎসল প্রভু ‘নাম’ রূপে আসার সঙ্গে সঙ্গে করুণা
মেঘের বর্ষণে সব শান্ত হ’য়ে যায় ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা’ : বাবা ! সাধনার জন্মে কি একটা নির্দিষ্ট ঘর, বিশেষ
আসন, বিশেষ নিয়ম করা একটা সময়ের দরকার হয় ?

বাবাজী ম’শায় : তোমাদের ব্যবহার রাজ্যেওই কথাই বটে। চিকিৎসক
বৈজ্ঞানিক এঁদেরও তাই, তবে কথা কি জান ; এবার প্রভুর
বড় করুণা । “খাইতে শুইতে নাম যথা তথা লয় । দেশ
দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব সিদ্ধি হয়” মহৎ কৃপা হ’লে সর্বত্রই
তাদের ঠাই, সব কালই তাঁদের কাল । তবে যে দেখ ওটি
আফ্রিকের ঘর, ওটি পূজা অর্চার ঘর, এ হোলো ব্যবহার
রাজ্যের অভ্যাস । আর দেহ মনেও অনেকের লুকায় না,
একটু নির্জন নিঃসঙ্গ না হ’লে সামলান যায় না । কলির অন্তর্গত
মন-প্রাণ অল্পেতেই চঞ্চল হয় ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা’ : বাবা ! আপনি বলেন সংসঙ্গে থাকলে, আর প্রসাদ
চরণামৃত খেলে রিপূর বল কমে যায়, কিন্তু এমন অনেক
সময় হয় যে সে অবস্থাতেও শরীর বিকৃত হয়ে পড়ে তখন
উপায় কি ?

বাবাজী ম’শায় : ‘বন্ধু’ (শ্রীজগদ্বন্ধু) ব’লতো ! জপ ক’রতে ক’রতে স্নায়ু-
গুলি নিস্তেজ হয়ে থাকে একটু ফাঁক পেলেই তাদের প্রকোপবাড়ে
তখন সেখানে থেকে সরে গিয়ে বেশ ক’রে স্নান ক’রবি, যদি
না পারিস দৌড়বি, ক্লান্ত হলেই তারাও ক্লান্ত হবে । যার
শরীরে দৌড়ান সয়না সে বেড়াবে । ব্রজে থাকতে মাঝে
মাঝে ওমনি ক’রতে হোতো । যমুনায় ডুবে আসতুম ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! ওতে হোলো গোড়ার রিপূর কথা. বাকী-
গুলির কি ব্যবস্থা ?

বাবাজী ম'শায় : 'বন্ধু' ব'ল্‌তো আয়নায় মুখ দেখুবি, তা হোলোই
ক্রোধ সরে যাবে। লোভ এলে খুব তেতো রস খাবি। তখন
ছত্রিশগড়ের বাড়ীতে থাকি, দু'বেলা দু'গ্লাস শিউলি পাতার
রস খেয়েছি। মোহ এলে ঠাই নাড়া হবি। অহঙ্কার হ'লে
উপোস করবি, পরের উপর কটাক্ষ বুদ্ধি (মাৎসর্য) এলে
নিজের দোষ ভাববি। এ সব ছিল তার উপদেশ (শ্রীজগদ্বন্ধুর
উপদেশ)। 'ন' মাস ব্রজে থাকার সময় সে কাছে ছিল তিন
মাস। হাতে কলমে বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে নাম ক'রলে
এসবের অনুষ্ঠানের বিশেষ দরকার হয় না। শ্রীগুরুর
আনুগত্যে নাম ক'রতে হয়। অনেক ঝড়ঝাপটা তিনিই
সহ করেন রূপায় আসা কিনা তাঁর।

আনুগত্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! শ্রীগুরুর আনুগত্য আমরা মুখেই বলি' আর
কিছু লিখে শেষের পংক্তিতে লিখি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত অমুক।
সত্যি সত্যি কি সম্ভব ?

বাবাজী ম'শায় : ভাল মাটিতে বীজ পড়লে গাছ হয়, তারপর জল
বাতাসে ধীরে ধীরে সে গাছ বড় হয় ফুল ফল ধরে। এও
তেমনি, তাঁর দেওয়া বীজ শুদ্ধ ক্ষেত্রে প'ড়লে পরেই সব
আপনা আপনি হবেই, 'নাম' 'মন্ত্রের' কাজও তো সোজা নয়।
তিনিও চুপ্ ক'রে থাকবেন না। বটের বীজ কাকেই থাক
আর কেউ গিলেই ফেলুক্ হজম করবার নয়। একটু ফাটল

পেলেই হোলো, বীজের শক্তি দেখাবেই সে। তবে অল্প দিনেই গাছ আর ছায়া চাও তো তেমনি করে লাগাও, নইলে হবে বটে, কিন্তু দেরী হবে। আনুগত্য তো তাই। সব ছেড়ে ঝাঁপ দেওয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আনুগত্য লাভ তো অল্প ভাগ্যে হয় না, যদি হয় তবে আবার সেও চাপা পড়ে যায় অনেকের, কেন এমন হয় বাবা ?

বাবাজী ম'শায় : হ্যাঁ তাও হয়। স্বজাতি সঙ্গের অভাবে সেটা চাপা প'ড়ে যায়, (এখানে স্বজাতির অর্থ অনুকূল সঙ্গ) ওতে বড় অনিষ্ট ঘটে ; প্রতিকূল সঙ্গের তুফান খুব জোরে যখন আসে তখন তার ভেতর কি আছে নজরে ঠেকে না, কিন্তু দুদিন পরে জোয়ার চ'লে গেলেই দেখে মাঠে প'ড়ে অছি। এও তেমনি, হঠাৎ একটি সঙ্গ লাভ হোলো আর তার আকর্ষণ এসে নিজের সামান্য কিছুও যা ছিল সব চাপা প'ড়ে গেল, শেষটায় 'হা হুতাশ'।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' ! বাবা ! এমন তো হয় যে জ্ঞানত প্রতিকূল সঙ্গ করিনা কিন্তু ধীরে ধীরে প্রথমকার মনের অবস্থা আর থাকে না, এ কেন হয় ?

বাবাজী ম'শায় : তোমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে বোধ হয় যে, আহার গা ছোঁয়া, নিঃশ্বাস, অপরের কাপড় চোপড় পরা, অন্তরসঙ্গে বসে গল্প, এসবের ভেতর দিয়ে তার মনোভাব গুলি ধীরে ধীরে তোমার মনে প্রভাব আনে। তারপর তার মনোভাব যত বেশী হবে তুমিও তার ভাবে ডুবে যাবে, শেষটায় লাভে মূলে সব যায়। এমন কথাও আছে, যে কাছে বসে দূরে থাক্

চোখে চোখেও মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। খুব সাবধান :
কিন্তু কবিরাজ ব'লেছেন (শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ)—

‘নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ বিনা না জুয়ায় ।’

সঙ্গ চাই বই কি, নইলে ইষ্টবস্তুর মার্জ্জন মনন হবে কি ক'রে
কিন্তু আপন মরমী জনের সঙ্গ চাই। গোস্বামীরা শ্রীকৃষ্ণের
তীরে ব'সে ইষ্ট গোষ্ঠী ক'রতেন। ওঁদের মনে যখন যা ভাব
আসতো এক জায়গায় ব'সে সেগুলি প্রকাশ ক'রতেন,
আবার সেইগুলিকে মার্জ্জনা ক'রতেন, এক অনুভূতির সঙ্গে
মিল হ'য়ে গেলেই সেইটি তাঁদের সিদ্ধান্ত হতো। তারপর
স্মরণ মনন ক'রতেন। সঙ্গ চাই, কিন্তু ওই তার ধারা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! অনুকূল সঙ্গে থাকলে কি আনুগত্যের
পথে আর বাধা আসেই না ?

বাবাজী ম'শায় : হ্যাঁ তাতেও আসে। সঙ্গে যিনি আছেন ‘অভিমান’
তাঁর উপদ্রব বডেডা। তিনি এসে ঘাড়ে চাপলে আর কথাই
নাই, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ‘সাধুসঙ্গ’ ‘প্রভুর আনুগত্য’
সব ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় হাজির করে। সাথে কি তাঁদের
দৃষ্টি ‘তৃণাদপি’। এ ‘অভিমান’ এমন বিষম ভূত যে, গুরু শিষ্য
ব'লে কোন কথা নেই। পথ ঘোরাল করে দেয়। গুরুর
আসনে ব'সে শিষ্যকে শাসন ক'রতে গেলেও তৃণাদপি যাজ্ঞ
থাকে না। এ রাজ্যের বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টি। এ অভিমান এলেই
দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশ আসবে। তখন আসবে পরিণাম-
দর্শিতা তারপর ‘সুখ’ ‘দুখ’। শেষটায় সব চ্যুত। বোঝো তা
হ'লে। ইষ্ট সেবাই কর আর শ্রীগুরুচরণেই থাক ‘অভিমান’
এলেই সর্বনাশ। অভিমান এসেই আগে তোমায় “আমি”
বুদ্ধি আনিয়ে দেবে, তারপর প্রভুর বাইরের দ্বারে ঐ যে

দাঁড়িয়ে আছেন মায়াদেবী, তাঁর কবলে প'ড়তে হবে। সে কবলে গেলেই তাঁর বৈভব দেখে সব ভুল হ'য়ে যাবে; শেষটায় ভ্রমণ। আবার কোন কালে যদি মহতের কৃপা হয়; তবে, তাও প্রভুর ইচ্ছায়। অনুকূল সঙ্গে থেকেও রেহাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! এ'র অনুকূল সঙ্গ লাভ হ'য়েছে এমনটি কি ক'রে বুঝবো ?

বাবাজী ম'শায় : তাঁর স্বভাব হবে সবাই যোগ্যআমিই কেবল অযোগ্য সবারই জন্ম প্রভু মুক্তদ্বার করে দিয়েছেন আমারই জন্মে সংসারের যত বিধি নিষেধ। এইটি যাঁতে দেখবে তিনিই তোমার অনুকূল সঙ্গ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা : এমন অনুকূল সঙ্গ পাব কি ক'রে ?

বাবাজী ম'শায় : সেখানে হুম্ড়ি খেয়ে প'ড়লেই তিনিই অনুকূল সঙ্গ জুটিয়ে দেবেন। যাঁরা তাঁর লীলা, তার গুণ গেয়ে কাটান, গ্রাম্য প্রশ্ন স্বপ্নেও করেন না তাঁদের সঙ্গ লাভ কি অল্প ভাগ্যে হয়, তাঁর কাছে জানাও তিনিই এনে দেবেন সঙ্গ। (হাসিতে হাসিতে) এখনকার ভাষা সত্যাগ্রহ। তেমনি করে-খাঁটি-আগ্রহ জানাও, 'প্রভু আমার বিরুদ্ধ ভাবটি বদলে দাও। আমার আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার পরীক্ষা আর কোরোনা'। নিশ্চয় তিনি অনুকূল সঙ্গ এনে দেবেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আমার অনুকূল সঙ্গ লাভ হ'চ্ছে এমনটি বুঝব কি ক'রে ?

বাবাজী ম'শায় : জীবনের ধারাটিই তোমার বদলে যাবে। কি ছিলে

কি করুছিলে আর এখন কি ঘটচে এটি মনে পড়বে। সঙ্গ লাভ বড় কঠিন। এক সময় চারু গিছিলো সচ্চিদানন্দস্বামীর কাছে তিনি ব'লেছিলেন 'কার সঙ্গ কর'। সে ব'লে আজ্ঞে বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গলাভ করি। তিনি তো তখুনি গড়গড় ক'রে জিগ্যেস ক'রলেন, কি বল্লে ? বাবাজী মহাশয়ের ? ঠিক তো ? চারু তো ভয়ে জড়সড় হ'য়ে বল্লে, 'আজ্ঞে না, সঙ্গ করি না, তবে তাঁর কাছে যাতায়াত করি।' স্বামীজী ব'ল্লেন হ্যাঁ তাই বল যে, যাতায়াত করি। সঙ্গ হয় না। সাধু সঙ্গ তো (লাভ) এত সোজা নয়। জীবনের চলতি ধারাটি একেবারে বদলে যাবে !

সাধন ও সম্পদ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! শাস্ত্র বলেন শ্রীহরি ভজনে দু'টি পথ একটি বিধির একটি অনুরাগের। এর উদ্দেশ্য কি ?

বাবাজী ম'শায় : 'বিধি' হোলো নিজের জন্মে আর অনুরাগ হোলো তাঁর সুখের জন্মে। দেহে ষাঁরা আছেন (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) তাঁদের কাছে তো নিজেকে সমর্পণ করেছো অনেকদিন, তাদিকে বশে না আনতে পারলে তাঁর সুখ বুঝবে কি ক'রে ? তাই ও'দিকে (ইন্দ্রিয় গুলিকে) তাঁর সেবার পথে আনবার জন্মে (ইন্দ্রিয় দমনের জন্মে) ওই পথ (বিধির পথ) ওটি হোয়ে গেলে আর দেহের দিকে খেয়ালই থাকবে না। তবে কোন ভাগ্য ফলে যদি ওটি এসে প'ড়ে (ভগবদ্ অনুরাগ)

তা হ'লে তাঁকে আর কিছু ভাবতেই হবে না। কোটিতে গুটিক হয়। তাই তাঁরা ব'লেছেন আগে বিধির পথই দরকার। নইলে এত দিন যে ওঁরা দেহে বাস ক'রছেন, তাঁরা নানা রকমে বাধা সৃষ্টি করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! বৈষ্ণবের সাধন রাজ্যে চৌষটি প্রকার অপরাধের কথা আছে ! এসব বাঁচিয়ে চলা কি সোজা ? এষেন ব্যাকরণ শাস্ত্র, একটু এদিক ওদিক হোলেই ব্যাকরণ ভুল, আর তার পরই তাকে বলে অপণ্ডিত। তাই বলছিলাম

—সাধন সম্পত্তি রক্ষার উপায় কি ?

বারাজী ম'শায় : ওতো হোলো পরের কথা। আগে ছ'টি শত্রুর কাছ থেকে রক্ষা করতে হবে, একটি ঘরে, একটি বাইরে। ঘরেরটি হ'লেন 'অভিমান'। ইনি বিষম চিঙ্গ, আমি 'নাম' করি। আমি 'পণ্ডিত'। আমার শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে অনেকে স্তম্ভী হন। এ হোলো ঘরের শত্রুর ভাষা, 'প্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দেয়'। তারপর হোলো বাইরের শত্রু। অসাধু হয়ে সাধুর বেশ ধরে আসেন। ঠাকুর মশাই ব'লেছেন—“এ ভাই বড়ই বিষম কলিকাল ! গরলে কলস ভরি মুখে তার ছুঁক পুরি তৈছে দেখ সকলি বিটাল। “ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে, গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ”।

—এর কাছে রেহাই পাওয়া বড় শক্ত। বড় বড় মহাপুরুষও এঁদের পাল্লায় পড়ে না জেহাল হন। সাধুবেশী অসাধুর সঙ্গে পড়লে ভয়ানক ক্ষতি। মহাবীর (হনুমান) দেখলেন প্রভুষুগলকে রক্ষা করার ভার তাঁর ওপর দিয়েছেন। তিনি ল্যাজের কুণ্ডলী পাকিয়ে গড় তৈরী ক'রে তার মধ্যে তাঁদিকে (রাম লক্ষণকে) রাখলেন, আর নিজে পাহারা দিতে

লাগিলেন। সর্বদাই সাবধান হ'য়ে আছেন, কখন কোন্ ছলে মহীরাবণ এসে পড়ে। এদিকে মহীরাবণ তো নানা পথ খুঁজছেন কখনও আসছেন কৌশল্যার বেশ ধ'রে ; কখনও আসছেন দশরথের বেশ ধ'রে, কখনও বা ভরতের, কখনও বা জনক রাজার, কিন্তু মহাবীর কেবলই জোড়হাত ক'রে তাঁদের কাছে জানাচ্ছেন,—আপনি অপেক্ষা করুন এক্ষুণি মহারাজ বিভীষণ আসবেন, এলেই দরজা ছেড়ে দোবো।

মহীরাবণ দেখলেন হনুমানকে তো কিছুতেই ভোলান যাচ্ছেনা। তখন ভাবলেন কি করা যায়। তাঁর মনে প'ড়ে গেল, হনুমান কেবলই বলছেন “বিভীষণ” এলেই দরজা ছেড়ে দোবো, আচ্ছা বিভীষণের রূপ ধ'রে যাই একবার। তাই ক'রলেন, একটু পরেই বিভীষণের রূপ ধ'রে এলেন। হনুমান তো তাঁকে দেখে একটু বিস্মিত হলেন। ইনি খাঁটি খাঁটি বিভীষণ বটেন তো? কিন্তু তাঁর আর পরীক্ষা করার অবসরই হোলো না, সেই বিভীষণরূপী মহীরাবণ এসেই বললেন, মহাবীর! দরজা দাও; একবার রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে একটা কথা ব'লে আসি, তাঁরা যেন সাবধানে থাকেন; আমার বেশ ধ'রে মহীরাবণও আসতে পারে। তাঁদের শিরে আমি রক্ষা কবচ বেঁধে দিয়ে আসি।

হনুমান আর ঠিক ক'রতে পারলেন না, ‘মায়াবীর’ কথায় ভুলে গেলেন, দিলেন দরজা ছেড়ে। মহীরাবণ তখন টুক ক'রে ভেতরে ঢুকেই রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে পাতালে প্রবেশ ক'রলেন। তাঁরা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন।

দেখলে তো? মায়াবীর ছল, শেষে যখন কিছুতেই পারে না, তখন ভক্তের বেশ ধ'রে আসে, ভক্তের মত কথা কয়, ভক্তের মত ব্যবহার করে। এ রাজ্যে ওই

হোলো! বাইরের শত্রু, ওদের সঙ্গ থেকে রেহাই পেতে হোলো
সর্বদা 'নামের বেড়া' দিয়ে গড় প্রস্তুত ক'রে রাখতে হয়।
আর তাঁকে জাগিয়ে রাখতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' বাবা! হনুমান তো ভুলে গেলেন, তিনি জীব, তাঁর
পক্ষে হয়তো কপট মায়া বোঝা সম্ভব হয়নি, কিন্তু রাম লক্ষ্মণ
তো ভগবান্ তাঁরা জানতে পারলেন না কেন?

বাবাজী ম'শায় : ঐ যে কথা তাছে তাঁরা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন।
'নরলীলা' কিনা? সবই মানুষের মত, জেগে থাকলে তো
হোতো না।—

দেখ্ছো না কৃষ্ণ বলরাম তো বৃন্দাবনে খেলা কর্ছিলেন, আর
সেই সময় এক অশুর এলো সেখানে, ব্রজের বালকের রূপ
ধ'রে। ঠিক ব্রজবাসী বালক। ছ'পক্ষে খেলা হ'চ্ছিলো
তখন (ভাণ্ডীর বটের কাছে)। বালকবেশী অশুরটি
গিয়ে ব'ল্লে—যে হেরে যাবে সে কাঁধে নিয়ে ঐ বটতলা পর্য্যন্ত
যাবে। তাতে কৃষ্ণ বলরাম রাজী হোলেন। অশুরটি তো
ইচ্ছে করেই হেরে গেল। ওমনি কৃষ্ণকে কাঁধে নিয়ে দে ছুট,
যখন বটতলা পেরিয়ে যাচ্ছে, তখনই তিনি বিশ্বস্তর
মুক্তিতে তাকে শেষ করলেন। ঠিক নরলীলা। ওই জন্মে
তো কথা, নামের বেড়া দাঁড় আর নামীকে জাগিয়ে
রাখ। নইলে তোমার চিত্ত থেকে নামীকে নিয়ে
মায়াবী পালিয়ে যাবে। ভক্তের বেশ ধ'রে এসে মায়াবীরা
কত কথাই বলে, এ করতে হবে, তা ক'রতে হবে, কিন্তু কোন
দিকে নজর দিলে হবে না, নামের গড়ে নামীকে জাগিয়ে
রাখ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি ব'ল্লেন ঘরের শত্রু অভিমান,—

তার জন্ম কি ক'রে হয় বাবা ?

বাবাজী ম'শায় : (হাসিতে হাসিতে) উনি হ'লেন রক্তবীজের বংশ ।
ওঁর মা বাবার দরকার হয় সা । নানা রকমে ওঁর উৎপত্তি ।
অনেক টাকা থাকলে ওঁর জন্ম হয়, আবার অনেক বেশী বিদ্যা
থাকলেও অভিমানের আগমন হয় । এসব অভিমান তো
কালে কালে সরে পড়েন কিন্তু আরও যাঁরা আছেন তাঁরা বড়
সাংঘাতিক । ধন দৌলত বিদ্যাবুদ্ধির রূপের সঙ্গে তাঁদের
রূপ ঠিক উল্টো । এঁদের হাত থেকে এড়ান বিষম ঠেলা ;
যাঁদের ধনদৌলত নেই, তাদের মনের অভিমান বড় লোকেরা
নিশ্চয় আমাদিগকে ঘৃণা করেন । আবার যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি
কম, তাঁরা ভাবেন বিদ্বানরা আমাদিগকে মুক্খু ব'লে অগ্রাহ্য
করে । যারা ঘোর সংসারী তারা ভাবে বৈরাগী সাধুবা
আমাদিগকে ঘৃণা করেন । এসব হোলো গূঢ় অভিমান.
তারপর আছে অন্তগূঢ় অভিমান. তাঁকে এঁরা
(বৈষ্ণবগণ) বলেন 'বৈষ্ণবী মায়া' । তিনি এলে
বেঁধে মার । আমি গুরুর আসনে ব'সে আছি, আমাকে
গুরুদেব মহন্ত ক'রে রেখে গেছেন, আমাকেই তিনি এসব
দিয়ে গেছেন । এসব রক্ষা না ক'রলে কে ক'রবে, ওরা সব
তাঁর ইচ্ছা ঠিক ঠিক পালন ক'রছে না. আমার আচরণই
তাঁর অভিমত, এসব হোলো বৈষ্ণবী মায়া । ঘরের শত্রু
অভিমান, এর সঙ্গে মিশলে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তার
কি ঠিক আছে ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : 'বাবা ! শ্রীগুরুর কৃপায় কি এ অভিমান যায় না ?

বাবাজী ম'শায় : তাতে আর সন্দেহ কি ? ও গুলি আমার ঘুচুক ব'লে

তাঁর শরণাপন্ন না হ'লে তিনি কৃপা ক'রলেও হৃদয়ে ব'সবে না। পতিত পাবনের ওপরও তো ভরসা নাই, বাইরে কেবল মুখের কথায় পতিত ব'লে জানালে কি হবে? পতিতের স্বভাব না এলে পতিত পাবন কি ক'রবেন। একটি গান মনে পড়লো—

‘পতিত পাবন নাম শুনেছ মন ; তাতে তোমার ভরসা কিসে
তুমি যে মন অভিমানের মঞ্চেপরি আছ ব'সে ॥

মুখে পতিত সবাই বলে, কু-রঙ্গে মাতিয়া চলে,
মুখের কথায় কি জগৎ ভোলে,

(তিনি করুণা করেন না কপট বেশে ।

মুখে গৌর তোমার হলাম,

স্বমুখে বিষয়ের গোলাম,

সাধু সেজে লোক ঠকালাম,

সবার মজুরী তার নয়নে ভাসে ॥

কিশোর কয় ছাড় কপটতা,

পতিত বলা তোমার মিছে কথা,

সাধু গুরুর পদে বিকিয়ে মাথা,

পড়ে থাক, যদি তর্বি শেষে ॥

তিনি তো জানতে পারছেন এ পতিত কি না ! ওই যে ব্রজ-
বালক বেশী অশুরের কথা। আরে তুই তো এলি ব্রজের বালকের
বেশে, কিন্তু তোর অন্তরে যে অশুর বসে আছে। তার কাছে
লুকুবি কি ক'রে? অভিমানী কি দয়ার পাত্র হয়? সে তখন
নিগ্রহের পাত্র। তোমরা অমনি চেষ্টাবে এত ভজন সাধন
করলুম কিন্তু তাঁর দয়া আর হোলো না। সে কি গো? তাঁর

‘দয়া হোলো না কি কথা ? কাকে তবে দয়া করবেন তিনি অশুরকে দয়া ক’রলে যে অশুরটিই বাড়বে ! তাই অশুরের পতন হয় । সাপকে দুধ খাওয়ালে যে তার বিষকেই বাড়ান হয় । তোমার ভেতর যিনি আছেন তিনি কে, তাই দেখে আগে ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা’ : বাবা ! মহাপুরুষরা দয়া করলে কি সেই সাপের মত অশুরের মত দুর্বৃত্ত অভিমান কি মূহুর্তের মধ্যে দূর হয় না ?

বাবাজী ম’শায় : হয় না আবার ! হয় বৈ কি ! কিন্তু তিনি নিজের আট ঘাট বেঁধে করেন ।—

অশুরকে দয়া ক’রতে গিয়ে নিজের বিপদতো কম আসেনা, সে বিপদে যখন তিনি ভোগেন তখন প্রভুর কাছেও জানাবার আর পথ থাকেনা । প্রভু বলেন—কেন তুমি যে “আমি” অভিমানে ওকে দয়া ক’রতে গেলে এখন আবার আমায় ডাক কেন ? দয়ায় গোড়ার কথা কি ‘আমি’ অভিমান ? দয়ার গোড়ার কথা ভগবৎ স্মরণ ; প্রভুর কাছে প্রার্থনা, আমি অভিমান ক’রলেই দুজনের বিপদ । কাজ কি বাবা ! তাই সাধু মহাপুরুষরা কাউকে “আমি” অভিমানে দয়া করেন না : সবই তাঁর কাছে জানান দেওয়া মাত্র । দয়া করার ফলে কারুর বিপদ হয়, কারুর বা ব্যাধি হয়, কেউবা অসামাজিক কিছু ক’রে বসেন, পতনতো হাতের কাছেই আছে । এ হোলো সরকারী রাজ্য, থানার দারোগা থেকে পুলিশের কড় কড়া পর্যন্ত সকলেই অপরাধীকে ইচ্ছা করলে মুক্তি দিতে পারেন কিন্তু তাতে রাজ্যও থাকে না অপরাধীও শোধরায় না, তাই তাঁরা ওপর ওয়ালাকে জানান মাত্র । নিজে কড়া সেজে কিছু ক’রতে গেলেই ওপর ওয়ালার চাপ ।

সকলের ওপর যিনি তিনি সব পারেন. তবুও তাঁকে ভাবতে হয়, আর পাঁচজনের মুখ চেয়ে, তাঁকে নিরপেক্ষ হ'তে হবে। ব্যবহার রাজ্যের নমুনা দেখেই সাধন রাজ্যের হিসেব ঠিক ক'রতে হয়।

স্বতন্ত্রতার আরও রূপ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ওপর লোকে একটি কটাক্ষ ক'রে বলে যে বৈষ্ণবগণ কন্সী জ্ঞানীদিগকে বড় পৃথক পৃথক ভাবে দেখেন।

বাবাজী ম'শায় : হ্যাঁ, ভেতরের কথাটি তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয় না বলেই একটু গোলমালে পড়ে যান। পাখীর ছানা দেখেছ ? তারা যখন খুব কচি, ডানা পালক ওঠেই নি হয়তো, তাদিকে বাসায় রেখে তাদের মা ভোরে উঠে আহার খুজতে খুব দূরে চলে যায় ; বাচ্চাটি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জেগে উঠে মাকে দেখতে না পেয়ে খোজে কিচি মিচি করে চেষ্টায়, শেষটায় খিদে পায়, তখন মা মা ক'রে খুব ডাকে, ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জাগে, তারপর প্রাণপণে আবার ডাকে। দিনের শেষে মা আসে অমনি আকুলি বিকুলি ক'রে মায়ের মুখের কাছে ঠোঁট নেড়ে কত অভিমান জানায়। এই যে এমনি করে মাকে ডাকা সে কি সত্যি সত্যি মাকে ডাকা ? না তা নয়, আমি অসহায়. মা তুমি এস, আমার খিদে পেয়েছে, ফড়িং টড়িং কি আছে দাও।

ব্যস্ ! যেই পোকা মাকড় পাওয়া অমনি চূপ্ । বুঝলে তো !
এই হোলো কন্য়ার ভগবান ডাকা । যেই ফল প্রাপ্তি
অমনি চূপ্ । আর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই ।

আর জ্ঞানীর হোলো 'বাছুরের ডাক' । ঘরে বাছুর রেখে
মা চলে গেছে । বাছুরতো সারাদিন হাসা হাসা করে ডাকছে
মুখে খড় কুটোও দেয় না । মা হয়তো ছেলের ডাক শুনে
একবার চলে এসেছে, ওমনি মাথা ল্যাজ নেড়ে ফোঁফাতে
ফোঁফাতে মায়ের কাছে ছুটলো । মা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে
থাকলো । বাছুরটি ওমনি চুক্ চুক্ করে দুধটুকু খেলে, বাস্
আর ডাকে না । জ্ঞানী 'ভক্তরা' 'ভগবান' ভগবান করেন ঠিকই
তবে পাখীর ছানার মত নন । পাখীর ছানা মায়ের কাছে
অন্য কিছু চায়, পেলেই চূপ । জ্ঞানীরা ভগবানের কাছে
অন্য কিছু চায় না, তাঁরই 'সত্ত্বা' চান । বাছুর গাইয়ের কাছে
দুধই চায় । সেটুকু পেলেই চূপ্ । মায়ের দুধের মত হোলো
'সষ্টি' সারূপ্য ঐশ্বর্য্য । ও ভিন্ন অন্য কিছু কাম্য নাই
তাঁদের ।

ভক্তের ধারা তা নয় । তাঁরা হলেন কুলবতী সতীর মত ।
কত দিন হয়তো স্বামীর দেখা পায়নি, আহার নিদ্রা নাই,
দিনরাত তাঁর জন্মে ভাবনা । ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে
গেছে । হঠাৎ স্বামী এসে পড়েছেন । অভিমানও আছে
আবার সেবার জন্ম ছটফটানিও আছে ; কোথা রাখি, কোথায়
বসাই, কেমন ক'রে খাওয়াই । আর কিছু চাই না, শুধু
তোমার সেবা চাই । আহা কত কষ্টে তোমার দিন যাচ্ছে ।
তোমায় ফেলে রেখে আমার কোন সুখ নাই । স্বামীও
দেখেন আমার বিরহে সতীর এই দশা হয়েছে । তিনি নীরবে
তাঁর সেবায় বশীভূত হন ।

ভক্তরা ওই সতীর মত। যাঁরা তাঁর স্বামীকে চেয়ে
'আত্মস্থ' চায় তার কাছে থেকে, তাদের সঙ্গ ভক্তরা করতে
চান না। প্রাণে ব্যথা লাগে। ঠাকুর মশাইয়ের তাই
ওই পদ—

কর্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিয়া ভিন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! সাধকের মধো এমন কথাও শুনেছি যারা কৃষ্ণ
নাম করেন না তাঁদিকে ভেক জিহ্বা ব'লে তাঁরা উপেক্ষার
দৃষ্টিতে দেখেন, একি রকম ?

বাবাজী ম'শায় : ঠিক উপেক্ষা নয় 'আক্ষিপ' করেন বল। ভেক জিহ্বা
বলাতো আজকের কথা নয়, স্বয়ং ব্যাসের কথা। ব্যাণ্ডের
জিভ্ থেকেও নাই কিন্তু ডাকে খুব। তাঁদের মুখে শুনেছি
এক সময় নাকি দেবী পার্বতী দেবতাদিকে অভিশাপ
দিয়েছেন, তোমাদের পুত্র কন্যা কিছুই হবে না। তাঁরা তো
ব্রহ্মার শরণাপন্ন হ'লেন ; ব্রহ্মা বল্লেন দেবীর অভিশাপ তো
রদ হবার নয়, কি করি বলুন। তাঁরা তখন বল্লেন এখন
উপায় কি ? ব্রহ্মা ব'ল্লেন আপনারা অনুসন্ধান করে দেখুন
দেবীর অভিশাপের সময় কোন্ দেবতা সেখানে ছিলেন না।
দেবতারা তখন অনুসন্ধান করে জানলেন। সেখানে অগ্নি
দেবতা ছিলেন না। ব্রহ্মা বল্লেন আচ্ছা তবে তাকেই আরা-
ধনা করুন, তাঁর পুত্র হ'লেই আপনাদের দুঃখ দূর হবে।
তখন দেবতারা তো ত্রিভুবন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোথাও অগ্নি
দেবতাকে খুঁজে পেলেন না। ক্লান্ত হয়ে এক সরোবরের
তীরে বসে ভাবছেন, এমন সময়, রসাতল থেকে এক ভেক
উঠে এসে সেই জলের ধারে দাঁড়িয়েছে।

দেবতারা 'তাকে জিগ্গেস করলেন—অগ্নি দেবতার সন্ধান জান ? ভেক্ বলে, হ্যাঁ জানি । আমার নিবাস রসাতলে কিন্তু অগ্নি দেবতা রসাতলে লুকিয়েছেন । তাঁর তেজে আমি থাকতে পারলাম না ; ওপরে উঠে এসেছি, দেহটাকে জলে ভিজিয়ে নিচ্ছি । ভেকের মুখে সংবাদ শুনে দেবতারা রসাতলে গিয়ে অগ্নির সাক্ষাৎ পেলেন । কাজ উদ্ধারও করলেন, কিন্তু অগ্নিদেব যখন জানতে পারলেন ওই ভেকই আমার সন্ধান দিয়েছে ওমনি অভিশাপ দিলেন 'তোমার রসজ্ঞান আর থাকবে না,' ভেক্তো ভয়ে অস্থির । কিন্তু দেবতারা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, হে ভেক্ ! অগ্নির শাপে তোমার রসজ্ঞান থাকবে না বটে কিন্তু তোমার মুখে জিহ্বার মত আওয়াজ করার ক্ষমতা থাকবে ।

সেই থেকে লোকে বলে 'ভেক্ জিহ্বা' । যে শ্রীভগবানের 'নাম' 'গুণ' মহা মহা মুনি ঋষিরা গান করেন, আর আনন্দে নৃত্য করেন, সেই করুণাময়ের নাম যারা করেন না অথচ সংসারের সব কথাই ওই জিব্ দিয়ে বলেন তাঁদের রসজ্ঞান কোথায় ? তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রসময়, তাঁর নাম ও গুণ গাইতেই যত ভিরকুটি ! তাই বৈষ্ণবগণ আক্ষেপ ক'রে বলেন-হায় হায়, তোমার জিহ্বা কেবল ভেকের জিহ্বা । সংসারের আশ পাশ কথা কয়ে কেবল আয়ু নষ্ট কর আর কালসাপকে ডেকে আন ।

বৈষ্ণব সমাজে দাস ভাব—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! শিক্ষিত সমাজের একাংশে এমনও কথা হয় যে তাঁরা বলেন বৈষ্ণবগণ 'দাস' 'দাস' ক'রে মানুষের মনকে নীচু করে দেন । দাসত্ব মনোবৃত্তিতে উন্নত কাজ হয় না ।

বাবাজী ম'শায় : (অল্প হাসিয়া) 'দাস' কথাটি খুব বড় আদর্শের কথা ।
 দাসের আদর্শ থাকলে জীবের এত অশান্তি থাকতো না ।
 সবই দেখতো তাঁর সংসার, আমরা মাত্র সেবক ; 'যারা দান
 করেন' তাঁরাই দাস । এ রাজ্যের বাঁধন পরা দাসের (চাকর
 বাকর) স্বভাব দেখে তোমরা বল মন নীচু হ'য়ে যায় ।
 তাকি হয় ? ঠাকুর বৃন্দাবন বলেছেন—

“অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম ।
 অল্প ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান ॥
 আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব বন্ধ নাশ ।
 তবে সেই হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥

এই বাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজ ।
 মুক্ত সব লীলাতনু করি কৃষ্ণ ভজে ॥

দাস কথার স্মৃতি শ্রীভগবানে । সেই স্মৃতি ভুল হ'য়েই এই
 বিপত্তি ঘটেছে । কৰ্ম্মবন্ধন মুক্ত হ'লেই ভগবানের দাসত্ব
 কামনা আসে । তাঁর দাসত্ব 'মুক্তির' আনন্দের চেয়েও কোটি
 কোটি গুণে সুখ, সে সুখে যাঁরা সুখী তাঁরাই তো জগৎকে সুখী
 করতে পারেন । হৃদয়ের নিধিকে জগৎবাসীর হৃদয়ে দান
 করতে পারলেই তাঁদের দাসত্বের সুখ । শ্রীগুরুদেবের
 আনুগত্য পরম্পরায় এই 'দাস কথার' উৎপত্তি । আজকালতো
 সেটি আর থাকছেনা । মনে প্রাণে সব মায়ার দাস, সংসারের
 দাস কিন্তু তাদিকে দাস বলেই জালা । আবার ভগবানের
 দাস বলেও বুঝতে পারে না ! খালি তর্ক যুক্তির কচাকচি ।
 ঈশ্বর গুণ্ডের একটি কবিতা পড়েছো ?

কাঁচা খাও পাকা খাও তাতে নাহি জ্বালা ।
তুমি খাও বলিলেই হয় বড় জ্বালা ॥

কলা কাঁচাও খাচ্ছ পাকাও খাচ্ছ, কিন্তু যেই তোমাকে কেউ
বলে ‘কলা খাও’ ওমনি তুমি তাকে মারতে গেলে ।
(বলিয়াই হাসি)

কবিরাজ ব'লেছেন—

‘কৃষ্ণ দাস’ অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু ।
‘ব্রহ্মানন্দ’ তার আগে নহে এক বিন্দু ॥

এ দাসত্ব যারা পছন্দ করেন না তাঁদের মনে ‘দাস’ কথার
বিরুদ্ধ অর্থতো জাগবেই ।

বৈষ্ণবের আদর্শ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! অনেক সময় ভগবান শঙ্করকে বৈষ্ণব
প্রধান বলা হয় । এদিকে তাঁকে ভগবানও বলা হয়, আবার
বৈষ্ণবও বলা হয় ।

বাবাজী ম'শায় : ভগবান নিজেই সেবকের আদর্শ দেখিয়েছেন, তাঁর
রূপটি ভাব দেখি । কপালে আছেন সুধাকর আর কণ্ঠে
আছেন কালকূট, ‘নীলকণ্ঠ’ হয়ে বসে আছেন । কারও মধ্যে
একটু কিছু গুণ দেখলেই বৈষ্ণবগণ সেই প্রভুর কৃপা ভেবে

ওমনি মাথায় ধারণ করেন। আর রাশি রাশি দোষ পেলেও কণ্ঠে ঢেকে রাখেন, একটুও বাইরে আসতে দেন না। জগৎ তাহ'লে বিষময় হ'য়ে যাবে। **এইটিই বৈষ্ণবের আদর্শ।**

তাঁর কৃপা না হ'লে সব উন্টে যায়। দেখছো না ওখানে বাল্যলীলায় বসন চুরি খেলা ক'রেছেন আর যায় কোথা? অমনি ঢাক পিটিয়ে তাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে গেয়ে বেড়ায়। তিনি যে দ্রোপদীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছেন লুকিয়ে থেকে, তা আর বলা হ'চ্ছে না।

তিনি যে এত কথা ক'য়ে জানালেন অজ্জুনকে, আমি 'আত্মারাম' 'পূর্ণকাম,' তা আর মুখে আসছে না, যা আসছে তা ঠিক উন্টে গোপিকা-লম্পট নন্দনন্দন। কি বলি বল বৈষ্ণবের আদর্শ তো সহজ নয়, তাঁর কৃপায় তিনি নেমে এসে না দেখালে কোন্ আদর্শ ধরে চলবে? প্রভুর তাই ওই রূপ।

উপায় কি ?

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! করুণা বশে তো অনেক কথাই শুনিয়েছেন, কিন্তু আমাদের যেন খেলের বোল মুখস্থ করার মত হ'চ্ছে, প্রচুর বোল মুখস্থ করে দেখা গেল হাত সাধা না হওয়ার জন্তে সব বোল বোলই থাকছে। শ্রীগুরুর উপদেশ জীবনে সাধা হ'চ্ছে না তো? কেবল বোল শেখা হ'চ্ছে।

বাবাজী ম'শায় : (অল্প হাসিয়া) সাধুরা বলেন “হরিশে লাগি রহ রে ভাই” “তেরী বিগড়ী বাতভি বনত্ বনত্ বনি যাই”।

—এতে লেগে থাকতে থাকতে সব বেগড়ানই শুধরে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! বেগড়ান কেমন !

বাবাজী ম'শায় : (আবার হাসিয়া) বড় বড় লোকেরা ভাল জাতের ঘোড়া কিনে আনেন, এনে দেখেন এদেশের ঘোড়াদের সঙ্গে

থাকতে থাকতে সাবেক চাল ভুলে গিয়ে নতুন চাল ধরে ।
তখন বলে এইরে ঘোড়াটা বিগড়ে গেছে । এও তেমনি মানুষ
এল সে রাজ্য থেকে, এখানে এসে রিপূর খপ্পরে প'ড়ে সাবেক
চাল ভুল গিয়ে রিপূর দাস হওয়ার চাল ধরে, তেমনি তেমনি
কথা বলে । সাধুরা তখন বলেন, জীবের বাত বিগড়ে গেছে ।
ও বেগড়ানতো সহজে যায় না, ঘোড়া যেমন ভাল সহিস
কোচায়ানের কাছে থাকতে থাকতে তবে সে বেগড়ান শোধ-
রায় মানুষও তেমনি ।

“শ্রীভগবানের করুণা-বাহনের সহিত কোচায়ানের মত”
যাঁরা এ জগতে আসেন তাঁদের কাছে প'ড়ে থাকতে থাকতে
তোমার স্বভাব বদলে যাবে । ‘বিগড়ী বাতভী বনি যাই’ ;
আনন্দে লেগে থাকতে হবে, নিশ্চয় হবে । সাধুদের উপর যে
তাঁর হুকুম আছে, শোধরানর জন্মই তো তাঁদের আশা ।

একটি ভক্তের প্রশ্ন—(তিনি দাদার মারফতে প্রশ্ন করেছিলেন)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! এত দেখে শুনে জ্ঞান হচ্ছে না কেন ?

বাবাজী ম'শায় : এখনও যে ফানুষ তত্ত্ব বোঝা হয় নি ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! ফানুষ তত্ত্ব কি ?

বাবাজী ম'শায় : (প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর নাম স্মরণ করে) প্রভু
'বলতেন' একটি সাধু বাজারে গিয়েছিলেন গিয়ে দেখেন—
একটি লোক মাথায় হাত দিয়ে বসে কাঁদছে । সামনে তার
কতকগুলি ফানুষ, তিনি জিগ্যেস করলেন—বাবা কাঁদছ
কেন ? বাজারের সেই লোকটি ব'লে আমি কিছু ধান কিনে
এনেছিলাম, ভাবলুম এগুলি বাজারে বেচে যা পাব মূল
টাকাটা রেখে লাভের টাকা দিয়ে সংসারের জন্ম কিছু নিয়ে
যাব । তা বাবা একটি লোক আমার পাশে এগুলি নিয়ে
(ফানুষগুলি) খুব হাঁক ডাক করে বেচ্ছিল । সে আমাকে

কি ভাবলে জানি না, আমাকে বোঝালে যে আমি চটপট্
চলে যাব, তোমার ও ধান বিক্রি হ'তে চের দেবী। আজ
হয়তো বিক্রি নাও হতে পারে। তার চেয়ে এগুলি নিয়ে
আমাকে ধানগুলি দাও। এ মাল খুব দামী, খুব বিক্রী
হবে। ব্যাস্ আমিতো সোনার মত রঙ এই ফানুশগুলি নিয়ে
তাকে যেই (আমার ধানগুলি) দেওয়া সে ওমনি চটপট্
চলে গেল। প্রথমটা আমার বেশ আনন্দ হোলো। তারপর
দেখছি লোকজনতো আমার এ সব কেউ কিনতেই চায় না,
তুই একটি ছেলে কিনতে চায়। এ সবে দামতো কিছুই নয়।
সাধু বল্লেন—তা ওগুলো বেচলেও তো তোমার তু' পয়সা
হবে। লোকটি বল্লেন, না, বাবা, এ কিছুই হবে না। মূলও গেল
লাভ তো গেলই। বলেই আবার কাঁদতে লাগলো।

সাধু বল্লেন—আরে কেঁদে কি হবে, যা গেছে তা গেছে, এখন
তো বুঝেছ? যা আছে ঐ দিয়ে আবার ব্যবসা কর; ধীরে
ধীরে আবার সব হবে। সাবধান আর যেন কেউ না
ঠকায়।

বুঝলে তো? সংসারে এসে রিপূর খপ্পরে প'ড়ে
ফানুশ পাওয়া গেছে, ওগুলির মূল্য তো কত! দেখতেই
খালি মন ভোলান। ওর তত্ত্ব বুঝলে দেখবে মূলও গেল
লাভও কিছু হবে না। তবুও যা আছে তাই নিয়েই চল।
সাধুর কথা শোন। যতটুকু সময় আছে তাঁকে স্মরণ ক'রলেই
হবে। সাধুর শরণ নাও তিনি ব'লে দেবেন কেমন করে
তাঁকে পাওয়া যাবে।

সাধন ও স্বতন্ত্রতা :

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! এমনও দেখা গেছে যে কোন শিষ্যটি হয়
তো খুব নির্ভাবান, শ্রীগুরুদত্ত উপদেশে তার প্রগাঢ় নির্ভা কিছু

কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেল সেই শিষ্যটী একটু পৃথক ধরনের আচরণ করছেন, শেষটায় শ্রীগুরুদেবের সঙ্গেই যেন পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলেন, এর রহস্য কি ?

বাবাজী ম'শায় : হুঁ, কথাটা রহস্যেরই বটে। তবে কথা কি জান ও ভাবটি ধরা বড় মুষ্কিল, যিনি ওই নিয়ে কটাক্ষ করবেন, তিনি অপরাধের ধাক্কাতে পড়বেন। “তঁারই দেওয়া উপদেশ (শ্রীগুরুদত্ত উপদেশ) আবার তঁার সঙ্গেই বিরোধ !” এর সূত্র ধরতে গেলে বড় বিড়ম্বনায় প'ড়তে হয়, প্রভুর চোখে কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টি। অনুগত ব্যক্তিটি খাঁটি কি না, তাই সকলকে দেখিয়ে দেন তিনি। ছোটবেলায় যাত্রা শুন্তে যেতাম্, ডোমসায় যাত্রা হ'চ্ছিলো 'পাণ্ডব বিজয়'। (ডোমসাস্থানটি ফরিদপুর সহরের দশ বার ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বের পালং থানার অন্তর্গত এবং মাদারিপুর সাবডিভিসনে, শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব স্থান ফরিদপুর সহরে এবং পিতৃভূমি 'কুমারপুর' গ্রামে, সেটী ডোমসার নিকট) ধর্মদাস রায়ের যাত্রা, লোকে লোকারণ্য হ'য়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দণ্ডীরাজা যুদ্ধ করেছিলেন, হেরে গেছেন। প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এলেন। কি করেন ! কৃষ্ণের শত্রু হ'য়ে থাকাও চলে না, তাই তিনি পাণ্ডবদের শরণাগত হ'য়ে বল্লেন—আপনারা আমায় আশ্রয় দিন। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত পাণ্ডবগণ দেখলেন বিষম সমস্যা। এঁকে আশ্রয় দিলে কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করতে হয় ; আবার এঁকে ত্যাগ ক'রলে সখার 'অভয় গুণের' মহিমা থাকে না। ওঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে তঁারই মহিমাকে জয় দিয়ে দণ্ডীরাজাকে অভয় দিলেন। দণ্ডীরাজারও মনে সেই কৃষ্ণভক্তদের গুণটির দাগ পড়'লো। এদিকে সে কথা শ্রীকৃষ্ণের কাণে গেল, তিনি এসে বল্লেন “তোমাদের সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটলো দেখছি,” ওমনি ভীম বল্লেন, হে কৃষ্ণ!

আমাদের বল তো একমাত্র তুমি। তোমার গরবেই আমরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণকেও সামান্য জ্ঞান করি। কিন্তু কৃষ্ণ! তুমি যে, সর্ব ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শরণাগত বৎসল; আজ যদি দণ্ডী-রাজাকে পরিত্যাগ করি তবে লোকে যে তোমারই কুশ গাইবে। তা সহিতে পা'রবো না, ওতে যদি জীবন যায় যাবে। হে কৃষ্ণ! শরণাগতকে রক্ষা করতে তুমিইতো শিথিয়েছো, আজ যদি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় আমরা তাতেও প্রস্তুত, তুমিই আমাদের সহায়। শ্রীকৃষ্ণ মুচ্‌কী হেসে বলেন—বেশ তা হ'লে প্রস্তুত হও। পাণ্ডবগণও মাথা নত ক'রে বলেন, আমরা প্রস্তুতই আছি। তারপর উভয় পক্ষে খুব যুদ্ধ হোলো, একপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর আর এক পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ, যাদব সৈন্য, অন্যান্য দেবতা। শেষটায় পাণ্ডবদেরই জয় হোলো। শ্রীকৃষ্ণের আর আনন্দের সীমা নাই। ভক্তের জয়ে প্রভুর আনন্দ। জগতকে দেখালেন যাঁরা প্রভুর গুণে বলীয়ান হন তাঁরা সহজেই উদ্ভীর্ণ হন। একে স্বতন্ত্রতা বলে দোষের হয়। ভক্তের-মন, বুঝতে পারে কোন্‌টি প্রভুর ইচ্ছা কোন্‌টি প্রভুর অনিচ্ছা। এ অনুভূতি না থাকলে সেটি হয় দেহের অভিমানে স্বতন্ত্রতা। —প্রভু তখন 'আসল' 'মেকি' ধরিয়ে দেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা! 'প্রভুর ইচ্ছা কি' এটি যে ভক্ত জানতে পারেন তাঁর আচরণে তো সকলে' সন্তুষ্ট হবে কিন্তু তেমনি ভক্তের আচরণেও সকলে খুসী হন না। ভগবদ্ ইচ্ছায় সকলের তো খুসী হওয়া উচিত্। এ সব ক্ষেত্রে ভগবদ্ ইচ্ছা আর ভক্তের ইচ্ছায় তো স্বতন্ত্রতা থাকতে পারে না!

বাবাজী ম'শায় : ওই যে কবিরাজ বলেছেন "সবার চিত্ত নারি আরাধিতে" যাঁদের বিরুদ্ধ স্বভাব হয় তাঁরা ভগবানের ওপরই

বল, আর ভক্তের আচরণের ওপরই বল. কখনও খুসী হতে পারেনা। ভক্ততো সকলের মন-ভোলান আচরণ করেননা, তাঁরা করেন ভগবানের সেবা। সে সেবার যেটি নিয়ম সেটা ষোল-আনা রক্ষা করেন তাঁরা। একটি বাদ পড়লে আর পাঁচটি বাদ প'ড়ে যাবে। তাই তাঁরা সহস্র বাধা এলেও সেই নিয়ম নিষ্ঠার আচরণে দৃঢ়তা রাখেন। সেইটিই হয় বজ্রের মত কঠিন। আবার প্রভুর করুণার কোথাও বিকাশ দেখলে আনন্দে নেচে উঠেন। তখন হয় ফুলের মতন, যেমনি সৌরভ তেমনি কোমলতা। লোকে বলে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' ? এ সব কিন্তু লোকের মুখপানে চেয়ে নয়, কোন দেহ অভিমানে বা প্রতিষ্ঠা গৌরবে নয়, এ হোল প্রভুর মুখপানে চেয়ে।--নিয়ম নিষ্ঠায় আর প্রভুর করুণা বিতরণে। তাই অনেক সময় ধরা যায় না ভক্তের স্বতন্ত্রতা কেন ? বিপরীত স্বভাব যাঁদের (যাঁরা ভগবদ্বিরোধী) তাঁরা মনে করেন ভক্তটীর আচরণ স্বতন্ত্র।

সংসারের স্রোতে সাঁতার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! সংসারে 'কর্মবেগ' জীবের থামবে কবে ?

—অসহ্যও তো লাগছে কারো কারো।

বাবাজী ম'শায় : (হাসিয়া) অসহ্য হ'লেই পাক্‌ড়াও ঠিকই হবে।

কৌতূহল তো মেটেনি। নদীর বেগ কত, কোথায় নিয়ে যায় তা তো জানা হয় নি। কৌতূহল হতেই তীরের কথা নিজের বলের কথা ভুলে স্রোতে গা ভাসাতে ইচ্ছে হোলো, ব্যাস, তারপর ভেসে ভেসে চলে আর হাত পা ছোঁড়ে। তারপর নিজের দমও ফুরিয়ে আসছে তীরের দিকেও চেয়ে দেখছে সব ফাঁকা। যখন একেবারে অসহায় তখন কেউ গিয়ে হয়তো

দড়ি ফেলে দিলেন। প্রথম প্রথম দড়িটি ধরে একটু তীরে ফিরে আসার চেষ্টা হোলো। তারপর যেই একটু বল হোলো ওমনি মনে মনে জাগলো দড়িতো রয়েছে আর একটু এগিয়ে দেখে আসি। তারপর আবার সেই দড়ি ধরে শ্রোতের টানে চলে। এমনি হোলো সংসার সঁতার। জীব অনাদি কাল থেকে তাঁকে ভুলে নিজেকে ভুলে সংসারের শ্রোতে কৌতুহল করে গা ভাসিয়েছে, করুণাময় নিশ্চয় তায় অসহায় দশা দেখে 'নামের রজ্জু' ছুঁড়ে দিয়েছেন। জীব প্রথমটা ধরে তারপর সেই নাম বলে আবার গা ভাসাতে চায়। কত দিনে যে দৃষ্টি ফিরবে! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তিনি তো চুপ্ করে নাই, কেবলই ছুটছেন, তবুও কি হুঁস আসে? বৈরাগীর পথে এসেও রেহাই নাই। বৈষ্ণবী মায়ার সংসারে আবার গা ঢালা।)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! বৈষ্ণবী মায়া কি রকম ?

বাবাজী ম'শায় : (হাসিয়া) গোড়ায় গোড়ায় হয়তো ইচ্ছা হোলো, একটি আশ্রম করতে হবে, সেইখানেই বিগ্রহসেবা আর নাম হবে। তাতে জীবের পরম কল্যাণ হবে। পথে যেতে আসতে নাম শোনাও হবে আর ভগবত দর্শনও হবে, ধীরে ধীরে হৃদয়ে লোভ জাগবে, প্রসাদ চরণামৃত খেতে খেতে চিন্তা-শুদ্ধি হবে। একটু একটু করে সাধুসঙ্গ করারও প্রবৃত্তি জাগবে।

এদিকে সাধুর মনটি কিন্তু গোড়ার কথা ভুলে গেল। তিনি শুনেছিলেন "জীবে দয়া নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন"। সেই প্রেরণাতেই তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা। তিনি খুব উদ্যোগ করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। ত্রিসঙ্ক্যা নাম, শ্রীমুক্তির সেবা, প্রসাদ চরণামৃত দিয়ে জীবে দয়া, তাদিকে শ্রীনাম শোনান। তারপর এল আশ্রম রক্ষা। আজ এটি নাই, কাল ওটি নাই,

তখন আশ্রম রক্ষার জন্তে জমি জায়গা চাই, বাড়ি চাই, টাকা চাই, বাসু, তারপরেই এলো বৈষয়িক ব্যাপার। তখন পরমার্থ স্বার্থ হয়ে উঠল, একে উচ্ছেদ কর, তার কাছে তাগিদ কর, শেষটায় যা হবার তাই হলো। এই হোলো বৈষ্ণবী মায়া। এর হাতে পড়লে “বেঁধে মার।”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : বাবা ! আপনি তো সবতেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন ? তা হোলো বৈষ্ণবের ধর্ম কি ভয় থেকেই উৎপন্ন হয় ?

বাবাজী ম'শায় : না ভয় কিসের ? তাঁর স্বরূপটি ভাব তা হলেই বুঝবে “সর্বত্র নির্ভয়”। তাঁর ছটি ঐশ্বর্য আছে। তার মধ্যে বৈরাগ্যও একটি ঐশ্বর্য। তাঁর বৈরাগী স্বরূপের কথা ভাবলে আর বৈষ্ণবী মায়ার দিকেও যেতে হবে না। এক পাতা তুলসী আর একটু জল দিলেই তিনি বিকিয়ে যাবেন। তা হোলো তাঁকে আবার দৌলত দিয়ে আশ্রম রাখার উদ্দেশ্য কি ?

একবার কোর্টে একটি মামলা হয়েছিল এক আশ্রম নিয়ে। দিদির মুখে শুনেছি [শ্রীললিতা সখীজীর মুখে] কোর্টে রায় দিলেন ভগবানের জন্তে ঋণ হয় না, ঋণ হয়েছে আশ্রমের আচার ব্যভার নিয়ে, ওতো সেবকদের ব্যাপার ! তবে মামলা ক'রছে তারা তা দোষটা কিসের ? [অল্প হাসিয়া] ওগো এসব কথা বললে তোমাদের গায়ে লাগবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদা' : তা হলে বৈরাগীরা থাকবে কেমন করে ?

বাবাজী ম'শায় : কেন ওই যে বলছেন, ‘মাগিয়া যাচিয়া কর উদর পূরণ।’ তোমাকে আশ্রম ক'রে বাঁধা আয় দিয়ে বসতে বলেছেন কি ? যে যা দেয় দিকনা তোমার সে দিকে লক্ষ কেন, যারা দেবে তারা ধন্য হবে। আর তুমি তোমার ভিক্ষা ছাড় কেন ?

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚରଣ
“ପା ଥେ ଯ”

সূচীপত্র

পাথের সঙ্কেত :	পৃষ্ঠা
১। মহামন্ত্রের পরিচর্যা—	৫৬৩
২। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীশ্যামকৃষ্ণের ইতিহাস—	৫৮০
(২।১) শ্রীকৃষ্ণদ্বয়ের স্বত্ব সামীত্ব লইয়া মথুরায় মুনসেফ্ কোর্টে দরখাস্তের নকল ও মুনসেফের অর্ডার—	৫৯৩
৩। কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত দাস গোস্বামীর সংস্কৃত ভাষায় শোচক ও পয়ারে অনুবাদ—	৬০০
৪। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি সঙ্কে—	৬০৮
৫। বৈষ্ণব মতে 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' রহস্য—	৬০৯
৬। 'আরোপে' আরতি হেরে দাস গোস্বামী ভঁহঁ করে—	৬১০
৭। শ্রীশ্রীপাটবাড়ী তত্ত্ব—	৬১২

(১)

“মহামন্ত্রের পরিচর্যা”

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

“মহামন্ত্র মহাশূর”

তাইতে বলি মহাশূর

পূর্ব পূর্ব যুগে

যে ধনের পায় নাই সন্ধান
কর্ম-যোগ-জ্ঞান-সাধন-ফলে—
যে ধনের পায় নাই সন্ধান
অনায়াসে করেন দান

মহামন্ত্র মহাশূর—তাই, অনায়াসে করেন দান

“পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমধন”—

অনায়াসে করেন দান

সবাই,—শক্তিহীন নামের কাছে

জগতে. কত কত সাধন আছে—

সবাই,—শক্তিহীন নামের কাছে

শ্রীগুরু-প্রেরণায় এই ত' জাগে

এই, বত্রিশ-অক্ষর ষোল-নাম

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-ধাম

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রস-ধাম

এ যে, ব্রজলীলা-রস-ধাম

তাই, মহামন্ত্র এত শক্তিমান্

তাই, মহামন্ত্র এত শক্তিমান্

শ্রীগুরু-মুখে শুনেছি

অপরূপ এ নাম-রহস্য

অপরূপ এ নাম-রহস্য

কিশোরীর দশমী-দশাতে

যখন দেখলেন লীলা থাকে না

যখন দেখলেন লীলা থাকে না

তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

ব্রজলীলা রাখবার লাগি

তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

কৃষ্ণ-বিরহিনী, কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে

—তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

'কৃষ্ণ-বিরহিনী, কিশোরীর শ্রীমুখ হতে'

—তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

'দশমী-দশায় আকৃষ্ট'

তখন এ নাম হ'লেন প্রকাশ

কৃষ্ণ-বিরহিনী,-কিশোরীর শ্রীমুখ হ'তে

—এ, নাম হ'লেন প্রথম প্রকাশ

যখনি এ নাম হ'লেন প্রকাশ

সঙ্গে সঙ্গে বিরহের শান্তি

প্রথম 'হরে' নাম স্ফরণে

বিরহিনী-কিশোরী শুনে

বিরহিনী-কিশোরী শুনে

ঐ,—বাঁশী বাজে কদম্ব-বনে

বিরহিনী-কিশোরী শুনে

অমনি প্রাণে জেগে উঠিল

তবে ত, কৃষ্ণ আছে ব্রজে

ঐ যে, কদম্ব-বনে বাঁশী বাজে

তবে ত, কৃষ্ণ আজি ব্রজে

ব্রজ ছেড়ে যায় নাই কোথায়—

ব্রজে আছে শ্যাম-রায়

ব্রজে আছে শ্যাম-রায়

কদম্ব-বনে বাঁশী-শুনে
ব্রজ ছেড়ে যায় নাই ব'লে

অম্নি হ'ল বিরহের শান্তি

অম্নি হ'ল বিরহের শান্তি

অম্নি হ'ল বিরহের শান্তি

বিরহ-তাপ মিটাইয়ে
কদম্ব-বনে বাঁশী শুনায়ে

প্রথম হরে 'পূর্বরাগ' জাগায়

প্রথম 'হরে' পূর্বরাগ জাগায়

প্রথম 'হরে' পূর্বরাগ জাগায়

পর পর নাম স্ফুরণে

পর পর লীলা ভোগ

পর পর লীলা ভোগ

ব্রজবিতারীর লীলা ভোগ

শেষ 'হরে' 'মহারাস' দেখায়

প্রথম 'হরে' পূর্বরাগ জাগায়

--প্রথম হরে 'পূর্বরাগ জাগায়'

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

ব্রজলীলা রস ধাম

ব্রজলীলা রস-ধাম

বিরহিনী, গৌরকিশোরীর শ্রীমুখোদগীর্ণ

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ' নাম

তোমরা ব'লে, বলতে পার

যদি কিশোরীর, শ্রীমুখ হতে এ নামের প্রকাশ

—তবে, কেন বলিলেন কবিরাজ

চতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে
শ্রীচৈতন্য মুখোদগীর্ণ ব'লে

তবে, কেন বলিলেন কবিরাজ
তবে, কেন বলিলেন কবিরাজ

এ কথার মর্ম
শ্রীগুরু-চরণ হৃদে ধ'রে

অপরূপ রহস্য ভাই
অনুভব কর ভাই রে
অনুভব কর ভাই রে
অনুভব কর ভাই রে

ব্রজ-বিহারী নন্দনন্দন
আস্বাদিতে স্বমাপুরী
রাধা-ভাব কান্তি অঙ্গী করি

নাম ধ'রেছেন গৌরহরি
নাম ধ'রেছেন গৌরহরি
নাম ধ'রেছেন গৌরহরি
নাম ধ'রেছেন গৌরহরি

'বিরহে'-'পরিপূর্ণ ভোগ' বটে

পরিপূর্ণ ভোগ বটে
'পরিপূর্ণ ভোগ বটে

তাই লিখেছেন কবিরাজ

'শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ।
নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বিরহেতে ভোর ॥'

মহাভাব নিধি গৌরানন্দ-সুন্দর

দশমী-দশায় সদাই বিভোর
দশমী-দশায় সদাই বিভোর

কাঁদেন সদাই দশমী-দশায়

গস্তীরা ভিতরে গোরারায়
গস্তীরা ভিতরে গোরারায়

এই 'হরে কৃষ্ণ' নাম
রাধা ভাবে দশমী-দশায়

নিরন্তর গৌরহরি জপেন
নিরন্তর গৌরহরি জপেন
নিরন্তর গৌরহরি জপেন

প্রাণ-গৌর-রহস্য অনুভবী

তাই ব'লেছেন কবিরাজ
তাই ব'লেছেন কবিরাজ

দশমী-দশাপন্ন

শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদগীর্ণ
শ্রীচৈতন্য-শ্রীমুখোদগীর্ণ

রাধিকা-ভাবিত-মতি

দশমী-দশাপন্ন
দশমী-দশাপন্ন
শ্রীচৈতন্য-মুখোদগীর্ণ

এ নাম,—যুগল বিলাস-ধাম
কারুণ্য-তারুণ্য-লাবণ্যামৃত-ধাম এ নাম, যুগল বিলাস-ধাম

ব্রজলীলারসের উপাদান

এই,—নামেই করেন অবস্থান
এই,—নামেই করেন অবস্থান

'মহামন্ত্র'-নামের মাঝে

ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে
ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

প্রথম 'হ'কার হ'তে শেষ 'রে'কারের মাঝে

—ব্রজলীলা-রস পূর্ণ আছে

সকলি আছেন মুক্তিমান

'পূর্বরাগ' হ'তে 'সন্তোগ সমৃদ্ধিমান' সকলি আছেন মুক্তিমান

তাই বলি, মহামন্ত্র মহাশূর

এ যে, ব্রজলীলা-রস-পুর

তাই বলি, মহামন্ত্র মহাশূর

যদি কা'রও, ভোগ ক'রতে সাধ থাকে
রাধাকৃষ্ণ, যুগল-উজ্জ্বল বিহার

—যদি কা'রও, ভোগ ক'রতে সাধ থাকে

তবে, যাও ভাই এই নামের কাছে
শ্রীগুরুদেবের পাছে পাছে

—তবে, যাও ভাই এই নামের কাছে

এই, নাম সব ভোগ করা'বে
যুগল-উজ্জ্বল বিহার
শ্রীরাধা, রাধারমণের রহোলীলা

—এই, নাম সব ভোগ করা'বে

পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম রূপে
এই, নাম সব ভোগ করা'বে

যুগল, সেবামৃত সমুদ্রে ডুবা'য়ে
মধুর, হরিনাম-সঙ্কীর্তন
যুগল, সেবামৃত সমুদ্রে ডুবা'য়ে

পরান গৌরাজ্জ দেখায়

'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ স্বরূপ

পরান গৌরাজ্জ দেখায়

দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি

মহা, রাস-বিলাসের পরিণতি
'রাই কানু একাকৃতি'

দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি
দেখায় প্রাণের গৌর-মুরতি

মুরতি অদভূত

ভানুসুতা-মণ্ডিত-নন্দসুত
মুরতিমন্তু-প্রেমবৈচিত্র্য

দেখায় প্রাণের শচীসুত

দেখায় প্রাণের শচীসুত

দেখায় প্রাণের শচীসুত

দেখায় প্রাণের শচীসুত

নিত্য-মিলনে নিত্য-বিরহ

দেখায় মধুর গৌর দেহ

দেখায় মধুর গৌর দেহ

দেখায় চিতচোরা গৌরা

'হরে কৃষ্ণ' নাম নিজ-স্বরূপ
পরম্পর, বৃকে ধ'রে আত্মহারা
বিলাস-বিবর্ত-রসে ভোজ
গৌর-অনুরাগীর বৃক-ভরা

দেখায় চিতচোরা গৌরা

দেখায় চিতচোরা গৌরা

দেখায় চিতচোরা গৌরা

দেখায় চিতচোরা গৌরা

(শ্রীপাদ বামদাস বাবাজী

(অ) শ্রীগৌরসুন্দর যে সংখ্যাপূর্বক 'মহামন্ত্র' জপ করিয়া-
ছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার লীলা পরিকরদের উক্তি—

(১) শ্রীল সনাতন গোস্বামী :

শ্রীচৈতন্য মুখোদগীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ ।

মজ্জযন্তো জগৎপ্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

(লঘুভাগবতামৃতম্)

(২) শ্রীল রূপ গোস্বামী :

হরেকৃষ্ণেত্যুচৈঃ স্মুরিতরসনো নামগণনা—

কৃতগ্রন্থিশ্রেণীসুভগকটিসূত্রোজ্জলকরঃ ।

বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিতভুজঃ

স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশো যাস্মতি পদম্ ।

(স্তবমালা)

(৩) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী :

বধ্বন্ প্রেমভরপ্রকম্পিতকরো গ্রন্থীন্ কটিডোরকৈঃ

সংখ্যাতুং নিজলোকমঙ্গল হরেকৃষ্ণেতিনাম্নাং জপন্ ।

অশ্রুস্নাতমুখঃ স্বমেবহি জগন্নাথং দিদিক্ষুর্গতা—

যাত্তৈর্গৌরতনু বিলোচনমুদং তম্বন্ হরিঃ পাতু বঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

(আ) মহামন্ত্র সংখ্যাপূর্বক জপের জন্য গৌরহরির
উপদেশ—

(১) নিজহৃৎ গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্

হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ ।

ইতি-প্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসুতুঃ কিং মে নয়ন-সরণীং যাস্ম্যভি পুনঃ ॥

(স্তবাবলী)

(২) আপনে সভাবে প্রভু করেন উপদেশ ।
কৃষ্ণনাম “মহামন্ত্র” শুনহ বিশেষ ॥

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে”

প্রভু বলে,—কহিলাম এই ‘মহামন্ত্র’
ইহা গিয়া ‘জপ’ সভে করিয়া নিব্বন্ধ ।

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

(৩) পুরীধামবাসী ব্রাহ্মণদের প্রসঙ্গে :

ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাদিয়া ।
চল তুমি আগে ‘লক্ষেশ্বর’ হও গিয়া ॥

* * * * *

প্রভু বলে জান লক্ষেশ্বর বলি কারে ।
প্রতিদিন যে লক্ষনাম গ্রহণ করে ॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

(৪) নবদ্বীপবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার প্রতি :

হাদিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সবাচারে ।

এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥

নবদ্বীপে বাল-বৃদ্ধ বৈসে যত জন ।

চণ্ডাল দুর্গত আর সজ্জন দুর্জন ॥

সবারে শিখাও হরি নাম 'গ্রন্থি' করি ।
অনায়াসে সর্বলোক যাক্ ভব তরি ॥

(চৈতন্যমঙ্গল)

(ই) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাপরিকরবৃন্দ সংখ্যাপূর্বক
মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন । যথা—

ষড় গোস্বামী :

সংখ্যাপূর্বক-নামগান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ—
নিদ্রাহারবিহারাকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ
রাধাকৃষ্ণগুণস্বতের্মধুরিমানন্দেন সন্মোহিতৌ
বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥

(শ্রীনিবাস আচার্য্য বিরচিত অষ্টকে)

ঠাকুর হরিদাস :

হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত প্রধান
প্রতিদিন লয় তিঁহ তিন লক্ষ নাম ॥

—চরিতামৃত

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী :

হরি নাম সংখ্যাপূর্ণ তণ্ডুলে করয় ।
সেই তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয় ॥

—ভক্তিরত্নাকর

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী :

সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়েন লক্ষ নাম ।
তুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥

(চরিতামৃত)

বন্ধন দশায় বাণীনাথ পটুনায়েক :

বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় হরিনাম ।
‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ’ কহে অবিরাম ॥
সংখ্যা লাগি ছই হাতে অঙ্গুলীতে লেখা ।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গ কাটে রেখা ॥

—চরিতামৃত

জগাই মাধাই :

জগাই মাধাই ছই চৈতন্য কৃপায় ।
পরম ধার্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায় ॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে ।
ছই লক্ষ কৃষ্ণ নাম নয় প্রতিদিনে ॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ :

প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস ।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস ॥
নিরবধি সদাই জপেন কৃষ্ণনাম ।
প্রভুর চরণ কায় মনে করি ধ্যান ॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

(ঈ) সংখ্যা পূর্বক ‘নাম’ জপের উপদেশ দানে ‘গৌর পরি-
করবৃন্দ’ :-

ঠাকুর হরিদাসের উপদেশে :

(হীরা) মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে ।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥

—চরিতামৃত

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম প্রতি লোকনাথ গোস্বামী :

যে বৈষ্ণব হইবে লইবে হরি নাম ।

সংখ্যা করি লৈলে কৃপা করেন গৌরধাম

—প্রেমবিলাস

(উ) শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ সংখ্যা পূর্বক মহামন্ত্র
জপ করিয়াছিলেন । যথা—

শ্রীনিবাস আচার্য্য :

সংখ্যা করি নাম লয় প্রহর দ্বয়েক ।

গ্রন্থ দরশনে আর যায় প্রহরেক ॥

—কর্ণানন্দ

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম :

হরি নামে নরোত্তমের এক বৎসর গেল ॥

* * * * *

তুই লক্ষ নাম সাধন নিভূতে বসিয়া ।

সংখ্যা নাম লয় বসি রাত্রিতে জাগিয়া ॥

-প্রেমবিলাস

শ্রীল শ্যামানন্দ :

লক্ষ নাম রাত্রি দিনে করয়ে সাধন ।

গোবিন্দ দর্শন আর সাধু দরশন ॥

—শ্যামানন্দ প্রকাশ

(উ) শিষ্যগণ প্রতি শ্রীল নরোত্তম :

শুন শিষ্যগণ কহিয়ে তোমাকে—

প্রথমেই কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি লক্ষ যার—

সে লইবে লক্ষনাম সংখ্যা আপনার

—কর্ণানন্দ

(ক) স্বশিষ্য কলানিধি, প্রতি আচার্য, শ্রীনিবাস :

(১) প্রভু কহে তুমি চৈতন্যের প্রিয়তম ।

লক্ষ নাম জপ তুমি করিবা নিয়ম ॥

—কর্ণানন্দ

(২) রাজা বীরহাঙ্গির প্রতি শ্রীনিবাস :

শ্রীকামগায়ত্রীর অর্থ যত্নে শুনাইল ।

হরিনাম জপের নিবন্ধ করাইল ॥

—ভক্তিরত্নাকর

(৯) শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর শিষ্যবৃন্দ সংখ্যা পূর্বক মহামন্ত্র
জপ ও কীর্তন করিয়াছেন । যথা কর্ণানন্দে—

রামকৃষ্ণ চট্টরাজ প্রভুর এক শাখা ।

আহার মহিমা গুণ নিঃকরিব লেখা ॥

হরিনামে রত সদা নয় হরিনাম ।

সংখ্যা করি জপে সদা অবিশ্রাম ॥

প্রভুর কৃপা পাত্র এক চট্টকৃষ্ণ দাস

লক্ষ হরিনাম জপে নামেই বিশ্বাস ॥

তবে সেই কলানিধি চট্টরাজ নাম ।

সদা হরিনাম জপে এই তার কাম ॥

কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে প্রভুর ভক্তগণ

এক এক লক্ষ হরিনাম করেন গ্রহণ ॥

গোবিন্দের ঘরনী সুচরিতা বুদ্ধিমস্তা ।
 শ্রীঈশ্বরীর কৃপা পাত্রী অতি সুচরিতা ॥
 লক্ষ হরিনাম সেই করেন গ্রহণ ।
 এই মতে রহে তেঁহ সুখাবিষ্ট মন ॥

কর্ণপুর কবিরাজ করয়ে ভজন ।
 লক্ষ হরিনাম যেই করেন গ্রহণ ॥

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীমথুরা দাস ।
 হরিনাম জপে সদা পরম উল্লাস ॥

শ্রীআত্মারাম প্রভুর প্রিয় দাস ।
 সদা হরিনাম জপে সংসারে উদাস ॥

রামচরণ চক্রবর্তী প্রভুর সেবক ।
 তার যত শিষ্যগণ কহিব কতক ॥
 লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা করিয়া ।
 রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা শুনে আশ্বাদিয়া ॥

তবে প্রভু কৃপা কৈল নিমাই কবিরাজে ।
 রূপ কবিরাজের ভ্রাতা খ্যাত জগ মাঝে ॥
 লক্ষ হরিনাম জপে সংখ্যা যে করিয়া ।
 সংকীর্ণনে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥

শ্যামসুন্দর দাস সরল ব্রাহ্মণ ।
 লক্ষ হরিনাম যেই করেন গ্রহণ ॥

শ্রীদুর্গাদাস নাম প্রভুর নিজ দাস ।
 সদা হরিনাম জপে অন্তরে উল্লাস ॥

আর এক সেবক শ্রীগোকুলানন্দ দাস ।

সদা হরিনাম জপে নামেতে বিশ্বাস ॥

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর যেই মহাশয় ;

প্রভুর প্রিয় শাখা হয় মধুর আশয় ॥

হরিনামে রত সদা লয় হরিনাম ।

সংখ্যা করি জপে নাম সদা অবিশ্রাম ॥

তারপরে কৃপা কৈল শ্রীমন্ত চক্রবর্তী ।

পদাশ্রয় পাঞা যেঁহ হৈলা কৃত-কীৰ্ত্তি ॥*

লক্ষ হরিনাম লয় নামেতে বিশ্বাস ।

বড়ই রসিক তেঁহ সংসারে উদাস ॥

তবে ত করিল দয়া বল্লভী কবিপতি ।

পদাশ্রয় পাইয়া যেঁহ হইলা সুকৃতি ॥

হরিনাম জপে সদা করিয়া নিয়ম ।

লক্ষ হরিনাম করি করেন ভোজন ॥

প্রেমীকৃষ্ণদাস আর মুক্তারামদাস ।

প্রভুপদে নিষ্ঠা সদা অন্তরে উল্লাস ॥

সবে মিলি একত্রেতে করেন ভোজন ।

লক্ষ হরিনাম সবে করেন গ্রহণ ॥

(গ)

“গৌরহরি” হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল নরোত্তম, আচার্য্য শ্রীনিবাস, শ্রীল শ্যামানন্দ এবং তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যাদির সময় পর্য্যন্ত যে সব বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রকাশিত বা হস্তলিখিত দেখিতে পাওয়া যায় সে সব গ্রন্থে

* কৃত কীৰ্ত্তি ।

কোথাও দেখা যায় না যে সংখ্যা না রাখিয়া “মহামন্ত্র” কীর্তিত হইয়াছেন কিম্বা কীর্তনের কোন বিধান আছে।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ মন্দিরের গোস্বামী শ্রীবনমালীলাল কর্তৃক ফাল্গুন কৃষ্ণা ৩০ বুধবার ১৯৯০ তারিখে লিখিত ব্যবস্থা পত্র হইতে জানা যায় যে ঐ সময়ের ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্বে বৃন্দাবনে ‘মহামন্ত্র’ ‘অসংখ্যাত’ কীর্তনের কোন প্রচার ছিল না।—

আবার, ঐ সময়ে স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীমদু অদ্বৈত বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীমুরলীমোহন গোস্বামীর ব্যবস্থাপিত পত্রাংশ—

‘আমি শ্রীবৃন্দাবনে নামসংকীর্তনে মহামন্ত্রের গান হওয়া শুনি নাই। আমি বৃদ্ধ, বর্তমানে ৮২ বৎসর বয়স। আমাদের পূর্বপুরুষ হইতে ব্যবহার প্রচলন আছে, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিবার পূর্বে ‘মহামন্ত্রে’ দীক্ষা দেওয়া। সুতরাং তাহার গান রীতি বিরুদ্ধ।’

আজও পূর্ববঙ্গ, উড়িষ্যা ও বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় যে ‘মহামন্ত্র’ নাম যজ্ঞের ‘অষ্টপ্রহর’, ‘চব্বিশ প্রহর’ অনুষ্ঠানে সংখ্যা রাখিবার জন্য জাপক নিযুক্ত থাকে।

ব্রজে শ্রীঅদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহাশয় বড় দশকুশী প্রভৃতি তাল সহকারে ‘মহামন্ত্র’ কীর্তন করিতেন। কিন্তু, সে কীর্তনে সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন—

“গোরা জপে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” ইত্যাদি ভাবে তিনি গান করিতেন। ঐরূপ নাম কীর্তন গৌরগুণগানেই পর্য্যবসিত হয়। স্বতন্ত্র তারক ব্রহ্ম নাম কীর্তন নহে।

১৩৪৪ বঙ্গাব্দে শ্রীবৃন্দাবনে কুস্ত মেলা হয়। সেই সময়ের কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে নদীয়া ও ব্রজের গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে দুইটি গোষ্ঠী হয়। প্রথম গোষ্ঠীর মত,—

‘মহামন্ত্র’ সংখ্যা পূর্বক জপ্য,—কীর্তনীয় নয়, হইতে পারে না। এই গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রখ্যাত বৈষ্ণব :—

শ্রীল বনমালীলাল গোস্বামী ও প্রভুপাদ শ্রীমুরলী মোহন গোস্বামী এবং শ্রীগৌরচন্দ্র গোস্বামী, (সোনার গৌরাজ্ঞ অঙ্গন, নবদ্বীপ), শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামী, (শান্তিপুর); শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী, (শ্রীখণ্ড); শ্রীমণীন্দ্র মোহন গোস্বামী, (ঝাণ্ডাটীয়া, ঢাকা); শ্রীকুঞ্জলাল গোস্বামী ভাগবতরত্ন, (শ্রীধাম নবদ্বীপ); ব্রজমণ্ডলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক শ্রীভক্তিচরণ দাস; শ্রীকামিনীবল্লভ গোস্বামী, (রাধাবাগ; বৃন্দাবন); শ্রীগোপালদাস বাবাজী প্রভৃতি।

অপর গোষ্ঠীর অভিমত,—

‘মহামন্ত্র’ জপ্য এবং অসংখ্যাত কীর্তনীয়ও। ইহাদের প্রধান— তাৎকালীন চার সম্প্রদায়ের মোহান্ত, শ্রীনিত্যানন্দদাস; শ্রীবিনোদ-বিহারী গোস্বামী, (কালিদহ, বৃন্দাবন); প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি।

ঐ মতদ্বৈধতা এ যাবতকাল শিষ্য পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে।

—(‘বড় অবতার’ ও ‘অশেষ বিশেষ রস আন্বাদনকারী’ রঙ্গিয়া গৌরহরির এ ও এক লীলা রঙ্গ !)

(২)

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের ইতিহাস :

১৫৩৩।৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত বিরক্ত বৈষ্ণব সমাজের (মাধব গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়) প্রধান বা মহাস্তবৃন্দের 'নাম মালা' ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ—

মহাস্তব নাম : বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ

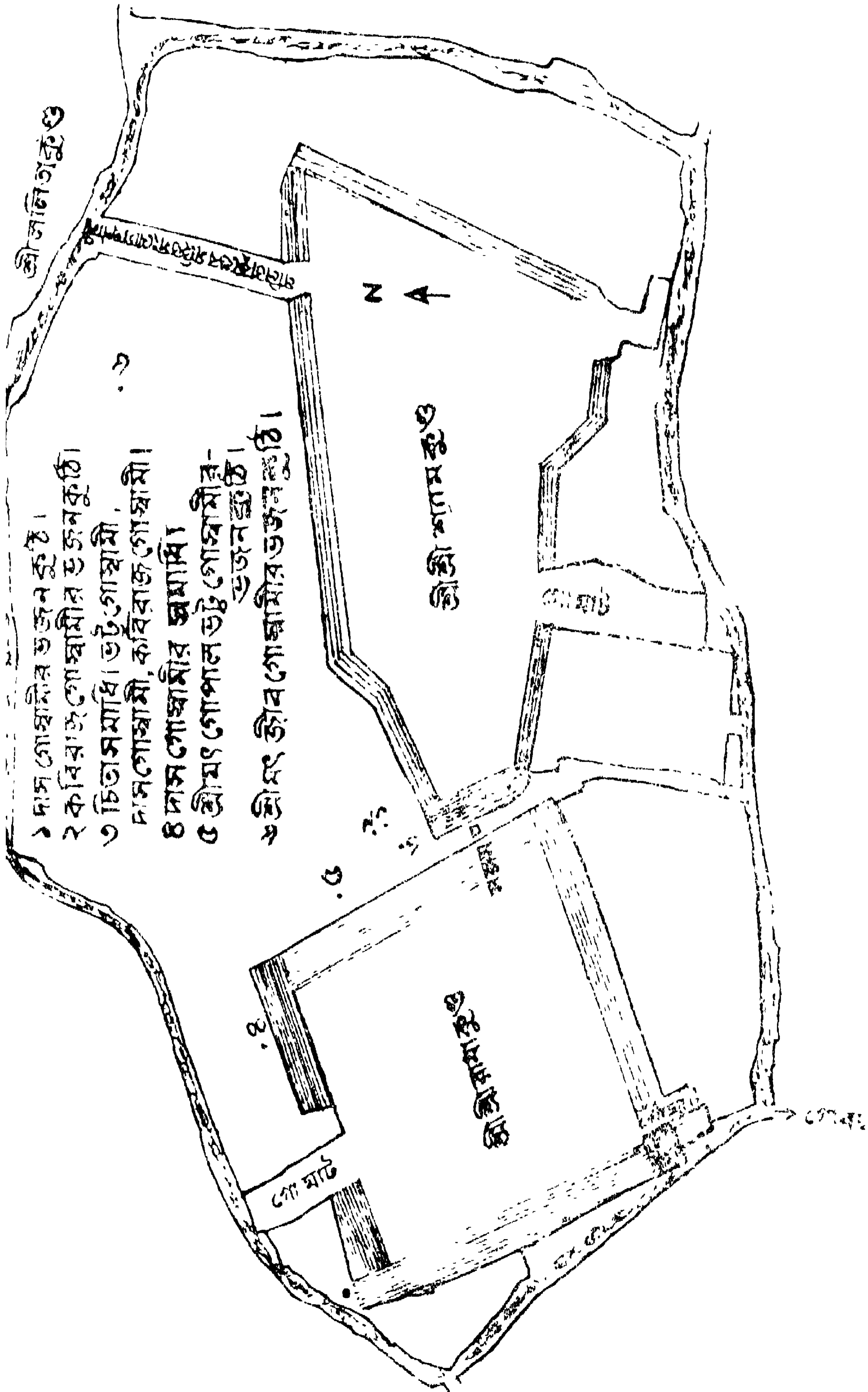
১। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী—১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে দুইটি কবলায় ৬০ মূল্যে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের জমি খরিদ হয়। জমি বিক্রেতাদের নাম—

কামনা, শালোয়া, অধব, মাজ্জু, কুজ্জা ও গোবিন্দ। ঐ সময় পর্য্যন্ত জমিটি ধান্যক্ষেত্র ছিল।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের জমি খরিদ হয়।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ঐ কুণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বস্থ জমিগুলি খরিদ হয় তাণ্ডাব চারটি 'কবলা' আছে।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের বিজয়া দশমীর দিন (৭ রিক্ মাহারজব সন ৯৯৬ হিজরী) শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রী শ্যামকুণ্ডের সত্ত্ব স্বামীত্ব শ্রীজীব গোস্বামীকে দানপত্র যোগে অর্পণ করেন। ঐ দান পত্রটির অবিকল নকল মুদ্রিত আছে শ্রীহরিদাস দাস কৃত গোড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৫১। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের একটি নকসা (on Scale) সন্নিবেশিত হইল।



২। শ্রীজীব গোস্বামী—

৩। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ—১৬৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে ‘বারিখা’ ‘হায়দর,’ ‘গদর’ ও ‘মকর্দম’ “একরারনামা” দেয় যে রাধাকুণ্ডে জল যাইবার প্রণালীতে কেহ কর্ষণ করিবে না। এবং কুণ্ডের ইষ্টক অপসারিত করিবে না এবং তীরস্থ বৃক্ষ ছেদন করিবে না। এই দলিলের নকলও মুদ্রিত আছে উপরোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন পৃঃ—২৫২

৪। নন্দকিশোর দাস—

৫। শ্রীব্রজকুমার দাস—(পারস্য ভাষায় লিখিত বাদশাহী পরওয়ানা) ইংরাজী তারিখ ২৫ শে এপ্রিল ১৬৭২ খৃষ্টাব্দ। বঙ্গানুবাদ :—গোঁসাই ব্রজকুমার আসিয়া নালিশ করিতেছে যে পরগণা সাহারের অন্তর্গত আরাট গ্রামে রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী তাহার গৃহ আছে এবং সেই স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছে। গ্রামের অধিবাসিগণ বলপূর্বক ঐ জমিতে তাহাকে বাধা দিতেছে বৃক্ষাদি ছেদন করিতেছে এবং চতুর্দিকে স্থাপিত প্রস্তর সমূহ লইয়া যাইতেছে। সুতরাং ইহা লিখিত হইতেছে যে নালিশকারী যাহাতে সস্তুষ্ট চিন্তে ধ্যান ও ভগবানের নাম করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারে এতদর্থে তদন্ত করিয়া এবং অত্যাচারকারীগণ যাহাতে অভিযোগকারীর জমির চতুর্দিকস্থ বৃক্ষাদি ছেদন না করে এবং প্রস্তর লইয়া না যায় তজ্জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবা। এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিবা। ৭ই মহরম্ ১০৮৩

নোট :—

(১) এই সময় গ্রামের মালিক ‘গোড রাজপুতগণ’ ছিল। বিদেশীয় ব্যক্তিগণ স্বাধীন ভাবে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ও খাজনা

না দিয়া এই সমুদয় ভূমি দখল করিবে ইহা তাহার সহ্য করিতে পারিত না।

(২) আওরংজেব মথুরার নাম রাখিয়াছিলেন ‘ইসলামাবাদ’ ও বৃন্দাবনের নাম ‘মুদিনাবাদ’।

(৩) আকবর বাদশাহ যখন আসিয়াছিলেন তিনি বৃন্দাবনকে ‘ফকিরাবাদ’ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

৬। শ্রীগোপীরমণ দাস ওরফে শ্রীগোপীমোহন দাস—
মহম্মদশাহ বাদশাহের আমলের তিনখানি পারস্য ভাষায় লিখিত
পরওয়ানা আছে। বঙ্গানুবাদ নীচে—

(১) ইং ৩০শে জুলাই ১৭২১ খৃষ্টাব্দ :—

নৈয়দইজ্জৎখাঁ বাহাদুর অধীন মহম্মদসাহ গাজী। অনুগ্রহ প্রার্থী
সাহস সম্পন্ন মহম্মদ হায়াৎ বৃন্দাবন গ্রামের অধিবাসী গোপীরমণ দাস
অভিযোগ করিতেছে যে তাহার পূর্বাধিকারীগণ সাহার পরগণার
অন্তর্গত রাধাকুণ্ড গ্রামে জমি খরিদ করিয়া তাহাতে পুষ্করিণী ও
ও উদ্যান নির্মাণ করিয়াছে। মথুরা সহরের মালঝোলা নিবাসী
‘নাথুরাম’ নামক এক ব্যক্তি ঐ জমি লইয়া গোলমাল করিতেছে।
সুতরাং তোমাকে লিখা যাইতেছে যে তুমি মনযোগ সহকারে ও
বিশদ ভাবে তদন্ত করিবা এবং যদি অভিযোগ সত্য হয় তবে ঐ
প্রকার বাধা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবা, আর যদি সত্য না হয়, তবে
যথার্থ সংবাদ প্রেরণ করিবা। লিখিত হইল ১৬ই শওয়াল ২ জুলুস
১১৩৩ হিজরী।

(২) ইং তারিখ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৭৩১ খৃষ্টাব্দ :—

মথুরা অন্তর্গত পরগণা ইসলামাবাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
ফৌজদারগণের গোমস্তা সমূহকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ১৭ই

শওয়াল বৎসর ২ তারিখের সরকারী সম্পত্তি তত্ত্বাবধারকের ছাপ যুক্ত (UNDER the Seal of the Controller of Estate) প্রধান মন্ত্রী কুতুবুল মুলক্ ইয়ামিন্ উদৌলীয় পরওয়ানা, দ্বারা সরকারের প্রধানগণকে জ্ঞাপন করা যায় যে বৃন্দাবনবাসী গোপীরমণ দাসের পূর্বাধিকার জীব গোস্বামী গ্রাম আরাথ ওরফে রাধাকুণ্ডে জমি ক্রয় করতঃ তাহাতে পুষ্করিণী ও উদ্যান প্রস্তুত করে। এক্ষণে মথুরা ন নার্সী নাথুরাম নামক এক ব্যক্তি অন্যান্য লোকদের সহায়তায় ঐ জমির কিয়দংশ বেদখল করিয়া তাহাতে সীমানার দেওয়াল নির্মাণ করিতে চাহিতেছে। আমার উপর তদন্তের ভার দেওয়া হয় এবং হুকুম হয় যে এ বিষয়ে সত্য অবধারণ পূর্বক অত্যাচার নিবারণ করিবা। তদনুসারে আমি দলিল পত্রাদি দেখিয়া ও মান্যগণ্য ব্যক্তিদিগের নাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তদন্ত করিয়াছি। ইহাতে পরিষ্কার কাপে দেখা যাইতেছে যে কথিত জমি জীব গোস্বামীর হয় এবং ঐ সম্পত্তিতে আর কেহ সরিক নাই। অন্য কাহারও ঐ জমি লইয়া বিবাদ বা গোলমাল করা উচিত নহে। তারিখ ২৭ জিল্ল হুজ সন ২ জুলুস ১৭ই শওয়াল ১-১১৩৩ হিজরী।

(৩) ইং তারিখ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৭২১ খৃষ্টাব্দ :—

সাদতর্খা বাহাছুর ও বাহাছুর জাং-এর ছাপ যুক্ত এক্যমতে পরওয়ানা তারিখ ১৬ জলহুজ ৩।

এতদ্বারা সুবা আত্রার অন্তর্গত পরগণা সাহারের অধীন বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মচারীগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বৃন্দাবনবাসী গোপীরমণ দাস এই অভিযোগ দ্বারা জানাইতেছে যে উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত আরাথ ওরফে রাধাকুণ্ড গ্রামে জীবগোস্বামী জমি খরিদ করিয়া পুষ্করিণী ও উদ্যান নির্মাণ করিয়াছে। কতিপয় লোক শত্রুতা করিয়া ঐ জমিতে বাধা দিতেছে এবং বলপূর্বক বৃক্ষ ছেদন করিয়া লইয়া যাইতেছে। সুতরাং তোমাকে এতদ্বারা জানান

যাইতেছে যে তুমি তদন্ত করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ করিবা ।
এবং এরূপ বন্দোবস্ত করিবা যে, মূল্য দ্বারা ক্রীত জমিতে কেহ বাধা
না জন্মায় এবং বৃক্ষাদি কাটিয়া না লয় এবং পুনরায় যেন এই প্রকার
নালিশ উপস্থিত না হয় ।

৭ । অনন্ত দাস—

৮ । রাধামোহন দাস (ওরফে রাধারমণ দাস)—

৯ । নিত্যানন্দ দাস—

১০ । পরমানন্দ দাস

১১ । চরণ দাস

১২ । গোবিন্দ দাস

১৩ । পুরুষোত্তম দাস

(১) বাংলার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের নাতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন
ওরফে প্রখ্যাত “লালাবাবু” ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দিকে,
প্রস্তর সোপান দ্বারা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তীর বাঁধাইয়া দিয়া
ছিলেন । এ ঘটনার সময় ‘মহান্ত’ কে ছিলেন তাহা আজ জানিবার
উপায় নাই । কারণ ‘রেকড়ে’ দেখা যাইতেছে কেবল মহান্তদের
ক্রমিক নাম । কিন্তু, কে কখন মহান্ত হন বা কবে মহান্তপদ ত্যাগ
করেন বা অপ্রকট হন এ সব জানার আজ কোন উপায় নাই ।

(২) ঐ ‘লালাবাবু’ দাস গোস্বামীর আদর্শে প্রাকৃত বিষয় বৈভব
পরিত্যাগ পূর্বক নিষ্কিঞ্চন বেশ ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাঁহার শেষ
জীবন শ্রীকৃষ্ণতটে অতিবাহিত করেন । তিনি যে স্থানে ভজন
করিতেন আজও সে স্থানটির নাম “লালাবাবু”র ভজনকুঠি । ১৮১১
খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ রক্ষা করেন ।

(৩) শ্রীনবদ্বীপ দাস প্রণীত শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস পৃষ্ঠা ৫১ হইতে প্রাপ্ত সংবাদ দৃষ্টে বলা যায় যে—

(ক) ব্রজের মুকুটমণি শ্রীকুণ্ডতটে নিষ্কিঞ্চন ভাবে ভজন যে ‘সর্বোত্তম ভজন’ ইহা ‘লালাবাবুর’ দৃষ্টান্তে বৈষ্ণববৃন্দের মনে স্থান পায়। এবং লালাবাবুর অপ্রকটের পর হইতে ধীরে ধীরে বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীকুণ্ডতটে বাস ও ভজন জন্ম আসিতে আরম্ভ করেন।

(খ) ১৩ই অক্টোবর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের একটি চুক্তিপত্র আছে। বিরক্ত বৈষ্ণবগণ ঐ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া স্বীকার করেন যে ভজন কুঠি বাসী বৈষ্ণবগণ সম্প্রদায় মতে ধর্ম্ম আচরণ করতঃ একত্রে বাস করিবেন এবং যদি কেহ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য করেন তবে মহান্ত তাহাকে কুঠি হইতে বাহির করিয়া দিবেন এবং সে সমাজে পতিত হইবে। এই কারণে, (আজও) শ্রীরাধাকুণ্ডের মহান্তকে চলতি কথায় দেড়শত কুঠির মালিক বলে।

১৪। বৈষ্ণবচরণ দাস—রাধাকুণ্ডের উপরিতন জমিদার ‘গোড় রাজপুতগণের’ হাত হইতে কাল প্রভাবে সত্ব স্বামীত্ব রাজা পৃথ্বীসিংএ আসে। এই পৃথ্বীসিং ১৮৭৪ সালে বিরক্ত বৈষ্ণবদের খসড়া নক্সার ৯৪২ নং জমি ও ৪টি ভজন কুঠি বেদখল করেন। সে সময় মহান্ত ‘বৈষ্ণবচরণ দাস’। স্মতরাং বাধ্য হইয়া ইহার বৈষ্ণবচরণ দাসজী প্রমুখ আগরার সদর দেওয়ানী আদালতে মৌলবী মহম্মদ আব্দুল কোয়াইয়া খাঁ সবজজ আদালতে ১৮৭৫ সালে ৭ই জুন তারিখে স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্বক ঐজমি ও কুঠি পূর্ণ দখলের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। মোকদ্দমা বিচারাধান থাকাকালীন মহান্ত পরলোক গমন করেন।

১৫। গৌরাঙ্গ দাস—পূর্বতন মহান্ত বৈষ্ণবচরণ দাসজীর সময়ের বিচারাধীন মোকদ্দমা ইহার সময় নিষ্পত্তি হয়।

ইনি, বেদখলি জমিতে দখল প্রাপ্ত হইলেন। বিরক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ ঐ সব কুঠিতে জমিদারের বিরুদ্ধে স্বত্ববান হইয়া বহুকাল যাবৎ পরম্পরা ক্রমে দখলকার আছে ইহা ধার্ষ্য হয়। বৈষ্ণবচরণ দাসজী ও তাঁহার পূর্বতন মহন্তগণ যে এই দেড়শত কুঠির মালিক তাহা প্রমাণিত হয়।

নোট : “ভারত” অখণ্ড,—এ বোধ সে সময়ে সর্বসাধারণের মনে রেখাপাত করে নাই। সুতরাং ‘ভারত গৌরব’ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণববৃন্দকে ‘বিদেশী’ আখ্যা দিয়া জমিদাররা (প্রথম জমিদার গোড় রাজপুতগণ ও পরবর্ত্তী জমিদার রাজা পৃথ্বী সিং) অশেষ বিশেষ উৎপীড়ন করিতে চেষ্টা করেন। নিজেরা ব্যর্থকাম হইলে সরল গ্রামবাসীদের প্ররোচিত করেন। ফলে, গ্রামবাসীদের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিবাদ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তহশীলদার যে তদন্ত করিয়াছিল তাহাতেও কুণ্ডয় এবং কুণ্ডীরস্থ জমি সমুদয় বৈষ্ণবদিগের সত্ত্ব সাব্যস্ত হইয়াছিল।

১৬। যমুনা দাস—

১৭। গোপী দাস—

১৮। নরসিং দাস—এই সময়ে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—

(১) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহান্ত নরসিং দাসজী মথুরা জেলার মুন্সেফ্ লালা আলোপী প্রসাদের আদালতে শ্রীআনন্দ দাসজীর নামে নালিশ করেন। ঐ নালিশ আপীল পর্য্যন্ত হইয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় যে শ্রীরাধাকুণ্ডের ‘মহান্ত’ কেবল বাঙ্গালীই হইতে পারে। মণিপুরী জাতির কোন ব্যক্তি হইতে পারে না।

(২) শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস প্রণেতা মহান্ত শ্রীনবদ্বীপ দাসজী ঐ গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় তৃতীয় প্যারায় লিখিয়াছেন—

“আমরা শুনিয়াছি যে, নরসিংহ দাসজীর সময়ে গোড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পৃথক ‘গৌরমন্ত’ দ্বারা শ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর উপাসনা

হইবে কি 'কৃষ্ণমন্ত্রে' অর্চনা হইবে ইহা লইয়া মতভেদ উপস্থিত হয়। শ্রীরাধাকুণ্ডে এ বিবাদ ছড়াইয়া পড়ে। এবং তাহার ফলে যে সমুদয় বৈষ্ণব 'গৌরমন্ত্রের' পক্ষ অবলম্বন করিলেন তাঁহারা 'নূতন ঘেরা' নামক স্থানে পৃথকভাবে বাস করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা রাধাকুণ্ডের মহাস্তুর অধীন রহিলেন না।”

১৯। গুরুচরণদাস : ঘটনা—

শ্রীশ্বরূপদাসজী নামক জনৈক নিষ্কিঞ্চন বাবাজী সাধারণের নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া প্রায় ১২।১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দিক প্রস্তরের দ্বারা বাঁধাইয়া দেন। এই কার্যের সম্পূর্ণ পরিচালনা, রাজস্বি বনমালী বাহাদুরের সেরেস্তা হইতে হইয়াছিল।

অপর ঘটনা :—

কলিকাতার গিরিশবাবু শ্রীকুণ্ডেয়ের সঙ্গমস্থলে মার্বেল পাথর দ্বারা রত্নবেদী নামক ছত্র নিৰ্ম্মাণ করেন এবং শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণদিকে একটি ধর্মশালা করেন।

তৃতীয় ঘটনা—

গ্রামের জমিদার আবাগড়ের বলবন্ত সিং বৈষ্ণবদিগের 'বুর্জা' নামক দুইটি ভজন কুঠি বলপূর্বক ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং ঐ জমি হইতে তাহাদিগকে বে-দখল করেন। সেই জন্ত মহাস্ত শ্রীগুরুচরণ দাসজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে মহাবনের মুন্সেফ্-আদালতে ৭৮৯নং মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকা সময়ে উক্ত মহাস্ত পরলোকগমন করেন।

২০। ব্রজানন্দ দাস—পূর্বেক্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। ঐ মোকদ্দমায় ধার্য্য হয় যে পূর্ববর্তী মহাস্ত উইল দ্বারা পরবর্তী মহাস্ত নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং মহাস্ত দেড়শত কুঠির মালিক। এই

‘বুরজা’ দেড়শত কুঠির অন্তর্গত ও পরিক্রমার রাস্তার নিকট অবস্থিত । সুতরাং বিবাদী উপরিতন জমিদার হইলেও বৈষ্ণবগণ স্মরণাতীত কাল হইতে কুঠি সমূহের দখলদার থাকায় তাহারা বিরুদ্ধ স্বভেদে স্বভবান হইয়াছে অতএব মহান্ত নালিশী জমিতে দখল পাইবে ।

নোট : ঐ ‘বুরজার’ কতক অংশে বর্তমান ‘নিতাই’ ‘গৌর’ মন্দির ও শ্রীবিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন ।

২১। গোবিন্দ দাসজী—১২ই ডিসেম্বর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি মহান্ত হন । তাঁর সময়ে পাইকপাড়ার রাণী যোগমায়া ‘তমালতলার’ যে স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু বসিয়াছিলেন ঐ ‘ঘাট’ মহান্তের অনুমতি লইয়া বাঁধাইয়া দেন । (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ) ।

২২। জগদানন্দ দাসজী (১৯১২—১৯২০)—১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আবাগড়ের রাজা সূর্য্যপাল সিং (নাবালক) তাহার পক্ষে Court of wards জগদানন্দ দাসজীর নামে ১৫০ কুঠি বাবদ কুঠির প্রতি দুই পয়সা হিসাবে খাজনা ধরিয়া ১৬৮ টাকা দাবী করিয়া মুনসেফ আদালতে ২২৩নং মোকদ্দমা দায়ের করেন । এই মোকদ্দমাটা আপীল পর্য্যন্ত যায় । খাজনার দাবী খারিজ হয় ।

ঐ Court of wards বিভিন্ন বৈষ্ণবের নামে বাকী খাজনার দাবী করিয়া Case Nos. ২১০, ২১৫ ও ২৯৬ দায়ের করেন । এই সব মোকদ্দমাগুলিও খারিজ হয় ।

২৩। রাধারমণ দাসজী—

২৪। গৌর দাসজী—

২৫। অদ্বৈত দাসজী—

২৬। সনাতন দাসজী—ইনি ১৯২৫ খৃঃ হইতে মহান্ত ছিলেন । তাঁহার সময়ে ‘জ্ঞানবাবু’ তমালতলায় যে স্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু উপবেশন

করিয়াছিলেন ঐ স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ-
দ্বয়ের 'তীর' ও 'নীর' সর্বদা পরিষ্কার রাখা স্থানীয় বৈষ্ণববৃন্দের
ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ।

নোট : বিভিন্ন দলিল দৃষ্টে পাওয়া যায় যে,— দাস গোস্বামীর
পরবর্তী কাল হইতে সদা সর্বদা উপরিতন ভূম্যধিকারীগণ প্রায়
অখণ্ডভাবে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত বৈষ্ণববৃন্দকে নিজেদের অধীনে রাখিবার
অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কখন কখন নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে
আবার কখনও বা গ্রামবাসীদের দ্বারাও নানান অশান্তি সৃষ্টি
করিয়াছেন। 'নিতাই' 'গৌরের' করুণায় তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা
সর্বদাই ব্যর্থ হইয়াছে।

১৭। কৃষ্ণচৈতন্য দাসজী :—একটি নূতন ঘটনা—

১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ভূম্যধিকারীর ভৃত্যগণ জলের পান্য পরিষ্কার
কার্যে বাধা দিতে লাগিল। এবারের বিরোধের তীব্রতা অনুভব
করিয়া শ্রীকৃষ্ণবানী বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজীকে মহান্ত করেন।
Date of appointment 23. 4. 29 (ইনি পূর্বাশ্রমে ইংরাজী
ও দর্শনের M. A. এবং বাঙ্গলার একজন প্রখ্যাত Deputy
Magistrate ছিলেন।) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একদা মাধবদাস বাবাজী
শ্রীকৃষ্ণের জলের পান্য পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তখন আবাগড়ের
জমিদারের ভৃত্যগণ তাঁহাকে বশপূর্বক বিতাড়িত করিল। এই
ঘটনায় বৈষ্ণববৃন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সমগ্র ব্রজ মণ্ডলে এবং
বাংলাদেশ বা 'গোড় মণ্ডলে' এই সংবাদটি প্রচারিত হইল। সকলে
স্থির করিলেন যে উপযুক্ত ভাবে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া
বিরুদ্ধাচারী গ্রামবাসীবৃন্দের প্রশমিত করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণগোপাল গোস্বামী, নামময়-জীবন শ্রীরামদাস
বাবাজী মহাশয় এবং তাঁহাদেরই কৃপাসিঞ্চিত কতিপয় ব্যক্তির

সাহায্যে মহাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাসজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে আবাগড়ের রাজা ও শ্রীরঙ্গজী স্বামীর নামে কুণ্ডলের 'জলে' ও 'স্থলে' নিজ স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থ ও জল পরিষ্কার করিতে যাহাতে ভূম্যধিকারী বাধা দিতে না পারে তজ্জন্য মথুরার মুন্সেফ, আদালতে ৪৮২নং স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করেন।* বিবাদের ঘোরত্ব ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে নানা বিতর্ক লইয়া এই মোকদ্দমা তিনবার মহামান্য হাইকোর্ট সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত হয় এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া বাদীপক্ষ সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন।

এই মোকদ্দমায় কাগজ, পত্র, নথি, দলিলাদি ও শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ ও সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের বিষয় বস্তু প্রস্তুত করেন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব পরম ভাগবত শ্রীনবদ্বীপ দাসজী। পররত্নীকালে ইনি যখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাস্ত্র হন সেই সময় ইনি “শ্রীরাধাকৃষ্ণের ইতিহাস” নামক পুস্তিকা রচনা করেন। সেই গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তাঁহার অনুভব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (ইনি পূর্বাশ্রমে B. A. B.L. রংপুরের খ্যাতনামা উকিল। এবং বিরক্ত জীবনে ভাগবতভূষণ ও সাহিত্যরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।)

যথা—

“সর্বত্যাগী অসহায় ভিক্ষাপঞ্জীবী গোড়ীয় বিরক্ত বৈষ্ণবগণ যাহারা কেবল সাধন ভজনের জন্য ব্রজে আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই চারিশত বৎসর ব্যাপিয়া যে বৈষয়িক উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে—ইহার পশ্চাতে কি এক রহস্য আছে তাহা কে উদ্ঘাটন করিবে? শ্রীভগবানের এই পরম বিরোধময় বিচিত্র লীলার উদ্দেশ্য কি তাহা ক্ষুদ্র জীবের বোধগম্য হওয়া কঠিন।”

১৮। নরহরি দাসজী—১৯৪০।৪১ খৃষ্টাব্দে—

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই মহাস্ত্রজীর অনুমতি লইয়া ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ

* আঞ্জি ও অডারের নকল। শেষ অংশে ২।১ সংযোজিত হইল।

ধনী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ পাল মহাশয় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের এবং ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল তুলিয়া ফেলিয়া উত্তমরূপে পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন। এবং শ্যামকুণ্ডের প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য সম্পন্ন করেন। পঙ্কোদ্ধারে দেখা গেল যে তাহার তলদেশের চতুর্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত। লোকে বলিতে লাগিল, এইসব ঝরণাও এক একটি পৃথক তীর্থ। শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে একটি ছোট কুণ্ড দেখা গেল। ইহার মধ্যেও ঝরণা আছে, জল বরফের ন্যায় শীতল। ইহাকে ‘কঙ্কনকুণ্ড’ বলে। ঐ সময়ে Photo তোলা হয়, তাহার চিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

শ্যামকুণ্ডের মধ্যস্থলেও একটি বৃহত্তর কুণ্ড আছে। ইহাকে ‘বজ্র কুণ্ড’ বলে। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ইহা খনন করেন। শ্যামকুণ্ডের মধ্যেও বহু ঝরণা রহিয়াছে। (উপরের সিঁড়ির ৩টি ধাপের পর) এত উপরে এই সব ঝরণা কেমন করিয়া আসিল তাহা আশ্চর্যের বিষয়। এই সব ঝরণার জল দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণদ্বয় আবার পূর্ণ হইয়াছিল।

২৯। নবদ্বীপ দাসজী—পূর্বাশ্রমে নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী B. A. BL. রংপুরে ২৬ বৎসর ওকালতি করার পর ব্রজে আসেন। নবদ্বীপের প্রাপ্ত উপাধি সাহিত্যরত্ন ; “ভাগবত ভূষণ”।

৩০। কৃষ্ণচৈতন্য দাসজী—২-৭-৫৪ হইতে তিন মাস।

৩১। গৌরাঙ্গ দাসজী—২-৯-৫৫—১১-৪-৫৭ পর্যন্ত মহাস্ত ছিলেন।

৩২। মনোহর দাসজী—(১২-৪-৫৭—১৭-১২-৫৯) মথুরা মুন্সেফ্, আদালতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫২৮নং মামলা দায়ের হয়।

মোকদ্দমাটি,—সঙ্গম হইতে দক্ষিণে পরিক্রমা রাস্তা যাইবার বাঁধান স্থানে ১টি কুঠিকে লইয়া।

৩৩। রাধাকৃষ্ণ দাসজী—(১৮-১২-৫৯ হইতে, বর্তমানেও আছেন।) ২৭।৩।৬৩ তারিখে উপরোক্ত মোকদ্দমায় মহাস্ত জয়লাভ করেন। আর একটি মোকদ্দমা : এবার ১৩ জন রাধাকৃষ্ণের পাণ্ডা ও রামদাস সাধু (নিম্বাকি) দাবী করেন সঙ্গমে ৮' x ৮' এবং নিম-তলার নিম্নের চবুতরা। মোকদ্দমার মধ্য পথে তাহারা পলায়ন করেন। মহাস্ত একতরফা ডিগ্রী পান। **Case No. 373/59**

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীশ্রীশ্যামকৃষ্ণের স্বত্ব স্বামীত্বে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াও আজ কয়েক বৎসর হইতে চেষ্টা চলিতেছে যে, নিক্ষিঞ্চন বৈষ্ণবদের নিকট **Municipal Tax** আদায় করা।

নোট : অপর দুইটি ঘটনা—

(১) গোবালিয়রের মহারাজের ভ্রাতা শ্রীবলবন্তু ভাই সাহেব। তিনি কুমুম সরোবরের শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাসজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং তাহার উপদেশ ক্রমে কুমুম সরোবরের নিকটে ১৯১৩ সালে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ শ্রীবিগহ স্থাপিত করেন। ঐ মন্দির হইতে ব্রজচৌরাশীক্রোশের চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হইয়া থাকে। মন্দির পরিচালনাতির জন্য ট্রাষ্টীগণ আছেন।

(২) ১৯১৮ সালে মহাস্ত শ্রীজগদানন্দ দাসজীর সময়ে মণি-পুরের মহারাজা ৬৫০০ টাকা ব্যয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণদেবের চতুর্দিকে পরিক্রমায় পথ পাথরের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেন এবং ঐ রাস্তায় রাত্রিকালে আলোক দিবার বন্দোবস্ত করেন এবং এই সময়ে শ্রীব্রজমোহন দাসজির উদ্যোগে শ্রীরাধাকৃষ্ণে টাউন এরিয়া অর্থাৎ 'মিউনিসিপালিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ (ক)

শ্রীকৃষ্ণদেবের স্বত্ব স্বামিত্ব লইয়া মথুরায় মুনসেফ
কোর্টে দরখাস্তের ও মুনসেফের অর্ডারের নকল :

True copy of plaint in the Civil Suit No. 482 of 1931

IN

The Court of the Munsif, Muttra.

Civil Suit No. 482 of 1932

Mohant Krishna Chaitany Das Chela of Krishna Das
Birakta Bairagi Sadhoo in his capacity of Mohant of Bairagi
Sadhoo of Madhwa Gouriya Sampradaya of Radhakund,
Krishnakund in the Pargana and District Muttra.....

.....Plaintiff

Verses

(1) Srijut Raja Suryopal Singh Sahab Rais of Awagarh.

(2) Thakur Ranggi Maharaj installed in the big Temple
of his name Situated in the town of Brindaban through Sri
Swami Rangacharyaji Maharaj Mohanta resident of the said
Temple of Brindaban.

.....Defendants

The above named plaintiff begs respectfully to state as
follows :—

(1) That the Sites of two adjacent Sacred tanks Radhakund
& Krishnakund (Situate in village Arath alias Radhakund in
the Pargana and District Muttra) which are mentioned in the

life history of Hindu God Srikrishna had through lapse of ages been forgotten even by the people of the locality and all that was left of those tanks on the spot in the 16th. century A. D. was a shallow depression in the grounds with remnants of kacha Banks here & there in which water used to collect in rainy season, paddy crops were grown by the villagers, and the spot was then called (black & white fields) by the residents of the village.

(2) That in the 16th. century A. D. Sri Chaitanya Mahaprabhoo the most prominent saint of Madhwa Gouriya Sampradaya of Hindu religion (believed to be an incarnation of Srikrishna in his wanderings through Upper India happened to visit the village mentioned in para 1. of this plaint, which was then called (Arath) after the name of the demon Arishta that had been slain, there by God Srikrishna.

(3) That the said saint determined the said site of Racha and Krishnakund of revered memory, which the villagers through ignorance had begun to call (black & white fields) as stated above.

(4) That on his subsequent return to Puri in Orissa, the said saint deputed his disciples to go to Brajamandala (now called Muttra District) to revive Vaishnavism, to brighten the faith of people in Srikrishna and to re-awaken their interest in the holy scenes and places connected with his early life in the locality which were through lapse of time well nigh forgotten as such :

(5) That thus in the 16th. century A. D. Rupa Sanatan Ballava & the latter's son Jiva Goswami, being members of a very distinguished family who renounced, the world and

became the said Chaitanya Mahaprabhu's disciples---came to Muttra District along with other disciples including one Raghunath Das.

(6) That the said Raghunath Das & other disciples in the 16th. century A. D. acquired by way of purchase in the name of Jiva Goswami, plots of land, the sites of present Radha & Krishnakund aforesaid as also lands surrounding and abutting on the said kunds, from the then village people owners of the land, and there-after on the said plots the said disciples, chiefly Jiva Goswami and his successors, the Mahants for the time being (with the help of well-to-do Vaisnava followers of their faith who were eager to serve them) excavated the said tanks known as Radha & Krishnakund, built PUCCA GHATS with stone steps and Banks of the said tanks, and round those tanks built temples and many small cottages for the residence of Birakta Sadhoos of their faith---there after called 150. 'Kutis'.

(7) That from time to time on the lands so acquired the predecessors in office of the 'plaintiff' of this suit---the Mahant for the time being, planted trees, built a PUCCA stone-paved way for (Parikrama) perambulation round the said sacred tanks, and most of the said kutis and temples, permitted other people of their faith as also other Vaisnavas to raise temples thereon on plots given to them and allowed Birakta Sadhoos to occupy the said cottages, ejected them in case of their mis-behaviour and continued to exercise all the rights of ownership from the time of the said purchase hundreds of years ago upto now.

(8) That the predecessors of the plaintiff and the plaintiffs have, all along in their own right been in peaceful

possession of their said properties and have been keeping the said PUCCA GHATS in a state of good repairs, have been skimming the green moss from the surface water of the tanks and draining and cleaning the silt from the beds there of, and have also repaired and maintained the big sluice drain for rain water leading to the tank from Lalitakund.

(9) That the plaintiff to this suit, being the present Mahant is as such vested with all the rights aforesaid.

(10) That on a few occasions during time past, the ancestors of defendant No 1, as also other persons took unwarranted steps detrimental to some of the said rights of the Mahant for the time being, and matters reaching the law courts or the Government Officer incharge of the Administration of Justice, the rights of the Mahant for the time being, were vindicated.

(11) That inspite of several adjudications declaring the said right of ownership of the predecessors of the plaintiff, the servants of defendants No. 1 & 2 have of late, since a notice was given to them in Nov, 1930, begun to offer casual and half-hearted obstructions in skimming the moss from surface water of the tanks and removing silt from the bed of the same and works incidental to the same and there-by are clouding the title of the plaintiff only in portions marked in blue in the map appended to this plaint, being the land which underlies the tank. The defendants or their predecessors have nor have had any semblance of title to the same. The plaintiff and his predecessors have been owners and possessors of the same long before the advent of the British rule and the purchase by defendants' predecc-

ssors. Under the above circumstances the plaintiff is entitled to a declaration of his right to it and perpetual injunction against defendants No. 1 & 2, or any such other consequential relief as the circumstances of the case permit.

(12) That because in July last the said perfunctory opposition and obstruction has been started, cause of action for the suit arose to the plaintiff in July 1931 against defendant No. 1 and 2 at village Radhakund, Pargana Muttra, within the jurisdiction of this court.

(13) That in order to avoid the worry of a Law suit the plaintiff by means of his humble petition dated the September 29th. 1931 prayed the defendants 1 & 2, to direct their servants not to molest the sadhoos occupying the said 'Kuties' by leave & licence and on behalf of the plaintiff, in the exercise of plainliffs right referred to above, in Para II, but as yet they have vouch-safed no reply, hence the present suit.

(14) That as the Collector Sahib of Muttra has in reply to a formal notice of suit under section 80 of C. P. C. assured the plaintiff that the Government did not claim the property in dispute as its own, the Secretary of State for India in Council is not made a party.

(15) That the object of this suit is not at all to infringe in any way the right of public to visit and use the sacred Tanks Radha and Krishnakund for religious purposes or to object to the pandas or any other persons leading the pilgrims to the said Tanks and taking voluntary gifts from them.

(16) That for perpose of Jurisdiction & payment of Court fees this suit is valued at Rs. 1000/- (One thousand) as stated below :—

Prayer :

(A) That it may be declared that the plaintiff in his capacity of Mohant of Birakta Shadhoos of Radhakund of the Madhwa Gouriya Sampradaya is the owner of the land lying under the tanks Krishnakund and Radhakund situate in the town of Radhakund, pargana and district Mattura of which land 'a plan coloured blue' is herewith submitted and on which the plaintiff relies. Valued at Rs. 800/- the value of the land.

(B) The defendants be restrained by a perpetual injunction from interfering with the exercise of his rights by the plaintiff to skim the moss from the surface water and to remove silt from the beds of the said tanks, and other acts incidental thereto. Valued at Rs. 200/-

(C) The Cost of this Suit may be awarded against the contesting defendants.

(D) That any other relief to which the Court may appear just may be granted to the plaintiff.

The contents of paragraph 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and part of Para 8, paras 10, 12, and 16 of this plaint are stated on information received and believed to be true and the contents of part of para 8, 9, 11, 13, 14 and 15 are stated out of my own knowledge.

Verified at.....

By.....

general attorney of the plaintiff aforesaid.

Autograph signature of

Dated the 5th. Nov. 1931.

Signature of
(*in Urdu*)

Order :—

Subject to the right of the hindus to visit & use the sacred tanks Radhakund & Krishnakund for religious purpose and the right of the pandas to lead the pilgrims there and take voluntary gift from them, the plft in his capacity as the Mahanta Gouriya Samprodarya is declared to be the owner and the claim for perpetual injunction is decreed to be their owner and the claim for perpetual injunction is decreed as prayed. The plft will have his Costs from the Difts & the latter will bear their own.

Sd. Bindbashini Prasad

Munsif. 1. 6. 33

(৩)

কবিরাজ গোস্বামি বিরচিত দাস গোস্বামীর
সংস্কৃত শোচক ও পয়ারে অনুবাদ :

বন্দে রঘুনাথদাসং রাধাকুণ্ড নিবাসিনং ।

চৈতন্য-সর্বভজ্ঞং ত্যক্তান্যাত্মাবমুক্তমম ॥

(শ্রীজীব গোস্বামীকৃত বৈষ্ণববন্দনা)

আমাদের গ্রন্থ মন্দিরে (শ্রী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির, শ্রীশ্রীভাগবত
আচার্য্যের পাটবাড়ী, বরাহনগর)—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
বিরচিত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক (সংস্কৃতে) আছে ।

(পুঁথি নং ১৩৫৫।৬০)

পরবর্তী মহাজন শ্রীল রাধাবল্লভ দাস কর্তৃক বাংলা পয়ারে (বৃহৎ
ভক্তিতত্ত্বসারে ধৃত) দাস গোস্বামীর শোচকটি যে কবিরাজ গোস্বামীর
সংস্কৃতেই বঙ্গানুবাদ তাহা পরিষ্কার বোঝা যায় । এখানে আমরা
প্রথমে কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃতে বিরচিত দাস গোস্বামীর শোচক
ও তাহার বাংলা পয়ার নীচে উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীচৈতন্যহরেঃ কৃপাসমুদয়াদ্দারান্ গৃহান্ সম্পদঃ

সদেদশাধিপত্যঞ্চ যঃ স্বমলবৎ ত্যক্ত্বা পুরশ্চর্য্যা ।*

প্রাপ্তঃ শ্রীপুরুষোত্তমং পদযুগং তস্যাসিষেবে চিরং

ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ১

* শ্লোকটির দ্বিতীয় চরণের প্রথম পাদে “ছন্দোভঙ্গ” থাকা সত্ত্বেও আদর্শ
পাঠটিই রক্ষা করা হইল ।

শ্রীচৈতন্য কৃপা হইতে রঘুনাথ দাস চিতে
 পরম বৈরাগ্য উপজিলা ।
 দারাগৃহ সম্পদ নিজ রাজ্য-অধিপদ
 মল প্রায় সকল ত্যজিলা ॥
 পুরশ্চর্যা কৃষ্ণ নামে গেলা শ্রী পুরুষোত্তমে
 গৌরাজ্ঞের পদযুগ সেবে ।
 এষ্ট মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়নগোচর কবে হবে ॥

রাধাকৃষ্ণ ইতি স্বনাম দদতা গোবর্দ্ধিনাদ্রেঃ শিলাং
 গুঞ্জাহারমপি ক্রমাৎ ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে যঃ স্বয়ং ।
 রাধায়াঞ্চ সমর্পিতঃ করুণয়া চৈতন্যগোস্বামিনা
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ২

গৌরাজ্ঞ দয়াল হঞা রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া
 গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে ।
 ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে শ্রী রাধিকার শ্রীচরণে
 সমর্পণ করিলা তাহারে ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোচর কবে হবে ॥

চৈতন্যে নিভৃতং ব্রজং গতবতি ছিদ্ভা কচান্ যো ব্রজং
 প্রাপ্তস্তদ্ বিরহাতুরঃ স্বকবপূর্হাতুঞ্চ গোবর্দ্ধনে ।
 দ্রষ্টুং রূপসনাতনৌ কৃততনুত্রাণশ্চ তাভ্যাং বলাৎ
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৩

চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ে করে
 বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ।
 দেহত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবন্ধনে
 ছুই গোসাত্তিও তাহারে দেখিলা ॥
 ধরি রূপ সনাতন রাখিল তার জীবন
 দেহত্যাগ করিতে না দিলা ।
 ছুই গোসাত্তিওর আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ড তটে গিয়া
 বাস করি নিয়ম করিলা ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোচর কবে হবে ॥

রাধাকুণ্ডতটে বসন্ নিয়মিতঃ স্বভ্রাতৃরূপাজ্জয়া
 বাসঃ কাম্বলকৈঃ ফলৈব্রজভুবৈর্গবৈশ্চ বৃত্তিং দধৎ
 রাধাং সংস্মৃতিকীর্তনৈর্ভজতি যঃ স্নানং ত্রিসঙ্ক্যং চরন্
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচর ॥ ৪

ছেঁড়া কাম্বল পরিধান বনফল গব্য খান
 অন্ন আদি না করি আহার ।
 তিন সঙ্ক্যা স্নান করি স্মরণ কীর্তন করি
 রাধাপদ ভজন যাঁহার ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোচর কবে হবে ॥

পঞ্চাশদ্ ঘটিকাঃ সদানয়দহোরাত্রস্ত ষট্ সংযুতা
 রাধাকৃষ্ণবিলাসসংস্মৃতিযুতৈঃ সঙ্কীর্তনৈর্বন্দনৈঃ ।
 যঃ শেতে ঘটিকাচতুষ্টয়মিহাপ্যালোকতেশ্বেশ্বরৌ
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৫

ছাপান দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ গুণগানে
 স্মরণেতে সদাই গোড়ায় ।
 চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে
 এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোড়র কবে হবে ॥

শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দমধুপো যঃ শ্রীস্বরূপাশ্রিতে
 রূপাঈছেতনুঃ সনাতনগতির্গোপালভট্টপ্রিয়ঃ ।
 শ্রীরূপাশ্রিতঃ সদগুণাশ্রিতপদো জীবহতিবাৎসল্যবান্
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৬

গৌরাজের পদাশুভে রাখে মনোভঙ্গরাজে
 স্বরূপের সদাই ধেরায় ।
 অভেদ শ্রীরূপের সনে গতি যার সনাতনে
 ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয় ॥
 শ্রীরূপের গণ যত তাঁর পদে আশ্রিত
 অত্যন্ত বাৎসল্য যঁর জীবে ।
 সেই আর্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি
 প্রভুর করুণা হবে কবে ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোচর কবে হবে ॥

শ্রীকৃষ্ণং স্বগণং শচীসুতমথো নানাবতারাংশ্চ যঃ
 শ্রীমূর্তীশ্চ নিশামিতা নিশামিতা যাযাশ্চ লীলাশ্রলীঃ ।
 প্রত্যেকং নমতীহ বৈষ্ণবগান্ দৃষ্টান্ শ্রুতান্ প্রত্যহং
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৭

শ্রীচৈতন্য শচীসুত তাঁর গণ হয় যত
 অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম ।
 গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
 সবারে করয়ে পরণাম ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোচর করে হবে ॥

রাধামাধবয়োবিয়োগবিধুরো ভোগানশেষান্ ত্র-মাৎ
 চৈতন্যস্য সনাতনস্য চ রসান্ যট্ চান্নমপ্যভ্যাজৎ ।
 শ্রীরূপস্য জলং বিনা হরিকথাং বাচং স্বরূপস্য যো
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৮

রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
 শুখারুখা অন্ন মাত্র মার ।
 গৌরাজ্ঞের বিয়োগে গল্প ছাড়ি দিল আগে
 ফল গব্য করিল আহার ॥
 সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
 কেবল করয়ে জল পান ।
 রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
 রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥
 এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
 নয়ন গোচর কবে হবে ।

হা রাধে ক হু কৃষ্ণ হা চ ললিতে ক ত্বং বিশাখেহসি বা
 হা চৈতন্যমহাপ্রভো ক হু ভবান্ হা হা স্বরূপ ক বা
 হা শ্রীরূপসনাতনেত্যহুদিনং রোদিত্যলং যঃ সদা
 ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ৯

শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাঁহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হঞা কাঁদে ।
কৃষ্ণকথা আলাপনে না শুনিয়া শ্রবণে
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্জুনাদে ॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন ।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা 'স্বরূপ' মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ন গোচর কবে হবে ॥

যঃ প্রাপ্তান্ ব্রজবাসিনোহুতিশিশুন্ মান্য্যান্ দ্বিজান্ বৈষ্ণবান্
প্রীত্যোথায় মুদোপগুহ্য তিলকেনাভ্যর্চয়ন্ ভাষণৈঃ
মৈত্র্যা কৃষ্ণপদাশ্রিতান্ সুখয়তি স্বাজ্জ্যুশ্রিতান্ লাক্ষনৈঃ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ১০

যিনি ব্রজবাসীগণকে এবং ব্রজবাসী শিশুবৃন্দকে মান্য করিতেন
এবং তত্রস্থ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকেও মান্য করিতেন, তাঁহাদিগকে
দেখিয়াই প্রীতির সহিত উখিত হইয়া তাহাদিগকে সন্তোষ বিধান
আলাপ ও উৎকৃষ্ট প্রীতির উপহার দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেন এবং কৃষ্ণ-
ভক্ত মাত্রকে ও নিজের আশ্রিত জনকে সমভাবে লালন করিতেন
সেই শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আবার আমার নয়ন গোচর হোন ।

চৈতন্যস্য সনাতনস্য চ বিনা রূপস্য সংদর্শম্
চক্ষুস্বত্বমিদং বৃথেনি বিম্বশনক্ষ্যং দধে স্বেচ্ছয়া ।
স্বাচারং দ্বিগুণীচকার ভজনং চাক্ষোহপি যঃ সাগ্রহম্ ।
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ১১

যিনি শ্রীচৈতন্য দেব, শ্রীসনাতন, শ্রীরাপের অদর্শনে নিজের
দৃষ্টিকে বৃথা মনে করিয়া স্বেচ্ছায় অন্ধত্ব সাধন করিয়া ছিলেন এবং
অন্ধাবস্থায় নিজের আচরণ এবং ভজনে দ্বিগুণ আগ্রহ সাধন করিয়া
ছিলেন সেই শ্রীরঘুনাথ আমার নয়ন গোচর হোন ।

রাধাবল্লভ রাধিকাদয়িত হে গান্ধর্বিবকাবান্ধব
শ্রীরাধা প্রিয় রাধিকারমণ হে বৃন্দাবনেশেশ্বর
গোবিন্দাচ্যুত কৃষ্ণ ভো কুরুকৃপামিথং সদা রৌতি যঃ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ১ -

হে রাধাবল্লভ গান্ধর্বিবকা-বান্ধব
রাধিকারমণ রাধানাথ ।

* * * *

রাধে মাধবি মাধবপ্রিয়তমে গান্ধর্বিবকে রাধিকে
কৃষ্ণ প্রেয়সি দেবি কৃষ্ণ দয়িতে কুণ্ডপ্রিয়াধিশ্বর
দানং মাং স্বপদান্তিকং নয় দয়াং কুবর্ত্যলং রৌতি যঃ
ভূয়াৎ শ্রীরঘুনাথ দাস ইহ মে ভূয়ঃ স দৃগ্গোচরঃ ॥ ১৩

হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা-ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন ।

হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ॥

* * * *

ইদমমলং তৎপ্রকৃতি সূচকং শ্রীহরিপ্রণয় বিলসৎ সরস ভক্তি-

—সিন্ধোস্তবম্

পঠতি কৃতীহ রঘুনাথদাসস্য যঃ, স ভবতি রাধিকা হরেঃ

—কৃপাভাজনম্

ইতি—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীরঘুনাথদাস
গোস্বামিনঃ গুণলেশ সূচকং নমাস্তম্ ।

নোট : ১০ ও ১১ নম্বর শ্লোকের অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর
দেবশর্মা কৃত ।

(৪)

“শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি সম্বন্ধে” :

‘শ্রীকৃষ্ণ-তটে’ দাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির আজও বর্তমান । ঐ সমাধিকে প্রত্যহ স্নান, আঙ্কিত, তিলক, ‘মাঠা-ভোগ’ সমর্পণ আদি সবই করা হয় । এই সমাধির সেবক শ্রীভাগবত দাস বাবাজী মহাশয়ের চেষ্টা ও নেতৃত্বে ১৩৭১ বঙ্গাব্দের শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা (৩ রা চৈত্র বুধবার) হইতে ‘অখণ্ড নাম সংকীৰ্ত্তন’ চলিতেছেন ।

কিন্তু এই সমাধিটি তাঁর (দাস গোস্বামীর) ‘পুষ্প সমাধি’ কি ‘পূর্ণ সমাধি’ তাহা বলা যায় না । প্রথমতঃ কোনও গ্রন্থে উল্লেখ নাই । তারপর, যাঁহাদের প্রায় একশত বর্ষ বয়স (এখনো প্রকট) এইরূপ বিভিন্ন ব্রজবাসী ও বৈষ্ণববৃন্দের সহিত আমরা আলাপ করিয়াছি । কোন হৃদিস পাওয়া যাইতেছে না ।

‘ଗଣ୍ଡିରା-ବିହାରୀ ଶୌରହରିର ବୀଜାଚଳ ଚୌକାର ଧାରକ’



ଶ୍ରୀମତୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନେ

(৫)

‘বৈষ্ণব মতে ‘আবির্ভাব, ‘তিরোভাব’ রহস্য’ :

বৈষ্ণব ধর্মমতে ‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ যেন অভিনয় মঞ্চে যবনিকাপাত ।

‘যবনিকাটি’ ওঠান থাকিলে দর্শকবৃন্দ অভিনয় ও অভিনেতাদের দেখিতে পায় । আর যবনিকাটি ফেলা থাকিলে দর্শকমণ্ডলী কিছুই দেখিতে পায় না । কিন্তু যঁরা যঁরা রঙ্গমঞ্চের অধিকারীর নিজজন, তাঁরা যবনিকাপাত থাকিলেও অভিনেতাদের সহজেই দেখিতে পান । এমন কি অভিনয়কালে, তাঁহাদিগকে (অভিনয়ের মর্যাদায়) সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া পাটির লোকদের ও অভিনেতাদের দেখিতে হয় ; আর, যবনিকা পড়িলে তাহাদের (অধিকারীর লোকদের) সে সম্ভ্রম ঘুচিয়া যায় ।—আসে নিবিড় ‘আত্মীয়তা’ ‘অন্তরঙ্গতা’ ।

এই কারণে, কোনও ‘বৈষ্ণবগ্রন্থে তিরোভাব’ তিথিটি ছাড়া ‘অপ্রকট’ বৎসরের উল্লেখ দেখা যায় না ।

যুগের পরিবর্তনে ও ভক্তির হুল্লভতায় কিম্বা ন্যূনতায় আজ সমাজের এক অংশ, আচার্য্যবৃন্দের তিরোভাব বৎসর নির্ধারণে মহা ব্যস্ত । ফলে দেখা যায় “কেবল বাক্যের বাণিজ্য” । যাহা সংরক্ষিত হয় নাই,—তাহা আজ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে ?

(৩)

“আরোপে আরতি হেরে দাস গোস্বামী হুঁ হুঁ করে” ৫
আরোপ (আ—রূপ + নিচ্ ভাবে অচ্) অভেদ ভাবনা ।

মহাজনী পদ—

“সুর-নর মুনিগণ, হেরতহিঁ আরতি
ভকত বৎসল প্রতিপালকী ।
বাজে ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ কাঁঝরী,
অঞ্জলি কুমুম গুলাবকী ॥

হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী”

বাবাজী ম’শায়ের আখর :

“গোসাঞি, আর ত’ কিছু বলতে নারে
‘আরোপে আরতি হেরে’

—“গোসাঞি, আর ত’ কিছু বলিতে নারে
গোসাঞির, প্রেমে কণ্ঠ বোধ হল রে
কেবল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে

গোসাঞি-এর বয়ান ভাসে নয়ন নারে

—কেবল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে
নন্দগ্রামের পানে চেয়ে, কেবল, হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করে

শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে গড়ি যায় যায় রে

বলে, তবৈবাম্বি তবৈবাম্বি
‘রাধে’, ত্বয়া বিনা ন জীবামি বলে, তবৈবাম্বি তবৈবাম্বি

রাধে, আমি তোমার আমি তোমার

আমি তোমা বিনা বাঁচি না গো

—রাধে, আমি তোমার আমি তোমার

এত বলি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁরে গড়ি যায় রে”

দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-ভট্টে। গোপীনাথদেবের ‘সঙ্গীত’, যাকার দর্শন
করিতেছেন—

(বিভূ) নন্দগ্রাম সহ নন্দনন্দনের আরতিকাঙ্গিনী সঙ্গোষ্ঠী
যশোদা।—সঙ্গে সঙ্গে ভারতুর বা দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইল।—
এখন দেখিতেছেন—

(বিভূ) নালাচলধাম সহ শ্রীল ‘জগন্নাথদেবের আরতি’ দর্শনকারী
‘গৌরসুন্দর’।—এ গৌরসুন্দর হচ্ছেন—‘বিরাহিনী শুক রাধা’।

‘দাস গোস্বামীর’ কৃপা কটাক্ষে, কাবিরাজ গোস্বামীতেও এই
‘আরোপে’ দর্শনের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। দিক দর্শন হিসাবে
দেখানো হচ্ছে—

যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ সংহতিঃ ।
ন চাস্তুতং তদিত্ব তু যৎ ব্রজাটবী
মুদে হরেরলভত বাধিকাত্মতাম্ ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত . ষষ্ঠ সর্গ ২৫ শ্লোক)

* পরার বঙ্গানুবাদ—

‘যে যে দিকে নটরাজ কবে নিরীক্ষণ ।
সেই দিকে হয় প্রিয়া অঙ্গের স্ফূরণ ॥
হইল শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধিকাময় ।
প্রাণ প্রিয়তম কক্ষে দিতে সুখচয় ॥’

* শ্রীশশধর সরকারের পরারে অনুবাদ—

(৭)

“শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী ভব্ব”

শ্রীশ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম (বরাহনগর, কলিকাতা-৩৫

“নদে” “নীলাচল” ও “ব্রজ”—এই তিন ভূমির ‘প্রকটিত ও অপ্রকটিত’ পরিকর সহ সমন্বয় ভূমি যে “খেতুরী” তাহার অনুভবী দ্রষ্টা শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়ের ‘নিত্য’ বসতিস্থলী হচ্ছেন, এই শ্রীপাঠবাড়ী।

—ইনি ঐতিহাসিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য—

--বাবাজী মহাশয়ের পরিজনদের পরিচয় তিনি নিজেই ‘কীর্তনে’ ব’লে গিয়েছেন।

প্রখ্যাত শ্রীল ভাগবতাচার্য্য এবং প্রখ্যাত শ্রীল রামদাস এই শ্রীপাঠবাড়ীতে ‘নিত্য’ অবস্থান ক’রছেন।

এই স্থানটির প্রকৃত পরিচয় মহাপাঠবাড়ী—লোকে এ নামের পরিচিতি নাই।

ভারতে বিভিন্ন স্থানে অপূর্ব বৈভব সম্পন্ন বৈষ্ণব মহাপুরুষ-বৃন্দের ‘শ্রীপাট’ আছেন। কিন্তু এই ‘মহাপাঠবাড়ীটি’ ‘স্বীয় বৈশিষ্ট্যে’ ‘অমহিমায়’ ‘অনন্য সাধারণ’ এবং ‘তুলনাহীন’।

(শ্রীগুরুদেব শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয়কে ‘বুকে-ধরা’ এই ‘মহাপাঠবাড়ীর’ করুণাতেই এখানে অবস্থান পূর্বক “ঠাকুর হরিদাস” ও “দাস গোস্বামী” এই শ্রীগ্রন্থদ্বয়ের মুদ্রণ কার্য্য সু-সম্পন্ন হ’য়েছে।)



“শ্রীগুরু কৃপায় কি না হয় ?”

“দাস গোস্বামী” গ্রন্থের পূর্ববর্তী সঙ্কলন “ঠাকুর হরিদাস”
সম্বন্ধে প্রখ্যাত মণীষিবৃন্দের অভিমত—

যাঁহারা যাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে সঙ্কলয়িতার সহিত পরিচিত, আশা-
করি তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে এইরূপ কার্য্য
“শ্রীগুরু কৃপা ছাড়া” এই মূর্খ নির্বোধ সঙ্কলয়িতার পক্ষে সম্পূর্ণ
অসম্ভব ।

—এ সঙ্কলনে সঙ্কলয়িতার স্থান যেন “পায়েসের ডাবু” :

—অর্থাৎ পরম সমর্থ দানবীর ধনী ব্যক্তি ‘পরমায়’ প্রস্তুত ও
পরিবেশন,—এই উভয় কার্য্য জ্ঞান রস-গ্রহণে অক্ষম, অতি তুচ্ছ
একটি ‘ডাবু’ ব্যবহার করেন, (সেইরূপ) নিহেতুক কৃপাকারী
“শ্রীগুরু করুণা” ‘অপদার্থ’ তুচ্ছ সঙ্কলয়িতাকে “ঠাকুর হরিদাস” ও
“দাস গোস্বামী” সঙ্কলনে ও প্রকাশে ব্যবহার করিয়াছেন । ইহা
সু-সত্য সু-সত্য ।

—সঙ্কলক

ଅଭିମତ ସଭେତ :

- ୧ । ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହନୀତିକୂମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ—
- ୨ । " " ଶ୍ରୀକୂମାର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ—
- ୩ । " " ରମେଶଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର—
- ୪ । " " କାଳିଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ—
- ୫ । " " ସହାନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ—
- ୬ । — " ଚମଳାକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ—
- ୭ । " " ବିମାନବିହାରୀ ମଜୁମଦାର—
- ୮ । — " ଦେବପ୍ରସାଦ ଘୋଷ—
- ୯ । ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀକାଳିପଦ ଡକ୍ଟରାଚାର୍ଯ୍ୟ—
- ୧୦ । ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ଗ୍ରାସାଚାର୍ଯ୍ୟ—
- ୧୧ । ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନରେନ୍ଦ୍ରଲୀଳ ଗଜୋପାଧ୍ୟାୟ M A
- ୧୨ । ଶ୍ରୀଦୀନନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ—
- ୧୩ । ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦବିହାରୀ ଦତ୍ତ—
- ୧୪ । ଅଧ୍ୟାପକ ଧୀରାନନ୍ଦ ଠାକୁର—
- ୧୫ । ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ—
- ୧୬ । " " ଶ୍ୟାମଳକୂମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ—

ପତ୍ର ପତ୍ରିକା :

- ଅମୃତ—
- ଉଦ୍‌ଘୋଷନ—
- ଉଜ୍ଜୀବନ—
- ଦେଶ—
- ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ—(୧)
- ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ—(୨)
- ଭାବମୁଖେ—
- ବସୁମତୀ (ଦୈନିକ)—
- ବିଷ୍ଣୁବାଣୀ—
- ସୁଗାନ୍ତର—
- ଶ୍ରୀମୁଦର୍ଶନ—
- ସଂହତି—
- ସଂସଦ—
- ହିମାଞ୍ଜୀ—

ବୈକବାଚାର୍ଯ୍ୟ :

- ଶ୍ରୀପାଦ କାନ୍ତପ୍ରିୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ—(ନବସୀପ)
- ଶ୍ରୀମ ଗୌରଘନାନନ୍ଦ ଠାକୁର—(ଶ୍ରୀଧୃତ)— ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିମତ ।

“ঠাকুর হরিদাস” সম্বন্ধে—
ভারতের তথা বাংলার প্রখ্যাত মনীষিবৃন্দের অভিমত :

!! ॐ !! !! শ্রী !!

Dr. Sunil Kumar Chatterji, Sahityartana.

(National Professor of India in Humanities)

16, Hindusthan Park,
Calcutta-29

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত “ঠাকুর হরিদাস” পুস্তকখানি অতি মূল্যবান সংযোজন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকদের মধ্যে ঠাকুর হরিদাস মুসলমানের ঘরে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া যিনি ‘ঘবন হরিদাস’ নামে সুপরিচিত—একজন ক্ষণজন্মা ভক্ত পুরুষ এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীতিভাজন অনুগামী ছিলেন। ধর্মের জন্য এবং নাম প্রচারের জন্য ইহাকে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, প্রাণপণ করিয়া ইনি আপনার ধর্ম নীতিতে অটল ছিলেন, এবং অহিংসক নীতিতে ইহার প্রতিরোধ হইয়াছিল বলিয়া শেষে ইনি জয়ী হইয়াছিলেন। ইহার বৈষ্ণবোচিত দীনতা ও বিনয়, আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের কথা প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিকে অনুরূপ ভাবের দ্বারা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা আশ্রিত করে।

বৈষ্ণব সাহিত্য সাগর মন্থন করিয়া এই অতি উপাদেয় গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। মনে হয়, এখানি হরিদাস সম্পূর্ণ আখ্যান ও অষ্ট কথার একটি পরিপূর্ণ সম্পূট। মূল বা আকর গ্রন্থ সমূহ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি পুস্তকের প্রামাণিকতা বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশেষে

শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজী প্রমুখ সাধকের হরিদাস সঙ্ঘীয় কীর্তন পদ দেওয়া হইয়াছে—তাহা হইতে বাংলাদেশে বৈষ্ণব জনগণের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুর হরিদাসের প্রতি সে প্রগাঢ় আস্থা বিদ্যমান তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলিবে।

এই সুলিখিত ও সুমুদ্রিত পুস্তকে গ্রন্থকার কতকগুলি রঙ্গীন ও একরঙ্গা চিত্র সমিবেশিত করিয়াছেন। সেগুলির মধ্যে কুই চারখানির বিশেষ মূল্য আছে—যেমন কুঞ্জঘাটা রাজবাড়ীতে রক্ষিত শ্রীচৈতন্য দেবের পরিকর সহ চিত্র—ইহা হইতে ঠাকুর হরিদাসের ছবিখানি তিন রঙের রূকে বড় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশা করি ভক্ত, ঐতিহাসিক সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠক সমাজে এই বইয়ের উপযুক্ত সমাদর হইবে। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ৫ই মে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Dr. SRIKUMAR BANARJEE
M. A. B. L. Ph. D.

31, Southern Avenue,
Calcutta-29

Dated Cal. the 24th May 1967

শ্রীশ্রীচূর্ণা

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু—

আপনার সঙ্কলিত ঠাকুর হরিদাস গ্রন্থখানি আশ্বাদন ক'রে সমস্ত অন্তর এক অনির্বচনীয় মধুর রসে আপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপনি যেরূপ একান্ত আত্মনিবেদন ও ভক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে হরিদাসের পুণ্য জীবন কাহিনীর বিবৃত করেছেন ও ঘটনা বিবৃতির সঙ্গে যে রসাস্বাদন যুক্ত করেছেন তাতে গ্রন্থখানি আমাদের মত বিষয়াসক্ত ও চৈতন্য কৃপাহীন জীবকেও এক দিব্য ভাব জগতে উত্তীর্ণ করে দেয়

আর হরিদাস সাধনার অন্তর্নিহিত রসটি পরিস্ফুট করার জন্য নাম-
সিদ্ধ সিদ্ধান্তপ্রবর শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সে অমৃতস্যন্দী
কীর্তন-বিলাস ও তার মধ্যে অপূর্ব আখর সংযোজন অন্তর্ভুক্ত
হয়েছে। তাতে অমাবিল, অজস্র উচ্ছ্বসিত ভক্তিশ্রোতোধারায়
সমস্ত চিত্ত প্রাণিত হয়ে মহাতীর্থ সঙ্গমে অবগাহনের আনন্দ
উপভোগ করে।

এই গ্রন্থের অমৃতরস অভিষেকের মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ধর্মের
কতকগুলি নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে নূতন আলোক চিত্তে স্ফুরিত হয়।
সর্বপ্রথম, শ্রীচৈতন্য পরিকর গোষ্ঠীর মধ্যে—হরিদাস ঠাকুরের অনন্য
বৈশিষ্ট্য ও কেন্দ্রিক আসনটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। শ্রীচৈতন্য অবির্ভাবের
পূর্বেই সে দুই জন সাধকের অন্তরে তাঁর আগমনের পূর্বাভাস
উন্মেষিত হয়েছিল—তাঁরা হচ্ছেন শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর।
এঁরা চৈতন্যের প্রেমধর্ম নিজেদের অন্তরে অনুভব করেছিলেন ও
নাম কীর্তন রসে মগ্ন হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্য জীবনী গ্রন্থ ও
বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী যেন শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী প্রভুকেই কিছুটা
প্রাধান্য দিয়েছে। অদ্বৈত চৈতন্য পরিকর গোষ্ঠীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে
স্থান পেয়েছেন। হরিদাস তাঁহার বিনয় দৈন্যের আতিশয্য ও নির্জন
সাধনারতির জন্য যেন একটি পার্শ্বচরিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি
চৈতন্য ভাবমণ্ডলের প্রান্তলগ্ন একটি স্তিমিত জ্যোতিষ্করূপেই সাধারণ
ভক্ত পাঠকের নিকট প্রতিভাত হয়ে থাকেন। আপনার গ্রন্থ পাঠে
এই ঐতিহাসিক মূল্য বোধের একটা আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে
পড়ে। হরিদাসই এই জ্যোতিষ্করূপের প্রধান গ্রন্থ রূপে কেন্দ্রিয়
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী হয়েছেন। তিনি চৈতন্য ধর্মের
দুইটি প্রধান তত্ত্বের একনিষ্ঠ সাধক ও মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। নাম
মহাত্ম্যের তিনি বিশুদ্ধতম প্রতীক ও স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর সংস্পর্শ
থেকে তাঁর নিজের মহামন্ত্রের পূর্ণ মাধুর্য ও শক্তি উপলব্ধি করেছেন।

আর তাঁর অহিংসা ও অক্রোধ সমদর্শী সর্বজীবে প্রেম হরিদাসের পুণ্য জীবনে যতটা দিব্যরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে এমন আর কোন ভক্তের মধ্যে হয়নি তাছাড়া হরিদাসের তিরোধানে স্বয়ং চৈতন্যদেবকে যত গভীরভাবে অভিভূত করেছে ও তাঁকে প্রেমানন্দ নৃত্যে মাতোয়ারা করেছেন, তিনি হরিদাসের মহাপ্রয়াণকে যতটা দিব্যভাবরসে অভিষিক্ত করেছেন, আর কোন চৈতন্য—অন্তরঙ্গের সে সৌভাগ্য হয় নি। চৈতন্যদেব তাঁর গভীর ভাবমুক্ততার ও প্রেমাশ্রবণের অর্ঘ্য নিবেদনে হরিদাস যে তাঁর দ্বিতীয় সত্তা তার অখণ্ডনীর স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন।

তাছাড়া, বৈষ্ণব সাধনার কেন্দ্রস্থ নিগূঢ় তত্ত্ব প্রত্যয়ও হরিদাসের নামযজ্ঞ সমাহিত, আপাত-জটিলতাহীন, একনিষ্ঠ ভজন প্রণালীর মধ্যে নিহিত। তিনি শুধু নাম জপ করেই সাধারণ ভক্তের মধ্যে নাম মহিমা প্রচার করেই, নামের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে পরিচিত হয়েই গৌরাজ্জ দেবের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-মিলন-তত্ত্ব, দ্বৈত সত্তার অভেদাত্মক রূপ ও গৌর-নিতাইএর নিগূঢ় অন্তরঙ্গতা-রহস্যের মর্মভেদ করেছিলেন। নীলাচল প্রবাস কালে ও সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নবদ্বীপ লীলার প্রারম্ভ-স্তরে শ্রীমন্নহাপ্রভুর যে অন্তরঙ্গ ও বাহিরঙ্গ সাধনার একটি সুস্পষ্ট সীমা নির্দেশ করেছিলেন, ও অধিকারীভেদে তাঁর ভক্তগোষ্ঠীকে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, হরিদাস তাঁর নির্জন সাধনা ও চৈতন্য-সঙ্গ পরিহার সত্ত্বেও এই দুই রূপ সাধনার মধ্যে সংযোগ সেতু রচনার হেতু হয়েছিলেন। নীলাচল বাসী মহাপ্রভু গণ্ডীর সাধনা-প্রকোষ্ঠে অলৌকিক কৃষ্ণ-বিরহরস আশ্বাদন করে সিদ্ধ বকুল তলায় গুহাহিত হরিদাসের কাছে এসে তাঁর আনন্দের পূর্ণতা লাভ করতেন। শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজীর ধ্যানতন্ময়, সাধনানির্মল অনুভূতি হরিদাসের প্রতি শ্রীচৈতন্যের রহস্যময় আকর্ষণের মূল কারণটি আবিষ্কার করেছে। হরিদাসের আননের স্বচ্ছ মুকুরে তিনি তাঁর সত্তা অনুভূত

অপ্রাকৃত ভাবরোমাঞ্চমুকুলিত স্বপ্নার প্রতিফলন দেখতেন। ভক্তের বদন-দর্পণে ভগবানের লীলা-বিলাস রহস্য প্রতিবিস্তৃত হয়ে তার বহিঃরূপ ইন্দ্রিয়গম্য প্রত্যক্ষতায় প্রতিভাত হত। অন্তরে বন্দী রতন-ঝলক বাহিরে ছটা বিস্তার করত; হরিদাসের নাম-সাধনা তাই চৈতন্যাবতারে অনুষ্ঠিত বৃন্দাবন লীলার গোপন বার্তাটির বহিঃনিষ্ক্রমণ পথ রচনা করে। চৈতন্য প্রত্যয়কে ঘনীভূত করে প্রেম-ধর্ম-রস-চর্চাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। চৈতন্য ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে আর কার এরূপ অন্তরতম দৌত্যে অধিকার জন্মেছিল ?

নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত এই গৃহ সাধনার প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলেন এমন কথা বৈষ্ণব মহাজন গ্রন্থে অনুল্লিখিত। তিনি অমৃত কলসের ভাণ্ডারী ছিলেন, কিন্তু এই অমৃত ঘট কিরূপ অলৌকিক কামধেনু দোহনে পূর্ণ হত, তার উৎস-সন্ধানী ছিলেন কি ?

আরও একটি বৈষ্ণব ধর্মের মূল তত্ত্ব হরিদাস ঠাকুরের জীবনের পটভূমিকায় নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে নাম কীর্তন শুধু বহিরঙ্গ সাধনার জপ-মন্ত্র, নামপ্রেম থেকে শুদ্ধাভক্তির স্ফূরণ হয় ও এই নামই সংসার-সাগর-ততীষু জনগণের 'মহাতরণী' এই ধারণার কারণ এই সে আমরা নাম সাধনার প্রথম প্রারম্ভের কথাই জানি, তার চরম সিদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। এই রাধা-নাম-বর্জিত, দিব্যপ্রেমব্যঞ্জনা-হীন, কেবল ভক্তি প্রেরণা প্রণোদিত নাম জপের মধ্যে যে মহাপ্রভুর জীবন সাধনার সূক্ষ্মতম নির্যাস ও প্রেমাতুভূতির মধুরতম রস তাদের সমস্ত দৈবশক্তি নিয়ে অতল গভীরে আত্মগোপন করে আছে ও রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমেই যে এর মন্ত্রচৈতন্যের মধ্যে অলক্ষ্যভাবে ক্রীয়াশীল এ রহস্য অদীক্ষিত অসাধকের কাছে অজ্ঞাতই থাকে। হরিদাসের জীবনে সে সত্য একবার প্রকাশিত হয়েই আবার রহস্য সাগরে ডুব মেরেছে। যিনি হরিদাসের মত নির্ভা নিয়ে নাম-সমুদ্রে নিমজ্জিত হবেন, যিনি প্রেমরত্নাকরের অগাধ জলে আত্মসংবিৎ হারিয়ে ডুবে

যাবেন, তিনিই এই ভক্তি সাধনা মন্ত্রের অক্ষরে অক্ষরে অনাস্বাদিত মধুর রসের সন্ধান পেয়ে অনিবচনীয় তৃপ্তি লাভ করবেন। নাম জপের মৃগালে শেষ পর্য্যন্ত দিব্যরসগন্ধভরা শতদল পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠবে, আবৃত্তির স্থির সরোবরে রসের হিল্লোল উঠে সাধককে এক অপক্লপ আনন্দ তীরে পৌঁছে দেবে।

মস্থিত ছুঙ্কের তলে নবনীতের ন্যায় কঠোর অনুশাসনের লৌহ-শৃঙ্খলবদ্ধ পৌনঃপুনিক মন্ত্র-উচ্চারণ গভীরশায়ী রসের উদ্বোধন ঘটিয়ে ভক্তিপথের পথিককে প্রেম স্বর্গের অভিযাত্রী, চির কিশোর—কিশোরীর লীলাবিলাসস্থল ভাববৃন্দাবনের অধিবাসী করে তুলবে।

এই সত্যই হরিদাসের সর্বভোগশূন্য কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্রাসাধনের মধ্যে দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে। তিনি তাঁর সমস্ত ত্যাগ-বৈরাগ্যের মরুভূমির মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ও শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জশ্যামলিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সাধারণতঃ আধুনিক সমালোচক চৈতন্য-চরিত গ্রন্থগুলিকে পৌরাণিক অতিরঞ্জন দৃষ্ট বলে অভিযোগ করে থাকেন—চৈতন্যের জীবনকাহিনী যেন পৌরাণিক অলৌকিকতার প্রক্ষেপে অনৈতিহাসিক হয়ে উঠেছে। এই অভিযোগ আক্ষরিক ভাবে সত্য অস্তুরধর্মে অসত্য। সত্য সত্যই নবদ্বীপে ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের অবতারকে কেন্দ্র করে পঞ্চদশ—ষোড়শ শতকে বাংলায় পৌরাণিক যুগের পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্য পরিকর গোষ্ঠী যে কোন পৌরাণিক অবতারের কায়দ্যাহের সমধর্মী, সংখ্যায় প্রচুর, উদ্দেশ্যে এক-সূত্রগ্রথিত ও একই লক্ষ্যবদ্ধ। আর পৌরাণিক যুগের অতিমানবিকতা অন্ততঃ দুইটি ঐতিহাসিক চরিত্র উদাহৃত—এক, দিব্যোন্মাদগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য, ও অপর, বাইশ বাজারে বেত খাওয়া অমানুষিক অত্যাচারে অটল যবন দীন হরিদাস—

ইতি—

বৈষ্ণবকৃপাকণাপ্রার্থী

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

Dr. R. C. Mazumdar

4, Bepin Pal Road,
Calcutta-26

সবিনয় নিবেদন

আপনার “ঠাকুর হরিদাস” গ্রন্থখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। এই পরম বৈষ্ণবের জীবন কাহিনীর যত প্রচার হয় ততই ভাল। আপনার গ্রন্থখানি এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

নিং শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

VISVA-BHARATI

KALIDAS BHATTACHARYA

Santiniketan

West Bengal (India)

পরম শ্রদ্ধাপ্পদেষু

১৮ই অক্টোবর

আমি অনেক দিন আগেই আপনার “ঠাকুর হরিদাস” শ্রীগ্রন্থখানি পরম তৃপ্তির সহিত আদৃত্য অতি যত্ন করে পড়েছি। এমন অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক গ্রন্থ বর্তমান সমাজে অতি বিরল। আমার ইচ্ছা হয় বারে বারে ঐ গ্রন্থখানি পাঠ করি। পাঠ করতে বসলে ছাড়া যায় না।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করবেন। ইতি—

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য

মহানাংম সম্প্রদায়

শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন

পোঃ শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর

শ্রীশ্রীমহানাংম যজ্ঞক্রেত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

অমিত শ্রীতিভাজনেষু

আপনার “ঠাকুর হরিদাস” শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম।
শ্রীগ্রন্থ পাকীস্থানে পৌঁছিয়া আমার হাত পর্য্যন্ত আসিতে বেশ
বিলম্ব হইয়াছে।

আপনার গ্রন্থ, গ্রন্থ নয় ‘অমৃতের খণ্ড’। তাহাতে শ্রীল বাবাজী
মহাশয়ের আঁখরে কপূর বাসিত হইয়াছে। গুরুকৃপাস্নাত আপনার
লেখনীস্পর্শে মধুর লীলা মহা-মাধুর্য্য-মহোদধিতে পরিণত হইয়াছে
“স্বাচ্ স্বাচ্ পদে পদে”।

মৃত্যুঞ্জয়ী “ঠাকুর হরিদাস” শ্রীগ্রন্থ আপনাকেও বৈষ্ণব জগতে
অমর করিয়া রাখিবে। ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে আরও ছই তিনটি
গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। তাহাদের তুলনায় আপনার গ্রন্থ পূর্ণাঙ্গ
হইয়াছে। একটি অখণ্ড চিত্র।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসঙ্গী শ্রীকৃপ, শ্রীসনাতন, শ্রীনরহরি,
শ্রীরামানন্দ, শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রমুখ পার্শ্বদগণের প্রত্যেকের সম্বন্ধে
এক একটি গ্রন্থ লিখিয়া আপনি বৈষ্ণব জগতকে আরও সমৃদ্ধিশালী
করুন।

আপনি শ্রীরাম-কিঙ্কর। নিত্যানন্দরামের কৃপায় আপনার
লেখনী মহাযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ভাবাপ্নুত হৃদয় “ঠাকুর
হরিদাস” পাঠ করিতেছি আর ভাবিতোঁছি কবে জগতের প্রতি ঘরে
এই মহারত্ন পূজিত হইবেন। জয় নিতাই। জয় জগদ্বন্ধু।

কৃপার্থী

দাস - মহানাংমত্রত ব্রহ্মচারী

C. K. Bhattacharyya

CALCUTTA

M A. LL B.

Phone : 55-3498

Member. Senate & Syndicate

24A, Hemendra Sen Street,

CALCUTTA University

Calcutta-6

MEMBER OF PARLIAMENT

LOK SABHA

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু—

এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া আপনি ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের মহত্বপূর্ণ সাধন করিয়াছেন। ঠাকুর হরিদাসের চরিত্র ও সাধনা জগতে দুর্লভ। এইজন্য মহাপ্রভুর পরিকরণের মধ্যে এবং ধর্ম-জগতে তাহার বিশেষ স্থান। এই দেবদুর্লভ জীবনের কথা কিন্তু বিশেষ কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আপনি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া বিচ্ছিন্ন জীবন কথাগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া একটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ জীবনীর আকার দান করিয়াছেন। তাহার জন্য সামাজিকগণ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

মহাপ্রভুর সাধনা ও শিক্ষা ঠাকুর হরিদাসের মধ্যে রূপ লইয়াছিল শ্রীহরিদাসকে তাহার প্রত্যক্ষ মূর্তি বলা যাইতে পারে। আপনার রচনায় ও সংগ্রহে ঠাকুর হরিদাসের সে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্য পরিকরণের মধ্যে ঠাকুর হরিদাসের স্থান কোথায় এবং কতখানি তাহাও আপনি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঠাকুর হরিদাসের জীবনী সংগ্রহে আপনি যে সকল সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে নিত্যধামগত শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের সংকীর্ণন পদগুলির বিশেষ স্থান আছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ঠাকুর হরিদাস সম্বন্ধে যে অনুভব লিপিবদ্ধ আছে শ্রীশ্রীবাবাজী মহাশয়ের অনুভব পূর্বাচার্যগণের সে অনুভবকে কেবল 'সম্পূর্ণ' ও 'সমৃদ্ধ' করে নাই তাহাকে 'অধিকতর পরিষ্কৃষ্ট

করিয়েছে' এবং তাহার 'অন্তরঙ্গ ভাবটিকে' উদ্ঘাটিত করিয়েছে। ইহাতেই আপনার যাহা আকাঙ্ক্ষা তাহারও পূরণ হইয়াছে। আপনার রচনায় ও সংগ্রহে ঠাকুর হরিদাস যে ভাবের ভাবুক ছিলেন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বহুভাবসম্বিত সাধনার যে ভাবটি লোক সমাজে প্রকাশার্থে ঠাকুর হরিদাসের আবির্ভাব সে ভাবও সর্বসাধারণের অনুভবসাধ্য হইয়াছে।

“ঠাকুর হরিদাসের” বহুল প্রচার হউক ইহাই আমার প্রার্থনা। শ্রীহরিদাসচরিত্রের অনুধ্যান সমাজের কল্যাণ করিবে এবং বর্তমান সমস্যাপিড়িত জীবনে শান্তি ও স্থিতি আনিবে।

ইতি—

বিনীত শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

পুঃ একটি সংশোধনের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

আপনার গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৩য় পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

“প্রসিদ্ধ কুলটা হইল পরম মহাস্ত্রী” মূল গ্রন্থে এখানে “কুলটা” শব্দের স্থলে বৈষ্ণবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—

Dr. Bimanbehari Mazumdar

M. A. Ph. D. P. R. S.

Bhaghatratna

GOLA DARIAPUR

PAINA-4

Phone : 23156

সবিনয় নিবেদন—

ঐ গ্রন্থের ভাষা যেমন সরল সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী, ভাবও তেমনি মনোহর। সর্বত্র আপনি ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ইহা আরও সুখের বিষয়।...প্রণাম।

ভবদীয়—

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্, এ, বি. এল্,

৫৯বি, আপার স্কুলার রোড,

এম্, পি, (ভারতীয় রাজ্যসভা)

কলিকাতা-৯

ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি

টেলিফোন : ৩৫-১৬৬২

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য

শ্রীরামকিঙ্কর দাস সংকলিত

“ঠাকুর হরিদাস”

অভিমত

৩পূরীধাম স্বর্গদ্বরাস্থ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সেবক শ্রীরামকিঙ্কর দাস মহাশয় সংকলিত “ঠাকুর হরিদাস” গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। একে ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্শ্বদ যবন হরিদাস ঠাকুরের পুণ্য কাহিনী বিবৃত হইয়াছে এই গ্রন্থখানিতে, তত্পরি সংকলিত দাস মহাশয় যেরূপ ভক্তিরসাপ্নুত হইয়া বৈষ্ণব মহাজনদিগের গ্রন্থাদি হইতে ঠাকুর হরিদাসের লীলা কাহিনী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। অথচ শুধু যে উচ্ছ্বাসেই পরিপূর্ণ এই গ্রন্থখানি তাহা নহে, ঠাকুর হরিদাসের জীবনের বিচিত্র কাহিনীর তথ্য ও ঘটনাবলীও অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা হয়ত ঠিক বৈষ্ণবভাবাপন্ন নহেন অথচ সাধু-মহাত্মাদিগের পুণ্য চরিত কথা জানিতে উৎসুক তাঁহাদিগের নিকটও এই গ্রন্থখানি খুবই উপাদেয় ও উপভোগ্য হইবে মনে করি। বলা বাহুল্যমাত্র আধ্যাত্ম জীবন গঠনে অতি মূল্যবান এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আমি কামনা করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

কলিকাতা

ও হরিরোম্

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীকালিদাস তর্কচর্চা

শান্তিনগর,

পোঃ ভদ্রপল্লী, হুগলী

এহু রত্ন সমীক্ষা

শ্রীশ্রীভগবতভক্তি যেমন ভগবদ্ভক্তের প্রাক্তন অসাধারণ মহাপুণ্যের ফল, তেমনই ভগবদ্ভক্তি-বাসিত চিত্ত ভগবদ্ভক্তের পুণ্য-চরিত কথার আলোচনা করিবার সুযোগ লাভ করাও মহাপুণ্য প্রসূত ইহা অসন্দিক্ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। তাই আজ গোড়ীয় বৈষ্ণব চূড়ামণি বিদ্যাচারসম্পন্ন শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস মহাশয়ের নিপুণ লেখনী-প্রসূত “ঠাকুর হরিদাস” নামক গ্রন্থরত্ন আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সাগ্রহে ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া স্বকীয় প্রাক্তন মহাপুণ্য সম্ভাবনা সম্বলিত পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি।

এই গ্রন্থরত্নের ভক্ত-কবি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত ও হরিদাস ঠাকুরের জীবন কথা প্রভৃতি মহামূল্য বহুগ্রন্থ পর্য্যালোচনা পূর্বক বৈষ্ণব কুলের চরম আদর্শভূত যবন হরিদাসের অপূর্ব পবিত্র চরিত্র-গত অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অতি মধুর সামঞ্জস্য পূর্ণ সরল ভাষায় বর্ণনা করিয়া সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের তথা বৈষ্ণব তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমাজের সুগভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

আমরা যখন এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের বর্ণিত হরিদাস ঠাকুরের প্রথম ও দ্বিতীয় অগ্নিপরীক্ষা, কারাবরণ, কারাবাস, দণ্ড বিধান প্রভৃতি বিচিত্র বিস্ময়কর প্রকরণ সমূহ অধ্যয়ন করি, তখন ঠাকুর যবন হরিদাসের কামক্রোধাদিরিপুবিজয়িনী বিস্ময়জননী মহাশক্তি, বৈষ্ণবধর্মে সুমহতী নিষ্ঠা, নামজপের সঙ্কল্প পালনে দৃঢ়তা, নাম সংকীর্ণনে উন্মত্ততা, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিষ্ণুভক্তি প্রসূত অলৌকিক শক্তি-প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লোকাতীত মহাবিস্ময়ে অভিভূত হই এবং মনে মনে তাহার চরণ প্রাপ্তে ভক্তিভরে নিজ মস্তক অবনত করি।

এই মহা গ্রন্থ যাহারা একান্তচিন্তে পাঠ করিবেন তাহাদের কাছে ঠাকুর যবন হরিদাসের পবিত্র জীবন কথার অনুমাত্র অংশ অবিদিত থাকিবে না ।

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার যেমন পরম বৈষ্ণব তেমনই তত্ত্বগবেষণাদক্ষ, তাই তিনি এই গ্রন্থে নানা প্রাচীন গ্রন্থের নানা উপাদেয় তত্ত্ব আহরণ পূর্বক প্রমাণ সহযোগে উপাশ্রয় করিয়া নিঃশেষ রূপে হরিদাস ঠাকুরের চরিত্র বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভের সুযোগ সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন । যাহার ফলে তিনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রেরই অসীম কৃতজ্ঞতা ও অজস্র সাধুবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই ।

এই গ্রন্থাকারেব বর্ণিত যবন হরিদাসের অনন্য সাধারণ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি ও বৈষ্ণবোচিত আচার নিষ্ঠা প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া অতি নাস্তিক দুঃচরিত্র ব্যক্তিও নাস্তিকতার ঘোর অন্ধকার হইতে আস্তিকতার উজ্জ্বল আলোকময় লোকে উন্নীত হইবেন ইহাই আমি সম্ভাবনা করি । অনুভবশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রই এই গ্রন্থের নানা বিষয়ে মহোপকারিতা অনুভব করিবেন । অতএব এই কল্যাণময় মহাগ্রন্থের ভূরি প্রচার কামনা করি এবং শ্রীশ্রীভগবানের চরণ-প্রাপ্তে গ্রন্থকারের নিরাময় কল্যাণময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি ।

—তদীয় গুণমুগ্ধ

শ্রীকালিপদ তর্কচাৰ্য্য

শ্রীমধুসূদন গ্ৰামাচার্য্য

প্রধান অধ্যাপক প্রাচ্যবিভাগ

গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজ । কলিকাতা

শ্রীমৎ রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত “ঠাকুর হরিদাস (১ম খণ্ড) গ্রন্থখানি আছোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম । গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ছায়া অবলম্বন করিয়া ‘তৃণাদপি সূনীচেন’ ইত্যাদি শ্লোকের মূর্ত্তপ্রতীক বৈষ্ণবচূড়ামণি ঠাকুর হরিদাসের কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রয়াণ পর্য্যন্ত অমৃত-মধুরিমাময়ী জীবন কথা আলোচ্য গ্রন্থে অতি নিপুণ ভাবে প্রাঞ্জল-ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন । আমার মনে হয়, সাধন পরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন কাহারও পক্ষে এইরূপ ভাবগন্তীর মাধুর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর নয় । সুতরাং গ্রন্থকার সে একজন ভাগবতোত্তম এবং উন্নত সাধন-মার্গে অধিষ্ঠিত এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ । এই গ্রন্থরত্ন-খানি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানসমন্দিরে হরিদাসের জীবন-বীণা ঝঙ্কত হইয়া উঠে । বিশেষতঃ উক্ত গ্রন্থে বিদেহী ভক্ত সাধক শ্রীমদ্-রামদাস বাবাজী মহোদয়ের রোমাঞ্চ সঞ্চারী অনবদ্য সংকীর্ণন পদাবলী সংযোজিত হওয়ায় মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়াছে । ত্রিতাপ-তাপিত সংসারী জীবগণ এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিলে অভূতপূর্ব শান্তি-লাভের অধিকারী হইবে । আমি বৈষ্ণব ও সুধীসমাজে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি ।

ইতি—

শ্রীমধুসূদন গ্ৰামাচার্য্য

দীননাথ ত্রিপাঠি

কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়দর্শন-তর্ক-তর্ক
শ্রায়-মৌমাংসাতীর্থ, শ্রায়চার্য্য

ঠাকুর হরিদাসের জীবন অতুলনীয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতে তাঁহার লীলাকথা যে ভাবে নিবিষ্ট আছে. তাহা পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উদয় হয়। গ্রন্থকার 'ঠাকুর হরিদাস' গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে সংকলন করিয়া একত্র হরিদাসের সমগ্র লীলা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এই গ্রন্থটি পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। একে শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি ভগবনুতির সহিত হরিদাস ঠাকুরের লীলা বিলাস তারপর শ্রীশ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজের অনুভূতির সম্বন্ধ মিলিত হইয়া উক্ত গ্রন্থখানি নিত্য স্বাধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইয়াছে মনে হয়; আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হরিদাস ঠাকুরের লীলা বুঝিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। তথাপি এই গ্রন্থ পড়িলে মনে হয় পাঠক তাঁহার কিঞ্চিৎ লীলাস্বাদে পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা আমাদের বিশ্বাস।

নিবেদন ইতি—

বিনীত—শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠি

Dr. B. B. Dutt,

30, Motijheel Avenue,
Dumdum, Cal-28

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভক্তপ্রবর, আপনার অপ্রত্যাশিত কৃপাপ্রদত্ত, কলিযুগের প্রহ্লাদ, ভক্তশ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাসের অমর জীবন কাহিনী পাইয়া চমৎকৃত হইলাম এবং নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। ঠাকুর হরিদাস

ছিলেন ভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। লিখিয়াছেন, আপনার মতন ভক্ত-সাধক। এই পবিত্র জীবনীতে তাই বহিয়া গিয়াছে আত্ম ভক্তিরসের অমৃত-বাহিনী সুরধুনী। ভাগ্যবান্ ভক্তই এই পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করিবার অধিকারী। আমার সেই ভাগ্য হয় নাই। তবুও মনে হইল, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মন পবিত্র হইল, দেহ শুদ্ধ হইল। যেই রসের আশ্বাদ পাইলে সংসার-রসগোল্লার রসও বিরস হইয়া যায়, 'মাত্রাস্পর্শ' লোপ পায়, ঠাকুর হরিদাস সেই দিব্যামৃতরস নিত্য আশ্বাদন করিতেন।

বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতেও তাঁহার মন বহির্মুখ করিতে পারে নাই।—আপনার লেখার গুণে সেই চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রামদাস বাবাজীর কীর্তনামৃতে ভক্তপ্রবরের মহিমা বড়ই সুমধুর হইয়াছে। এই ভোগবানের যুগে এই রকম ভক্তিগ্রন্থ যতই প্রচার হয়. ততই মঙ্গল।

আপনি আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

অধ্যাপক—ধীরানন্দ ঠাকুর

ঠাকুর হরিদাস

(অভিমত)

জীবনের সৎ, মহৎ ও সুন্দর বৃত্তিগুলির অনুশীলনই ধর্মসাধনা। এই অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নিত্যকালীন। সুতরাং যথার্থ ধর্মসাধনার আবশ্যিকতাও সার্বকালিক, সার্বদেশিক।

তথাকথিত ধর্মমতসমূহের মূল্যবত্তা নিরূপণ করতে হবে এই শাস্ত্রতর্কালিকাতার মানদণ্ডে।

হিন্দুধর্মের সার স্বরূপের মর্ম অবগত হোলে তার এই নিত্যকালীন-তার কথা উপলব্ধি করা যাবে। হিন্দুধর্মের একটি অভিব্যক্ত সুপরিণত রূপ বৈষ্ণব-ধর্ম। বৈষ্ণব-ধর্মের পরাকাষ্ঠা চৈতন্য প্রবর্তিত গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম।

বৈষ্ণব ধর্মের অনুভব-নির্ভরতা ও যুক্তি প্রতিষ্ঠাতার এবং বাস্তবিকতা ও ভাবিকতার পূর্ণ-স্বরূপের পরিচয় যাঁরা একদা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হোলেন যবন হরিদাস। এই পরিচয়ে মুগ্ধ হোয়েই বোধ হয় তিনি মনে প্রাণে-বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অদ্বৈত-দেব ও চৈতন্য-দেবের সংস্পর্শে এসে হরিদাসের জীবন সাধনা হোতে পেরেছিলো ঐকান্তিকতর, গভীরতর। গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে হরিদাসকে বিশিষ্ট ভাবে গ্রহণ করে ও স্বীকৃতি দিয়ে অদ্বৈত ও চৈতন্যদেব এক অসামান্য মানবতা, দূরদর্শী সমাজ চেতনা এবং যথার্থ, যুক্তিনিষ্ঠ ধর্ম বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশের সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসে এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বিশেষ প্রণিধেয়। বৈষ্ণব-ধর্মের অসাম্প্রদায়িকতা ও সর্বজনীনতার কথাই প্রমাণিত হোয়েছিলো তাঁদের প্রচেষ্টায়।

পক্ষান্তরে হরিদাসেরও অসাধারণ শক্তির কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সেকালের সেই সংকীর্ণ, কুসংস্কার-বিমূঢ়, আতঙ্কময় প্রতিকূল পরিবেশে বৈষ্ণব ধর্মের সর্বজনীনতা ও সত্য সৌন্দর্যময়তার বিষয় উপলব্ধি গ্রহণ ও স্বীকৃতি করার এবং অসহনীয় নির্যাতন সহেও সেই ধর্মকে অবিচলিত নিষ্ঠা ও অনুরাগ দিয়ে ধরে থাকার অনন্য ক্ষমতা হরিদাসেরই ছিলো।

এই বিচারে একান্ত একক ছিলো পরম ভক্ত হরিদাসের জীবন। তাঁর উপলব্ধ ধর্মের অনুভূত অনুরাগের এবং সাধিত আচরণের নৈষ্ঠিকতা সর্ব মানুষের আদর্শ-স্বরূপ।

কিন্তু মহাশক্তিমান এই ভক্তের জীবন-কথা তেমন সুবিদিত নয়।

তাঁর এই স্বরূপের পরিচয় সে-ভাবে দেখাবার চেষ্টাও তেমন দেখা যায়নি এত দিন ।

এখন তার নিদর্শন পেলুম একটি সুলিখিত গ্রন্থে । গ্রন্থটির নাম “ঠাকুর হরিদাস” । লেখক রামকিঙ্কর দাস । এই লেখকও এক পরম বৈষ্ণব ভক্ত, নিষ্ঠাবান সাধক । তাঁর বৈষ্ণব শাস্ত্রের জ্ঞান ও উপলব্ধির নিদর্শন আছে এই সদৃশ্যে ।

ইনি মুখ্যত ‘চৈতন্য ভাগবত’ এবং ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থদ্বয়কেই আকর রূপে আশ্রয় করেছেন । কিন্তু সেই গ্রন্থ দুটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা হরিদাস জীবনীর নানা উপাদানকে পরম অনুরাগের সঙ্গে সংকলন, স্ফূর্ততা দিয়ে অনুভব এবং সবার উপর সহজ সরস করে রূপ দেওয়ার চিত্তশক্তির স্বচ্ছ উজ্জ্বল প্রমাণ মিলে এই আলোচ্য গ্রন্থে ।

অনাচ্ছন্ন মনে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে, বিষয়কে পরিষ্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রচনার ক্ষমতা এই লেখকের আছে । এই ক্ষমতার গুণে এখন জানা কত সহজ হোলো, হরিদাসের জীবন সত্যই কি বিস্ময়কর, বিচিত্র ছিলো । কত চক্রান্তের প্রতিকূলতায়, কত নির্ঘাতনের নির্মমতার আঘাতে হরিদাসের ভক্তিশক্তির অলৌকিকতা পরিষ্কীত ; কত বিনয়ে-দৈন্যে কত অনীহতায় এবং অনুরাগে যে হরিদাসের মহৎ জীবন ছিলো সুন্দর, আনন্দভাজন তা স্পষ্টই প্রতীত হয়েছে এই গ্রন্থে । এক একটি পরিচ্ছেদে হরিদাস জীবনের এক-এক প্রকাশকে এমন করে রূপ দিয়েছেন এই লেখক যে তাতে হরিদাসের মহাজীবনকে যেন একবারে প্রত্যক্ষ করা যায় । গ্রন্থের ভাষাতেও কী চমৎকার কমনীয় প্রসাদ-গুণ ।

অকুণ্ঠিত চিত্তে বলতে ইচ্ছা করে বাঙলা জীবনী-সাহিত্যের ভাণ্ডারে গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখ্য এক সংভরণ ।

—ধীরানন্দ ঠাকুর

Anil Chandra Banerjee

M. A. Ph D.

P228. C. I. T. ROAD

CALCUTTA-10

শ্রীচৈতন্য চরণে সমর্পিত চিত্ত শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস কর্তৃক
সঙ্কলিত ঠাকুর হরিদাসের পরম পবিত্র জীবন কাহিনী পাঠ করিয়া
ধন্য হইলাম। বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্য রূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি
রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন এবং ভক্তিরস পানে উন্মুখ বৈষ্ণব সমাজকে
সাদরে উপহার দিয়াছেন। আশা করি তিনি ভবিষ্যতে অন্যান্য
বৈষ্ণব মহাজনগণের পুণ্য জীবনী পাঠক সমাজে উপস্থিত করিবেন।
ভক্তগণের নিকট এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩১শে বৈশাখ

ওঁ

চৈত্র সংক্রান্তি

৬১১, মুর এভিনিউ.

কলিকাতা-৪০

পরম পূজনীয় বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীরামকিঙ্কর দাস

শ্রীচরণকমলেষু—

অপ্রত্যাশিত ভাবে গত বুধবার ২৯শে চৈত্র আপনার প্রেরিত
“ঠাকুর হরিদাস” নামক শ্রীগ্রন্থখানি পেয়ে বিস্ময়ে পুলকিত হলাম।
এমন একটি মহাগ্রন্থ আমার মত অধম নরকুকুরকে আপনি প্রেরণ
করা কেন সঙ্গত মনে করলেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বইটি
পাঠিয়ে আপনি মাদৃশ অভাজনকে যে করুণা প্রদর্শন করেছেন তার
জন্মে আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করছি।

পরম ভক্ত বৈষ্ণব ব্যতীত একুপ সদগ্রন্থ সমালোচনার অধিকার জন্মে না। কিন্তু আমি তো বৈষ্ণব নই। ভক্তও নই। আমার মতো অকৃতী অধম এক পাষণ্ডকে অভিমত প্রকাশের আহ্বান জানিয়ে অবশ্যই আপনি অমানীকে মান দান করেছেন। আমি সম্মানিত হয়েছি নিঃসন্দেহ কিন্তু আপনার সঙ্কলিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির সম্মান বৃদ্ধি করতে পারব কি না জানি না।

ঠাকুর হরিদাস গ্রন্থখানির মুদ্রণ পরিপাট্য প্রশংসনীয়, চিত্রগুলি সুনির্বাচিত, সু-অঙ্কিত উপযুক্ত উপলক্ষে প্রদত্ত। কিন্তু এ তো কেবল বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের উৎকর্ষের কথা।

অন্তরঙ্গ বিচারে দেখা যায় যে একুশটি সুবিভক্ত পরিচ্ছেদে গঠিত এই গ্রন্থের বিষয় বস্তু ভক্তিরসপরিপ্লুত অথচ জীবনীগ্রন্থসঙ্গত ঐতিহাসিকতায় সমৃদ্ধ। ঠাকুর শ্রীহরিদাসের জীবন কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও ভক্তিরোমাঞ্চময়। তাঁর জীবনে যা কিছু শিক্ষণীয় উপাদান ছিল, গ্রন্থকার সমস্তই সযত্নে সংগ্রহ করেছেন। যা কিছু পবিত্র, যা কিছু মধুর, সে-সবের একশেষ করে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়েছে। লেখক নিত্য নব অভ্যুদয় লাভ করুন; এই পত্র লেখকের বিনীত প্রার্থনা। কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতা মতি নিয়ে নির্ঠার সঙ্গে এই সঙ্কলন কার্য তিনি সমাপ্ত করেছেন। তাঁকে আমি সর্বান্তঃ করণে সাধুবাদ জ্ঞাপন করছি।

যখন হরিদাস যে প্রকৃতই মুসলমান ছিলেন, এ কথা অবিশ্বাস করার কারণ দেখি না। তিনি খাঁটি মুসলমান না হলে তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে কাজিরা অসম্ভব হয়ে তাঁকে বাইশ বাজারে কোড়া মারার আদেশ দিতেন না। প্রকৃত গবেষকের সত্যনিষ্ঠা নিয়ে শ্রীরামকিঙ্কর অন্য সম্ভাবনাগুলির উপর আলোক পাত করেছেন। তবে দুটি প্রামাণিক গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত যে সাক্ষ্য বহন করছে তার ঐতিহাসিকতা স্বয়ং সার যত্নাথ সরকারের মতো

পণ্ডিতও মেনে নিয়েছেন। সুতরাং হরিদাসের যবন হওয়া সত্ত্বেও ভক্তি মূলক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের বিষয়ে কোন অপ্রত্যয় বা সংশয়ের অবকাশ দেখি না। এমন সদৃষ্টান্ত আরও আছে।

পরিশেষে আপনাকে প্রণিপাত জানিয়ে এ পত্রের উপসংহার-
করি। কোটি জন্মের সুকৃতি ব্যতীত এমন গ্রন্থ রচনা সাফল্য দেখা
যায় না।

ইতি

আপনার দাস নরাধম অধ্যাপক—

শ্রীশ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কানুপ্রিয় গোস্বামী

নবদ্বীপ,

শ্রীশ্রীগৌরহরি জয়তি ॥

শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ পদারবিন্দমধুপেয়ু—

সবহুমান নিবেদন,—

ভবদীয় কৃপা প্রদত্ত ‘ঠাকুর হরিদাস’ গ্রন্থখানি পাইয়া ও মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইলাম, পরে আপনার কৃপালিপিও পাইয়াছি জানিবেন। জগদ্বরেণ্য শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের পুণ্য চরিত এবং বাহা আপনার ন্যায় মহতের সঙ্কলিত, এতাদৃশ গ্রন্থের সমালোচনা করিবার যোগত্যা ও সাহস যে, মাদৃশ হীনজনের থাকিতে পারে না, এ কথা উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন তথাপি আপনার ন্যায় পরম বৈষ্ণবের কৃপা নির্দেশ পালন করা অত্যাবশ্যক বিবেচনায়, নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ণন যজ্ঞই বর্তমান যুগে ‘সর্বযজ্ঞ সার’ অর্থাৎ মুখ্য ধর্মরূপে বিদ্যোশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নামের মহামহিমা শাস্ত্রে নিগূঢ় ভাবে নিহিত থাকিলেও কলিপাবনা-

বতারী শ্রীনাম প্রেম ধর্মের জগতে মহাপ্রবর্তক শ্রীশ্রীমহাপ্রভু—
শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ আবির্ভাবের পূর্বে উহা প্রকৃষ্টরূপে জন সমাজে
প্রচারিত হয় নাই। তদীয় শ্রীচরণানুচর নিত্য পরিকরগণ সকলেই
শ্রীকৃষ্ণ নাম পরায়ণ ছিলেন। তন্মধ্যে আবার শ্রীঠাকুর হরিদাস
ছিলেন সেই ভুবন মঙ্গল শ্রীহরিনাম প্রচারের শ্রীগৌরলীলার অগ্রদূত।
অমৃতময় শ্রীনাম মাহাত্মের মূর্তি বিগ্রহরূপে ঠাকুর শ্রীহরিদাস এই মর
জগতে নামামৃত বিতরণের জন্য প্রকট হইয়াছিলেন যথা সময়ে
শ্রীগৌরচন্দ্রেরই প্রেরণায়।

শুদ্ধা ভক্তিই সর্বজীবের আত্মধর্ম। জীবের দেহে দেহে ভেদ
থাকায় দৈহিক গুণ-কর্মাদির ভেদ অনুরূপ দৈহিক ধর্মের ভিন্নতা
অনিবার্য। কিন্তু জীবতার মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ না থাকায় এবং
সকল জীবের একই ‘কৃষ্ণদাস’ সম্বন্ধ হওয়ায়, বর্ণাশ্রমাদি দৈহিক ধর্মের
মত এই সর্বাত্ম ধর্ম ভক্তির আচরণে তাই জাতি-কুলাদি কিম্বা স্থাবর
জঙ্গমাদি অথবা দেশ-কাল পাত্রাদিরূপ কোন অধিকার ভেদ নাই।

“কৃষ্ণ ভজনে নাই জাতি কুলাদি বিচার”।

ভক্তিই পরম স্বতন্ত্রা ও সর্বনিরপেক্ষা। এই হেতু সর্ব জীবের
পরম আত্মধর্ম ভক্তিই।

শ্রীকৃষ্ণ নাম সংকীর্তন হইতেছেন জীব হৃদয়ে সেই সুছলভা ভক্তি
সঞ্চারের ‘পরম উপায়’।

“নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়”।

নববিধা ভক্তি উদয়ে শ্রীনাম সংকীর্তনই পরম কারণ।

“নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হইতে হয়।” সুতরাং বর্তমান যুগে
শ্রীনাম সংকীর্তনই সর্বজীবের সর্বশ্রেষ্ঠ বা পরম আত্মধর্ম।

“তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন”।

এতাদৃশ অব্যর্থ-প্রভাব শ্রীনাম গ্রহণে যদি শ্রদ্ধাদিক্রমে ভক্তির
উদয় না দেখা যায়, তবে অপর কোন কারণের অন্বেষণ না করিয়া,

বুঝিতে হইবে কোন নামাপরাধ সংঘটিত হওয়ায়, যাহার ফলে শ্রীনাম অপ্রসন্নতাবশতঃ স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন না।

“তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।

কৃষ্ণনাম বীচ তাহে না হয় অক্ষুর।” এই হেতু সর্বভাবে দশবিধ নামাপরাধ বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া শ্রীনাম গ্রহণের উপদেশ।

“নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন”।

একমাত্র নামাপরাধ ব্যতীত নামের ভজনে অপর কোন বিধি নিষেধ নাই।

“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।

দেশ কাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধি হয়।”

শ্রীনাম সঙ্কীর্ণনের এই সর্বনিরপেক্ষতা ও সার্বত্রিকতারূপ মহা মহিমার জন্য শ্রীনামই এই যুগে, জীবের সর্বোত্তম আত্মধর্ম-রূপে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। তাই কেবল মানুষের জন্যই নহে স্থাবর জঙ্গমাবধি সর্বজীবেই শ্রীনাম কীর্তন প্রভাবের ক্রিয়াশীলতা শাস্ত্রসিদ্ধ।

“স্থাবর জঙ্গমাদি বলিতে না পারে।

শুনিলে সে হরিনাম, তারা সব তরে।”

অপর কোন ধর্মের, মনুষ্যত্বের সর্বজীবে এতাদৃশ ব্যাপকতা বা সার্বত্রিকতা দেখা যায় না।

শাস্ত্রোক্ত সেই শ্রীনাম মহিমা, শ্রীঠাকুর হরিদাস চরিত্রে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রতিটি আচার ও প্রচারে—

“আচার প্রচারে নামের কর ছুই কার্য্য।

তুমি জগতের গুরু জগতের বর্ষ” ॥” শ্রীসনাতন দাসের এই উক্তিভেদেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। স্থিরচিত্তে তদীয় জীবনী আলোচনায় ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

বেনাপালের গহন বনমধ্যে যে নাম যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতে পুষ্ট হইয়া ও তৎকালে জনাকীর্ণ সপ্তগ্রামের

ধনপতিগণের সভাগৃহে যাহার পূর্ণাছতি প্রদত্ত হইয়াছিল শ্রীনাম-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানে বিরুদ্ধবাদী অপরাধগ্রস্তগণের চেতনা সম্পাদনে এবং যে হরে কৃষ্ণ নাম মন্ত্রের পরম সাধ্যবস্তু হইতেছেন শ্রীগৌরসুন্দর ইহা ‘জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ’ এই শ্রীমদ্বৈত বাক্যে প্রকাশ রহিয়াছে। ঠাকুর হরিদাসের সেই শ্রীহরিনাম সাধনার পরিপূর্তির পরিসীমা বা চরম বিশ্রাম স্থল হইয়াছিল নীলাচলে সিদ্ধ বকুলতলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণের সহিত শ্রীগৌর চরণে মহাপ্রয়াণে ও স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক তদীয় শ্রীনামসিদ্ধ তনু অঙ্কে ধারণ করিয়া প্রেমনর্তনে এবং পরিশেষে সিন্ধুকূলে স্বয়ং শ্রীহস্তে বালুকা অর্পণ পূর্বক সমাধি দানে, জগতে শ্রীনাম মহিমার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছেন—এখনও সেই শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মঠ।

সেই হরিনামময় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সুমঙ্গল চরিত কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুসরণ পূর্বক সহজ সুন্দর সুন্দরিত ভাষায় সুনিপুণতার সহিত সঙ্কলিত হইয়া এই ‘ঠাকুর হরিদাস’ গ্রন্থে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা বর্তমান কলি সন্তপ্ত জগতের জনগণের মনে পরম মঙ্গল শ্রীহরি নাম গ্রহণের প্রেরণা জাগাইবে, ইহা যথেষ্টরূপে আশা করা যায়।

বিশেষতঃ পরবর্ত্তীকালের নামসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে যিনি অক্লান্ত ভাবে দেশের সর্বত্র শ্রীহরিনাম কীর্তন প্রবাহ বহাইয়াছেন—সেই বৈষ্ণবা-গ্রগণ্য শ্রীমৎ. রামদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুপম আখর যুক্ত কীর্তনাবলী এই গ্রন্থে সংযুক্ত হওয়ায় এবং সাক্ষাৎ সেই শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মর্ত্যলীলায় সিদ্ধিলাভ স্থান ‘শ্রীহরিদাস মঠ’ হইতে এই গ্রন্থের প্রকাশ ব্যবস্থা হওয়ায় এই সকল পরিবেশ প্রভাবে এই গ্রন্থে যে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা অতুলনীয় বলা যাইতে পারে।

আশা করি এই উপাদেয় গ্রন্থখানি নিত্য পাঠ্যরূপে গৃহে গৃহে বিরাজমান হইয়া জাতির কল্যাণ বিধানের সহায়ক হইবেন।

বিনীত নিবেদন ইতি—বৈষ্ণব কৃপালব প্রার্থী দীন কানুপ্রিয় গোস্বামী
শ্রীধাম নবদ্বীপ-

‘অমৃত’ (চিঠিপত্র)

Friday 5th. January,

গৌরাঙ্গ-পরিজন প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য

‘কি করে যে মুসলমানের ছেলে হরিদাস হল, সংসার বন্ধন ছিন্ন করে বিরাগী হল কেউ বলতে পারে না—’আমার এ উক্তিৰ ভিত্তি দীন রামকিঙ্কর দাস সঙ্কলিত শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মঠ, স্বর্গদ্বার পুরী থেকে প্রকাশিত’ ঠাকুর হরিদাস ‘গ্রন্থ’—রামকিঙ্কর দাস লিখছেন :

“হরিদাস ঠাকুর বুঢ়ন গ্রামে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন, তাঁহার বাল্যকালের কোন ঘটনাই বৈষ্ণব মহাজনগণ উল্লেখ করেন নাই। তিনি কতকাল পিতৃগৃহে ছিলেন। কিরূপে কোন স্পর্শমণির স্পর্শে তিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা এখন কাহারও জানবার সাধ্য নাই।……ঠাকুর হরিদাসের পিতা মাতার সঙ্গে কিরূপ সম্পর্ক ছিল। কিরূপে তিনি গৃহত্যাগ করেন, এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনগণ নির্বাক।”

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কলিকাতা-২৬

‘উদ্বোধন’

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম লীলা পার্শদ ও পরিকর ঠাকুর হরিদাসের স্থান ভক্তি জগতে অতি উচ্চে। তিনি ছিলেন ভক্ত শিরোমণি। কত লৌহময় জীবন যে তাঁহার স্পর্শ মণির স্পর্শে কাঞ্চন-জীবনে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আলোচ্য গ্রন্থখানি মহাভক্ত শ্রীহরিদাসের একখানি প্রামাণিক জীবন চরিত। সংকলন কর্তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবত—এই গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রধানতঃ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস ভক্ত পাঠকগণের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

‘দেশ’

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শদ এবং পরিকর যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাসের পুণ্য জীবন লীলা গ্রন্থ খানিতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু সঙ্কলন নহে, সাধনানুভূতি সমৃদ্ধ ভাবের সংবেদনে সঙ্কলন রীতি ভাবের একটি অবিমিশ্র রীতি গ্রন্থখানিতে পরিস্ফুট রহিয়াছে দেখা যায়। সংকলন কর্তা চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য ভাগবত এই দুই খানি গ্রন্থ হইতেই প্রধানত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুরের জীবনী গ্রন্থ ইতিপূর্বেও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানির একটি বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। বিশটি পরিচ্ছেদে আলোচনা বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি

অধ্যায় সঙ্কলন-কর্তার ভগবৎ প্রীতিমূলক অনুভূতির উজ্জল্যে পারস্পর্যসূত্রে ভাবের ঘনিষ্ঠতায় আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচনার মাধুর্য পাঠকের মনকে যেন এক নিঃশ্বাসে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। হরিদাস ঠাকুরের নির্বান উপলক্ষে শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্তন সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বিশিষ্টতায় রসভূয়িষ্ঠ লাভ করিয়াছে। বাবাজী মহারাজের ভাবসমাহিত কীর্তন রঙ্গে ভগবৎ প্রেমের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভক্তহৃদয়কে নাচাইয়া তোলে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাজদেবের লীলার মাধুর্যে আমাদের অন্তর আগ্নুত হয় এবং আমাদের মন ভাগবৎ-প্রীতিতে ভরিয়া উঠে। এমন পুস্তকের সর্বত্র সমাদর বাঞ্ছনীয়।

‘প্রবর্তক’

.....দীন—রামকিঙ্কর দাস বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং সাধক। তিনি বহু গবেষণা, আয়াস এবং শ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের বিচিত্র জীবন কথা সহজ এবং সরল ভাষায় আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য সুখ পাঠ্য সংক্ষিপ্ত এবং সংহত। রচনার সরসতা পাঠক সাধারণকে নির্বিশেষে পরমানন্দ লোকে নিয়ে যায়। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত নিজস্বতা এবং বিশটি পরিচ্ছদে একটি মহামানবের সুখ-দুঃখ হাসি অশ্রুর আলেখ্য উপস্থাপনের অনায়াস ভঙ্গি সুন্দর।

আমরা ঠাকুর হরিদাসকে জীবন-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন বলেই মনে করি। এবং লেখককে সাধুবাদ জানাই।

রবিবারের 'বসুমতী'

মহাপ্রভু অভিন্ন হৃদয় পার্শ্বদ বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের জীবন কথা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি ধর্মান্বিতা ও ভক্তজনের ধর্ম ও ভক্তিভাব উন্মেষের পরম সহায়ক। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের লেখনীতে, বিপিন বিহারী দাস গুপ্ত মহাশয়ের 'হরিদাস ঠাকুরের জীবন কথা' গ্রন্থে এবং অনুরূপ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের বহু রচনার মধ্যে এই মহাপুরুষের হৃদয় গ্রাহী কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি ঈদৃশ গ্রন্থের আরও প্রকাশ ও আরও প্রচার বাঞ্ছনীয়। বর্তমান গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দাস মহাশয় উপযুক্ত গ্রন্থকর্তাদের ন্যায়ই আর একটি মহৎ কাজ করেছেন ঠাকুর হরিদাসের এই অপূর্ব জীবনী গ্রন্থখানি প্রকাশ করে। এই গ্রন্থের রচনা কৌশল, তথ্য সম্পদ, পরিচ্ছেদ বিভাগ ব্যতীত, অজস্র একাধিক রঙের যে চিত্র সম্পদ সংযোজিত হয়েছে তা অভাবনীয়। অকুণ্ঠ চিত্তে অর্থব্যয় না করলে এক প্রকারে গ্রন্থখানি মূল্যবান ও সুসোভিত করে তোলা কখনই সম্ভব ছিল না। ভক্তজনের মধ্যে এই গ্রন্থের অবশ্যই সমাদর হবে।

'শ্রীসুদর্শন'

সিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবন সীমার মাঝে অসীমের খেলা। তাই লেখনীমুখে তার সম্যক পরিচয় প্রদান—তার যথাযথ আলেখ্য চিত্রণ বড়ই দুর্লভ ব্যাপার, কারণ সে জীবনের অন্তর্গূঢ় রহস্য তো স্থূল তে, কামকামনার অঞ্জলিলিপু চোখে দেখা যায় না। এমনি অনন্য

সাধারণ নিগূঢ় তত্ত্বের খনি, নাম-প্রেমের মুর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন ঠাকুর হরিদাস। অনন্ত বারাধি সদৃশ পারাপার হীন সমুজীবনের পরিমাপ করিবে কে ? তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতন ভক্ত এবং অনন্য-সাধারণ পণ্ডিতকেও বলিতে শুনি—‘বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজে না বুঝয়’। মানব-সাধ্যের পরাকাষ্ঠা অধ্যাত্ম সাধনায়। এই সাধনায় যিনি যতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই অধ্যাত্ম জীবন রহস্যের উদ্ঘাটনে ততটুকু সমর্থ হইবেন। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারি গ্রন্থাকার গুরু-কৃপালব্ধ অধ্যাত্ম শক্তি এবং বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকাংশই ঠাকুর হরিদাসের এমন অপূর্ব চরিত-কথা রচনা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনা-শৈলী, প্রকাশভঙ্গীমার অপূর্বতা এবং ভাবের মাধুর্য্য ও ভাষার সৌন্দর্য্যে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জীবনী রচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার তুলনা বিরল। অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু রসিক ভাবুক পাঠকমাত্রেই গ্রন্থপাঠে মুগ্ধ হইবেন— তৃপ্ত হইবেন।

— — — —

‘হিমাদ্রি’

ঠাকুর হরিদাস ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ। শুধু অন্তরঙ্গ নয় বিশিষ্টতম পার্শ্বদও তিনি বটেন।

জনজীবনে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশের বহু আগে, চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মান্দোলন শুরু হওয়ার বহু আগে যে ছইজন বৈষ্ণব গোড়দেশে ভক্তি ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে ব্রতী হন তাঁহাদের একজন অদ্বৈত আচার্য্য

অপর হরিদাস ঠাকুর। হরিদাসের বিশেষত্ব অষ্টমতের মত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিনি প্রচার করেন নাই—করিয়াছেন প্রপত্তি ও নাম সাধন-মূলক ভক্তি ধর্মের প্রচার। কৃষ্ণ নামের মহাচারণ ও ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে তাই হরিদাস গৌড়দেশের সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন। যবন কুলে জন্মান সত্ত্বেও যে অত্যাশ্চর্য্য বৈষ্ণবীয় সংস্কার তাঁহার জীবনে উদ্গত হইতে দেখা গিয়াছে তাহার তুলনা বিরল।

মহাপ্রভুর প্রেমলীলা ভক্ত প্রবর হরিদাসের জীবনে অপরূপ মহিমায় প্রতিফলিত হয়। দৈন্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও ভক্তি প্রেমের বিকাশ দেখা যায় তাঁহার সাধন সত্বে। হরিদাসের নির্য্যান লীলার যে করুণ মধুর বর্ণনা চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে ভক্তি সাহিত্যে তাহার তুলনা খুজিয়া পাই না। মহাপ্রভুও তাঁহার প্রাণসর্বস্ব হরিদাসের অন্তিম সংলাপ ও প্রেমাস্তি আজও সহস্র সহস্র ভক্তের হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তোলে। মহাভক্ত ঠাকুর হরিদাসের জীবন-লীলার এক অপূর্ব আলেখ্য, লেখক এই গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়াছেন। হরিদাসের জীবন তথ্য বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা হইতেই প্রধানতঃ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সংগৃহীত তথ্য ও হরিদাস-তত্ত্ব যে ভাবে তিনি পরিবেশন করিয়াছেন তাহা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। মহা বৈষ্ণব হরিদাস, নামমুক্তি হরিদাস এখানে যেন জীবন্ত হইয়া ধরা দিয়াছেন।

রামদাস বাবাজী মহারাজের অনুভূতি লব্ধ সুললিত পদাবলী ও আখর সমূহ সংযোজিত হওয়ার গ্রন্থের আকর্ষণ আরো বাড়িয়াছে পুরাতন ও আধুনিক চিত্রগুলি অবশ্যই ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতি অনু-ধ্যানের সহায়তা করিবে। এই গ্রন্থটি শুধু বৈষ্ণব সমাজেরই উপকার করিবে না, অধ্যাত্মরসিক পাঠক মাত্রেরই কল্যাণ সাধন করিবে।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
হৃদয়ের	১৮০	৪	বাহিরের
যদি রাখতে সাধ তবে এই জগতে	৫৭০	৬	যদি রাখতে সাধ এ জগতে, তবে
স্বর্গ	১৭	১৪	স্বর্গ
সু-পরিষ্কৃত	১১/	১	সু-পরিষ্কৃত
ভুলগ্ঠিত	১১৭০	৭	ভুলগ্ঠিত
হেলোকুলিত	১১৮০	৮	হেলোকুলিত
যে	১৫০	১০	সে
অনুস্মৃত	২১	১৮	অনুস্মৃত
বৈশিষ্ট্যম্	২৮	১২	বৈশিষ্ট্যোন
বৈশিষ্ট্যন	২৮	১২	বৈশিষ্ট্যম্
মাধবকুঞ্জ	৩১০	১১	মাধবীকুঞ্জ
শ্রীকুঞ্জতটে	৩১০	১৩	শ্রীকুঞ্জ-তটে
আবির্ভাব	২	২৩	আবির্ভূত
নত্য	৯	২৫	নিত্য
ইত্যাदिগুণ	১৭	৯	ইত্যাदिগুণঃ
মস্ত	১৮	২৩	মস্ত
ব্রজলীলার	৩৭	৩	ব্রজলীলায়
মদির	৪২	১	মদিরা
সেই জগৎ	৪৭	১০	এবং
কণ্টক	৪৯	৩	কণ্টক
স্কন্ধ	৬২	১০	স্কন্দ
প্রেমবৈচিত্র্য	৭৫	১০	প্রেমবৈচিত্র্য
ভাগের	৭৭	১৪	ভোগের
প্রেমবৈচিত্র্য	৮০	১০	প্রেমবৈচিত্র্য
আশায়	৯৮	৫	আশয়

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
পড়িলেন	১০২	১	পড়িলে
নিম্নোহধন্যজন	১০৫	১৭	নিম্নোহধন্যজন
ব্রহ্মের	১০৫	২০	ব্রহ্মের
সমর্পয়তু	১০৭	১৮	সমর্পয়িতু
সভক্তি	১০৭	১৮	স্বভক্তি
নিজপ্রণয়িতাং	১০৮	১	নিজপ্রণয়িতাং
ভূজেঃ	১১১	১৩	ভূজঃ
পবনমালী	১১১	২১	পবনালী
দৃশোর্ঘ্যশ্রুতি	১১২	২	দৃশোর্ঘ্যশ্রুতি
রথারূঢ়স্মারাদধিপদবি	১১২	৯	রথারূঢ়স্মারাদধিপদবি
বদভ্র	১১২	১০	বদভ্র
শ্রমজুষাং	১১৪	১১	শ্রমজুষাং
চিরমসুরভাবপ্রণয়িনং	১১৫	১৫	চিরমসুরভাবপ্রণয়িনাং
স্মিতলোকঃ	১১৭	২০	স্মিতলোকৈঃ
শকে	১২৮	১৭	খৃষ্টাব্দে
খাতক	১৩৩	৮	ঘাতক
মণ্ডল	১৩৮	১	মণ্ডন
দানে	১৫০	৪	দান
রাজমন্ত্রীর	১৭৪	২১	রাজমণ্ডীর
শুদ্ধ ভক্তের নাম	১৭৯	১১	শুদ্ধভক্তের
সর্ব অবস্থায়	১৭৯	১২	সর্ব অবস্থায়
আমাদের			“নাম” আমাদের
পরিচ্ছেদ	১৮০	১	তরঙ্গ
প্যাপী	১৮৬	১১	ব্যাপী
শুঁটিষ্ঠ	২০২	৫	শুঁঠ
অন্ধ	২১২	২১	অন্ধ

অঙ্ক	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
বহিঃপ্রকাশ	২৯৩	১৮	বহিঃপ্রকাশ
কন্যা	৩০৭	৮	কন্যা
ভাবের বৈচিত্র্য	৩১৫	৭	ভাবের বৈচিত্র্য
অগ্নির	৩২২	১৮	অগ্নি
হাস	৩৩৩	১০	হাস
অমূল্য	৩৩৩	১৬	অমূল্য
কদাচু	৩৩৬	৭	কদাচু
দৃশোর্মে	৩৩৬	৭	দৃশোর্মে
গিয়াছিলেন	৩৩৯	১৪	গিয়াছেন
পারে	৩৫১	২২	পরে
অত্যাধু	৩৬২	৭	চা তদুত
এক	৩৭৪	৮	একা
ভাবের	৩৮২	৭	ভাবে
ছন্তে	৩৮৬	১৯	ছরন্তে
মতীতৈবানয়োভ্রাজতো	৪০৬	১০	যোগকর ভ্রাজতে
তয়োমিত্রতমীয়ষঃ	৪০৬	১৩	তয়োমিত্রতমীয়ুষঃ
কৃতিষদিতন	৪০৬	১৪	কৃতিষুদিতন
হৃদয়ং	৪২৯	১৩	হৃদয়
পুরঃ	৪৩০		পুনঃ
মুদে	৪৩০	১২	মদে
ভূজপদোঃ	৪৩২	৭	ভূজপদোঃ
শ্রীগৌরাজ্ঞা	৪৩২	৯	শ্রীগৌরাজ্ঞা
যা	৪৩২	১৩	না
কালিন্দিক	৪৩৩	২	কালিন্দিক
হরিদৃষ্টা	৪৪০	২	হরিদৃষ্টা
মুকুরগতাত্মানমতুলং	৪৪০	২	মুকুরগতাত্মানমতুলং

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
মুহর্গোবিন্দাচ	৪৪৩	২	মুহর্গোবিন্দাচ
নিজ	৪৪৪	১৫	নিজ
শচীশূরু	৪৪৪	১৬	শচীশূরুঃ
গূঢ়াং	৪৪৫	১০	গূঢ়াং
পরিদির্শন্	৪৪৬	১৭	পরিদিশন্
গকুল	৪৪৯	৫	গোকুল
পৃথুপ্রেমাস্তোধো	৪৫০	৪	পৃথুপ্রেমাস্তোধো
উরে	৪৫১	২৩	উরে
কোথায়	৪৫৬	৬	কোথাও
নিশি দিশি	৪৯৩	১, ২, ৩	দিবা নিশি
আরোপিই	৫২২	১৪	আরোপই
স্বা স্বা	৫২৫	৭	স্ব স্ব
ধীন	৫২৫	৮	অধীন
ভূলে	৫২৬	৩	ভূলে
বোঝে	৫৩২	২৬	বোঝো
তিলকেনাভ্যর্চয়ন্	৬০৫	২২	তিলকেনাভ্যর্চয়ন্
সংদর্শম্	৬০৫	২১	সংদর্শান্ম্
চক্ষুশ্মত্‌মিদং	৬০৫	২২	চক্ষুশ্মত্‌মিদং
চাক্ষোহপি	৬০৫	২৩	চাক্ষোহপি

“নিজের ছুঁখে যে চক্ষে জল আসে সেটি বন্টার জল, জমি উর্বরী না করে বরং যা কিছু ফসল থাকে ডুবাইয়া নষ্ট করে ; কিন্তু অপরের জন্য যে জল চক্ষে আসে তাহা আকাশের ধারাবারি, সমস্ত হৃদয় টুকুকে সিদ্ধ ও উর্বরী করে এবং অচিরে সেই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে কৃত কৃতার্থ করে—

হৃদয় কর্ষণের এমন সহজ ও সরল উপায় আর দ্বিতীয় নাই। এই প্রকার চক্ষের জলে ও কৃষ্ণ-নাম-মহামন্ত্র দ্বারা হৃদয় ‘সিদ্ধ’ ও ‘কর্ষণ’ করিতে থাকুন” (পাগল হরনাথ)

গৌরাঙ্গপ্রিঃ

